জুল ভের্ন

রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড



জুল ভের্ণ রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

অনুবাদ ও সম্পাদনায়: অদ্রীশ বর্ধন



বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক : মন্মথ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

দাম : ষোল টাকা

মুদ্রক : অজিত কুমার সামই

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১/১এ গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

॥ জুল ভের্ন ॥

জন্ম নানতেস-এ, আটই ফেব্রুয়ারী ১৮২৮। পড়লেন আইন, হলেন সাহিত্যিক। আমেরিকা গেলেন ১৮৬৭ সালে। মারা গেলেন অ্যামিয়েন্সএ, চব্বিশে মার্চ, ১৯০৫।

আধুনিক সায়েন্স ফিকশ্যানের জনক বিশ্বখ্যাত কাহিনীকারের স চাইতে চাঞ্চল্যকর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ 'বিজ্ঞান সুবাস' রোমাঞ্চকর কল্পকাহিনী ফ্যানটাসটিক অ্যাডভেঞ্চার, কল্পনাবহীন ভবিষ্যদর্শন প্রতিটি উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় বহুলক্ষ কপি বিক্রিত। জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, এমন কি পৃথিবীর বাইরের দুঃসাহসিক অভিযানের বিস্ময়কর শ্বাসরোধী কাহিনী। পরিবারের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়ার মত, বারবার পড়ার মত অনুপম রচনা সংগ্রহ।

সূচীপত্র

□ □ □

পৃষ্ঠা

দুনিয়ার মালিক

[মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড]

... .

(১) পাহাড়ের রহস্য

এ-কাহিনীতে নিজের কথাতেই সাতকাহন যদি হই তো বুঝতে হবে এ-ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বড় বেশী জড়িয়ে পড়েছিলাম অত্যাশ্চর্য কতকগুলো ঘটনায়। অত্যাশ্চর্য এই অর্থে যে বিংশ শতাব্দীতে এরকম অসাধারণ বিস্ময় বুঝি আর দেখা যাবে না। এক কথায় এ-কাহিনীকে এই শতাব্দীর পরমাশ্চয বললেও চলে। মাঝে মাঝে নিজেরই মনে হয়, সত্যিই এ-ঘটনা কি ঘটেছিল? মনের পটে যে ঘটনাব ছায়াছবি এখনো ভেসে চলেছে, তা সত্যিই স্মৃতিব সিনেমা, না, মনগড়া বিভ্রান্তি? ছেলেবেলা থেকেই অজ্ঞাত-রহস্যের পেছনে ছোটার সুযোগ পেলে আমি আর কিছু চাই না। দুর্জ্ঞেয়, কুহেলী আবৃত এবং গোলকধাঁধাব মত জটিল যে কোনো সমস্যা চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছে আমাকে আমার শৈশবকাল থেকেই। বড় হয়ে এই নেশা আরো বেড়ে ছিল বলেই আজ আমি ওয়াশিংটনস্থ ফেডারাল পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট হেড ইন্সপেক্টর। একদিক দিয়ে কর্তব্যের চাপ আর একদিকে নেশার তাগিদ—দুইয়ের ঠেলায় আমি বিচিত্র অদ্ভুত এই ঘটনামালায জড়িযে ফেলি নিজেকে। অল্প বয়স থেকেই সরকার বাহাদুর আমাকে অনেক রকম গোপন তদন্তের ভার দিয়েছেন। হরেক রকম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ফয়সালা করার দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়েছেন। তাই অত্যাশ্চর্য এই ঘটনাসমূহের গুরুদায়িত্বও যে আমার কাঁধে চাপবে এ-আর আশ্চর্য কী। চমকপ্রদ তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর যে ধরনের দুর্ভেদ্য রহস্যলহরীর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে নামতে হল আমাকে, তার সমতুল্য হেঁয়ালী ইতিহাসে আর নেই!

একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুরোধ সর্বাগ্রে জানিয়ে রাখি। এ-কাহিনী বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঠকপাঠিকা যেন আমাকে বিশ্বাস করেন। বহুক্ষেত্রে কোন তথ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারব না আমি—আমার মুখের কথাকেই বিশ্বাস করতে হবে। যদি না করেন, করবেন না। কেননা, যা ঘটেছে, তা আমি নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারি না। অবিশ্বাস্য ঠিকই, কিন্তু সত্য।

আশ্চর্য এই হেঁয়ালী-কাহিনীর সূচনা ঘটে আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার পশ্চিম অঞ্চলে। এই অঞ্চলেই রয়েছে গ্রেট আইরী পর্বতশৃঙ্গ—ব্লু-রিজ পর্বতমালার মধ্যে। ক্যাটবা নদীর ধারে অবস্থিত মরগ্যানটন নামে ছোট্ট শহর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় পাহাড়টার প্রকাণ্ড গোলাকার অবয়ব। আরও পরিষ্কার দেখা যায় প্লেজ্যান্ট গার্ডেন গ্রামের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের দিকে আসবার সময়ে।

গ্রেট আইরীর নাম গ্রেট আইরী হয়েছে কেন, এত নাম থাকতে গ্রেট আইরী স্থানীয় বাসিন্দারা নামটা পছন্দ করল কেন উন্নতশীর্ষ পর্বতটার জন্যে, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রেট আইরীর শিখরদেশ একদম ন্যাড়া, পাহাড় তো পাহাড়ই—পাথর ছাড়া কিস্সু নেই; দেখলে বুক কাঁপে—এমনি ভয়াল-দর্শন; এ-পাহাড়ে চড়ার ক্ষমতা অতিবড় পর্বতারোহীরও নেই—এক কথায় দুর্লঙ্ঘ্য; আবহাওয়ার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় গোটা পাহাড়টাকে অদ্ভুত রকমের নীল দেখায় এবং মনে হয় এ-পাহাড় যেন নীল আকাশেরই খসে পড়া টুকরো—কাছে যাওয়া যায় না—গেলে মরীচিকার মত সরে সরে যায়।

গ্রেট আইরী নামটা এসেছে বোধহয় বিস্তর পাহাড়ি পাখীদের নাম থেকে। এ-পাহাড় যেন শিকারী পাখীদের আস্তানা বিশেষ। শকুন, ঈগল, কনডর—ভীষণাকৃতি প্রচণ্ড শক্তিমান আকাশের আতংক বলতে যে সব পাখীদের বোঝায়—পাথরময় পাহাড়টা যেন তাদের গোপন ঘাঁটি। সংখ্যায় যে তারা কত সে হিসেব কে রাখে? শিখর ঘিরে তারা ওড়ে বিশাল ডানা ঝটপটিয়ে, তীক্ষ্ণ তীব্র রক্তজল করা চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হয়—মানুষ কোনোদিন যে-চূড়ায় পৌঁছোতে পারেনি—সেখানে অবাধে বিচরণ করে।

এ-হেন গ্রেট আইরী যেন পক্ষীকুলের কাছে আর তেমন আকর্ষণীয় মনে হচ্ছেনা। দূর থেকে দেখা গেছে, পাখীর দল শিখরের অনেক ওপরে থেকে চক্কর দিতে থাকে, গগনবিদারী হাঁকডাকে দিকবিদিক মুখরিত করে, তারপর দানবিক ডানায় বাতাস তোলপাড় করে—কর্কশ ভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে দ্রুতবেগে উড়ে যায় অন্যদিকে।

গ্রেট আইরী নামটা তাহলে টিঁকে গেল কেন? এ-পাহাড়ের নাম আগ্নেয়-গিরির জ্বালামুখ রাখলেই যেন মানাতো। কে জানে খাড়াই গোলাকার দেওয়ালের মাঝখানে প্রকাণ্ড গহ্বর আছে কিনা। কে জানে প্রকৃতির হাতে গড়া সেই প্রকাণ্ড গামলার মধ্যে একটা সরোবর আছে কিনা। আশ্চর্য কিছু নয়। আপ্পালাচিয়ান পর্বতমালার কিছু অঞ্চলে এমনি উপহ্রদ দেখা যায়; শীতের তুষার আর বর্ষার বৃষ্টি জমে পাহাড়ি গর্তে। তৈরী হয় উপহ্রদ।

সংক্ষেপে, গ্রেট আইরী আসলে একটা প্রাচীন আগ্নেয়গিরি কিনা, তা কেউ

জানে কি? বহুযুগ ঘুমন্ত ছিল, কিন্তু প্রশমিত হয়নি জঠরের অগ্নি? মঁ পিলীর মত ভয়ংকর বিপর্যয় বা মাউন্ট ক্রাকাটোয়ার মত প্রলয়কাণ্ড কি ফের ঘটতে চলেছে গ্রেট আইরীর আশেপাশেও? গহ্বরে জমা জল পাথুরে ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁয়ে মাটির তলার আগুনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তা বাষ্পে পরিণত হবে—বেরোনোর পথ না পেয়ে কল্পনাতীত বিস্ফোরণে আগুন, ছাই, লাভা, পাথর দিয়ে ডুবিয়ে দেবে ক্যারোলিনার শ্যামল ভূপ্রকৃতিকে, ঠিক এমনি কাণ্ডই ১৯০২ সালে মার্টিনিক-য়ে ঘটেছিল, তাই না?

সর্বশেষ এই সম্ভাবনাটার সমর্থনেই যেন কয়েকটা লক্ষণ দেখা গিয়েছে সম্প্রতি—লক্ষণগুলো অগ্ন্যুৎপাতের লক্ষণ বলেই মনে হয়। ধোঁযার কুণ্ডলী ভাসতে দেখা গেছে পর্বত শিখরে। চাষীরা পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাটির তলায় অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছে—গুমগুম শব্দ ভেসে আসছে পাতাল রাজ্য থেকে, গভীর রাতে দেখা গেছে পাহাড়চূড়োর মাথার আকাশ লাল হয়ে গিয়েছে আগুনের রক্তিম আভায।

হাওয়ায় ধোঁয়াব মেঘ ভেসে গেছে পূবদিকে প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেনের পানে, ছাই আর স্ফুলিঙ্গ ভাসতে ভাসতে নেমেছে মাটির ওপর। তাবপর একদিন ঝড় উঠতেই চূড়োব ওপর জমা ঘন মেঘে ম্যাড়মেড়ে অগ্নিশিখা প্রতিফলিত হয়েছে, এমন একটা নারকীয আভা ছডিযে পড়েছে বাতের মেঘে যে দূর থেকে দেখে গা ছমছম করে উঠেছে গাঁয়ের লোকের। মনে হয়েছে কবাল পাহাড যেন অগ্নিগর্ভ মেঘ মুকুট পরে তৈবী হচ্ছে রুদ্রলীলাব জন্যে।

এই সব অদ্ভুত কাণ্ডকাবখানা দেখে আশপাশের লোকজন ভড়কে যাবে, এ-আর আশ্চয কী। সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড কৌতূহল। পাহাড়ের পেটে কি আছে—জানতেই হবে। "গ্রেট আইরীব রহস্য"—এই শিরোনামায় গবম গরম খবর ছাপা হতে লাগল ক্যারোলিনার সব কটা খবরের কাগজে।

সবাই লিখল, এত ব্যাপারেব পর গ্রেট আইরীর ধারে-কাছে থাকা কি নিরাপদ? প্রাণ হাতে নিযে কি দরকার ওখানে থাকার? প্রবন্ধের পব প্রবন্ধে ঘুরিয়ে-ফিরিযে লেখা হল এই ধরনের আশংকা। যারা পড়ল, তাদেব কেউ কৌতূহলী হল, কেউ ভয় পেল। যারা কৌতূহলী হল, তাদের বাড়ী কিন্তু বিপজ্জনক এলাকার বাইরে। কাজেই প্রাণের ভয় নেই। তাই প্রকৃতি আবার কি খেলায নামতে চলেছেন, জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হল তারা। কিন্তু ভযে কাঠ হয়ে গেল তারাই যারা কাচ্ছা-বাচ্ছা বউ নিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে বসে আছে গ্রেট আইরীর ধারে-কাছে। প্রলয শুরু হলে তারাই মরবে

আগে। সব চাইতে আতংকিত হল মরগানটনের নাগরিকরা, প্লেজ্যান্ট-গার্ডেনের শান্তিপ্রিয় বাসিন্দারা এবং পাহাড় ঘিরে অবস্থিত গণ্ডগ্রাম আর খামার-বাড়ীর নিরীহ গ্রামবাসীরা।

এতদিন কেন পাহাড়ে উঠে গ্রেট আইরীর চূড়ো পর্যন্ত দেখে আসা হয়নি, এই নিয়ে এখন পরিতাপের অন্ত রইল না গ্রামবাসীদের। অ্যাদ্দিনে গ্রেট আইরীকে পায়ের তলায় রাখা উচিত ছিল পর্বতারোহীদের। কিন্তু তাদের আর দোষ কী? খাড়াই দেওয়ালে পা দেওয়ার মত জায়গা থাকলে তবে তো চূড়োয় উঠবে? গ্রেট আইরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার মত স্লুক সন্ধান পেলে কি তুঁদে পর্বতারোহীরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতো? কোথাও এতটুকু খাঁজ নেই তেলতেলে মসৃণ পর্বতগাত্রে—তাই তো সবাই হার মেনেছে গ্রেট আইরীর কাছে। কিন্তু আর বুঝি চুপ করে বসে থাকা যায় না।

ক্যারোলিনার পশ্চিম প্রদেশ যদি অগ্ন্যুৎপাতের লাভাস্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? এত বড় বিপদের আশংকা যখন দেখা দিয়েছে, তখন আর দেরী নয়। গ্রেট আইরীর পেটে কি কাণ্ড চলছে, তার সরেজমিন তদন্ত আশু প্রয়োজন।

জ্বালামুখ বেয়ে ওঠা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। অনেক বিপদ, অনেক অসুবিধে, অনেক ঝঞ্ঝাট আছে। সুতরাং আগে সে চেষ্টা না করে, পাহাড়ে না উঠেও পাহাড়ের ভেতরে এক ঝলক যাতে দেখে নেওয়া যায়, সেই চেষ্টাই করা উচিত নয় কি? স্মরণীয় সেই বছরেই সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে উইলকার এলেন মরগানটনে। উইলকার নামকরা বেলুনবাজ। বেলুনটিকেও তিনি সঙ্গে আনলেন। পূবদিক থেকে বাতাস বইলেই উনি বেলুনে চড়ে যাবেন গ্রেট আইরীর মাথা টপকে। অনেক উঁচুতে উঠলে গায়ে আগুনের আঁচ লাগবে না। বেলুনও অক্ষত থাকবে। সেই ফাঁকে শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে গ্রেট আইরীর গভীরতম কন্দর পর্যন্ত দেখে নেবেন উইলকার। সত্যি সত্যিই পাহাড়ের তলা ফাটিয়ে আগ্নেয়গিরি উঁকি দিয়েছে কিনা, সেটাই দেখা দরকার। এই একটা প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেলেই বোঝা যাবে আশপাশের অধিবাসীদের বরাতে কি আছে, অগ্ন্যুৎপাত যদিও বা ঘটে, বিলম্বে ঘটবে কি অবিলম্বে ঘটবে—তাও জানা যাবে।

প্রোগ্রাম মাফিক বেলুন উড়ল আকাশে—দোলনায় উইলকার তৈরী হয়ে রইলেন দূরবীন বাগিয়ে। ঝিরঝিরে হাওয়া একদিকেই বয়ে চলেছে। আকাশ টলটলে পরিষ্কার। মিষ্টি রোদে ভোরের মেঘগুলোও অদৃশ্য প্রায়। জ্বালামুখের ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী না থাকলে তলা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে

পাবেন বেলুনবাজ উইলকার। বাষ্প থাকলে বুঝতে পারবেন কোনখান থেকে কিভাবে ভুস ভুস করে উঠছে অত বাষ্প।

সাঁ-সাঁ করে পনেরোশ' ফুট ওপরে উঠে গেল গ্যাস-বেলুন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট পনেরো। পূবের হাওয়া জমির ওপরে এত আস্তে বইছে যেন গায়ে হাত বুলোচ্ছে আলতো ভাবে—অত উঁচুতে হাওয়ার বেগ তাই নেই। তার পরেই ঘটল অঘটন। একেই বলে দুর্দৈব। হঠাৎ উল্টো-পাল্টা হাওয়ার গুঁতো খেয়ে বোঁ-বোঁ করে পূবদিকে উড়ে গেল বেলুন। অনেক দূরে সরে গেল গ্রেট আইরী থেকে। চেষ্টার কসুর করলেন না নভোচারী উইলকার—কিন্তু অবাধ্য বেলুন দুর্দান্ত হাওয়ার দাপটে বায়ুবেগে মিলিয়ে গেল উল্টো দিগন্তে। পরে জানা গেল, বেলুনসহ উইলকার ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন নর্থ ক্যারোলিনার রাজধানী র‍্যালে-র সন্নিকটে।

ইতিমধ্যে নতুন করে গুম গুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পর্বত কন্দরে, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ উঠে আসছে জ্বালামুখ দিয়ে, রাতের আঁধারে যেন চুল্লীর আভায় লাল হচ্ছে আকাশ। সর্বনাশ! গ্রেট আইরীব অগ্ন্যুৎপাত কি তাহলে এগিয়ে এল? ভূত্বক কি এবাব শিউরে শিউবে উঠবে? শুরু হবে ভূমিকম্প? না, আর দেরী নয়। আরেকবাব শূন্যপথে তদন্ত করা দরকার গ্রেট আইরীর জ্বালামুখ।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে আবছা আশংকা পরিণত হল রীতিমত আতংকে। এতদিন গা ছমছম করত, এবারের খাড়া হল গায়েব লোম। খবরের কাগজগুলো মওকা পেয়ে উসকে দিল গণ আতংককে। পাহাড় আর মরগানটনের মাঝামাঝি অঞ্চলের তাবৎ জনসাধারণ ভয়ে আধমরা হয়ে রইল যে কোনো মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনায়।

চৌঠা এপ্রিল রাত্রে আচম্বিতে ভীষণ আওয়াজে ঘুম ছুটে গেল প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেনের নিরীহ অধিবাসীদের। মাথার ওপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল নাকি? ভয়ের চোটে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল বাসিন্দাদের। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ীর বাইরে, ভেবেছিল বাইরে বেরিয়েই হয়ত দেখবে ধরণী দু ফাঁক হয়ে গিলে নিয়েছে ক্ষেত খামার—মাইলের পর মাইল জুড়ে গাঁয়ের আর চিহ্ন নেই—মুখব্যাদান করে আছে ভূ-পৃষ্ঠ!

একে তো ঘুট ঘুটে অন্ধকার, তার ওপর রাশি রাশি মেঘ গুলতানি করছে প্রান্তরের ওপর। দিনের আলো পর্যন্ত হার মানত; মেঘের চাদর ফুঁড়ে নীচে নামতে পারতনা।—দিবালোকেও অদৃশ্য থাকত পর্বত মূর্তি।

নিশ্ছিদ্র তমিস্রার মধ্যে সেকী চীৎকার হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি। কেউ

কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কেউ কারও আর্ত চীৎকারে সাড়া দিচ্ছেনা, অথচ প্রত্যেকেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। হাতড়ে হাতড়ে অন্ধের মত এগোচ্ছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তাঘাটে গাদাগাদি করছে। চারিদিকের ভয়ার্ত সোরগোলের মধ্যে কতগুলো কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে —"ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!" "অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে গেছে!" "কোত্থেকে? কোত্থেকে?" "গ্রেট আইরী থেকে!"

দাবানলের মত খবর ছড়িয়ে গেল মরগানটনে—পাথর, লাভা আর ছাই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টির মত নামছে সারা অঞ্চলে।

ধড়িবাজ নাগরিকরা কিন্তু উড়ো খবরে কান দিল না। অগ্ন্যুৎপাত হলে আওয়াজ নিশ্চয় চট করে থামবেনা, বরং বাড়বে। আগুনের লকলকে চেহারাও দেখা যাবে জ্বালামুখের ওপরে, এমন কি মেঘলোক পর্যন্ত উদ্ভাসিত হবে পাতাল-অগ্নির লাভায়। কিন্তু সেরকম আওয়াজও নেই, আলোও নেই। ভূমিকম্প? কিন্তু কই, বাড়ী ঘরদোর তো ভূমিসাৎ হয় নি। তবে কি পাহাড় থেকে বিরাট শৈলখণ্ড গড়িয়ে পড়ার জন্যেই কেঁপে উঠেছে চারিদিক? হয়ত তাই।

একঘণ্টা অতিবাহিত হল নির্বিঘ্নে—নতুন কোন ঘটনা ঘটল না। পশ্চিমের হাওয়া ব্লু-রিজ মাউণ্টেনের যত কিছু আবর্জনা যেন ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিল। উঁচু পাহাড়ের পাইন আর হেমলক তরুর পাতায় পাতায় দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে, বিচিত্র মর্মর ধ্বনি ভেসে আসছে পর্বত থেকে সমতলে। আর কোনো ভয় নেই। আতংক ফিকে হয়ে আসতেই ঘরের লোক ঘরে ফিরতে লাগল। উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল ভোরের প্রতীক্ষায়।

তারপরে আচম্বিতে রাত তিনটের সময়ে পিলে চমকে উঠল বাসিন্দাদের। লম্বা লাফ দিয়ে গ্রেট আইরীর প্রস্তর-প্রাকার বেয়ে অগ্নিশিখা ধেয়ে গেল কালো আকাশের দিকে। আগুনের আভায় লালে লাল হয়ে গেল মেঘের দঙ্গল। আলোকিত হল বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই সঙ্গে একটা আশ্চর্য পট পট আওয়াজ শোনা গেল। যেন জঙ্গলে দাবানল লেগেছে, যেন একসাথে গাছ পুড়ছে, গুঁড়ি ফাটছে প্রচণ্ড শব্দে।

আগুন কি আপনা থেকেই জ্বলেছে? কিভাবে? বিদ্যুতের আগুনে নিশ্চয় গাছপালা জ্বলছে না—আকাশে বিজলীর চিহ্নমাত্র নেই। মেঘডাকার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। দাহ্য পদার্থের অবশ্য ঘাটতি নেই। ব্লু-রিজ মাউণ্টেনের ওপর দিকে জঙ্গলে শুকনো কাঠকুটোর তো অভাব নেই। কিন্তু এ-আগুন ধীরে ধীরে তো জ্বলেনি—হঠাৎ জ্বলেছে তাহলে?

"আগুন-পাহাড় জেগেছে! অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়েছে!"

দিকে দিকে উঠল আতংকঘন চীৎকার—অগ্ন্যুৎপাত! অগ্ন্যুৎপাত! গ্রেট আইরী তাহলে সত্যিই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি? এতদিন ঘাপটি মেরে থাকার পর ফের আগুন-বমি শুরু করেছে? আগুন নৃত্যের পরেই কি শুরু হবে পাথর বৃষ্টি আর ছাইয়ের ফোয়ারা? তরল অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে কি নামবে বন্যার মত গলিত লাভা? যাওয়ার পথে ছারখার করে দেবে শহর গ্রাম খামার বাড়ী? প্লেজ্যান্ট গার্ডেন আর মরগানটন পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ তৃণভূমি, শ্যামল বনভূমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে দানব পাহাড়ের সংহার লীলায়?

এবার আর আতংককে বাগ মানানো গেলনা, কোনোরকমেই বশে আনা গেল না। বাচ্ছা কোলে শিহরিত মায়েরা ছুটল পূবের রাস্তা বেয়ে। বাড়ী ঘরদোর ছেড়ে পুরুষরা দামী দামী জিনিসপত্র বাণ্ডিল বেঁধে নেমে পড়ল রাস্তায়—মুরগী শুওর গরু বাছুর ঘোড়া মেষকে ভাগিয়ে দিলে বন আর মাঠের দিকে। অন্ধকারের মাঝে সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার! কুচকুচে কালো আঁধার, কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেনা। একই সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে গুঁতোগুতি করছে মানুষ আর পশু, মিলিত কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে ইতর প্রাণী এবং দ্বিপদ প্রাণী, মাথার ওপর জ্বলছে আগ্নেয়গিরির আগুন, গা ঘেঁসে রয়েছে জলার জল—যে কোন মুহূর্তে সে জল উথলে উঠে ভাসিয়ে দেবে বনজঙ্গল মাঠ গ্রাম! এমন কি পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত কখন জানি সরে যাবে—মাটির মানুষকে টেনে নেবে মাটির তলায়! এর পর যদি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে লাভা নামতে থাকে জ্বলন্ত নিয়ে, পলাতকরা পালিয়ে যাবে কোথায়?

জনতার মধ্যে বুকের পাটা যাদের চওড়া, যারা দলে পড়ে ঘাবড়ায় না কখনো, তারাই কেবল প্রাণপণে আটকাতে চেষ্টা করল পলায়মান বাসিন্দাদের। গাঁয়ের মোড়লদের মধ্যে যারা বিলক্ষণ সেয়ানা, তারা সাহসে কোমর বেঁধে এগোলো গ্রেট আইরীর দিকে। পাহাড় থেকে মাইল খানেক তফাতে এসে দেখল, আগুনের প্রতাপ কমে আসছে। পাথরও ছিটকোচ্ছে না, লাভাও গড়াচ্ছে না, ছাইও বেরোচ্ছে না। পায়ের তলায় মাটিও কাঁপছে না ভূমিকম্পের মত—গুমগুম গুড় গুড় আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা আর নেই বলেই মনে হল। কল্পনাতীত প্রলয়ের খপ্পর থেকে বিনা আঁচড়ে রেহাই পেল বোধহয় গ্রামবাসীরা।

অনেকক্ষণ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োবার পর বেশ খানিকটা নিরাপদ ব্যবধানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পলাতকরা। জিরিয়ে নেওয়ার পর জনাকয়েক গ্রামবাসী বীরত্ব দেখানোর জন্যে গুটিগুটি ফিরে এল গাঁয়ের দিকে। দেখাদেখি ফিরল আরো কয়েকজন। ভোরের আগেই আস্তে আস্তে ফিরে গেল যে যার ঘরে।

লক্ষণ দেখে মনে হল, অগ্ন্যুৎপাত জাতীয় কিছুই ঘটেনি। আগুনবর্ষির ধার দিয়েও যায়নি গ্রেট আইরী। ভবিষ্যতেও লাভাস্রোত দিয়ে জনপদ ছারখার করবার মত বদ খেয়াল গ্রেট আইরীর হবে বলে মনে হল না।

এরপরেও কিন্তু ফের একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গেল ভোর পাঁচটা নাগাদ। আবার জাগ্রত হল গ্রেট আইরী। অন্ধকার তখনও জমাট বেঁধে রয়েছে পর্বত চূড়ায়। ভোরের রাত চমকে উঠল অদ্ভুত একটা ফর-ফর-ফর-ফর আওয়াজে। সেই সঙ্গে ডানা ঝাপটানোর ঝটপট ঝটপট শব্দ···বাতাস তোলপাড় করে যেন মস্ত পাখী উঠছে আকাশে। পাহাড়ের মাথায় তখনো অন্ধকার। নইলে দূর থেকেই চাষীরা দেখতে পেত যেন একটা বিরাট শিকারী বাজ পাখী আকাশের দানবিক আতংকের মত-ডানা ঝটপটিয়ে উঠে এল গ্রেট আইরীর উদর থেকে এবং নক্ষত্র গতিতে মিলিয়ে গেল পূবের আকাশে।

(২) মরগানটন পৌঁছোলাম

ওয়াশিংটন থেকে রওনা হয়েছিলাম রাত্রে। নর্থ ক্যারোলিনার রাজধানী র‍্যালে-তে পৌঁছোলাম সাতাশে এপ্রিল।

দুদিন আগে ফেডারাল পুলিশের বড় কর্তা আমাকে তলব করেছিলেন তাঁর খাসকামরায়। ঘরে ঢুকে দেখলাম অস্থিরভাবে তিনি অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আমাকে দেখেই বলেছিলেন—"জন স্ট্রক, অতীতে বহুবার প্রমাণ করেছো তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারো। কঠিনতম কাজও সুসম্পন্ন করবার ক্ষমতাও তোমার আছে।"

বাতাসে মাথা ঠুকে জবাব দিয়েছিলাম—"মিস্টার ওয়ার্ড, সব কাজেই সফল হব, সব ধাঁধার জট ছাড়াতে পারব, এ গ্যারান্টি দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। তবে হ্যাঁ নিষ্ঠার কথা যদি বলেন তো বলব আপনার দেওয়া কোনো কাজেই তার অভাব ঘটবেনা।"

"তুমি কি আগের মতই হেঁয়ালীর জট ছাড়াতে ভালবাসো? রহস্য দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ো?"

"নিশ্চয়।"

মিস্টার ওয়ার্ডের বয়স প্রায় পঞ্চাশ ক্ষমতাবান পুরুষ। শরীর এবং মন — দুটোই সমান সবল। তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী। গুরুত্বপূর্ণ এই পদের যোগ্য ব্যক্তি। অতীতে বেশ কয়েকবার অনেকগুলো জটিল সমস্যা আমার কাঁধে চাপিয়ে তিনি খুশী হয়েছেন সন্তোষজনক সমাধান পেয়ে। সেই কারণেই

আমার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা। মাস কয়েক আমার উপযুক্ত কাজ জোটাতে পারেন নি তিনি। আমিও নিষ্কর্মা ছিলাম। তাই অধীর আগ্রহে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখপানে। আমি তো জানি, উঞ্ছ কাজ দিয়ে আমাকে খামোকা বিরক্ত করবেন না তিনি, নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। আমার কর্তব্যও অতীব কঠিন।

মিস্টার ওয়ার্ড বললেন—"মর্গান্টনের কাছে ব্লু-রিজ পাহাড়ে সম্প্রতি যা ঘটেছে, নিশ্চয় তা শুনেছো।"

"শুনেছি। অসাধারণ ঘটনা সন্দেহ নেই। যে কোনো মানুষকে উৎসুক করার পক্ষে যথেষ্ট।"

"স্ট্রক, ঘটনাগুলো শুধু অসাধারণ নয়, অত্যাশ্চর্যও বটে। কিন্তু আমাদের দেখা দরকার ও অঞ্চলে সত্যিই কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসছে কিনা। আরো রহস্য আরো বিপদে জড়িয়ে পড়তে চলেছে কিনা গ্রামবাসীরা, আমাদের তা জানতেই হবে।"

"অগ্নিকাণ্ড অকারণে ঘটে না। ভয়ের কারণ আছে বই কি।"

"তাহলেই দেখো, পাহাড়ের মধ্যে কি খেলা চলছে, তা জানা দরকার। সত্যিই যদি দেখি প্রকৃতি স্বয়ং মহাশক্তি নিয়ে, মাথা চাড়া দিচ্ছেন—যে শক্তির বিরুদ্ধে করণীয় কিছুই নেই আমাদের—তাহলে সময় থাকতেই গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ার করতে হবে—আসন্ন বিপদ থেকে তাদের বাঁচাতে হবে।"

"তাতো বটেই। এ কাজ তো আমাদেরই। পাহাড়ের মধ্যে হঠাৎ এত তোলপাড় কাণ্ড কেন চলছে, তা জানতে হবে বই কি।"

"খাঁটি কথা। কিন্তু স্ট্রক, কাজটা কঠিন - অসুবিধে অনেক। প্রত্যেকেই রিপোর্ট পাঠাচ্ছে, গ্রেট আইরীর দেওয়াল বেয়ে ওঠা নাকি মানুষের কর্ম নয়। ভেতরে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত কি কেউ অনুকূল পরিবেশে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করেছে? আমার সন্দেহ আছে। সেই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কেউ যদি পণ করে গ্রেট আইরীতে উঠবো বলে, তাহলে সে উঠবেই। কেউ আটকাতে পারবে না।"

"মিস্টার ওয়ার্ড, দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছুই নেই। সমস্যা কেবল খরচের।"

"সারা তল্লাট জুড়ে লোকজন ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। তাদের মনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে যা খরচ হয়, তা আমরা করব, স্ট্রক। কে জানে হয়ত দেরী করলে এতগুলো লোকের প্রাণ নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। আরো একটা কথা তোমার মাথায় ঢুকিয়ে রাখি। গ্রেট আইরীকে যতটা দুর্লঙ্ঘ্য মনে

করা যায়, আসলে হয়ত ততটা নয়। নিশ্চয় ভেতরে ঢোকার সহজ পথ কোথাও আছে। একদল বদমাস সেই গোপন পথের হদিস পেয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঘাঁটি বানিয়ে বসে আছে।"

"বলেন কী! ডাকাতদের আড্ডা—"

"আমার ভুলও হতে পারে, স্ট্রক। হয়ত এই অদ্ভুত আওয়াজ, আলো আর ধোঁয়ার পেছনে মানুষের কারসাজি নেই—সবই প্রকৃতির খামখেয়াল। কিন্তু কোনটা সত্যি, তা জানতে চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

"একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বলো।"

"ধরুন, গ্রেট আইরীকে জয় করা গেল, পেটের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে দেখে এলাম সত্যি সত্যিই আসন্ন অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ তোড়জোড় চলছে সেখানে। কিন্তু পার পাব কি করে? ঠেকাবো কি করে?"

"অগ্ন্যুদ্গার ঠেকানোর ক্ষমতা আমাদের নেই, স্ট্রক। তবে বিপদ কি ধরনের, তা আন্দাজ করতে পারব নিশ্চয়। মাউন্ট পিলী যে ভাবে লাভাস্রোত দিয়ে চাপা দিয়েছিল মার্টিনিক-কে, যদি দেখা যায় একই দশা হতে চলেছে নর্থ ক্যারোলিনার গ্রেট আইরীর অগ্ন্যুৎপাতে, তাহলে লোকজনকে সময় থাকতেই সরিয়ে দেব বাড়ী থেকে—"

"স্যার, আমার মনে হয় বিপদ অতদূর ছড়াবে না।"

"আমারও তা মনে হয় না, স্ট্রক। ব্লু-রিজ পাহাড়ের মধ্যে আগুন-পাহাড় ঘুমোচ্ছিল এত বছর—এ হতেই পারে না। আপ্পালাচিয়ান পর্বতমালার ইতিহাস ঘাঁটলেই তা বোঝা যায়। এরা কেউই আদিতে অগ্নিস্রাবী ছিল না। কিন্তু এত কাণ্ডকারখানা বিনা কারণে নিশ্চয় ঘটছে না। কারণটা কি, জানতে চাই আমি। আমি ঠিক করেছি জোর তদন্ত চালাবো ওখানে। গ্রেট আইরীর পেটে হঠাৎ কেন অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ করেছে, তা জানবই জানব। স্থানীয় বাসিন্দাদের জেরা করতে হবে, গ্রেট আইরীর পেটের ভেতরেও ঢুকতে হবে। এ-কাজের জন্যে এমন একজন এজেন্টকে বেছেছি যাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। স্ট্রক, তুমিই সেই এজেন্ট।"

সোল্লাসে বললাম—"আমি এক পায়ে খাড়া, মিস্টার ওয়ার্ড। কথা দিচ্ছি, আপনার মনের মত খবর আনবার জন্যে যা করতে হয়, সব করব।"

"জানি, স্ট্রক। এ-কাজের যোগ্যতম লোক বলতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার রহস্য পিপাসু মনটাও বিস্তর খোরাক পাবে মাথা ঘামানোর। রহস্যভেদ তোমার নেশা—এ-কাজ সেই নেশার খোরাক।"

"যা বলেন, স্যার।"

"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার পূর্ণ ক্ষমতা তোমার রইল। পাহাড়ে উঠতে গেলে পর্বতারোহীদের দল তৈরী করতে হবে। তার জন্যে যত টাকা লাগে, সে টাকাও তুমি পাবে।"

"কথা দিচ্ছি, যেখানে যা দরকার, তার অভাব হবে না।"

"একটা ব্যাপারে হুঁশিয়ার থেকো। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে চলবে। ও তল্লাটের সব লোকই এখন অতি-উত্তেজনায় ভুগছে। আমার সন্দেহের কথা একদম ওদের শুনিও না। তদন্ত করবে গোপনে। গণ-আতংক যাতে ফের মাথা চাড়া না দেয়, সেদিকে নজর রাখবে।"

"বুঝেছি।"

"মরগানটনের মেয়র তোমাকে সাহায্য করবে। ফের বলছি, আত্মপরিচয় গোপন রাখবে। খুব দরকার না হলে, কাকপক্ষীও যেন টের না পায় তুমি কে, তোমার উদ্দেশ্য কী। তোমার বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচারশক্তির অনেক প্রমাণ আমি পেয়েছি বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ কাজেও তুমি কিস্তিমাৎ করবে।"

"কখন রওনা হব?"

"আগামীকাল।"

"বেশ, আগামীকালই রওনা হব ওয়াশিংটন থেকে। মরগানটন পৌঁছোবো পরশু।"

তখন কি ছাই জানতাম ভবিষ্যতের গর্ভে কি বিপুল বিস্ময় ওৎ পেতে রয়েছে আমার প্রতীক্ষায়!

বাড়ী ফিরলাম তক্ষুণি। গোছগাছ করলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় হাজির হলাম র‍্যালে-তে। রাতটা সেখানে কাটিয়ে তার পরের দিন বিকেল নাগাদ পৌঁছোলাম মরগানটন রেলস্টেশনে।

মরগানটন শহরটা ছোট। কিন্তু জুরাসিক* আমলের ভূস্তরের কল্যাণে কয়লা পাওয়া যায় প্রচুর। কয়লাখনির দৌলতে মরগানটন রীতিমত সমৃদ্ধ শহর। খনিজ জলে সমৃদ্ধ অনেকগুলো জলস্রোত এ শহরের অন্যতম আকর্ষণ। মরসুম পড়লেই দলে দলে লোক আসে স্বাস্থ্য ফেরাতে।

*সাড়ে উনিশ কোটি বছর আগেকার আমলকে জুরাসিক আমল বলা হয়। সে সময়ে দানবিক মহীরুহ ছেয়ে থাকত ভূপৃষ্ঠ। সমুদ্রের জল হানা দিত ডাঙায়। মহাদেশের সৃষ্টি সম্ভবতঃ তখন থেকেই শুরু হয়। সরীসৃপ-প্রাণীরা দখল করে থাকত স্থল-জল-অন্তরীক্ষ। ডাইনোসর বিচরণ করত ডাঙায়।

এখানকার মাটি সুজলা এবং সুফলা। তাই মরগানটন ঘিরে কেবল শস্যক্ষেতের পর শস্যক্ষেত। আর আছে শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদে বোঝাই বিল এবং বাদা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে চির সবুজ মহীরুহের সারি। অকৃপণ হস্তে ঈশ্বর অনেক কিছুই ঢেলে দিয়েছেন—দেননি কেবল প্রাকৃতিক গ্যাস—যা অ্যালিঘ্যানি উপত্যকায় যত্রতত্র পাওয়া যায়। শক্তি, আলো আর উত্তাপের উৎসই তো এই গ্যাস। পাহাড়ি-জঙ্গলের ধার পর্যন্ত অগুন্তি গ্রাম আর খামার বাড়ী গায়ে গায়ে গড়ে উঠেছে—প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত থাকলে লোকজনের বসতি একটু বেশী তো হবেই। কাজেই গ্রেট আইরী যদি আগ্নেয়গিরির মত অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে, তাহলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে বহু হাজার বাসিন্দার। প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেন থেকে মরগানটন পর্যন্ত অঞ্চলে হাহাকার পড়ে যাবে।

মরগানটনের মেয়র ভদ্রলোকের নাম মিস্টার ইলিয়াস স্মিথ। বছর চল্লিশ বয়স। তাল ঢ্যাঙা মূর্তি। কর্মঠ এবং চৌকস। স্বাস্থ্যখানা দেখবার মত। দুই আমেরিকার তাবৎ ডাক্তার এলেও দেহ থেকে রোগ বের করতে পারবে না। অ্যালিঘ্যানির গহন অরণ্য আর দুর্গম গিরি কন্দরে ভালুক আর প্যান্থার এখনো টহল দিয়ে ফেরে দলে দলে। ভয়ানক হিংস্র এই শ্বাপদদের যমালয়ে পাঠাতে ওস্তাদ মিস্টার ইলিয়াস স্মিথ। এক কথায় মৃগয়া তাঁর নেশা বললেই চলে।

ভদ্রলোক নিজেও যথেষ্ট জমিজমার মালিক এবং বিলক্ষণ বিত্তবান। সরকারী কাজ ফুরোলেই উনি মরগানটন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। শিকারের নেশা বড় জবর নেশা। বন জঙ্গল ঠেঙিয়ে বাঘ-ভালুক বধ করেন। নয়তো দূরতম আত্মীয়-পরিজনের বাড়ী গিয়ে সামাজিকতা করে আসেন।

এ-হেন মিস্টার স্মিথের বাড়ীতেই সোজা গিয়ে উঠলাম আমি। ভদ্রলোক আমার পথ চেয়েই বসেছিলেন। টেলিগ্রাম মারফৎ আগেই হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তাই কোনোরকম ভনিতা ভড়ং না করে ঘরোয়া-ভাবে আপ্যায়ণ করলেন আমাকে। ভদ্রলোক বসেছিলেন মুখে তামাক-পাইপ আর টেবিলে ব্র্যাণ্ডির গেলাস নিয়ে। চাকর তক্ষুণি এনে রাখল আর একটা গেলাস। আগে আমাকে ব্র্যাণ্ডি পান করতে হল, তারপর গৃহস্বামী শুরু করলেন বাক্যালাপ।

আমুদে স্বরে বললাম—"ভাল, ভাল! মিস্টার ওয়ার্ড পাঠিয়েছেন আপনাকে? আসুন, আগে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করা যাক।"

ঠুন-ঠুন করে দুজনে গেলাস ঠোকাঠুকি করলাম এবং পুলিশ বড় কর্তার সম্মানার্থে আরেক দফা ব্র্যাণ্ডি পান করলাম।

এরপর সরাসরি কাজের কথায় এলেন মিস্টার স্মিথ—"বলুন এবার। মিস্টার ওয়ার্ডের দুশ্চিন্তাটা কি নিয়ে?"

তখন আমি খুলে বললাম মরগানটনে আমি কেন এসেছি। বড় কর্তা পুরো ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাকে। গ্রেট আইরী অগ্নিগভ কিনা, তা জানতে হবে এবং জনসাধারণের উদ্বেগ আতংক দূর করতে হবে। যত টাকাই লাগুক না কেন, যে কোন ব্যবস্থারই প্রয়োজন হোক না কেন—মিস্টার ওয়ার্ড তার ব্যবস্থা করবেন।

একটানা কথা বলে গেলাম আমি, একটা কথাও না বলে শুনে গেলেন মিস্টার স্মিথ। মাঝে মাঝে কেবল আমার এবং তাঁর গেলাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালতে লাগলেন এবং পাইপ থেকে বিরামবিহীন ভাবে ফুক-ফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। আমার প্রতিটি কথায় তাঁর গভীর মনোযোগ দেখেই বুঝলাম তিনিও আমার পথের পথিক। গ্রেট আইরীর প্রহেলিকা তাঁকেও ভাবিয়ে তুলেছে। তাই থেকে-থেকে মুখ আরক্ত হল, ঝোপের মত ভুরুর নীচে চক্ষু প্রদীপ্ত হল। বেশ বুঝলাম, গ্রেট আইরীব বহস্যভেদ শুধু আমার অভীষ্ট নয—তাঁরও।

আমাব কথা শেষ হলে ইলিযাস স্মিথ কিছুক্ষণ পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন আমার পানে--কথা বললেন না। তাবপর বললেন বাতাসের মত মৃদু স্বরে—"বটে! ওয়াশিংটনের কর্তাদের টনক নড়েছে তাহলে! গ্রেট আইরী পেটে কি লুকিয়ে রেখেছে, তারাও জানতে চান?"

"ঠিক ধরেছেন।"

"আপনি? আপনিও চান নাকি মিস্টার স্ট্রক?"

"একশ বার।"

"আমিও।"

অর্থাৎ দুজনের মধ্যেই সমান মাত্রাব মাতামাতি আরম্ভ করেছে কৌতূহল নামক সদা-অস্থির দানবটা!

ঠক-ঠক করে পাইপ ঠুকলেন মিস্টাব স্মিথ। পোড়া ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন—"এ ব্যাপারে আমার আগ্রহ দু'দিক দিয়ে। আমি নিজে অনেকগুলো খামার বাড়ীর মালিক। সুতরাং গ্রেট আইরীর গল্প কথা আমার মাথার পোকাকেও নাড়া দিয়েছে। তাছাড়া, মেয়র হিসেবেও আমার শান্তিবিধান করা আমার কর্তব্য।"

"আপনি তাহলে জোড়া উদ্দেশ্য নিয়ে অসাধারণ হেঁয়ালীর সমাধান করতে চান", বললাম আমি। "মাইডিয়ার মিস্টার স্মিথ, বলুন দিকি এবার গ্রেট

আইরী রহস্যের কোনো ব্যাখ্যা আপনার মাথায় এসেছে কী? কি মনে হয় আপনার—গ্রেট আইরী কি সত্যিই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে?"

"ব্যাখ্যা সত্যিই হয় না; কেননা, গ্রেট আইরী কক্‌খনো আগ্নেয়গিরি নয়। অ্যালিঘ্যানির সৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত থেকে হয়নি। আমার এলাকায় অন্ততঃ আগ্নেয়পাথর, আগ্নেয়ভস্ম, লাভা বা অগ্ন্যুৎপাতের কোনো চিহ্ন কোথাও দেখিনি। সুতরাং অগ্ন্যুৎপাত ঘটবে মরগানটনের ধারে কাছে—এ-থিওরী অসম্ভব।"

"মন থেকে বলছেন তো?"

"নিশ্চয়।"

"তাহলে বলুন দিকি কেন পায়ের তলায় মাটি কেঁপেছিল?"

"মাটি কেঁপেছিল?" মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন মিস্টার স্মিথ। "পাল্টা প্রশ্নটাই করি তাহলে। সত্যিই কি মাটি কেঁপেছিল? আগুন যখন বেশ লকলকিয়ে উঠছে পাহাড় চূড়ো দিয়ে, তখন আমি গ্রেট আইরী থেকে মাত্র এক মাইল দূরে আমার উইলডন খামার বাড়ীতে ছিলাম। বাতাস কাঁপছে টের পেয়েছিলাম, কিন্তু মাটির কাঁপুনি তো অনুভব করিনি।"

"কিন্তু মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে পাঠানো প্রতিটি রিপোর্টে—"

"আরে মশাই রিপোর্ট তৈরী হয়েছে গণ-আতংকের মর্জি মাফিক। আমি কিন্তু আমার রিপোর্টে মাটি কাঁপার কথা একদম লিখিনি।"

"কিন্তু আগুন চূড়ো ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠেছিল। কেন?"

"এটা একটা প্রশ্নের মত প্রশ্ন বটে। আগুনটা আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম। মেঘ পর্যন্ত রাঙা হয়ে গিয়েছিল আগুনের আঁচে। মেঘে ঠিকরে আগুনের আভা ঠিকরে পড়েছিল অনেক মাইল দূর পর্যন্ত। শুধু আগুন নয়, মিস্টার স্ট্রক! অদ্ভুত একটা আওয়াজও ভেসে আসছিল গ্রেট আইরীর চূড়োর ভেতর থেকে। হিস্‌-হিস্‌-হিস্‌ শব্দ! ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড বয়লার বাষ্প ছাড়ছে ফোঁস ফোঁস করে।"

"নির্ভরযোগ্য সাক্ষী আছে?"

"আছে বৈকি। আমার কানজোড়া।"

"হিস-হিস আওয়াজের সময়ে কি ডানা ঝটপটানির আওয়াজটাও শুনেছিলেন? মনে রাখবেন, গ্রেট আইরী থেকে যত শব্দ পাওয়া গেছে—এ আওয়াজটা তাদের মধ্যে সব চাইতে অদ্ভুত।"

"শুনেছিলাম বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু, আগুন নিভে যাবার পর উড়ে যায় এরকম প্রকাণ্ড কোনো পাখীর নাম আমার অন্ততঃ জানা নেই। ঐরকম ভীষণ ডানা ঝটপটানির শব্দ কোন জাতের পাখীর ডানায় সম্ভব, তাও

আমার জানা নেই। তাই নিজেকেই শুধোই, যা দেখেছি, যা শুনেছি—তা চোখ-কানের ভুল নয়তো? আকাশের উড়ন্ত বিভীষিকাকে গ্রেট আইরী ঠাঁই দেবে—এ-কল্পনা বাতুলকেই মানায়! সেরকম দানবিক পাখী সত্যিই যদি থাকত, অনেক আগেই তাদের চূড়ো ঘিরে উড়তে দেখা যেত। পাথর বাসার ওপরে নির্ঘাৎ চক্কর দিত আকাশ-দানোর দল—আমাদের চোখে পড়তই। না, মশাই না, গ্রেট আইরীর এত রহস্যের কোনো রহস্যেরই সমাধান হয় না।"

"সমাধান করব বলেই তো এসেছি, মিস্টার স্মিথ। আপনার সাহায্য না পেলে তো পারব না।"

"আমি আপনার পাশে আছি। কালকেই বেরোনো যাক অভিযানে।"

"হ্যাঁ, কালই," এই বলে মেয়রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম একটা হোটেলে। বেশ কিছুদিনের মত থাকবার ব্যবস্থা করে খেয়ে নিলাম। মিস্টার ওয়ার্ডকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম। মিস্টার স্মিথের সঙ্গে ফের দেখা করলাম সন্ধ্যে নাগাদ। পরের দিন ভোরবেলা যাতে বেরিয়ে পড়তে পারি, গোছগাছ করে নিলাম সেইভাবে।

আমাদের প্রথম কাজ হল দুজন ঝানু পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে গ্রেট আইরীর চূড়োয় ওঠা। ব্লু-রিজ পর্বতমালার অনেক উঁচু-উঁচু চূড়োয় মিস্টার মিচেল এবং অন্যান্য পর্বতারোহীদের পথ দেখিয়েছে এই দুজন। তবে ভুলেও গ্রেট আইরীকে জয় করার চেষ্টা করেনি—পারবেনা বলেই চেষ্টা করেনি। গ্রেট আইরীর দুর্লঙ্ঘ্য পাথর-পাঁচিল বেয়ে ওঠার ক্ষমতা টিকটিকি গিরগিটির থাকতে পারে—মানুষের নেই। তাছাড়া এইসব ঘটনা ঘটবার আগে গ্রেট আইরীকে দেখবার আকর্ষণও ছিল না পর্যটক মহলে। মিস্টার স্মিথ দুজনকেই চেনেন ব্যক্তিগতভাবে। পথপ্রদর্শক হিসেবে দুজনেই ডাকাবুকো, সেয়ানা, কুশলী এবং আস্থাভাজন। বাধাকে বাধাজ্ঞান করেনা দুজনের কেউই। আমরা স্থির করলাম, শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়ব এদের সাহায্যে।

সবশেষে অবশ্য মিস্টার স্মিথ একটা আশার কথা শোনালেন। আগে দুর্লঙ্ঘ্য থাকলেও গ্রেট আইরী হয়ত এখন দুর্লঙ্ঘ্য নয়।

"কেন নয়?" শুধোলাম আমি।

"কিছুদিন হল পাহাড়ের গা থেকে একটা মস্ত চাঁই খসে গড়িয়ে পড়েছে। ভাঙা জায়গাটা দিয়ে নিশ্চয় ওপরে ওঠা যাবে, নয়ত ভেতরে ঢোকা যাবে।"

"তাহলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে।"

"কালকেই সেটা দেখা যাবে।"

"হ্যাঁ, কালকেই।"

(৩) গ্রেট আইরী

পরের দিন ভোরবেলা রওনা হলাম আমি আর ইলিয়াস স্মিথ। ক্যাটবা নদীর বাঁ পাড় বরাবর একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে গিয়েছে সেই প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেন্স গাঁ পর্যন্ত। আমরা যাত্রা শুরু করলাম এই পথ ধরে। সঙ্গে নিলাম গাইড দুজনকে। ওরা স্থানীয় বাসিন্দা। হ্যারি হর্ন-য়ের বয়স তিরিশ। জেমস ব্রাক-য়ের বয়স পঁচিশ। ব্লু-রিজ আর কামবারল্যাণ্ড পর্বতমালার বিভিন্ন চূড়োয় কেউ উঠতে চাইলে এই দুজনই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় টুরিস্টদের।

দুটো তেজালো ঘোড়া টেনে নিয়ে চলল আমাদের হাল্কা গাড়ীটাকে। এই গাড়ীতেই যাবো পর্বতমালার পাদদেশ পযন্ত। খাবারদাবারের অভাব নেই গাড়ীতে। দু'তিন দিনের উপযুক্ত মাংস এবং মদ নিয়েছেন মিস্টার স্মিথ। দু'তিন দিনের বেশী নিশ্চয় থাকার দরকার হবে না। খাবার জলের জন্মে রয়েছে পাহাড়ি ঝর্ণা। বৃষ্টির জলে ঝর্ণাগুলো এখন গায়ে-গতরে বেশ জাঁকালো হয়েছে। বসন্তকালে এমনিতেও এ অঞ্চলে ঝর্ণার হাট বসে যায় যেন। পাহাড়ি জায়গা তো, পথে ঘাটে চলে ঝিরঝিরিয়ে।

বলাবাহুল্য, মরগাটনের মেয়র মহাশয় তার প্রিয় বাতিকের কথা বিস্মৃত হননি। অর্থাৎ মৃগয়ার জন্মে আনুষঙ্গিক কোন ব্যবস্থাই বাদ দেননি। সঙ্গে নিয়েছেন বন্দুক আর শিকারী কুকুর নিসকোকে। গাড়ী চলল গড়গড়িয়ে। নিসকো মহাফুর্তিতে নাচতে নাচতে ছুটে চলল গাড়ীর পাশে পাশে। উইলডন খামার বাড়ীতে অবশ্য রেখে যেতে হবে নিসকোকে। পাহাড় চড়া শুরু হলে নিসকোর আর কোন কাজ নেই। তাছাড়া খাড়াই পাঁচিল বেয়ে উঠতে হবে। গ্রেট আইরীর ছোট ছোট খাঁজে আঙুল আটকে ঝুলতে হবে—নিসকো পারবে কেন?

ভারি সুন্দর দিন। এপ্রিল মাসের ভোরবেলা বাতাস তো তাজা থাকবেই। শীতল সমীরণে গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। ভেড়ার লোমের মত কয়েকটা মেঘ বেগে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। সুদূর আটলাণ্টিক থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়াই যেন তাড়া করে নিয়ে চলেছে মেঘের দঙ্গলকে। ঝেঁটিয়ে সাফ করছে মাঠ-বন প্রান্তরকে। মেঘের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে সূর্যদেব। সতেজ সুন্দর লাবণ্যময়ী গ্রামাঞ্চলে ঢেলে দিচ্ছে অমৃত কিরণ ধারা। পাড়াগাঁর একটা নিজস্ব রূপ আছে একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। সারা বনভূমি মুখর হয়ে রয়েছে পশুপাখীর আনাগোনায় চেঁচামেচিতে। যেন সারা দুনিয়াটা ভীড় করেছে অরণ্য ভূমিতে। সামনে থেকে চোঁ-চাঁ দৌড় দিচ্ছে কাঠবেড়ালী, মেঠো ইঁদুর। ডালে ডালে লাফাচ্ছে, উড়ছে, চেঁচাচ্ছে ছোট সাইজের ল্যাজঝোলা কাকাতুয়া, ঝকঝকে রঙের বাহারে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ, কূজন গুজনে ঝালা-পালা হয়ে যাচ্ছে কান। থলির মধ্যে বাচ্চা নিয়ে লম্বালম্বা লাফ মেরে ক্যাঙারুর মত পালাচ্ছে অপোজাম। বট, তাল, রডোডেন্ড্রনের আড়ালে আবডালে পত্রশাখায় নাচছে হাজার হাজার পাখী।

সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছোলাম প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেনে। আকণ্ঠ খেয়ে আরামে রাত কাটালাম টাউন মেয়রের বাড়ীতে। ভদ্রলোক মিস্টার স্মিথের বিশেষ বন্ধু। প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেন আকারে একটা গ্রাম বললেই চলে। তবে মেয়র ভদ্রলোক খাতির যত্নের ত্রুটি রাখলেন না। অনেকগুলো প্রকাণ্ড বীচ গাছের ছায়ায় তাঁর বাড়ী। বাড়ীর মত বাড়ী। চোখ জুড়িয়ে যায়। এ-হেন বাড়ীতে তিনি জামাই-আদরে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের।

কথায় কথায় গ্রেট আইরীর প্রসঙ্গ উঠতেই গৃহস্বামী বললেন—"আপনারা ধরেছেন ঠিক। গ্রেট আইরীর ভেতরে কি আছে না জানা পর্যন্ত শান্তি পাবেনা কেউ।"

"গ্রেট আইরীর মাথায় শেষবার আগুনের শিখা দেখবার পর নতুন কিছু ঘটেছে কী?" শুধোলাম আমি।

"না, মিস্টার স্ট্রক। প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেন থেকে পাহাড়টা পুরোপুরি দেখা যায়। আর কোনো সন্দেহজনক শব্দ শুনিনি। স্ফুলিঙ্গও দেখিনি। যদি বলেন, অধিদেবতারা ঠাই নিয়েছিল গ্রেট আইরীর পেটে, ডাকিনী যোগিনীরা জড়িবুটি দিয়ে মন্ত্র আউড়ে ভূতপ্রেত নাচাচ্ছিল পাহাড়ের মাথায়, তাহলে ধরে নিতে পারেন অশরীরিরা বিদায় নিয়েছে। ডাইনীদের মন্ত্রপূত পাঁচন রান্না শেষ হয়েছে। গ্রেট আইরীকে আর তাদের দরকার নেই।"

"ডাইনী!" মুখ বেঁকিয়ে বললেন মিস্টার স্মিথ। "বেশ, বেশ, ডাইনী হোক, পিশাচ হোক, ভূত হোক, প্রেত হোক—পাঁচন-রান্নার কিছু কিছু উপকরণ নিশ্চয় পড়ে থাকবে? টিকটিকির ডিম, চামচিকের ঠ্যাং, সাপের মাথা, ব্যাঙের জিভ, ছাগলের খুর, গণ্ডারের শিং, অথবা শুওরের ল্যাজ—কিছুনা কিছু পাবোই।"

পরের দিন, উনত্রিশে এপ্রিল। কাক ডাকতে না ডাকতেই আবার নামলাম রাস্তায়। ইচ্ছে আছে দিনের শেষে পাহাড়ের তলায় পৌঁছে রাত

কাটাবো উইলডন খামার বাড়ীতে। দুপাশের মাঠ ঘাটের অবস্থা আগের মতই। শুধু যা রাস্তা আস্তে আস্তে ওপরদিকে উঠছে। জলাভূমি আর জঙ্গল ছাড়া পথে আর কিছু দেখছিনা। জলা ভূমির পর জঙ্গল, জঙ্গলের পর জলাভূমি। যতই উঁচুতে উঠছি। জলাভূমিব সংখ্যা কমছে। রোদের তাতে কাদাগুলো শুকিয়ে খট-খটে হয়ে গিয়েছে। জনবসতিও কমছে। বীচ গাছের ছায়ায় প্রায় অদৃশ্য দু'একটা গ্রাম চোখে পড়ছে। নিঃসঙ্গ খামার বাড়ীও দেখছি অনেক দূরে দূরে। ক্যাটবা নদীর সঙ্গে মিশেছে বিস্তর পাহাড়ি জল ধারা। খামার বাড়ী আর গণ্ড গ্রামে তাই মিষ্টি জলের অভাব কখনো হয় না।

কিন্তু সংখ্যা কমছে না ছোট পাখী আর পশুর—বরং বাড়ছে। কাতারে কাতারে পাখী যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করেছে চলার পথে। মিস্টার স্মিথ বার বার বলছেন—"হাত নিশপিশ করছে মশায়। নিসকোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? গুলি চালাবো? পার্ট্রিজ আর খরগোস শিকার না করে পথ হাঁটছি এই প্রথম। যাক, কপাল ভাল ওদের। খাবার দাবারের ঘাটতি যখন নেই, তখন বড় শিকারের পেছনেই আগে তাড়া করা যাক। ছোট শিকার এখন থাকুক।"

"বড় শিকারটা কি মিস্টার স্মিথ?" সুধিয়ে ছিলাম আমি।

"গ্রেট আইরীর রহস্য!"

"ঠিক। আশা করি খালি হাতে ফিবব না।"

বিকেল নাগাদ মাত্র ছমাইল দূর থেকে দেখতে পেলাম ব্লু-রিজের পুরো পাহাড় শ্রেণীকে। ঝকঝকে আকাশের বুকে পরিষ্কার রেখায় যেন আঁকা রয়েছে সুউচ্চ শৃঙ্গগুলো। সানুদেশে ঘনজঙ্গল। চূড়োর দিকে কিন্তু বিরল হয়ে এসেছে বৃক্ষরাজি। এলোমেলোভাবে দেখা যাচ্ছে দু'একটা সবুজ গুঁড়ি। গুঁড়িগুলোর চেহারা অদ্ভুত। কিম্ভূতকিমাকার। বেঁকানো, দুমড়োনো, তেউড়োনো। পাথুরে উচ্চতায় যেন ঝাঁকড়াচুলো কুব্জ প্রহরী। দেখলে গা ছমছম করে। পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। চুড়োগুলো ধারালো বল্লমের মত চোখা। ডানদিকে মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে প্রায় সাতহাজার ফুট উঁচু 'ব্ল্যাকডোম'য়ের দানবিক শীর্ষ।

"মিস্টার স্মিথ কি কখনো এ-চুড়োয় উঠেছেন?" শুধোলাম আমি।

"না। তবে যারা উঠেছে, তাদের নাকি কালঘাম ছুটে গেছে। খুব কঠিন। এদের কাছেই শুনেছি, ব্ল্যাক ডোম-য়ের চুড়োয় দাঁড়ালেও গ্রেট আইরীর ভেতর দেখা যায় না।"

"খাঁটি কথা। অমি নিজেও চেষ্টা করে ছিলাম, "বলল গাইড হ্যারি হর্ন।
"আবহাওয়া পরিষ্কার ছিলনা বোধ হয়?" বললাম আমি।

"ঠিক তার উল্টোটা বলতে পারেন। আবহাওয়া অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে, গ্রেট আইরীর অত উঁচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভেতর পর্যন্ত দেখা যায় না।"

"চল চল! এগিয়ে চল!" উচ্ছল কণ্ঠে বললেন মিস্টার স্মিথ। কেউ সেখানে যায়নি বলেই আমি সেখানে যাব। কেউ যা দেখেনি, আমি তা দেখব।"

বাস্তবিকই, সেদিন গ্রেট আইরী স্ববোধ পাহাড়ের মতই দাঁড়িয়ে রইল সামনে। অনেকক্ষণ দেখলাম, কিন্তু চুড়ো বা গা থেকে ধোঁয়া বা আগুন কিছুই দেখতে পেলাম না।

বিকেল পাঁচটায় পৌঁছোলাম উইলডন খামার বাড়ীতে। ভাড়াটেরা মহাসমাদরে অভ্যর্থনা জানাল বাড়ীওলাকে। চাষী বললে, অনেকদিন হল ফের ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রেট আইরী। আর উৎপাত করেনি। একসঙ্গে সবাই খেলাম একই টেবিলে বসে। রাতে ঘুমোলাম মড়ার মত—ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠলাম না। যা ঘটতে চলেছে, তার পূর্বাভাষ স্বপ্নের মধ্যে হানা দিয়ে ঘুম মাটি করল না।

পরের দিন ভোর হওয়ার আগেই সদলবলে শুরু হল পাহাড়ে চড়া। গ্রেট আইরীর উচ্চতা পাঁচহাজার ফুটের বেশী নয়। উচ্চতা এমন কিছু নয়। পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পর্বত শৃঙ্গে আকছার উঠছে অ্যালিঘ্যানির মানুষ। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এমনিতেই আমরা তিন হাজার ফুট ওপরে রয়েছি। কাজেই পর্বতারোহণ খুব কষ্টকর হবে না। ঘণ্টা কয়েক গলদঘর্ম হলেই চূড়োয় পৌঁছোবো। তবে হ্যাঁ, পথে অনেক বিঘ্ন আছে। চড়াই উৎরাই তো বটেই, সেই সঙ্গে আছে খাদ পেরোনোর ঝামেলা। খাড়াই পাথরে হাত-পায়ের আঙুল রাখবার মত খাঁজও যদি না থাকে, তাহলে ঝুঁকি নেওয়া চলবে না, ঘুরে যেতে হবে। এই ধরনের অজ্ঞাত বিপদ-আপদ অনেক আছে, আছে সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক। গাইড দুজন এ-ব্যাপারে আমার মতই অজ্ঞ। পথের বিপদ কোন দিক দিয়ে আসবে—তা তারা জানে না। সবাই জানে গ্রেট আইরীর চুড়োয় চড়বার ক্ষমতা মানুষের নেই। অবশ্য শেষদিকে একটা আশার বাণী শুনিয়েছেন মিস্টার স্মিথ। পাহাড় ভেঙে মস্ত চাঁই গড়িয়ে পড়েছে। সুখবর, সন্দেহ নেই!

মিস্টার স্মিথ দারুণ তামাকখোর। সারাদিনে কম করেও বিশবার তামাক ঠাসেন পাইপে। ভোর হতে না হতেই শুরু হল তাঁর প্রথম ধূমপান।

গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন—"যাক, শুরু ভালভাবেই হল। কতক্ষণ লাগবে—"

"যত সময়ই লাগুক না কেন, শেষ না দেখে যাচ্ছিনা," বললাম আমি।

"তাতো বটেই।"

"ওপরওলা চান না আমি খালি হাতে ফিরি। গ্রেট আইবীর রহস্য কাহিনী শোনবার জন্যে দিন গুনছেন মিস্টার ওয়ার্ড।"

"তা আর বলতে। দরকার হলে পাহাড়ের ফুটো দিয়ে পাতালেও ঢুকব, গুহ্য তত্ত্ব ছিনতাই করে তবে ছাড়ব।" বলে, ঈশ্বরের নামে দিব্বি গাললেন মিস্টার স্মিথ।

"আমার তো মনে হয় অভিযান আজকে শেষ হবে না। সুতরাং খাবারের ভাঁড়ারটা দেখে নিলে হয় না?"

"ঘাবড়াবেন না। গাইড দুজন দুদিনের খাবার রেখেছে পিঠের ঝোলায়। এছাড়া রয়েছে আমার আনা খাবার। নিসকোকে রেখে এসেছি ঠিকই, বন্দুক তো এনেছি। বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের খাঁজে, গুহায় প্রচুর জ্যান্ত খানা মিলবে—গুলি করে জুটিয়ে দেব মশায়। রান্না? চূড়োয় উঠলে হয়ত দেখবেন উনুন বানানোই আছে।"

"উনুন! বলেন কি মিস্টার স্মিথ।"

"ঠিকই বলছি, মিস্টার স্ট্রক। আগুনের শিখায় আকাশ লাল হয়ে গিয়েছিল এই সেদিন। গ্রামবাসীদের রাত ছেড়ে গিয়েছিল আশ্চর্য সুন্দর সেই শিখা দেখে। আপনি কি বলেন, আগুন একেবারে নিভে গেছে? ছাইয়ের মধ্যে ধিকি ধিকি আগুনও পাবেন না? ধরুন, গ্রেট আইবী সত্যিই একটা আগ্নেয়গিরি। আপনি কি বলেন আগ্নেয়গিরি এমন ভাবে নিভে গেছে যে ছাই চাপা আগুনও কোথাও পাবো না? তা যদি হয় তো বলব এটা আগ্নেয়গিরিই নয়। এক আধটা ডিম বা আলু সেদ্ধ করার মত অঙ্গারও যদি না থাকে তো আগ্নেয়গিরি কি মশায়? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগুন আছে চূড়োয়—শিখা যখন দেখেছি—ছাই চাপা আগুনও আছে।"

এ-কথা যখন হচ্ছিল, তখন পর্যন্ত মনের মধ্যে কোনো বদ্ধমূল ধারণা আমি রাখিনি। ওপরওয়ালার হুকুম হয়েছে গ্রেট আইবীর রহস্য উদ্ঘাটন করার। যদি দেখি, পাহাড়টা নেহাৎই মামুলী পাহাড়—বিপজ্জনক মোটেই নয়—পাঁচ-জনকে তা শুনিয়ে আশ্বস্ত করব। কিন্তু আমার মনের কথাটা লুকিয়ে লাভ কী? আমার ভেতরে কৌতূহল নামে যে দৈত্যটা অহোরাত্র ফুঁসছে, তার মনের খোরাক দিতে হবে তো? আমার নিজের চাহিদা মেটানোর জন্যে

গ্রেট আইরীর রহস্যভেদ করবই করব—অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে গ্রেট আইরীকে ঘিরে—আমি সব রহস্যের কেন্দ্রে পৌছোবো তবে ছাড়ব।

শুরু হল পর্বতারোহণ।।

খুঁজেপেতে ভাল পথ বের করবার জন্যে গাইড দুজন রইল সামনে। আমি আর ইলিয়াস স্মিথ গজেন্দ্রগমনে চললাম ওদের পেছন পেছন। গাছ আর পাথরের ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের একটা ফাটল সিধে উঠে গিয়েছিল ওপরে। সঙ্কীর্ণ হলেও ফাটলটা খুব খাড়াই নয়। আমরা হাত-পায়ের চাড় দিয়ে এই পথ ধরেই চললাম চূড়োর দিকে। পায়ের তলা দিয়ে ঝিরঝির করে নামতে লাগল জলের ধারা। বর্ষাকাল হলে আর রক্ষে থাকত না। ক্ষীণকায়া এই স্রোতস্বিনীই রণরঙ্গিনী মূর্তিতে লাফিয়ে লাফিয়ে নামত পাথর থেকে পাথরে। সরু জলের ধারা রূপ নিত গিরিপ্রপাতের। কিন্তু বর্ষাবাদলার সময় নয় এটা। তাই জলের ধারায় পা ভিজেও ভিজল না। গ্রেট আইরীর ভেতরকার কোনো হ্রদের জলও নয়। হ্রদ উপচে জল নামলে চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ত না।

ঘণ্টাখানেক পরে ফাটল পথ এমন খাড়া হয়ে গেল যে ডাইনে-বাঁয়ে মোড় নিয়ে উঠতে লাগলাম। তাতে সময় গেল বেশী, উঠলাম অতি সামান্যই। কিছুক্ষণ পর এ-ভাবে ওঠাও আর সম্ভব হল না। ভীষণ খাড়া ফাটল সিধে উঠে গেছে মাথার ওপর। পা রাখবারও জায়গা নেই। আমরা তখন গাছ-গাছালি আঁকড়ে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে অতি কষ্টে উঠতে লাগলাম এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। বেশ বুঝলাম, এইভাবে উঠতে থাকলে সূর্য ডুবে যাবে। তবুও শিখরদেশ নাগালের বাইরেই থেকে যাবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন মিস্টার স্মিথ—"বুঝেছি। এই জন্যেই কেউ উঠতে চায় না গ্রেট আইরীতে। এ-পাহাড়ের ধারে-কাছে কেউ ঘেঁসেছে বলে তো মনে পড়ে না আমার।"

"উঠে লাভ কী? এত মেহনত করে লাভ যদি হয় অষ্টরম্ভা, কে এগোবে বলুন? আমরা উঠছি অবশ্য ঠেকায় পড়েছি বলে—"

"যা বলেছেন। বন্ধুবান্ধব নিয়ে কতবার উঠেছি ব্ল্যাকডোম-যে। কিন্তু এ-রকম দুর্ভোগ কখনো পোহাতে হয়নি।" বললে হ্যারি হর্ন।

সায় দিল জেমস ব্রাক—"বাধার যেন আর শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত উঠতে পারব বলে তো মনে হয় না।"

কোন দিকে যাবো, এই নিয়ে দাঁড়ালো সমস্যা। ডাইনে, না, বাঁয়ে? দুদিকেই গভীর জঙ্গল। ও জঙ্গলে ঢোকার চাইতে ন্যাড়া পাথর বেয়ে ওঠা বরং সহজ। বেশ বুঝলাম, জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলটা কোন মতে পেরিয়ে যেতে

পারলেই কেল্লা মেরে দেবো। বাকী পথটা উঠতে খুব বেগ পেতে হবে না। এ-অবস্থায় গাইড দুজনের সহজাত বিচার-বুদ্ধির ওপর নিজেদের সঁপে দেওয়া ভাল। দুজনের মধ্যে সবচাইতে কাজের লোক হল জেমস ব্রাক। ছোকরা বানরের মত হাল্কা, পাহাড়ি ছাগলের মত চটপটে। আমি আর ইলিয়াস স্মিথ তো নাজেহাল হয়ে গেলাম ওর পাছু নিতে গিয়ে।

কিন্তু দরকার পড়লে কখনো পিছিয়ে পড়িনা আমি। আমার স্বভাবই ছিনেজোঁকের মত লেগে থাকা। শরীরটাও নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে বিলক্ষণ মজবুত। সুতরাং জেমস ব্রাক যেখানেই পৌছোকনা কেন, প্রাণ হাতে নিয়েও আমি পৌছোলাম সেখানে। কতবার যে পা পিছলে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম তার হিসেব মনে নেই। কিন্তু মরগানটনের ফার্স্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দশা দেখে মায়া হল আমার। ভদ্রলোক আমাদের মত বলিষ্ঠ, কর্মঠ এবং কমবয়সী নন। চেহারাটা বিরাট এবং বেশ মোটাসোটাও বটে। নাছোড়বান্দা বলতে যা বোঝায়, তা নন। ওঁর জন্যে আমরা যাতে পেছিয়ে না পড়ি, তারজন্যে অবশ্য চেষ্টার কসুর করলেন না ভদ্রলোক। শেষকালে যখন দেখলাম ঠিক সীলমাছের মত হুস্-হুস্ করে হাঁপাচ্ছেন নাদুস-নুদুস ম্যাজিস্ট্রেট মশায়, তখন গাইডদের জোর করে থামানোর চেষ্টা করলাম আমি।

পরিষ্কার বুঝলাম, আন্দাজে ভুল করেছি। বেলা এগারোটায় খাড়াই দেওয়ালের তলায় পৌছোনো কখনো সম্ভব হবে না। এখনো বেশ কয়েক শ' ফুট উঠতে বাকী। অথচ বেলা বারোটা প্রায় বাজতে চলল।

বেশ কয়েকবার এদিক-সেদিক মোড় নিলাম, ওঠবার মত পথের সন্ধানে ঝোপঝাড় ঠেঙানো হল।—শেষকালে দশটার সময়ে গাইডরা ইসারায় দাঁড়াতে বলল আমাদের। ঘন-জঙ্গলের বাইরে এসে গেছি। গাছপালা এখানে ফাঁকা-ফাঁকা। গ্রেট আইরীর পাথুরে পাঁচিল দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। আসল গ্রেট আইরী হল এই খাড়াই দেওয়াল।

"বাস্‌রে!" হাঁফাতে হাঁফাতে একটা মস্ত পাইন গাছে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন মিস্টার স্মিথ। "একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। জিরেন নিলে নবীন-উদ্যমে ফের ওঠা যাবে।"

"এক ঘণ্টার জিরেন পাবেন।" বললাম আমি।

"ফুসফুস আর পা-জোড়াকে খুব খাটানো হয়েছে। আসুন, এবার পেটগুলোকে খাটানো যাক।"

খাওয়ার ব্যাপারে একমত হলাম সকলেই। খেয়েদেয়ে নিয়ে ফের তেড়ে-ফুঁড়ে আক্রমণ করা যাবে'খন গ্রেট আইরীকে। কিন্তু আক্রমণ করাই সার

হবে না তো? মাথার ওপর অনেক উঁচুতে উঠে গেছে গ্রেট আইরীর দুর্লঙ্ঘ্য শিখরদেশ। দেখেই বুক কাঁপে, মন দমে যায়। রাশি রাশি আলগা পাথর ছড়ানো। নুড়িতে পা পড়লেই হড়কে নেমে যেতে হবে অনেক নীচে। এ-জাতীয় পর্বতগাত্রকে স্থানীয় বাসিন্দারা নাম দিয়েছে—'স্লাইড'! এই 'স্লাইড' অর্থাৎ 'গড়াই' আর ঐ খাড়া দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ওঠবার কোনো পথ নেই।

দোস্তকে বলল হ্যারি হর্ন—"জিভ বেরিয়ে যাবে।"

"মনে তো হচ্ছে। অসম্ভব বললেই চলে।" বলল জেমস্ ব্রাক।

ওদের কথাবার্তা শুনেই মুখ শুকিয়ে গেল আমার। সর্বনাশ! ফিরতে হবে? রহস্যভেদ তো দূরের কথা, পাহাড়ে উঠতেও পারি নি, এই কথা মিস্টার ওয়ার্ডকে গিয়ে বলতে হবে? কি মুখ দেখাবো তাঁকে? তার চেয়েও বড় কথা, আমার ভেতরে কৌতূহল নামক যে দানোটা কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে—তাকে শান্ত করব কি করে?

ঝুলি থেকে ঠাণ্ডা রুটি মাংস বের করে দুপুরের আহার সমাধা করতেই গেল একটি ঘণ্টা। এক ঘণ্টার বিশ্রাম কম নয়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন মিস্টার স্মিথ। হনহন করে নব উদ্যমে এগিয়ে গেলেন সামনে। পথ দেখাতে লাগল জেমস ব্রাক।

এগোলাম অতি ধীর গতিতে। গাইডদের মুখচোখের চেহারা দেখেই বুঝলাম, ওরাও দ্বিধায় পড়েছে। মনে সে রকম জোর আর নেই। সংশয় দেখা দিয়েছে—গ্রেট আইরীর চূড়োয় ওঠা সম্ভব হবে কী? একটু পরে হর্ন অনেকটা এগিয়ে গেল সামনে। বুঝলাম, পথ আছে কি নেই, জানতে গেল।

বিশ মিনিট পরে ফিরে এসে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল উত্তর-পশ্চিমদিকে। মাইল তিন-চার দূরে দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাকডোম পর্বতশৃঙ্গকে। পথ এখনো দুস্তর। আলগা পাথর আর তারের মত শক্ত ঝোপ পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। পা টনটন করছে। কষ্ট হচ্ছে খুবই। কি কষ্টে যে আরো দুশ ফুট উঠলাম, তা আমিই জানি।

সামনেই পাথর ফেটে গেছে। ঠিক যেন কুড়ুলের কোপে চাকলা উঠে গেছে পাহাড়ের গা থেকে। গাছ উপড়ে গিয়েছে—মুখ বাড়িয়ে রয়েছে ছেঁড়া শেকড়। খাঁজে আটকে রয়েছে ভাঙা ডালপালা। মস্ত পাথর গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে গিয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, বড় গোছের হিমানী-সম্প্রপাত ঘটেছে কিছুদিন আগে। পাহাড়ের ওপর বরফ জমেছিল। তারপর বরফের ধস নেমেছে। এককথায় যাকে বলা যায়—আভালাঁশ।

জেমস ব্রাক বলল—"এই পথেই গ্রেট আইরীর পাথর ভেঙে গড়িয়ে পড়েছে।"

সায় দিল হ্যারি হর্ন—"রাস্তা যখন তৈরী—তখন এই রাস্তা ধরেই ওঠা যাক।"

গ্রেট আইরীর সেই ক্ষতস্থান দিয়েই শুরু হল পর্বতারোহণ। মস্ত চাঁইটা প্রবলবেগে মাটি ঘসটে নামবার সময়ে আপনা থেকেই মাটিকে চেপেচুপে রাস্তা বানিয়ে দিয়ে গেছে। আমরা শক্ত খাঁজে পা রেখে টপাটপ উঠতে লাগলাম সোজা রেখায় এবং ত্বপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম 'গ্লাইড' নামক তুস্তর অঞ্চলের ওপর সীমায়।

একশ ফুট দূরে শুরু হয়েছে গ্রেট আইরীর সর্বশেষ বাধা—একশ ফুট উঁচু খাড়াই পাঁচিল। ঠিক যেন একটা চোঙা—একশ ফুট উঁচু, মসৃণ এবং গোলাকার—সটান উঠে গেছে মেঘলোকের দিকে।

এদিক দিয়ে চুড়োয় পৌঁছোনো সম্ভব নয়। দেওয়াল যেন হেলেত্বলে মাথা তুলেছে শূন্যে। সূচ্যগ্র খোঁচ আছে—কিন্তু সমতা নেই কোথাও। অনেক উঁচুতে দেখা যাচ্ছে একটা ঈগল পাখী। আমাদের দেখেই বিশাল ডানা মেলে ভাসল বাতাসে।

মিস্টার স্মিথ বললেন—"সবুর! সবুর! একটু জিরিয়ে নিয়ে অন্যদিক দিয়ে ওঠা যায় কিনা দেখা যাবে।"

"কোনো দিক দিয়েই আর উঠতে পারবেন না," বলল হ্যারি হর্ন। "পাথর ভেঙে গড়িয়ে পড়েছে এই দিক দিয়েই—অন্য কোনো দিকে নয়। সুতরাং এ-ছাড়া আর রাস্তা নেই।"

তুজনের কথাই ঠিক। রাস্তা এই একটাই—এদিক দিয়ে ওঠা সম্ভব না হলে অন্যদিকে চেষ্টা করতে হবে বই কি। যাই হোক, মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে দম নিয়ে ফের শুরু হল পাহাড় ভাঙা। হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছোলাম প্রস্তর-প্রাকারের পাদদেশে। প্রবেশ পথের সন্ধানে শুরু হল পাদদেশ-পরিক্রমা।

গ্রেট আইরীকে এত কাছ থেকে দেখে মনে হল একটা ফ্যানটাসটিক কিছু দেখছি। এ-যেন কল্পলোকের দৈত্যপুরী। এখানে যারা থাকে তারাও অমানুষিক—বিপুলকায় দানব। পুঁথিপুরাণের চিমেরা, গ্রিফিনরা এসে গ্রেট আইরীর খবরদারি শুরু করলেও অবাক হতাম না। ড্রাগনদেব গোপন আস্তানা বুঝি এইরকমই হয়।

খাড়াই দেওয়ালের গোড়া ঘেঁসে অতি সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে ঘুরে এলাম এক চক্কর। কিন্তু ওঠবার মত সামান্য জায়গাও পেলাম না। প্রকৃতি স্বয়ং যেন মানুষের কারখানায় তৈরী তেলতেলে মসৃণ চোঙা বানিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন গ্রেট আইরীর মাথায়। কেল্লার বুরুজের মত ত্বর্ভেদ্য প্রাচীর—বুড়ো আঙুল

রাখবারও জায়গা নেই কোথাও। প্রতিটি ইঞ্চি যেন ফিতে দিয়ে মেপে বানানো। যেখানেই যাই না কেন, দুর্গপ্রাকারের মতই পাথর-পাঁচিলের উচ্চতা ঠিক একশ ফুট!

ঘণ্টা দেড়েক পরে কাল ঘাম ছুটে গেল সকলের—শেষ হল পাদদেশ পরিক্রমা। বুকভরা হতাশা আর গোপন করতে পারলাম না। মিস্টার স্মিথও যে ভেঙে পড়েছেন মনে মনে, তা তাঁর কাষ্ঠহাসি দেখেই বুঝলাম।

বললেন—"জাহান্নমে যাক গ্রেট আইরী! আগ্নেয়গিরি না কচু! জ্বালামুখও নয়!"

আমি বললাম—"আগ্নেয়গিরি হলেই বা কি, না হলেই বা কি! এতক্ষণ এত কাছে থেকেও আগুনের ছিটেফোঁটাও তো পেলাম না। আওয়াজ-টাওয়াজও শুনলাম না। অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে আধমরা হয়ে থাকবার মত কিছুই নেই।

একটুও বাড়িয়ে বলিনি। অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারিদিকে। মৌনী পর্বত মাথা তুলে মূক বিস্ময়ে যেন দেখছে আমাদের। তারও উঁচুতে ঝকঝক করছে নীল আকাশ।

হিসেব করে দেখলাম, দুস্তর এই পর্বতশৃঙ্গের পরিধি বারোশ' থেকে পনেরোশ' ফুটের মধ্যে। দেওয়ালটা কতখানি পুরু জানতে পারলে ভেতরকার গহ্বরটা চওড়া কতখানি, তা জানা যেত।

মাথার ওপর অনেক উঁচুতে কতকগুলো শিকারী পাখী উড়ছে। এ-ছাড়া আর কোনো প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। বেশীক্ষণ থাকলে বুকের মধ্যে যেন পাথরের মত চেপে বসে নিথর নীরবতা।

ঘড়ি দেখলাম। তিনটে বাজে। খেঁকিয়ে উঠলেন মিস্টার স্মিথ—"দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কী? সারাদিন একপায়ে খাড়া থাকলেও চূড়োয় ওঠা যাবে না। মিস্টার স্ট্রক, সন্ধ্যেনাগাদ প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেনে ফিরতে যদি চান তো এখুনি রওনা হতে হবে।"

জবাব দিলাম না। এক ইঞ্চিও নড়লাম না, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের গা ঘেঁসে!

ফের হাঁক দিলেন মিস্টার স্মিথ—"কি হল? জবাব দিচ্ছেন না কেন? চলুন, নামা যাক।"

আমার মনের অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। অভীষ্টসিদ্ধি হল না, অথচ ফিরতে হবে? কৌতূহল নামক দানবটা মনের মধ্যে সমানে গুঁতিয়ে চলেছে। প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছি শিরায় উপশিরায়—রহস্যভেদ না করে ফেরা

চলবেনা! বাধা যতই বাড়ে, রোখও তত বাড়ে। আমার হয়েছে তাই। কিন্তু জেদ চেপে গেলেও করবটা কি? পাহাড়ের চূড়ো উল্টে ফেলে ভেতরে উঁকি দেব? দুহাতের নখ পাথরের ফাটলে ঢুকিয়ে চড়চড় করে পাথর ফাটিয়ে ভেতর পর্যন্ত দেখে নেব? অসম্ভব···অসম্ভব···যা দুঃসাধ্য, তা নিয়ে সময় নষ্ট করে আর লাভ কী? শেষবারের মত তাই জ্বলন্ত চাহনি নিক্ষেপ করলাম দুর্জয় গ্রেট আইরীর দুর্লঙ্ঘ্য শীর্ষের দিকে এবং নীরবে নতমস্তকে নামতে শুরু করলাম সঙ্গীদের পেছন পেছন।

নামবার সময়ে বিশেষ কষ্ট হল না। পথ যেখানে নেই, সেখানে 'গড়াই' অর্থাৎ 'স্লাইড' বেয়ে হড়কে নেমে এলাম। পাঁচটা নাগাদ পৌঁছোলাম পাহাড়ের তলায়। উইলডনের চাষী আনন্দে আটখানা হল আমাদের দেখে। সঙ্গে সঙ্গে বসিয়ে দিল টেবিল ভর্তি পঞ্চব্যঞ্জনের সামনে।

শুধোলো—"হল তো? ঢুকতে পারলেন না ভেতরে?"

ঘোঁৎ করে বললেন মিস্টার স্মিথ—"ভেতর বলে কিছু থাকলে তো ভেতরে ঢুকব? গেঁইয়াদের কারবারই আলাদা! যত্তোসব মন গড়া কথা!"

রাত আটটায় গাড়ী পৌঁছালো প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের মেয়রের বাড়ীতে। রাত কাটালাম সেখানে! আমি কিন্তু দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সাত পাঁচ কথা ভেবেই রাত ভোর করে দিলাম। কখনো ভাবলাম, পরের দিন পর্বতারোহীদের আরেকটা দল জুটিয়ে পাহাড়ে উঠব। কখনো ভাবলাম, তাতে লাভ কী? গ্রেট আইরীর যা-চেহারা দেখে এসেছি, পাখী ছাড়া কারো ক্ষমতা নেই তার মাথায় ওঠার। শেষকালে ঠিক করলাম, ধুত্তোর, মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে গিয়ে সব কথা বলা যাক। দেখাই যাক না কি পরামর্শ উনি দেন।

সেইমত পরের দিন গাইড দুজনকে মোটা বকশিস দিয়ে ফিরে এলাম মরগানটনে। সেই রাতেই চেপে বসলাম ওয়াশিংটনগামী ট্রেনে।

(৪) মোটর ক্লাবের মিটিং

গ্রেট আইরী কি তাহলে সত্যিই চিররহস্যাবৃত থাকবে? নাকি, এমন একদিন আসবে যেদিন রহস্যের অবগুণ্ঠন সরে যাবে পাহাড়-চূড়া থেকে কল্পনাতীত নতুন কোনো ঘটনায়? একমাত্র ভাবীকালই জানে এ-প্রশ্নের উত্তর। হেঁয়ালীর সমাধান কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ? বলা বাহুল্য! নর্থ ক্যারোলিনার এতগুলি প্রাণীর জীবন নির্ভর করছে বিচিত্র এই রহস্যের ওপর।

ওয়াশিংটনে ফিরে আসার দিন পনেরো পরেই কিন্তু জনমত বিভ্রান্ত হল

নতুন একটা ঘটনায়। হৈ-চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। রহস্যটা নতুন ধরনের —কিন্তু গ্রেট আইরী রহস্যের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মে মাসের মাঝামাঝি খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। পেনসিলভানিয়ার সব কটা খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হল একটাই খবর। অদ্ভুত কতকগুলো কাণ্ড ঘটছে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

ফিলাডেলফিয়া থেকে অনেকগুলো রাস্তা রশ্মিরেখার মত বেরিয়ে গিয়েছে চারিদিকে। প্রায় দেখা যাচ্ছে নক্ষত্রবেগে কি যেন একটা বেয়ে যাচ্ছে এই সব রাস্তার ওপর দিয়ে। জিনিসটা দেখতে কি রকম, কত বড়, তা কেউ বলতে পারছেনা। কক্ষচ্যুত উল্কার মত ভীষণ বেগে ছোটে যন্ত্রযানটা—তাই ধুলোর ঝড় ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। না গেলেও, একবাক্যে সবাই বললে যন্ত্রযানটা নিশ্চয় এক ধরনের মোটরগাড়ী। কি ধরনের মোটর? কেউ জানেনা। কিন্তু কল্পনা করতেও ছাড়ল না। পাবলিক যখন কল্পনা করতে শুরু করে, তখন ফলাফল কি দাঁড়ায়? কথায় বলে, গল্পের গরু গাছে ওঠে। উদ্দাম কল্পনার ফলও দাঁড়ালো সেইরকম।

এ কাহিনী যখনকার, তখন পেট্রল, ইলেকট্রিসিটি অথবা বাষ্প চালিত মোটরগাড়ীর গতিবেগ ষাট মাইলের বেশী কখনোই উঠত না। ইউরোপ আমেরিকায় এক্সপ্রেস ট্রেনও এর বেশী জোরে ছুটতে পারতনা। কিন্তু রহস্যজনক এই শকট নাকি ছোটে তার দ্বিগুণ বেগে।

এত জোরে ছুটলে রাস্তাঘাটে বিপদ আপদ লেগেই থাকবে, এ আর আশ্চর্য কী। যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারী পর্যন্ত—প্রত্যেকের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হল। কোনো রাস্তাই আর নিরাপদ রইল না, দুরন্ত শকটের ভয়ে। আকাশের বজ্রের মতই যন্ত্রযান যে আসছে, তা টের পাওয়া যেত অবশ্য অনেক আগেই। দূর থেকে ভেসে আসত গুম গুম-গুম গুম শব্দ। যাওয়ার পথে পেছনে রেখে যেত ঘূর্ণিঝড়। চক্ষের পলকে উধাও হত মাটির বিদ্যুৎ। ভেঙে পড়ত গাছের ডাল, লাঙল শুদ্ধ টেনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতো আতংকিত গরুর দল, ছাগল মুরগী শুওর চোঁ চাঁ দৌড় দিত যে-যেদিকে পারে, পাখীর দল প্রচণ্ড হাওয়ার টানে ছিটকে পড়ে মারা যেত কাতারে কাতারে।

অদ্ভুত, সন্দেহ নেই। সব চাইতে অদ্ভুত হল কাহিনীর মধ্যে ভুতুড়ে অংশটুকু। এতবেগে যন্ত্রযান রাস্তা মাড়িয়ে ছুটে যায়। অথচ রাস্তায় চাকার দাগ পড়ে না কেন? খবরের কাগজওলা এই অলৌকিক অংশটুকু নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জনসাধারণের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিল। এ ধরনের ভারী গাড়ী গেলে রাস্তায় ঘর্ষণের দাগ থাকবেই থাকবে। কিন্তু সামান্য কিছু ধুলোর রেখা

ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। যেন ধুলো ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—আলতো ছোঁয়া লেগেছে বাস্তাব ওপব। প্রচণ্ডবেগে যন্ত্রযান উধাও হলে পেছনের ঘূর্ণিঝড এ-টুকু ধুলো তো বাখবেই। কিন্তু চাকার দাগ কই? চিহ্ন আছে ধূলি-ঝঞ্ঝার—কিন্তু যন্ত্রযানেব?

'নিউইয়র্ক হেব্যাল্ড' অবশ্য মন্তব্য কবেছিল—"বস্তু যখন চূড়ান্ত গতিবেগে ধেযে যায়, তাব ওজন কমে যায়।"

সর্বনাশা শকটকে নিযে হৈ-চৈ পড়ে গেল চাবিদিকে। পথচাবীরা যদি নিবাপদে পথ হাঁটতে না পাবে, যানবাহন যদি নিশ্চিন্তভাবে বাস্তা চলতে না পাবে, তাহলে তাব ব্যবস্থা কবা হোক। উন্মাদেব মত যন্ত্রযান ছুটবে—যাওযাব পথে সবকিছু তছনছ কবে যাবে—এতো ববদাস্ত কবা যায না! এখুনি এই পাগলামিব বিহিত কবা হোক। বন্ধ করা হোক যন্ত্রযানেব পথ পবিক্রমা।

কিন্তু বন্ধ কে কববে? কাকে ধবলে শকট আব বাস্তায নামবেনা? গাড়ীটা কাব? কোত্থেকে আসে? কোথায যায? মত্ত প্রভঞ্জনেব মত ছুটে আসে রহস্যজনক যন্ত্রযান, বুলেটেব মত নিমেষ মধ্যে ধেযে যায সামনে দিযে। ঠিক যেন একটা ঝাপসা বেখা দেখা যায—তাব বেশী কিছু নয। পাগলা হাওযাকে কি বোখা যায? কামানেব গোলাকে কি ধবা যায?

ফেব বলছি, যন্ত্রযানটা ছুটছে কোন ইঞ্জিনেব শক্তিতে, সেইটাই কেউ আবিষ্কার কবতে পাবল না। বন্দুক নিক্ষিপ্ত গুলিব মত উধাও হলেও পেছনে ধোঁযাব বেখা, পেট্রলেব গন্ধ, বাষ্প ব মেঘ থাকত। কিন্তু আশ্চর্য এই যন্ত্রযান মিলিয়ে যাওযাব পব বাতাসে কোনো তেলেব গন্ধ পাওযা যায না—পেট্রলেব তো নযই। কযলাব ধোঁযা বা স্টীমেব কুহেলীও দেখা যায না। তবে কি এই গাডীব মূল শক্তি ইলেকট্রিসিটি? অজ্ঞাত মডেলেব অ্যাকুমুলেটবে নতুন ধবনেব কেমিক্যাল ঢেলে তৈবী হচ্ছে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তি?

আগেই বলেছি, জনসাধাবণ যখন কল্পনা কবতে আবম্ভ কবে, তখন মাত্রা ছাডিযে যায়। নানা মুখে লক্ষ গুজব ছডিযে পডল। কত বকম উদ্ভট গল্প যে শোনা গেল, তাব ইযত্তা নেই। উত্তেজিত জনসাধাবণ গোগ্রাসে গিলতে লাগল নিত্যনতুন কাহিনী এবং বিশ্বাস কবল অক্ষবে অক্ষরে। কুহেলী ধূসব এই শকটেব চালক নাকি শযতান স্বযং। অপদেবতাও বলা যায়। নবক থেকেও সাক্ষাত প্রেতমূর্তিবা এসে বসে চালকের আসনে। পবলোক থেকে আসে বলেই এ-গাডীকে চোখে দেখা যায় না প্রেতচ্ছাযাব মতই বিলীন হয পরলোকে। মানুষ তাকে বাধা দেবে কি কবে? কতটুকু ক্ষমতা মানুষেব? কিন্তু শযতানের ক্ষমতা অসীম। অদৃশ্যলোকেব অশবীবি বিভীষিকারা তাব সহায়।

কিন্তু খোদ শয়তান এলেও রাস্তার নিয়ম মানতে হবে বই কি! শয়তান বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? কক্ষচ্যুত উল্কার মত পথে-ঘাটে প্রেত-যান চালানোর বিশেষ অনুমতি-পত্র নেওয়া উচিত ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দপ্তর থেকে। বিনা পারমিটে তো বটেই, গাড়ীর নম্বর পর্যন্ত নেই, লাইসেন্সের বালাইও নেই। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল ঘণ্টায় দুশ মাইল বেগে গাড়ী হাঁকানো লাইসেন্স শয়তান কেন, কোনো মানুষকেও দেওয়া হয় নি। সুতরাং আর দেরী নয়। জনসাধারণের নিরাপত্তার খাতিরে এই মুহূর্তে ভয়ংকর ড্রাইভারের রহস্য উন্মোচন করা হোক—মুখোশধারী শয়তানের আসল চেহারা দেখানো হোক।

শুধু ফিলাডেলফিয়া নয়, অন্যান্য অঞ্চলেও ভোজবাজির মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে যেতে লাগল শয়তানের শকট। খসে পড়া তারার মতই ছুটে গেল দেশে দেশে। মাথা পাগলা মোটর-রেসুড়ের সর্বনাশী দৌড় প্রতিযোগিতা পেনসিলভানিয়ার লোকজন ছাড়াও দেখল নানান দেশের লোক। গুড়-গুড়-গুম-গুম শব্দে দূরাযত্ত বজ্রের মত ধেয়ে এল ভুতুড়ে শকট—ধুলোর ঝড়ে গা-ঢাকা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্ত মধ্যে। পুলিশের কাছে ক্রমাগত খবর আসতে লাগল, আশ্চর্য যন্ত্রযান সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে ফ্রাঙ্কফোর্টের কাছে কেনটাকিতে, কোলামবাসের কাছে ওহিওতে, অ্যামভিলের কাছে টেনেসিতে, জেফারসনের কাছে মিসৌরীতে এবং সবশেষে চিকাগোর ধারে-কাছে ইলিনয়-তে।

এক কথায়, সামাল সামাল রব উঠল দেশে দেশে। একী উৎপাত? একী নিগ্রহ? একী আপদ? সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণটিকে শক্ত হাতে নির্মূল করার জন্যে এগিয়ে এল কর্তৃপক্ষ। জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। কিন্তু প্রেতচ্ছায়ার মত অপস্রিয়মান মত্ত প্রভঞ্জনকে গ্রেপ্তার করাও তো অসম্ভব। একটা কাজ করা যেতে পারে। রাস্তা জুড়ে বড় বড় চাঁই ফেলে রাখলে মজাটি টের পাবে ধাবমান যন্ত্রদানব। রাস্তা বন্ধ জানতেও পারবে না—কামানের গোলার মত ছুটে আসবে এবং সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের পলকে লক্ষ টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে মাঠে-ঘাটে-রাস্তায়।

অবিশ্বাসীরা অবশ্য বলল—"যতো সব উদ্ভট ফন্দী! পাগলা ড্রাইভার হুঁশিয়ার লোক। পথের বাধা কাটিয়ে শকট চালনার কৌশল সে জানে।"

আর একদল উঁচিয়ে ছিল টিপ্পনী কাটবার জন্যে। তারা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—"বাধা থাকলে তাকে লাফিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নিশ্চয় শয়তানের শকটের আছে?"

"ঠিক, ঠিক," সায় দিল অন্যান্যরা—"চালক যদি খোদ শয়তান হয়, নিদেনপক্ষে ভূতপূর্ব পরী-টরীও যদি হয়, নিশ্চয় ডানাজোড়া কাঁধেই লাগানো আছে। বাহনসমেত সাঁ করে উড়ে যেতেও তো পারে?"

কথাটি অবশ্য আহাম্মক গুজববাজদের। অজ্ঞাত বস্তুটি আদতে কী, তা নিয়ে গবেষণা করার কোনো প্রয়োজন মনে করে না এরা। আরে বাবা, নরক-নৃপতির কাঁধে একজোড়া ডানা থাকলে পাখীর মত স্বচ্ছন্দে আকাশপথে উড়ে গেলেই পারেন। খামোকা মাটি মাড়িয়ে সর্বনাশা স্পীড শকট হাঁকিয়ে নিজের প্রজাবৃন্দকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করতে যাবেন কেন?

এ-হেন পরিস্থিতিতে যে মাসের শেষ সপ্তাহে ঘটল সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা। এই ঘটনার পর সন্দেহাতীতভাবে বোঝা গেল, গোটা যুক্তরাষ্ট্র এক দানবিক উৎপাতের খপ্পরে পড়েছে।

আততায়ীকে ধরা যায় না, দেখা যায় না—কিন্তু তার অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। এই কারণেই তার উপদ্রবের প্রতিকার সম্ভব নয়। কে জানে সারা আমেরিকা কাঁপিয়ে এবার সে ইউরোপেও হানা দেবে কিনা। অসাধারণ শকট চালকের রহস্যময় আবির্ভাবে সেখানকার লোকেও থরহরি কম্প হবে কিনা।

চাঞ্চল্যকর খবরটা একযোগে প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রের সব কটা দৈনিক কাগজে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ, উষ্ণ আক্রোশ, ভয়ার্ত মন্তব্যের ঝড় বয়ে গেল যেন সারা দেশের ওপর দিয়ে।

খবরটি এই:

উইসকনসিনের মোটর ক্লাব একটা মোটর রেসের আয়োজন করেছিল। ম্যাডিসন সেই প্রদেশের রাজধানী। রাস্তাটা তিনশ মাইল লম্বা - মোটর রেসের উপযুক্ত। শুরু হয়েছে পশ্চিম প্রান্তের প্রেইরি ডু চিয়েন থেকে, শেষ হয়েছে লেক মিচিগানের পাড়ে মিলওয়াকি শহর ছাড়িয়েই। উইসকনসিনের এই রাস্তাকে টেক্কা মারতে পারে পৃথিবীর আর একটি রাস্তা—নিকো আর নাগোয়া মধ্যস্থ দানবিক সাইপ্রেস তরুবীথি ছাওয়া জাপানী পথ। এ-ছাড়া বিশ্বের কোথাও এমন খাসা রাস্তা আর নেই। একটানা পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত সিধে গেছে এ-রাস্তা—ঠিক যেন ধনুক নিক্ষিপ্ত তীর। উঁচুনিচু কোথাও নয়—আগাগোড়া সমতল। নাম করা অনেক গাড়ী অংশ নিয়েছিল দৌড়-প্রতিযোগিতায়। মোটর সাইকেল থেকে আরম্ভ করে মোটর গাড়ী পর্যন্ত—কেউ বাদ যায়নি। সব মডেলের, সব গড়নের, সব দেশের যন্ত্রযান নাম লিখিয়েছে রেসে। কেন না, পুরস্কারের মোট পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার

ডলার। টাকার লোভেই মরিয়া হয়ে গিয়েছিল রেস্থ্ডেরা—প্রাণ যায় যাক, জিততেই হবে। সর্বোচ্চ বেগের কীর্তি রাখতেই হবে।

ধরে নেওয়া গেল সব চাইতে বেগবান যন্ত্রযান ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে দৌড়োবে। তার মানে, দুশ মাইল পথ পাড়ি দিতে সময় লাগবে তিন ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টা যাতে রাস্তায় অন্য কোনো যানবাহন না চলে, তার ব্যবস্থা করলেন কর্তৃপক্ষ। নিষেধাজ্ঞা জারী হয়ে গেল, প্রাণের মায়া থাকলে তিবিশে মে সকালবেলা অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত রেসের রাস্তায় গাড়ী নিয়ে কেউ যেন বাহাদুরি দেখাতে না আসেন। দুর্ঘটনা ঘটলে আহত বা নিহত ব্যক্তিই দায়ী হবেন।

পিল পিল করে লোক আসতে লাগল রেস দেখতে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল পুরো তল্লাটটা। উইসকনসিনের লোক তো এলই, সেই সঙ্গে হাজার হাজার লোক এল প্রতিবেশী প্রদেশ থেকে। ইলিনয়, মিচিগান, আয়োয়া, ইণ্ডিয়ানা, এমন কি সুদূর নিউইয়র্ক থেকেও পিঁপড়ের মত সারি দিয়ে জনতা আসতে লাগল রগড় দেখতে। এলেন বিস্তর বিদেশী স্পোর্টসম্যান। ইংরেজ ফরাসি, জার্মান অস্ট্রিয়ান এবং অন্যান্য দেশবাসী—কেউ বাদ গেলেন না। এঁরা প্রত্যেকেই এলেন নিজের দেশের প্রতিযোগীদের মদৎ দেওয়ার জন্যে। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের চিরাচরিত রেওয়াজ অনুযায়ী এল জুয়াড়ীরা। মোটা টাকার বাজি পড়তে লাগল জনতার মধ্যে কে হারে কে জেতে এই নিয়ে। সব মিলিয়ে, এলাহি কাণ্ড আরম্ভ হল উইসকনসিনের মোটর রেসে।

রেস শুরু হবে কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। এক সঙ্গে সমস্ত গাড়ী ছুটতে শুরু করলে অ্যাকসিডেণ্ট অনিবার্য। তাই, দু'মিনিট অন্তর একটি একটি গাড়ী ছুটে যাবে ভীম বেগে। রাস্তার দুপাশে কালো মাথার সর্দার তো রইলই— প্রতিযোগীদের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

প্রথম দলের দশজন রেস্থ্ডেকে ছেড়ে দেওয়া হল আটটা আর আটটা কুড়ির মধ্যে। দুর্ঘটনা না ঘটলে এগারোটার মধ্যেই এদেই অনেকেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যস্থানে। পরের গাড়ীগুলো একে একে রওনা হল এদের পেছনে।

দেড়ঘণ্টা পর দেখা গেল প্রেঙ্গরি দু চিয়েনে বাকী রয়েছেন আর মাত্র একজন প্রতিযোগী। পাঁচ মিনিট অন্তর টেলিফোনে খবর আসছে। প্রতিযোগীরা কে কার পেছনে রয়েছেন, কে, এগিয়ে গেছেন—সমস্ত খবর যেন নখদর্পণে জানা যাচ্ছে। ম্যাডিসন আর মিলঅকির মাঝামাঝি রাস্তার সব কটা গাড়ীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল বেনন্ট ভাইয়েদের চার সিলিণ্ডার

যুক্ত কুড়ি অশ্বশক্তি সম্পন্ন বেগবান যন্ত্রযান। গাড়ীর চাকাগুলিও মাইকেলিন টায়ারে তৈরী। ঠিক পেছনেই যাচ্ছিল হার্ভার্ড ওয়াটসন আর ডায়ন-বুটন গাড়ী দুখানা। এর মধ্যেই অনেক অ্যাকসিডেণ্ট ঘটেছে এবং ঘটছে। অনেক গাড়ী রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাকী সব যন্ত্রযান অসহায ভাবে পেছিয়ে পড়েছে, জিততে পারবে বলে মনে হয না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, শেষ দৌড়টা হবে জনাবাবোর মধ্যে। সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী। তাঁদের খুঁটিনাটি বিবরণ পর্যন্ত ছাপা হল খববেব কাগজে। কিন্তু আশ্চয দেশ আমেরিকায় তা নিয়ে কেউ উতলা হল না। শুধু জখম কেন, নিহত হলেও হৈ চৈ পডতনা। দৌড-প্রতিযোগিতায় মাবা যাওয়াটা ওদেশে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

তাই পুবোধা প্রতিযোগী মিলঅকিব ফিনিশিং লাইনেব কাছাকাছি আসতেই উৎকণ্ঠা চবমে উঠল। উৎসাহ উদ্দীপনা কৌতূহলে ঠাসা মানুষেবাই ভীড করেছে পথেব দুধাবে। উত্তেজনা আবেগে ধডাশ ধডাশ করছে প্রত্যেকেব হৃদপিণ্ড। দশটা নাগাদ আঁচ কবা গেল বিশ হাজার ডলাবেব প্রথম পুরস্কাবটা পাঁচটি গাডীব একটিব ববাতে ঝুলছে। এই পাঁচটি মোটবেব দুটি আমেবিকান, দুটি ফ্রেঞ্চ, একটি ইংলিশ।

বাজিধবাব হিড়িকটা এবাব কল্পনা করুন। স্বদেশ প্রীতি, দেশাত্মবোধেব জোয়াব এল যেন। আমেবিকান গাড়ীকে জেতাতেই হবে। বিপুল অংকেব বাজি ধবা শুরু হল বাস্তাব দুধারে। একই সঙ্গে এত লোক বাজি ধবায় হিসেব রাখতে হিমসিম খেযে গেল জুযাডীব। চাবিদিক থেকে কেবল হাঁকডাক চীৎকাব চেঁচামেচি—"হারভার্ড ওয়াটসন। ওয়ান টু থ্রী।"

"ডায়ন বুটন—ওযান টু টু!"

"সর্বস্ব পণ কবলাম বেনল্টযের ওপব!"

টেলিফোন মাবফৎ এক একটা খবব আসছে সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিযে উঠছে জনসাধারণ।

প্রেঈরি দু চিয়েনেব ঘড়ি ঘবে তখন সাড়ে নটা বাজে। শহব থেকে মাইল দুই দূরে আচমকা একটা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। ধূলি-মেঘের মধ্যে থেকে উত্থিত হল প্রচণ্ড গুড-গুড-গুম-গুম শব্দ। ধুলোর মেঘ যেন নিমেষ মধ্যে উড়ে গেল বাস্তার ওপব দিযে—সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ তীব্র ধ্বনি—যেন নৌবাহিনীর সাইবেন বাজছে।

সামাল-সামাল রব উঠল চারিদিকে। এসে গেছে! এসে গেছে! দুরন্ত উৎপাত উড়ন্ত শয়তানের চালনায় ফের রাস্তায় নেমেছে! সরে দাঁড়াও!

সরে দাঁড়াও। কিন্তু সরবার সময় কোথা? অথচ সরতেই হবে। পথ করে দিতেই হবে। নইলে কয়েক শ' লোক এক ধাক্কাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে যে!

প্রাণের ভয়ে আঁতকে উঠে দেখতে দেখতে পথ পরিষ্কার করে দিল জনতা, হারিকেন ঝটিকার মত বিপুল বেগে সাঁৎ করে উধাও হল ধূলোর মেঘ। কল্পনাতীত গতিবেগে কি জিনিস গেল পাশ দিয়ে, কেউ দেখতেও পেলেন না। শুধু বোঝা গেল, ছুটন্ত মেঘের গতিবেগ কম করেও ঘণ্টায় একশ পঞ্চাশ মাইল।

নিমেষের জন্যে আবির্ভূত হয়েই পরমুহূর্তে অদৃশ্য হল প্রেতচ্ছায়া। পেছনে রইল কেবল সাদা ধূলোর সুদীর্ঘ রেখা—ঠিক যেন এক্সপ্রেস ট্রেন ধোঁয়ার ট্রেন রেখে গেল পেছনে। গতি প্রকৃতি দেখে মনে হল জিনিসটা অত্যন্ত অসাধারণ ইঞ্জিন-চালিত এক ধরনের মোটর। জ্যামুক্ত তীরের মত এইভাবে সাঁই সাঁই করে ছুটলে প্রতিযোগীদের সামনে পৌঁছোবে অচিরে। তাদের স্পীডের দ্বিগুণ স্পীডে ছাড়িয়ে যাবে সবাইকে—পৌঁছে যাবে চরম লক্ষ্যে।

বিপদ কেটে যেতেই লুপ্ত সাহস ফিরে এল জনসাধারণের মধ্যে। শোনা গেল নানাধরনের চেঁচামেচি।

"নারকীয় মেশিন—ফের এসেছে নরক থেকে।"

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই। পুলিশের ক্ষমতাও নেই ওর টিকি ধরবার।"

'পুরো পনেরোটা দিন ঘাপটি মেরে ছিল অলৌকিক উৎপাত।'

"ভেবেছিলাম মেশিন বিগড়েছে—নয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে—আর আসবেনা।"

"শয়তানের শকট—নরকের আগুনে চলছে—চালক শয়তান স্বয়ং।

সত্যি কথা বলতে কি, শয়তান না হলেও চালকটি কে? নিজে রহস্যে ঘেরা, মেশিনটিও ততোধিক রহস্যাবৃত। স্পষ্ট বোঝা গেল, এই মেশিনটিই এতদিন হানা দিয়েছে দেশে দেশে—তারপর অনেকদিন দেখা যায় নি। আত্মঅহমিকায় স্ফীত হয়ে পুলিশ ভেবেছিল বুঝি তাদের দাপটেই ভুতুড়ে যন্ত্রযান ফের ফিরে গেছে ভূতলোকে। কিন্তু পুলিশ মহলের মুখ চুণ করে দিয়ে ফের আবির্ভূত হয়েছে উন্মাদ চালক—উন্মত্ত বেগে ঐ তো চালিয়ে নিয়ে গেল যান্ত্রিক বিস্ময়কে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা থিতিয়ে আসতেই লোক ছুটল টেলিফোন যন্ত্রের কাছে। রিসিভার তুলে নিয়ে হুঁশিয়ার করে দিল সামনের লোকদের এবং প্রতিযোগীদের। যাচ্ছে! যাচ্ছে! কালান্তক যমদূতের মত ছুটন্ত বিভীষিকা ভীমবেগে ধেয়ে যাচ্ছে সামনে। চূড়ান্ত বিপদ ছুটে আসছে রাস্তা কামড়ে!

সাক্ষাৎ আভালাঁশ যেন…যেন ধস নেমেছে পাহাড় থেকে…সামনে যা পাবে তাই ছারখার করে দেবে ছুটন্ত আতংক…তছনছ করে ছুটছে…ছুটছে…ছুটছে…! টক্কর লাগলেই মোটরসমেত প্রতিযোগীরা সহস্র খণ্ডে চূর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন হবে ধরাধাম থেকে! হুঁশিয়ার! সবাই হুঁশিয়ার! ভয়ংকর উন্মাদ ছুটে আসছে শয়তানের শকট হাঁকিয়ে!

টক্কর লাগলে উন্মাদ চালক নিজেও কি অক্ষত থাকবে? মনে হয় থাকবে। অতিশয় ধুরন্ধর আর ঝানু ড্রাইভার না হলে এই বেগে যন্ত্রযান চালানোর সাহস কারো হয় না! পাকা হাত বলেই যন্ত্রযান চালাচ্ছে না তো, যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাত আর চোখ যুগপৎ কাজ করে চলেছে নিখুঁতভাবে। পথের বাধা কাটিয়ে যেতে হয় কিভাবে, তা জানে বলেই বুকের পাটা তার এতখানি। উইসকনসিন কর্তৃপক্ষ অবশ্য আগে থেকে অন্যান্য যানবাহন চলা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন—প্রতিযোগীদের মোটর ছাড়া অন্য কোনো মোটর ও রাস্তায় এখন চলবে না। তা সত্ত্বেও কিনা প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নেমেছে নামগোত্রহীন অজ্ঞাত একটা যন্ত্রযান? কি অধিকারে নিষিদ্ধ রাস্তায় আবির্ভূত হয়েছে ছুটন্ত আতংক—জানাব অধিকার নিশ্চয় আছে জনসাধারণের?

প্রতিযোগীরা টেলিফোন মারফৎ খবর পেয়ে গিয়েছিল। গ্র্যাণ্ড প্রাইজের কথা ভুলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল প্রত্যেকেই। একপাশে সরে গিয়েও স্পীড কমায়নি কেউ। প্রাণপণে ছুটছে প্রত্যেকের মোটর। এর চেয়ে জোরে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এমন সময়ে গুড়-গুড়-গুম-গুম শব্দ ভেসে এল অনেক পেছন থেকে। মুহূর্তের মধ্যে একটা লম্বাটে শলাকা যেন সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। ধূলি-ঝঞ্ঝার মধ্যে পলকের মধ্যে শুধু দেখা গেল লম্বাটে চুরুট-আকৃতির শকটটার দৈর্ঘ্য প্রায় তিরিশ ফুট। ঘূর্ণ্যমান চাকা এত জোরে ঘুরছে যে অদৃশ্য বললেই চলে। মেশিন উধাও হল কক্ষচ্যুত উল্কার মত কিন্তু আশ্চর্য! পেছনে ধোঁয়া দেখা গেল না। তেলপোড়া গন্ধও পাওয়া গেল না!

শকট চালককে কিন্তু এবারও দেখা গেল না। প্রতিবারের মত এবারও সে সম্পূর্ণ অদৃশ্য রইল ধাবমান শকটের মধ্যে।

তৎক্ষণাৎ খবর চলে গেল মিলঅকিতে—সাবধান সকলে! শয়তানের শকট তোমাদের দিকেই যাচ্ছে!

সাজ-সাজ রব উঠল চারিদিকে! রাস্তায় ব্যারিকেড সাজাও! বড় বড় পাথরের চাঁই, গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখো রাস্তা জুড়ে। ঘুচে যাক শয়তানের শয়তানি! ছাতু হোক এক ধাক্কাতেই! কিন্তু সময় কোথায়? শকট এসে

গেল বলে! কি দরকার রাস্তায় গাছ-পাথর ফেলবার? রাস্তা শেষ হচ্ছে লেক মিচিগানের পাড়ে। যত বড় শয়তানই হোক না কেন, স্থলে জলে সমানে চলবার মত শকট নিশ্চয় তার নেই। সুতরাং লেকের জলে তাকে থামতেই হবে। তারপর বাছাধনকে টের পাইয়ে দেওয়া যাবে কত ধানে কত চাল!

রাস্তার দুপাশে কাতারে দাঁড়িয়ে থাকা মোটর রেস ভক্তরা মত্ত হল উদ্ভট জল্পনা-কল্পনা নিয়ে। সে কী কল্পনা! লোম খাড়া করা ভূতপ্রেতের আজগুবী গল্পও হার মেনে যায়! শয়তানের শকট-তত্ত্ব যাদের বিশ্বাস হল না, তারাও পেছিয়ে রইল না গাঁজাখুরী গল্প রচনায়। শয়তান স্বয়ং না চালালেও নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত অ্যাপোক্যালিপ্স থেকে নিশ্চয় কোনো দানব মূর্ত হয়েছে রহস্যধূসর ঐ শকটে!

সময় নেই, আর সময় নেই। এক মিনিট সময়ও আর নেই। শরীরী অপচ্ছায়া এসে পড়ল বলে!

এগারোটা তখনো বাজেনি। রাস্তা যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেইখান থেকে ভেসে এল গুরুগম্ভীর গুম গুম-গুম-গুম শব্দ। সাংঘাতিক ঘূর্ণি ঝড়ের মত ধুলো পাকসাট খেয়ে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। ধুলো যেন তাথৈ-তাথৈ নাচছে। সহস্র চক্র যেন ঘর্ঘর ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করছে। বাতাস চিরে ফালা-ফালা হয়ে গেল তীক্ষ্ণ তীব্র হুইস্‌ল ধ্বনিতে—সাবধান! সাবধান! মূর্তিমান আতংক আসছে!

কিন্তু একী কাণ্ড! স্পীড কমাচ্ছে না কেন অজ্ঞাত শকট? পথের শেষ এইখানেই—মাত্র আধমাইল দূরে লেক মিচিগানের জল। জলে তলিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলে প্রভঞ্জন-গতিকে রুখতে হবে এখন থেকেই। তবে কি মেশিন বিগড়েছে? লাগাম ছেঁড়া অশ্বের মত বিকল যন্ত্র ছুটে চলেছে স্বইচ্ছায় নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে? শকট চালক রুখতে পারছে না শকটকে?

কোনো সন্দেহই নেই তাতে। খসে পড়া তারার মত সাঁৎ করে মিলঅকির বুক চিরে বেরিয়ে গেল রহস্যাবৃত শকট। এরপর? শহর থেকে নিষ্ক্রান্ত যন্ত্রযান কি এখন ধ্বংস হবে লেকমিচিগানের জলে?

মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল শকট। কোন পথে গিয়েছে, সেরকম কোনো নিশানা পাওয়া গেল না পথের ধুলোয়।

গেল কোথায় শয়তানের শকট?

(৫) নয়া ইংলণ্ডের উপকূল বরাবর

কাগজে কাগজে যখন এইসব ঘটনার খাস্তা-তাজা-টাটকা গরম খবরাখবর ফলাও করে ছাপা হচ্ছে, আমি তখন ওয়াশিংটনে ফিরে এসেছি। বাড়ী ফেরার

আগেই গিয়েছিলাম চীফ-এর সঙ্গে দেখা করতে। পাইনি। পারিবারিক ব্যাপারে হঠাৎ দেশে গিয়েছেন—ফিরবেন কয়েক সপ্তাহ পরে। দেখা না পেলেও মিস্টার ওয়ার্ড নিশ্চয় ব্যর্থতার বিবরণ জেনে গিয়েছেন খবরের কাগজ মারফৎ। বিশেষ করে নর্থ ক্যারোলিনার কাগজগুলো বেশ রসিয়ে লিখেছে আমাদের গ্রেট আইরী অভিযান এবং শুকনো মুখে ফিরে আসার আদ্যোপান্ত বিবরণ।

তাই খামোকা দেরী করার জন্যে আর ধৈর্য ধরতে পারছিলাম না আমি। এমনিতেই কৌতূহলের নিপীড়নে ছটফট করছিলাম নিরন্তর, তার ওপর মিস্টার ওয়ার্ড না থাকায় খিঁচড়ে গিয়েছিল মনটা। ঠিক করতে পারছিলাম না এরপর কি করা উচিত। গ্রেট আইরীর রহস্য উদ্ঘাটনের আশা কি ত্যাগ করব? কক্‌খনো নয়! আরো বারো বার শিখরদেশের তলায় উঠতে রাজী, বারো বারই মুখে চুণকালি মেখে ফিরে আসতে রাজী—তবুও হাল ছাড়ব না।

গ্রেট আইরীর দেওয়ালের অপরদিকে পৌঁছোনো মানুষের কর্ম নয়, একথা আমি বিশ্বাস করিনা। মানুষ এত হীনবীর্য নয় যে একটা পাহাড়ের কাছে তাকে হার মানতে হবে। চারদিকে ভারা বেঁধে অনায়াসে উঠে যাওয়া যায় চূড়োর ডগায়। নয়তো পাথর ফাটিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ভেতরে ঢোকা যায়। এর চাইতে কঠিনতর সমস্যার সমাধান করে ফেলছেন আজকের ইঞ্জিনীয়াররা। কিন্তু এক্ষেত্রে খরচের কথাটা ভাবতে হবে বই কি। খরচের তুলনায় লাভটা যদি কম হয়, তাহলে টাকাগুলো জলে ফেলার কোনো মানে আছে কি? সুড়ঙ্গ খুঁড়তে একগাদা টাকা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু লাভ কি হবে? জনসাধারণের আর আমার কৌতূহল নিরসনের জন্যে খোলামকুচির মত এতগুলো টাকা ওড়াতে হবে?

আমার পুঁজি অতি সামান্যই। মিস্টার ওয়ার্ড অবশ্য সরকারী টাকা ঢালতে পারেন—কিন্তু তিনিও নেই। আমার কৌতূহল তখন চরমে ওঠায় কয়েকজন কোটিপতিকে জপিয়ে টাকা বের করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সোনাদানার খনি আছে না জানলে টাকার কুমীররা টাকা বের করবেন কেন? আপ্পালাচিয়ান পর্বতশ্রেণী স্বর্ণখনি-আকীর্ণ অঞ্চলের আওতায় আসে না। প্যাসিফিক মাউণ্টেন ট্রান্সভাল বা অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনির প্রলোভন বিশ্বাসজনক, ক্যারোলিনায় নয়।

মিস্টার ওয়ার্ড অফিসে ফিরলেন পনেরোই জুন। আমি ব্যর্থ হয়েছি জেনেও সাদর স্বাগতম জ্ঞাপন করলেন। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বললেন সোল্লাসে—"এসেছে! এসেছে! কাঁচুমাচু মুখে ফিরে এসেছে। তুখোড় রহস্যসন্ধানী জন স্ট্রক! আহারে, এমনভাবেও কেউ হার স্বীকার করে?"

"করে বইকি, মিস্টার ওয়ার্ড," জবাব দিলাম তখুনি। "চাঁদের বুকে তদন্ত করতে পাঠালেও এমনি মুখ আমসি করে ফিরে আসতে হত। প্রকৃতি নিজে যেখানে বিঘ্ন সাজিয়ে রেখেছেন, সেখানে হার স্বীকার করা ছাড়া আর পথ ছিল না, মিস্টার ওয়ার্ড। ও-পাহাড় জয় করবার মত উপযুক্ত শক্তি সঙ্গে ছিল না।"

"জানি, জানি, স্ট্রক, আমি সব জানি। তুমি যে শুধু মরতে বাকী রেখেছিলে গ্রেট আইরীকে কব্জায় আনতে গিয়ে, তাকি আমি জানি না? তবুও কিন্তু কথাটা থেকে যাচ্ছে—জন স্ট্রক খালি হাতে ফিরে এসেছে। গ্রেট আইরীর পর্বত-কেল্লায় কি কাণ্ড চলছে, তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি।"

"পারিনি, মিস্টার ওয়ার্ড। সত্যিই কিছু জানতে পারিনি।"

"আগুন পর্যন্ত দেখোনি?"

"না।"

"সন্দেহজনক আওয়াজ-টাওয়াজ?"

"একদম না।"

"এর পরেও কি মনে হয় আগ্নেয়গিরি জাতীয় কিছু একটা আছে—গ্রেট আইরীর মধ্যে?"

"কি করে বলব?"

"আগ্নেয়গিরি থাকলেও তা ফের ঘুমিয়ে পড়েছে। আগ্নেয়গিরি হলে এভাবে মটকা মেরে পড়ে থাকত না। জানান দিত ঠিকই। স্ট্রক, হয় আগ্নেয়গিরি একেবারেই নিভে গেছে, না হয় পিলে চমকানো গুজবগুলো ক্যারোলিনা বাসিন্দাদের উর্বর কল্পনাশক্তির মৌতাতী গল্প।"

"না, স্যার। যা রটে, তার কিছু বটে। কথাগুলো মিথ্যে ন·। মরগানটন আর প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের মেয়র দুজন কাণ্ডজ্ঞানহীন নন—বাজে কথা তাঁরা বলেন না। পাহাড়ের চূড়ো ছাড়িয়ে আগুনের শিখা দেখা গিয়েছিল বইকি। অদ্ভুত আওয়াজও শোনা গিয়েছে। যা ঘটেছে, তা সত্যিই ঘটেছে—মিথ্যে নয়।"

মিস্টার ওয়ার্ড বললেন—"মানলাম। সাক্ষীদের কথা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে কি? না, গ্রেট আইরী এখনও তার রহস্য ফাঁস করতে নারাজ।"

"বলেন তো এখুনি গাঁইতি আর ডিনামাইট দিয়ে গ্রেট আইরী ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি। কিন্তু তাতে দেদার খরচ, মিস্টার ওয়ার্ড।"

"তাতো বটেই। তবে কি জানো, এখন আর তত ঝক্কি পুইয়ে লাভ কি?

গ্রেট আইরী তো ফের মরে গেছে। আবার উপদ্রব শুরু না হওয়া পর্যন্ত সবুর করা ভাল। হয়ত প্রকৃতি নিজেই ফাঁস করে দেবেন গ্রেট আইরীর রহস্য।"

"বিশ্বাস করুন মিস্টার ওয়ার্ড, আপনার দেওয়া কাজ হাসিল করতে না পেরে মরমে মরে রইছি আমি।'

"দূর বোকা। সামান্য এই ব্যাপার নিয়ে এত উতলা হচ্ছ কেন? দার্শনিক ভাবে পরাজয়কে মাথা পেতে নেওয়া ভাল। জীবনের সবক্ষেত্রে কি জয়লাভ সম্ভব? হারতেই হয়। পুলিশ-বিভাগেও ঠিক তাই। সারা বছরে কত অপরাধী আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফস্কে যাচ্ছে বলো তো? ওরা যদি একটু বুদ্ধিমান হত, একটু কম অদূরদর্শী হত, আহাম্মুকির সঙ্গে এত মাখামাখি না করত—তাহলে ওদের কাউকে ধরতে পারতাম কি? আমার তো মনে হয় দুনিয়ায় সব চাইতে সহজ কাজ হল অপরাধের জাল বোনা, জুয়াচুরীর ফাঁদ পাতা, ডাকাতির পরিকল্পনা রচনা করা অথবা গুমখুনের ষড়যন্ত্র করা। কণামাত্র সূত্র না রেখে, কাকপক্ষীকেও সন্দিগ্ধ না করে প্ল্যানমাফিক এগিয়ে করে যাওয়া আরো সহজ। ওহে, তুমি যেন আবার ভেবো না অপরাধ অনুষ্ঠানে তালিম দিচ্ছি তোমাকে। আমি চাই—দুনিয়ার অপরাধীরা যেমন আছে তেমনি থাকুক, অর্থাৎ একটু কম চালাক থাকুক। কিন্তু আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের ধার ধারছে কে? সেই জন্যেই তো কত অপরাধী রোজ বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে, তার হিসেব কেউ রাখে কী?"

কথাটা খাঁটি আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, অপরাধীদের ঠিকুজী কুষ্ঠি ঘাঁটতে বসলে দেখা যায়, তাদের মত বোকা গাধা দুনিয়ায় আর হয় না। সেই জন্যেই তো আরো অবাক হলাম "দানব মোটরের" কীর্তিকলাপ নিয়ে। এতগুলির প্রদেশের পুলিশ চীফরা নাজেহাল হয়ে গেল অথচ শয়তান শকটের চালকের নাড়িনক্ষত্র জানা তো দূরের কথা, ছায়া পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারল না?

মিস্টার ওয়ার্ড নিজেই কথা প্রসঙ্গে বিস্ময়কর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। আমিও জানালাম, শয়তান শকট আমাকেও কম বিস্মিত করেনি।

মিস্টার ওয়ার্ড অনেক কথা বললেন। শয়তান-শকটকে অনুসরণ করা যায় না। আগে যতবার দেখা দিয়েছে শয়তান শকট, ততবারই টেলিফোনে কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়ার আগেই দৈত্য-মোটর যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে। বহু-দুঁদে পুলিশ চর মোতায়েন করা হয়েছে দেশের সবত্র। কিন্তু শয়তান-শকটের উন্মাদ চালককে আবিষ্কার করা যায়নি। অসামান্য গতিবেগে দেশে

দেশে আবির্ভূত হয়েছে আশ্চর্য যন্ত্রযান, দেখা দিয়েই পলকের মধ্যে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে অদৃশ্য বাতাসের মধ্যে। একবারই তাকে অনেকক্ষণ দেখা গিয়েছিল। প্রেঙ্গৈরী-দু-চিয়েন থেকে মিলঅকি পর্যন্ত দুশ মাইল সড়কে দীর্ঘক্ষণ ধেয়ে চলেছিল বিরামবিহীনভাবে। দেড় ঘণ্টায় পাড়ি দিয়েছিল দুশ মাইল পথ।

কিন্তু সেই শেষ। তারপর থেকেই নিপাত্তা হয়েছে আজব মেশিনটা। প্রচণ্ড গতিবেগে সড়কের শেষপ্রান্তে ছুটে এসে গতিবেগ রাখতে না পেরে লেক মিচিগানের জলে ছিটকে পড়েনি তো? 'শয়তান' কি তাহলে হ্রদের তলদেশে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত তার শকটের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে? দেশবাসী কি তাহলে এখন থেকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারে নির্ভয়ে? উঁহু, অধিকাংশ লোক বলল ঠিক তার উল্টো কথা। শয়তান শকট শয়তানি দেখাতে আবার আবির্ভূত হবে।

বিনা দ্বিধায় অক্ষমতা স্বীকার করলেন মিস্টার ওয়ার্ড। বললেন, ব্যাপারটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ। আমিও একমত হলাম তার সঙ্গে। নরকের দূত শকট চালক যদি আবার আবির্ভূত না হয়, তাহলে অলৌকিক কাণ্ড আখ্যা দিয়ে ধামা চাপা দিতে হবে আশ্চর্য এই কাণ্ডকারখানাকে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা হয় না, পুলিশ তার কি সমাধান করবে?

প্রাণ খুলে দুজনে এই নিয়ে কথাবার্তা বললাম। ভেবেছিলাম, এইবার বুঝি উঠতে হবে আমাকে। এই সময়ে ঘরময় বার কয়েক পায়চারী করে আচমকা বললেন মিস্টার ওয়ার্ড—"যা বলছিলাম, মিলঅকির ঘটনা খুবই অদ্ভুত। তার চেয়েও অদ্ভুত হল এই ঘটনাটা!'

এই বলে একটা রিপোর্ট আমার হাতে তুলে দিলেন চীফ। রিপোর্টটা এসেছে বোস্টন থেকে। বিষয়টা নিয়ে সান্ধ্য দৈনিকে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। রিপোর্টে নিবিষ্ট হতেই বাইরে থেকে ডাক এল মিস্টার ওয়ার্ডের। আমি একা জানলার সামনে বসে তন্ময় হয়ে পড়তে লাগলাম আরেকটা লোমহর্ষক কাহিনী।

কিছুদিন ধরেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে মেইন, কানেকটিকাট, আর ম্যাসাচুসেটস-এর উপকূলে। কেউ বলতে পারছেনা ব্যাপারটা কি, কিন্তু জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে রহস্যজনক একটা কিছুর দাপাদাপিতে। তীর থেকে মাইল দু'তিন দূরে একটা ছুটন্ত বস্তুকে দেখা যাচ্ছে ঢেউ ছিন্নভিন্ন করে ছুটে যাচ্ছে তীরের মত, বিজলী ঝিলিকের মত নিমেষ মধ্যে পেছিয়ে আসছে, পরক্ষণেই জলের তলায় গোঁৎ মেরে মিলিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিপথ থেকে।

বিদ্যুৎ যে বেগে ছোটে, বস্তুটার গতিবেগও যেন সেই রকম। ফলে, সবচেয়ে সেরা টেলিস্কোপে চোখ রেখেও দেখা যাচ্ছেনা জিনিসটাকে দেখতে কিরকম। লম্বায় বস্তুটা তিরিশ ফুটের বেশী নয়। গড়নটা চুরুটের মত লম্বাটে। রঙ সবুজাভ। ফলে সমুদ্রের জলের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকে—ভাল করে দেখা যায় না। কেপ কড আর নোভা স্কোটিয়ার মাঝের উপকূলে হরবখৎ দেখা গিয়েছে ছুটন্ত রহস্যকে। বোস্টন, প্রভিডেন্স, পোর্টসমাউথ, পোর্টল্যাণ্ড থেকে স্টীমলঞ্চ আর মোটরবোট চেষ্টা করেছিল বস্তুটার কাছে ঘেঁসবার—চেহারাটা একটু ভাল করে দেখবার। তাড়াও করেছিল। কিন্তু পারেনি। বন্দুক থেকে ছোঁড়া তীরের মত চক্ষের পলকে ঢেউ কেটে অপসৃত হয়েছে সমুদ্র রহস্য।

এরপর থেকেই সমুদ্র আতংককে নিয়ে জলপনা কলপনা, গল্পগুজব শুরু হবে—এ আর আশ্চর্য কী। মুখে মুখে অনেক গল্প ছড়িয়ে পড়ল ডালপালা মেলে। সমুদ্রে যাদের জীবন কাটে, সেই নাবিক মহল একবাক্যে স্বীকার করল, এ-জিনিসকেও কস্মিনকালেও তারা দেখেনি। প্রথমে মনে হয়েছিল, তিমি মাছের মত প্রকাণ্ড মাছ। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? সবাই জানে, তিমি মাছ জলপৃষ্ঠে ভেসে ওঠে নাকের ফুটো দিয়ে জল আর বাতাসের পিচকিরি ছুঁড়বে বলে। এই হল ওদের নিঃশ্বেস নেওয়া। কিন্তু অত্যাশ্চর্য জলচর জীবটি তিমির মত কখনো জলের ফোয়ারা ছোঁড়েনি, শব্দ করে নিঃশ্বেসও নেয়নি। প্রকাণ্ড সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জীব যদি না হয়, সমুদ্র দানবটা তাহলে কোন শ্রেণীর? পৌরাণিক রাক্ষস নয় তো? অতিকায় সমুদ্র নাগ, লেভিয়ানথান, অক্টোপাস অথবা ক্রাকেন বা নাকি গভীর জলের দানব বিশেষ। জলপৃষ্ঠে তাদের কেউ উঠে আসেনিতো?

নিউ ইংল্যাণ্ডের উপকূল বরাবর সামুদ্রিক দানোর হামলা শুরু হতেই ধীবরমহল সন্ত্রস্ত হল। জেলে নৌকো আর প্রমোদতরীদের সাহস হল গভীর জলে যাওয়ার। সমুদ্র দানবকে দূরে কোথাও দেখা গেলেই নৌকোর দল টেনে লম্বা দিত সবচেয়ে কাছের বন্দরের দিকে। অবিবেচকের মত রগড় দেখবার জন্যে জলে ভেসে থাকার কোনো মানে হয় না। জলচর বিভীষিকার মতি গতি কেউ জানেনা। যদি হিংস্র হয়? যদি চড়াও হয়? প্রাণ অত সস্তা নয়!

বড় জাহাজ বা স্টীমারের অত ভয়ডর নেই। দানব হোক, কি, তিমি হোক—ঘাবড়াবার পাত্র নয় তারা। এরকম অনেকগুলো জাহাজ থেকে দেখা গেছে সমুদ্র-দানবকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। কাছে যাওয়ার চেষ্টা

করতেই ভীমবেগে পালিয়েছে প্রাণীটা। একদিন বোস্টন থেকে একটা সরকারী গান বোট দূর সমুদ্রে টহল দিতে গিয়েছিল সমুদ্রের বিভীষিকাকে কামানের গোলা ছুঁড়ে ভাগিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু চক্ষের নিমেষে জলে ডুব দিল সমুদ্র দানব। খামোকা কামান দেগে আর লাভ নেই দেখে মুখ চুন করে ফিরে এল গান বোট। জলের ওপর যত আস্ফালনই করুক না কেন, সমুদ্র-দানব যে কাউকে গুঁতোতে চায় না—তা বুঝল সবাই।

এই পর্যন্ত পড়া হয়েছে, এমন সময়ে ফিরে এলেন মিস্টার ওয়ার্ড। আমি বললাম—"যাই বলুন না কেন, সমুদ্র-দানব সমুদ্র-সর্প বলে মনে হয় না। হলে বড় জাহাজ দেখে পালাতো না। ছোট নৌকো দেখে তাড়া করার প্রলোভন সামলাতে পারতনা। অনুভূতি বা বুদ্ধির প্রখরতা মাছেদের মধ্যে থাকেনা।"

"কিন্তু আবেগ থাকে।"

"মিস্টার ওয়ার্ড, সমুদ্র-দানবকে নিয়ে বড্ড বেশী মাথা ঘামানো হচ্ছে না কি? কারো ক্ষতি করেনি সে। দুদিন লাফালাফি করে নিজেও অন্য কোথাও চলে যাবে। নয়ত একদিন ধরা পড়বে। ধরা পড়লে ওয়াশিংটন মিউজিয়ামে বসে তাকে খুঁটিয়ে দেখা যাবে 'খন।"

"সামুদ্রিক জন্তু যদি না হয়?"

"না হলে আর কি হতে পারে?" সবিস্ময়ে বললাম আমি।

"শেষ পর্যন্ত আগে পড়ো," বললেন মিস্টার ওয়ার্ড। পড়লাম বাকী অংশটুকু। শেষের দিকে কিছু কিছু অনুচ্ছেদ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছেন চীফ।

প্রথম প্রথম সবাই ভেবেছিল সমুদ্র-রহস্য নিশ্চয় কোনো সামুদ্রিক জন্তু। তাড়া দিলে একদিন না একদিন এ-তল্লাট ছেড়ে লম্বা দেবে। তারপর কিন্তু অন্য একটা সন্দেহ উঁকি দিল অনেকের মধ্যে। মাছের মত দেখতে নতুন ধরনের কোনো মহাশক্তিশালী জলযান নয় তো?

তাই যদি হয়, তাহলে জলযানের ইঞ্জিনটি নিশ্চয় বিস্ময়কর শক্তি রাখে। আশ্চর্য নৌকোর গুহ্যতত্ত্ব বিক্রী করার আগে উদ্ভাবক ভদ্রলোকটি নিশ্চয় জনসাধারণের ঔৎসুক্যকে খুঁচিয়ে তুলছেন—এমন জনমত সৃষ্টি করছেন যাতে নৌ-দুনিয়ার সবার তাক লেগে যায়। এরকম অবিশ্বাস্য গতি. চক্ষের নিমেষে মোড় নেওয়া, মাছের মত ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করা, তীরের মত বেগে ছুটে অবলীলাক্রমে অনুসরণকারীকে বোকা বানানো—দুনিয়ার চক্ষু চড়কগাছ করার পক্ষে কি যথেষ্ট নয়?

জলপোত ইঞ্জিন নির্মান বিজ্ঞান তখন অনেক উন্নতি করেছিল। মাত্র

পাঁচদিনে আটলান্টিক পাড়ি দিত অতিকায় জাহাজ। ইঞ্জিনীয়াররা তাতেও সন্তুষ্ট নন। আরও প্রগতির আশা রাখেন তাঁরা। নৌ-বাহিনীও পেছিয়ে নেই। যুদ্ধ জাহাজ, টর্পেডো বোট, টর্পেডো-বিধ্বংসী রণপোত, ইত্যাদি জলযানের গতিবেগ আটলান্টিকগামী কোনো জাহাজের চাইতে কম নয়। ভারতবর্ষ অভিমুখী সওদাগরী জাহাজ বা প্রশান্ত মহাসাগরের যে কোনো বেগবান জাহাজও পাল্লা দিয়ে পারবেনা নৌ-বাহিনীর এই সব মারণ-পোতের সঙ্গে।

সাগর-বিস্ময় নতুন ডিজাইনের কোনো জলযান হলেও তার গড়ন কি রকম তা এখনো জানা যায় নি। জলযানের ইঞ্জিনটিও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। আজ পর্যন্ত ও-রকম পাওয়ারফুল ইঞ্জিন তৈরী করা সম্ভব হয়নি। বিশ্বের কোনো জাহাজ-ইঞ্জিন এত জোরে জাহাজকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা। শক্তির উৎস কি, তাও অজ্ঞাত। যন্ত্রযানে পাল নেই—সুতরাং নিশ্চয় হাওয়ার ধাক্কায় চলেনা। ধোঁয়ার রেখাও দেখা যায়নি—সুতরাং বাষ্পচালিত কলের ইঞ্জিনও নয়। তাহলে কিসের?

এই পর্যন্ত পড়েই আমার খটকা লাগল। চুপ করে বসে ভাবছি। তাই দেখে শুধোলেন মিস্টার ওয়ার্ড।

"কি ভাবছ, স্ট্রক? খুব ধাঁধায় পড়েছ মনে হচ্ছে?"

"মিস্টার ওয়ার্ড, তথাকথিত এই জলযানের ছোটবার শক্তি এক কথায় প্রচণ্ড, ঠিক এই রকমই প্রচণ্ড গতিবেগ ছিল অদ্ভুত মোটরটার। দুক্ষেত্রেই আমরা জানি না ইঞ্জিনটা চলছে কিসে, কোন শক্তি এই রকম বিপুল বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে দু'ধরনের যন্ত্রযান দুটোকে।"

"কথাটা মন্দ বলোনি স্ট্রক।"

"স্যার, এ-রকম উৎকট সমস্যাও আমি জীবনে দেখিনি। মাথামুণ্ডু বোঝা ভার!"

ডাঙার যন্ত্রযান উধাও হয়েছে লেক মিচিগানের জলে। নিশ্চয় ভেঙে তলিয়ে গিয়েছে জলের তলায়। নিখোঁজ হয়েছে রহস্যাবৃত ড্রাইভার। এখন দেখা দিয়েছে আরেক রহস্য—ছুটন্ত জলযান। আমাদের উচিত এখন আদাজল খেয়ে জলপোত-চালককে গ্রেপ্তার করা। জলপোত রহস্য উদ্ঘাটন করা। কিন্তু উদ্দেশ্য কি জলযান আবিষ্কারকের? এতবড় আবিষ্কারকে কি গোপন রাখতে চান? ডাঙার যন্ত্রযানের মত জলের যন্ত্রযানও যদি ফুস করে বাতাসে মিলিয়ে যায়? তার আগেই মেশিনটাকে ফাঁদে ফেলা দরকার। এরকম যুগান্তকারী আবিষ্কার কিনে নেওয়ার জন্যে শুধু আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট কেন, বিশ্বের অনেক গভর্ণমেণ্টই এগিয়ে আসবে। টাকার পরোয়া করবেনা।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছুক নন উদ্ভাবক মহাশয়। যিনি নিজে অজ্ঞাত থাকতে চান, তিনি তাঁর আবিষ্কারকেও তো অজ্ঞাত রাখতে পারেন? ধূমকেতুর মত দেখা দিয়ে দেশে দেশে সাড়া ফেলে উধাও হয়ে গিয়েছে ডাণ্ডার মোটর। সেই ভাবেই জনগণের কৌতূহল জাগ্রত করে দিয়ে অভিনব জলপোতও তো রহস্য তিমিরে ডুব দিতে পারে চিরকালের মত? দুক্ষেত্রেই উদ্ভাবক ধরা দিতে চান না—কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের মহিমা দেখিয়ে বিশ্ববাসীর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে চান।

জলপোতটা যেন জল ফুঁড়ে হঠাৎ উঠে এসেছে—আবার জলেই ডুব দেবে। ওয়াশিংটনে রিপোর্ট পৌঁছানোর চব্বিশ ঘণ্টা আগেও জলযানটার চিহ্ন দেখা যায় নি কোথাও। পৃথিবীর কোনো উপকূলে দেখা যায় নি তার আশ্চর্য জলক্রীড়া। দুম করে যে আবির্ভূত হয়েছে, দুম্ করেই সে অদৃশ্য হবে—এইটাই তো স্বাভাবিক?

আর একটা অদ্ভুত কাকতালীয় খচখচ করছিল মাথার মধ্যে। শুধু আমি নয়, মিস্টার ওয়ার্ডও লক্ষ্য করেছিলেন অদ্ভুত কাকতালীয়টা। ওয়াণ্ডারফুল মোটর গাড়ী অদৃশ্য হতে না হতেই দেখা দিয়েছে ওয়াণ্ডারফুল জলযান। দুটো যন্ত্রযানেরই যন্ত্রপাতি অসাধারণ—অবিশ্বাস্য শক্তিমান তাদের ইঞ্জিন। দুটোই সমান বিপজ্জনক যান বাহন-মানুষের পক্ষে। একই সঙ্গে যদি পৃথিবী টহল দিতে শুরু করে দুই যন্ত্রযান—নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে জলে এবং স্থলে। নির্ভয়ে কেউ পথ চলতে পারবে না। নৌকো বাইতে পারবে না। জল বিহার করতে পারবেনা, কাজ কারবার মাথায় উঠবে। সুতরাং জনসাধারণকে নিরাপদে রাখার জন্যে পুলিশের তৎপর হওয়া উচিত এখন থেকেই। যাতায়াতের পথে ধূমকেতু সমান উৎপাতকে বরদাস্ত করা যায় না কোন মতেই।

মিস্টার ওয়ার্ড এইভাবেই সমস্যাটা তুলে ধরলেন আমার সামনে। আলোচনা করলাম বটে, কিন্তু সুরাহা হল না। উৎপাত নিরোধের পন্থা কি, সেইটাই কারো মাথায় এল না। কথা ফুরোনোর পর যেই উঠতে যাচ্ছি শেষ কথাটি বললেন মিস্টার ওয়ার্ড।

বলল—"স্ট্রক, একটা জিনিস তুমি বুঝি খেয়াল করোনি?"

'কি, স্যার?"

"জলযান আর মোটরগাড়ী—দুটোর চেহারায় একটা ফ্যানটাসটিক সাদৃশ্য আছে।"

"তা ঠিক। কোথায় যেন একটা মিল আছে।"

"এমনও তো হতে পারে, দুটো যন্ত্রযানই আসলে এক?"

(৬) প্রথম পত্র

বাড়ী ফিরে তন্ময় হয়ে রইলাম এই চিন্তায়। বউ বাচ্ছা নেই যে চিন্তায় বাধা দেবে। বাড়ীতে বুড়ি দাসী ছাড়া আর কেউ থাকে না। মায়ের আমলের দাসী। পনেরো বছর ধরে আমার একার সংসার সামলাচ্ছে।

মাস দুয়েক আগে লম্বা ছুটি নিয়েছিলাম। ছুটির মধ্যেই ডাক পড়েছিল—গ্রেট আইরী গিয়েছিলাম চারদিনের মধ্যে। নতুন কাজের আহ্বান না এলে এখনো দু সপ্তাহ বাকী রয়েছে ছুটি শেষ হওয়ার।

ছুটি বাতিল করে ঝাঁপ দেব নাকি রহস্যের সাগরে? মিলঅকির রহস্য আর নিউ ইংল্যাণ্ড উপকূলস্থ রহস্য মাথার মধ্যে এরকম খচখচ করতে থাকলে ছুটির মজা আর রইল কোথায়? যমজ রহস্যকে চিচিং ফাঁক না করে ঘুমোতেও তো পারব না। কিন্তু রহস্যের চাবিকাঠিটি কোথায়? কোন পথে ঢুকবো জোড়া প্রহেলিকার গোলক ধাঁধায়? পথ কোথায়? কোথায় পাবো আশ্চর্য যন্ত্রযান যুগলের গোপন ঠিকানা?

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পাইপ ধরালাম। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গিয়েছে। খবরের কাগজও এসে গিয়েছে। কিন্তু কোন খবরটা পড়ব? রাজনীতির কচকচি আমার ভাল লাগে না। রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের চিরন্তন অন্তর্দ্বন্দ্ব কাঁহাতক আর পড়া যায়? সমাজের খিচিমিচিও বরদাস্ত করতে পারি না। স্পোর্টস নিয়েও নেই কোনো মাথাব্যথা। তাই কিছুই যখন ভাল লাগছেনা, তখন নর্থ ক্যারোলিনার খবর খোঁজা যাক। যদিও জানি, বৃথা চেষ্টা। মিস্টার স্মিথকে পই পই করে বলে এসেছি, গ্রেট আইরীর বেচাল ব্যবহার দেখলেই যেন টেলিগ্রামে খবর পাঠানো হয় আমাকে। টেলিগ্রাম আজও আসে নি। সুতরাং খবরও নেই নিশ্চয়। তবুও তন্নতন্ন করে খুঁজলাম সব কটা পাতা। হতাশ হয়ে ছুঁড়ে ফেললাম দৈনিক। নিমগ্ন হলাম গভীর চিন্তায়।

মিস্টার ওয়ার্ড তাঁর শেষ কথাটা দিয়ে আমার টনক নাড়িয়ে ছেড়েছেন। মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছিনা তার অনেক চিন্তার সার চিন্তা—দুটো যন্ত্রযানই এক নয় তো? জলযান এবং স্থলযান—আসলে একই যান জলেও চলে, স্থলেও চলে। অথবা হয়ত একই হাতে নির্মিত হয়েছে দুটো মেশিনই, নিদেন পক্ষে দুটো যন্ত্রযানের মধ্যেই যে এক-ই ইঞ্জিন বসানো রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবিশ্বাস্য গতিবেগে এতবড় যানকে ছুটিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দুক্ষেত্রেই সমান—কেউ কম যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান অনেক গবেষণা

গতিবেগের যে সীমায় পৌঁছেছে, অজ্ঞাত এই আবিষ্কারক হেলায় তার দ্বিগুণ গতিবেগ সৃষ্টি করতে পারে!

"আশ্চর্য! আবিষ্কারক কি তাহলে একজনই?"—ভাবলাম মনে মনে।

অসম্ভব অনুমিতি নয় নিশ্চয়। কেন না, আজ পর্যন্ত দুটো যন্ত্রযানকে একই সঙ্গে দু জায়গায় আবির্ভূত হতে দেখা যায় নি। সুতরাং মিস্টার ওয়ার্ডের সন্দেহকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিড় বিড় করে বললাম নিজের মনে—"গ্রেট আইরীর পর আসছে মিলঅকি আর বোস্টনের ধাঁধা। গ্রেট আইরী আমাকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছেড়েছে। এবারও কি সেই দশা হবে?"

দুটো সমস্যার চেহারাই কিন্তু মোটামুটি এক রকমের। গ্রেট আইরীর লঙ্কাকাণ্ড দেখে ধাত ছেড়ে গিয়েছিল হাজার হাজার গ্রামবাসী আর শহুরে মানুষের। ব্লু-রিজে অগ্ন্যুদগার আরম্ভ হলে বিপদ সকলেরই।

আর এখন দেখা দিয়েছে নতুন বিপদ। এবারও সাধারণ মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আয়োজন চলছে। রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়—যে কোনো মুহূর্তে ধুলো তাথৈ-তাথৈ নাচ জুড়বে, যেন সহস্রচক্র দানব ধ্বনি তুলে ধেয়ে আসবে, নিষ্পেষিত করবে যানবাহন পথচারীকে।

জলেও সেই বিপদ হানা দিয়েছে। উপকূল বরাবর বিস্তীর্ণ জলে মারাত্মক স্পীডে ছুটছে মূর্তিমান আপদ। নৌকোডুবি জাহাজডুবি—সব কিছুরই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উন্মত্ত গতিবেগের বলি হতে চলেছে অসহায় জনসাধারণ।

খবরের কাগজগুলো আর কিচ্ছু করতে না পারুক, অমূলক ভীতিকে ছড়িয়ে দিতে পারে ভাল ভাবে। তিলকে তাল করে ছাপা হয়েছে প্রতিটি কাগজে। ভয়ের চোটে জনসাধারণের হাত-পা পর্যন্ত বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে! দানব-গাড়ীর গাড়োয়ানকে নিয়ে কত গালগল্প যে ছড়িয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আমার বুড়ি দাসী পর্যন্ত উৎকণ্ঠায় আধমরা হয়ে রয়েছে কে জানত। ডিনার খাওয়ার পর টেবিল সাফসুতরো করতে এসে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার সামনে। এক হাতে জলের বোতল, আরেক হাতে তোয়ালে ঝুলিয়ে বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে:

"স্যার, খবর পেলেন?"

"না।" কোন খবর জানতে চাইছে, তা আঁচ করে নিয়ে জবাব দিলাম।

"মোটর গাড়ীটা আর আসেনি?"

"না।"

"বোট-টা?"

"না। -তুঁদে সাংবাদিকরাও আর খবর দিতে পারছে না খবরের কাগজে।"

"কিন্তু আপনি? গুপ্ত পুলিশ কি বলে?"

"আমরাও হালে পানি পাচ্ছি না।"

"তাহলে পুলিশ রেখে আর লাভ কি?"

এই প্রশ্ন এর আগেও বহুবার শুনেছি—এখন শুনলে আর রাগ করি না—চুপ করে থাকি। সত্যিই তো! এত পুলিশ পুষে লাভ কী তাহলে?

বকর বকর করে চলল বুড়ি দাসী—"এবার দেখুন না কি হয়। সর্বনাশের আর দেরী নেই। তুম করে একদিন এই শহরেই হানা দেবে পাগলা ড্রাইভার—রাস্তায় রাস্তায় ঝড়ের বেগে গাড়ী চালাবে—তছনছ করবে, খুন করবে—রক্তগঙ্গা বইয়ে ছাড়বে।"

"তাহলে তো ভালই হয়। ক্যাঁক করে ধরবার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।"

"ধরবেন? কাকে? শয়তানকে? তাকে ধরা যায় না!"

"কেন ধরা যায় না?"

"শয়তান ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে বলেই ধরা যায় না! খোদ শয়তানকে হাত কড়ি পরাবেন আপনি? আর হাসাবেন না!"

বুঝলাম। শয়তান-মাহাত্ম্য অনেক দূর গড়িয়েছে দেখছি। যা কিছু দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, দুরূহ—সব কিছুর মূলে শয়তানকে হাজির করেই জনগণ নিশ্চিন্ত। যত দোষ একা শয়তানের—আর কারো নয়! গ্রেট আইরীর চূড়োয় আগুন জ্বালিয়েছে কে? না, শয়তান। উইসকনসিন মোটর প্রতিযোগিতায় জিতেছে কে? না, শয়তান। ম্যাসাচুসেটস আর কানেকটিকাট-য়ের উপকূলে জল তোলপাড় করে ছুটছে কে? না, শয়তান।

শয়তানের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে না হয় বোকাসোকাদের বুদ্ধু বানানো যায়। কিন্তু বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে! দুটো মেশিন-ই কি চিরকালের মত উধাও হল, না, ফের দেখা দেবে? উল্কার মত যে ছুটে গিয়েছিল, খসে পড়েছিল তারার মত—একশ বছর পরে কত কিংবদন্তীই না জানি রচিত হবে অলৌকিক সেই যন্ত্রযানদের নিয়ে। মুখে মুখে ফিরবে অবিশ্বাস্য অ্যাডভেঞ্চারের রঙচঙে ইতি-কথা।

দিন কয়েক ধরে ইউরোপ আমেরিকার সব কটা কাগজ মেতে রইল এই প্রসঙ্গ নিয়ে। হিড়িক উঠল গরম-গরম সম্পাদকীয় লেখার। লোক তাতানোর রেস আরম্ভ হয়ে গেল যেন। হুজুগে লোকগুলো এই তালে মুখরোচক গল্প শুনিয়ে নাম কিনে ফেলল রাতারাতি। দু'দুটো মহাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যেন ক্ষেপে গেল শয়তানের শকট নিয়ে। ইউরোপীয়রা ঈর্ষায় জ্বলে গেল

আমেরিকানদের সৌভাগ্য দেখে। আশ্চর্য যন্ত্রযান আমেরিকার মাটি বেছে নিয়েছে ভেল্কী দেখানোর জন্যে। কেন? ইউরোপকে কেন বঞ্চিত করা হল? তবে কি মেশিন-আবিষ্কারক নিজেও আমেরিকান? সর্বনাশ! তাহলে তো পোয়াবারো আমেরিকান পদাতিক আর নৌ-বাহিনীর। দুদিনেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে টেক্কা মারবে মার্কিন মিলিটারীরা!

দশই জুন একটা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপা হল নিউইয়র্কের একটা দৈনিকে। লেখক খুব হুঁশিয়ার এবং অনেক খবর রাখেন। দ্রুততম যন্ত্রযানের গতিবেগের সঙ্গে মন্থরতম যন্ত্রযানের তুলনা করে তিনি ভবিষ্যদবাণী করেছেন, মার্কিন নৌবাহিনী যদি এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের গুপ্ততত্ত্ব জেনে ফেলে, তাহলে ইউরোপ পৌঁছোতে তাদের তিন দিন লাগবে। আমেরিকা পৌঁছোতে কিন্তু ইউরোপের লাগবে পাঁচ দিন।

শুধু মার্কিন পুলিশ কেন, দেশবিদেশের গুপ্তচররা উঠে পড়ে লাগল যন্ত্রযানের হদিশ বের করার জন্যে। সবাই বুঝল, সাংঘাতিক যন্ত্রযান যুগলকে কব্জায় আনতে না পারলে কোনঠাসা হতে হবে প্রত্যেককেই।

মিস্টার ওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা হলেই ঘুরেফিরে এক প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা চলে। উনি বার বার মনে করিয়ে দেন গ্রেট আইরীতে আমার ব্যর্থতার কথা। আমিও বার বার তাকে স্মরণ করিয়ে দিই, সাফল্য নাগালের বাইরে বলা চলে না। টাকা ছাড়ুন, গ্রেট আইরীর দম্ভচূর্ণ করব।

মিস্টার ওয়ার্ড তখন বলেন—"ওহে স্ট্রক, জয়ের মুকুট আবার পরবে মাথায় যদি আশ্চর্য মোটর আর বোট-যের রহস্য সমাধান করতে পারো। তামাম দুনিয়ার ডিটেকটিভরা উঠে পড়ে লেগেছে—ওদের আগেই যদি কিস্তিমাৎ করতে পারো—লোকে তোমায় মাথায় নিয়ে নাচবে!"

"কাঁধে দায়িত্ব পড়লে নিশ্চয় কোমর বেঁধে লাগব। কিন্তু দিচ্ছেন কই?"

"দেব, দেব, একটু ধৈর্য ধরো! সবুরে মেওয়া ফলে, জানো না?"

এ-হেন পরিস্থিতিতে একটা চিঠি পেলাম পনেরোই জুন। চিঠি এল রেজিস্ট্রি ডাকে—সই করে নিতে হল ডাকপিওনের হাত থেকে। চিঠি পৌঁছে দিয়ে গেল আমায় বুড়ি দাসী। হাতের লেখা চিনতে পারলাম না। কিন্তু ডাক-ঘরের ছাপ দেখে চমকে উঠলাম।

মরগানটনের ছাপ! দুদিন আগের তারিখ!

মরগানটন! নিশ্চয় মিস্টার স্মিথের চিঠি।

আনন্দ চাপতে পারলাম না। বুড়ি দাসীকে সামনে পেয়েই তাকেই বললাম সোল্লাসে—"মরগানটনের মেয়রের চিঠি! তার মানে, খবর আছে!"

"মরগানটন? সেখানে পাহাড়ের পেটে আগুন জ্বালিয়েছিল পিশাচরা?"

"ঠিক ধরেছো!"

"সেরেছে! আপনি মরগানটনে ফের যাবেন নাকি?"

"না গেলেই খুশী হও বুঝি? কিন্তু কেন?"

"গেলে আর ফিরবেন না বলে। গ্রেট আইরীর চুল্লীতে চাপা পড়বেন নির্ঘাৎ।"

"অত ভয় করলে চলে কি? দেখাই যাক না কি খবর এল চিঠিতে।"

খামটা লাল গালা দিয়ে জোড়া। শীলমোহরের প্রতীক ছাপটা অদ্ভুত রকমের—তিনটে তারকা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খামের কাগজ বেশ পুরু এবং মজবুত। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলাম। কাগজটা চার ভাঁজ করা। চিঠিটা লেখা হয়েছে একটা ভাঁজের পিঠে। প্রথমে চোখ গেল স্বাক্ষরের দিকে।

স্বাক্ষর নেই! শেষ পংক্তিতে তিনটে অক্ষর আছে—সই নেই!

বললাম—"আরে, এ চিঠিতো মরগানটন-মেয়রের নয়।"

"তাহলে কার?" শুধোলো বুড়ি দাসী। কৌতূহলে উদগ্রীব তার মুখ একে বুড়ি, তায় গুজবপ্রিয়—খবরের গন্ধ পেলে হয়।

স্বাক্ষরের জায়গায় লেখা অক্ষর তিনটে ভাল করে দেখলাম।

বললাম—"জানি না। এ নামে কাউকে আমি চিনি না।"

হাতের লেখাটি কিন্তু স্পষ্ট। খোঁচগুলো রীতিমত ধাবালো। বলিষ্ঠ লেখা বলতে যা বোঝায়। মোট বিশ লাইনের লিপি। চিঠিটার হুবহু অনুলিপি নীচে দিচ্ছি। আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল শুধু চিঠি লেখার জায়গাটি দেখে। গ্রেট আইরী থেকে লেখা হয়েছে আশ্চর্য এই পত্র।

গ্রেট আইরী, ব্লুরিজ মাউণ্টেনস্,
নর্থ ক্যারোলিনা, তেরোই জুন।

মিস্টার স্ট্রক,
চীফ ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ,
৩৪, লঙ স্ট্রীট, ওয়াশিংটন, ডি সি।

মহাশয়,

"গ্রেট আইরীর অন্তঃপুর-রহস্য ফাঁস করার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আপনার ওপর।

"মরগানটনের মেয়র এবং দুজন পথ-প্রদর্শককে নিয়ে গত আটাশে এপ্রিল এসেছিলেন গ্রেট আইরীতে।"

"বুরুজের পাদদেশে পৌঁছেছিলেন, এক চক্কর ঘুরেও এসেছিলেন—কিন্তু বুরুজের সুউচ্চ পাঁচিল টপকানোর পথ পাননি।

"পাথরের ফাটল খুঁজেছিলেন—পাননি।

"শুনে রাখুন: গ্রেট আইরীতে কেউ ঢোকে না; ঢুকলে আর বেরোয় না।

"ফের চেষ্টা করতে যাবেন না। ফলাফলটা প্রথম বারের মত হবে না। পস্তাতে হবে, যদি যান।

"হুঁশিয়ার করে দিলাম। যদি না শোনেন, অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি লেখা আছে জানবেন।

"এম. ও. ডব্লিউ"

(৭) তৃতীয় মেশিন

সত্যি কথাই বলি, চিঠি পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম। মুখ দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে এল বিস্ময়ধ্বনি—"অ্যাঁ! সে কী!" আমার স্বগতোক্তি শুনে বিমূঢ় চোখে চেয়ে ছিল বুড়ি দাসী।

চিঠি পড়া শেষ হতেই শুধোলো—"খারাপ খবর নাকি?"

বুড়ি দাসী অত্যন্ত বিশ্বাসী। কিছুই লুকোই না ওর কাছে। তাই জবাব দিলাম চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে শুনিয়ে। উদ্বেগ থর-থর মুখে শুনল বুড়ি। বুঝলাম, বেশ ভয় পেয়েছে।

মুখে বললাম—"কেউ মস্করা করেছে নিশ্চয়!" এমন ভান করলাম যেন থোড়াই কেয়ার করছি চিঠির হুমকিকে।

বুড়ি কিন্তু দারুণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে—"আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। খোদ শয়তান না হলেও শয়তান-পুরী থেকেই লেখা চিঠি তো!"

বলে, গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল বুড়ি। আমি আবার চিঠির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লাম। উড়ো চিঠির মতই উড়ো চিঠি। বলা নেই কওয়া নেই ভয় দেখাচ্ছে। আমার কিন্তু মনে হল, কেউ গাড়োয়ানি ইয়ার্কি জুড়েছে। খবরের কাগজের দৌলতে দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেছে আমার ব্যর্থ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। আমেরিকায় টিটকারি দেওয়ার লোকের অভাব নেই। তাই কেউ ভয় দেখানোর ছলে উপহাস করতে চাইছে আমার ব্যর্থতা! রঙ্গব্যঙ্গ জুড়েছে জন স্ট্রককে নিয়ে!

গ্রেট আইরীকে চোর-ডাকাতদের গোপন ঘাঁটিও আর বলা যায় না। ক্রিমিন্যাল যারা, তারা গা-ঢাকা দিয়েই থাকতে চায়। গোপন আস্তানার

ঠিকানা পুলিশকে জানায় না। পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়ার অভিলাষ থাকলে লুকোচুরি খেলাই চলে—চিঠি পাঠিয়ে আস্তানায় ঢুকতে নিষেধ করে না কেউ। এ-চিঠি তো চ্যালেঞ্জ করা চিঠি! পুলিশকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বানের পরোক্ষ নিমন্ত্রণ। ডাকাত সর্দারের ঘটে এটুকু বুদ্ধি নিশ্চয় আছে যে পুলিশকে এ ধরনের চিঠি পাঠানো মানেই তাদের তাতিয়ে তোলা। কেননা, পুলিশ তো সঙ্গে সঙ্গে ডিনামাইট বা মেলেনাইট দিয়ে ডাকাত-দুর্গের পাচিল উড়িয়ে দেবে। পত্র মারফৎ আস্ফালন তখন থাকবে কোথায়? তাছাড়া, গ্রেট আইরীতে প্রবেশ পথ যদি সত্যিই না থাকে তো ডাকাতরা সেখানে ঢুকল কি করে? নিশ্চয় এমন কোনো সুড়ঙ্গ আছে যা আমাদেব চোখ এড়িয়ে গিয়েছে? না, না, এ-চিঠি পাগলের লেখা চিঠি, নয়তো ফক্কড়েব ফক্কুড়ি। বিদ্রুপ করা হচ্ছে আমাকে। সুতরাং আমার চিন্তাভাবনা উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।

এইসব ভেবেই ঠিক করলাম মিস্টার ওয়ার্ডকে চিঠি দেখাবো না। ছিঁড়তেও মন চাইল না। তালাচাবী দিয়ে রাখলাম টেবিলের ড্রয়াবে। মিস্টার ওয়ার্ড কোনোরকম গুরুত্ব আবোপ করবেন না ফাঁকা হুমকির ওপব। ভবিষ্যতে যদি এ-জাতীয় চিঠি ফেব আসে, একই লোক যদি আবাব ফক্কুড়ি করতে চায়, তখন না হয় পত্র-প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবা যাবে। ফাজলামি ছুটিয়ে দেওয়া যাবে।

দিন কয়েক বেশ শান্তিতে কাটল। ওয়াশিংটন থেকে শীগগিরই বেরোতে হবে। এমন কোনো লক্ষণ দেখলাম না। আমাদের কাজটাই অবশ্য বিদঘুটে। কখন কোন মুহূর্তে তলব পড়বে—তা আগের মুহূর্তেও জানা যায় না। ওরিগন থেকে ফ্লোরিডা, মেইন থেকে টেক্সাস পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যে কোনো জায়গা থেকে ডাক আসতে পারে। মনটা খুবই খারাপ এইসব কারণে। যদি গ্রেট আইরীর ব্যর্থতার পর আবার ব্যর্থ হই পরের কাজেও, চাকরীতে ইস্তফা দেব। রহস্যপুরুষের ড্রাইভার বা মোটরগাড়ীব আর কোনো খবব নেই। মার্কিন চর তো বটেই, অন্যান্য রাষ্ট্রের গুপ্তচররাও আমেবিকার উপকূল, লেক, নদী আর রাস্তার ওপর নজর রেখেছে অহোরাত্র। আমেরিকা দেশটা অবশ্য নেহাত ছোট নয়। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে নজর রাখাও অসম্ভব ব্যাপার। তবে যমজ যন্ত্রযানেরা এর আগে নিরিবিলি জায়গায় কক্ষনো দেখা দেয়নি। প্রতিবারেই ভেল্কী দেখানোর জন্যে বেছে নিয়েছে জনবহুল তল্লাট। যেমন দৌড়-প্রতিযোগিতার দিন উইসকনসিনের প্রধান সড়ক অথবা বোস্টন পোতাশ্রয় যেখানে প্রতিমুহূর্তে হাজার হাজার জলযান যাতায়াত করছে এবং লোক গিজগিজ করছে! গা-ঢাকা দিতে চাইলে এ ধরনের জায়গায় কেউ আসে? লক্ষণ দেখে মনে হয় বোধহয় অ্যাদ্দিনে অক্কা পেয়েছে ডাকাবুকো ড্রাইভার। যদিও

বা বেঁচে থাকে, আমেরিকায় নিশ্চয় নেই। হয়ত প্রাচীন পৃথিবীর জলে জলে টহল দিচ্ছে তার আশ্চর্য জলযান। নয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকোনো নিভৃত নিকুঞ্জে ঘাপটি মেরে রয়েছে।

গোপন ঘাঁটির কথা ভাবতেই খেয়াল হল। তবে কি গ্রেট আইরীই সেই ঘাঁটি? এর চাইতে দুর্গম ঘাঁটি আর কোথাও কি আছে? কিন্তু অত উঁচুতে মানুষ উঠতে পারেনা, মোটরে উঠবে কি করে? রহস্যে ঘেরা চালক যতই ফ্যানটাসটিক হোক না কেন, বোট নিয়ে গ্রেট আইরীর উদরে আস্তানা নেওয়া নিশ্চয় সম্ভব নয়? উঁচু আকাশের পাখী ছাড়া গ্রেট আইরীতে ঘাঁটি গড়ার সাধ্য আর কোনো প্রাণীর নেই। ঈগল কনডর বা শকুনিরাই শুধু পারে, ওখানে যেতে।

উনিশে জুন পুলিশ দপ্তরে যাবো বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েই দেখলাম দুজন লোক তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে আমার পানে। আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছে—অত খেয়াল করলাম না। টনক নড়ল রাত্রে বুড়িদাসীর কথা শুনে।

বেশ কিছুদিন ধরে নাকি দুজন লোক চোখে চোখে রেখেছে আমাকে। বাড়ীর সামনে একশ পা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে দুজনে। আমি বাড়ী থেকে বেরোলেই পেছন নেয়।

"তুমি নিজের চোখে দেখেছো?' শুধোলাম আমি।

"নিশ্চয়। কাল তো স্পষ্ট দেখলাম আপনিও বাড়ী ফিরলেন, লোক দুটোও আপনার পেছন পেছন এল। দরজা বন্ধ হল—ওরাও চলে গেল।"

'ভুল করোনি তো?'

'আজ্ঞে না।"

"ফের দেখলে চিনতে পারবে?

"পারব।"

হেসে বললাম—'তাহলে আর কি। ভাল গোয়েন্দা হবার সব গুণই যখন তোমার আছে, পুলিশ দলে নাম লেখালেই পারো।"

'ঠাট্টা করছেন? চোখে তো এখনো ছানি পড়েনি—বিনা চশমাতেই দেখতে পাই। যা দেখেছি, ঠিকই দেখেছি—ভুল নয়। চর লেগেছে আপনার পেছনে। আপনিও চর লাগান ওদের পেছনে।'

"বেশ, বেশ, তাই করা যাবে'খন," মন রাখতে বললাম। আমার লোক দিয়ে পাকড়াও করার পর জানা যাবে বাছাধনরা কি চায় আমার কাছে।"

সত্যি কথা বলতে কি, বুড়ি দাসীর মনটি বড় সরল। কি দেখতে কি

দেখেছে। তাই নিয়ে খামোকা ভেবে লাভ কি? তবুও মুখে বললাম—"তুমি কিছু ভেবো না। এবার থেকে রাস্তায় বেরোলে চোখ রাখব পেছনে।"

"ভালই হবে।"

ছায়া দেখে চমকে ওঠা স্বভাব বুড়ি দাসীর। তাই ফের বললে—"এবার ওদের দেখলেই হুঁশিয়ার করে দেব আপনাকে। চৌকাঠ পেরিয়ে আপনিও দেখতে পাবেন।"

"ঠিক আছে, তাই হবে," বলে বিদায় করলাম বুড়িকে। নইলে হয়ত এরপরেই শুনবো, ভূতের রাজা বীলজিবাব স্বয়ং দুজন প্রধান পারিষদ নিয়ে পেছন নিয়েছে আমার।

পরের দুটো দিন সজাগ রইলাম, কিন্তু স্পাই দুজনের ছায়াও দেখা গেল না। বুড়ির ভয় যে অমূলক, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। কিন্তু বাইশে জুন সকালবেলা বুড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল ওপর তলায়। বলল দম আটকানো চাপা গলায়—"স্যার! স্যার!"

"কি হল?"

"এসেছে!"

"কে?"

"স্পাই দুজন!"

"বটে! ওয়াণ্ডারফুল স্পাইরা তাহলে এসে গেছে?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে! জানলার সামনেই! ওৎ পেতে আছে! আপনি চৌকাঠ পেরোলেই পাছু নেবে।"

জানলার সামনে গিয়ে খড়খড়ির পাখী তুলে দেখলাম। সত্যিই দুজন লোক চেয়ে আছে বাড়ীর দিকে।

দুজনেরই চেহারা বেশ ঘষামাজা। সুপুরুষ। চওড়া কাঁধ। বলিষ্ঠ। বয়স চল্লিশের নীচে। হালফ্যাশানের পোশাক পরিচ্ছদ, নরম চওড়া কিনারা টুপী, ভারী উলেব স্যুট, মজবুত জুতো, হাতে ছড়ি। দুজনেই ঠায় চেয়ে আছে আমার বাড়ীর দিকে। দুজনের কেউই অবশ্য বুঝতে পারল না খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আমিও চেয়ে আছি তাদের পানে। কিছুক্ষণ পরে নিজেদের মধ্যে দু'চার কথার পর দুজনে গুটিগুটি কোথায় যেন গেল, ফিরে এল একটু পরেই।

"এদেরকেই দেখেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

না, চোখের ভুল নয়। বুড়ি দাসীর হুঁশিয়ারি ভিত্তিহীন নয়। ভয়ের চোটে ছায়া দেখে চমকে ওঠা ওর স্বভাব। কিন্তু এ-লোকদুটো মরীচিকা-দর্শনের

মত ছায়া বাজি নয়। ঠিক করলাম, হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। আমি নিজেই পাছু নিতে পারি। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। ওরা আমাকে চেনে। সটান গিয়ে জিজ্ঞেস করতেও পারি কি চায় ওরা। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হবে না। কিন্তু আমি এত সহজে ওদের ছাড়ছিনা। আজকেই গোয়েন্দা লাগাবো পেছনে। দুজনেরই নামধাম জেনে তবে ছাড়ব।

ওরা ওৎ পেতে রয়েছে রাস্তায়। আমি যাব পুলিশ দপ্তরে। ওরাও যাবে পেছন পেছন। সেরকম বুঝলে পুলিশ হাজতে আপ্যায়ন করা যাবে খন দুই মূর্তিমানকে। জামাই-আদর কাকে বলে, হাজতবাস করলেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

টুপী নিলাম। বুড়ি দাসীকে হুঁশিয়ার থাকতে বললাম। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামলাম একতলায়। দরজা খুলে পা দিলাম রাস্তায়।

উধাও হয়েছে স্পাই দুজন। রাস্তা ফাঁকা।

সারাদিন অনেক চেষ্টা করেও দুজনের কাউকে দেখতে পেলাম না। টো-টো করলাম রাস্তাঘাটে—কিন্তু বৃথাই। বুড়ি দাসীও নজর রেখেছিল রাস্তায়। তাকেও হতাশ হতে হল। সেইদিন থেকে বাড়ীর সামনেতে তারা আর এল না, রাস্তাঘাটেও দেখা দিল না। আমি কিন্তু ভুললাম না দুজনের চেহারা। আমার স্মৃতির ফোটোগ্রাফে ধরা রইল দুজনের ছবি।

হয়ত ওরা ভুল করে পাছু নিয়েছিল আমার। কাছ থেকে ভাল করে দেখবার পর ভুল ভেঙেছে। যার খোঁজ খবর চায়, আমি হয়ত সে লোক নই। তাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং আমিও ভুলে গেলাম দুই গুপ্তচরের বৃত্তান্ত। ভুলে গেলাম এম-ও-ডব্লিউ স্বাক্ষরিত উড়ো চিঠির কথা।

চব্বিশে জুন ঘটল আরেকটি নতুন ঘটনা। আবার জাগ্রত হল আমার কৌতূহল। চনমনে হল জনসাধারণ। খবরটা প্রথমে বেরোলো ওয়াশিংটন ইভনিং স্টারে। পরদিন সকালবেলা একই খবর ছাপা হল সব কটা কাগজে।

খবরটা এই :

"লেক কিরডাল হ্রদটা টোপেকা থেকে চল্লিশ মাইল পশ্চিমে। জায়গাটা এমন কিছু বিখ্যাত নয়। নামও শোনেনি অনেকে।

"কিন্তু এখন থেকে শুনতে হবে। এতদিন কেউ খোঁজ-খবর রাখেনি এই লেকের। এখন থেকে রাখতে হবে। লেক কিরডাল টনক নাড়িয়েছে সকলের।

"অদ্ভুত আশ্চর্য বিচিত্র কাণ্ডকারখানার রঙ্গমঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে অখ্যাত লেক-টি—বিখ্যাত হতে চলেছে রাতারাতি।

"পাহাড় ঘেরা লেক কিবড়ালের জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। প্রকাণ্ড আর গভীর গামলার মধ্যে যেন বৃষ্টির জল আর পাহাড়ি নদীর জল জমে সৃষ্টি হয়েছে এই লেকের। সূর্যের কড়া রোদে জল উবে যায়। বৃষ্টি আর পাহাড়ি স্রোতস্বতী পূরণ করে ঘাটতি।

"লেক কিবড়ালের মোট ক্ষেত্রফল প্রায় পঁচাত্তর বর্গমাইল। চারপাশের পাহাড় অনেক উঁচু—জলের রেখা সে তুলনায় অনেক তলায়। ঠিক যেন পাহাড়বন্দী সরোবর। হ্রদে পৌঁছোতে হলে গিরিপথ, সুড়ঙ্গ এবং অনেক খাদের পাড় বেয়ে আসতে হয়। অনেকগুলো গ্রাম গড়ে উঠেছে হ্রদের পাড়ে। হ্রদের জলে কিলবিল করে অগুন্তি মাছ। জেলে-নৌকোয় ছেয়ে থাকে জলপৃষ্ঠ।

"পাড়ের কাছে লেক কিবড়ালের জলের গভীরতা পঞ্চাশ ফুট। খোঁচা খোঁচা ডুবো পাথর বল্লমের মত মাথা চাড়া দিয়েছে কিনারা বরাবর। হ্রদ তো নয়, যেন একটা প্রকাণ্ড গামলা। হাওয়ার জোর বাড়লে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ে কিনারার ডুবো পাথরে-ফেণা আছড়ে পড়ে তীরভূমিতে। কখনো-সখনো ফেণারাশি বহু উঁচুতে উঠে স্প্রে আকারে ভাসিয়ে দেয় আশপাশের গ্রাম। ঠিক যেন হারিকেন ঝড় মাতামাতি আরম্ভ করে হ্রদের জলে। জল আরো গভীর হয়েছে মাঝামাঝি জায়গায়। গভীরতা সেখানে তিনশ ফুটেরও বেশী।

"ধীবরকুল বেঁচে আছে লেকের মাছের ওপরেই। বেশ কয়েক হাজার জেলে পেট চালাচ্ছে মাছের ব্যবসা নিয়ে। লেকের এ পাড় ও পাড় করবার জন্যে খান কয়েক স্টিমার তো আছেই, আর আছে কয়েক শ জেলে ডিঙি। পাহাড়ের বাইরে রেলরাস্তা ঘিরে আছে গোটা অঞ্চলটাকে। টাটকা মাছ রেল পথে চালান যায় ক্যানসাস এবং কাছাকাছি প্রদেশে।

"লেক কিবড়ালের এই বিবরণ জানা না থাকলে অত্যাশ্চর্য ঘটনাটার রসাস্বাদন করা যাবে না।"

লেক কিবড়ালের বিশদ বিবরণ পেশ করার পর 'হুডনি স্টার' শুরু করেছে পিলে চমকানো কাহিনীটা :

"বেশ কিছুদিন ধরে জেলেরা একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করছে। লেকের জল আশ্চর্যভাবে ফুলে উঠছে। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের আকারে জলরাশি তীরভূমিতে আছড়ে পড়ছে। লেকের তলদেশ থেকে যেন কিসের ঠেলায় জল ফেঁপে উঠছে—তরঙ্গাকারে ছুটে আসছে। হাওয়ার লেশমাত্র না থাকলেও ফেণার আকারে জল ফুঁসে উঠছে—প্রশান্ত আবহাওয়াতেও জল ফুলে ফুলে উঠছে।

"জল হঠাৎ ফুলে উঠলে ক্ষুদে ক্ষুদে জেলে নৌকো তো ভেসে যাবেই। ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় কতবার নৌকো ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়েছে অন্যান্য নৌকোর ওপর। নৌকো ভেঙেছে, ডুবেছে, জেলেদের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঢেউয়ের টানে জেলে ডিঙি পর্যন্ত হালে পানি পায় না—বে-সামাল হয়ে ভেসে যায় এদিকে-সেদিকে।

"নিশ্চয় গভীর জলে এমন কিছু ঘটছে যার জন্যে এমনি ভাবে ফুলে ফুলে উঠছে বিপুল জলরাশি। অনেকরকম ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। প্রথমে শোনা গিয়েছিল ভূমিকম্প, লেকের তলদেশে অগ্ন্যুদ্গার জাতীয় পাতাল-প্রলয় চলেছে। কিন্তু পরে সে ধারণা নাকচ হয়ে গিয়েছে। কেন না, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির উৎপাত হলে উদ্বেল জলরাশি একটা টানা রেখায় ছুটে যেত না পাড় বরাবর—লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তরঙ্গ ধেয়ে যেত না জলোচ্ছ্বাসের আকারে। বিশেষ কোনো অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয় জলোচ্ছ্বাস—সারা লেকটাই জলতলের বিভীষিকার ক্রীড়াস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"আরেকটা কথা শোনা গিয়েছিল। জলতলের বিভীষিকা নিশ্চয় কোনো দানব-প্রাণী। কিন্তু লেকের বাইরে থেকে অতবড় প্রাণীটা নিশ্চয় পাহাড়-পর্বত মাড়িয়ে আসেনি। তবে কি লেকের জলেই জন্মেছে, বড় হয়েছে, এখন দাপাদাপি জুড়েছে? অসম্ভব। নিশ্চয় বাইরের জগৎ থেকে আমদানী ঘটেছে আশ্চর্য জীবটার। কিন্তু আসবে কোন পথ দিয়ে? মহাসমুদ্র কাছাকাছি থাকলে না হয় বলা যেত ভূগর্ভ-সুড়ঙ্গ দিয়ে লেকের জলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মহাসাগরের জলের। সামুদ্রিক দানব সেই পথেই আশ্রয় নিয়েছে লেক কিরডালে। কিন্তু তা কি করে হবে? আমেরিকার ঠিক মাঝখানে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশ কয়েক হাজার ফুট ওপরে সামুদ্রিক দৈত্য আসতে পারে না। গোলোকধাঁধার পর গোলকধাঁধায় আসল ঘটনাটা পর্যন্ত গুলিয়ে যেতে বসেছে। সত্যিমিথ্যের জগাখিচুড়িতে আরো জটিল হচ্ছে রহস্যজাল।

"এমনও হতে পারে জলের তলায় সাবমেরিন বোট নিয়ে কেউ এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছে? এ-ধরনের বোট এ যুগে আর উদ্ভট কিছু নয়। বছর কয়েক আগে কানেকটিকাটের ব্রীজপোর্টে "প্রোটেকটর" নামে একটা আজব জলযান মহড়া দিয়েছিল। জলে-স্থলে, এমন কি জলতলেও অবাধ গতি ছিল তার। আবিষ্কারকের নাম লেক। ভদ্রলোক দুটো মোটর বসিয়েছিলেন তাঁর উভচর যানে। একটা বিদ্যুৎচালিত পঁচাত্তর অশ্বশক্তিসম্পন্ন। আরেকটা পেট্রল-

চালিত আড়াইশ অশ্বশক্তিসম্পন্ন। চাকাগুলোর ব্যাস ছিল এক গজ। ফলে ডাঙায় গড়গড়িয়ে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে সমুদ্র সাঁতরানোও সম্ভব হয়েছিল প্রোটেকটরের পক্ষে।

"ধরে নেওয়া গেল, জলের তলায় লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে একটা নতুন ধরনের সাবমেরিন। কিন্তু লেক কিরডাল পাহাড় দিয়ে ঘেরা জায়গা। ডুবোজাহাজ সেখানে আসে কি করে? সমুদ্র দানব আসতে পারে না পাহাড় টপকে, ডুবোজাহাজ আসে কি করে? অসম্ভব।

"জলতলের রহস্য ভাবিয়ে তুলল স্থানীয় জেলেদের। ধীবর সম্প্রদায় এত ভয় পেল যে বলবার নয়। কিন্তু কেউ ধরতে পারল না, জিনিসটা কি? যন্ত্র, না, দানব? সমস্যার আংশিক সমাধান ঘটল বিশে জুন। মার্কেল নামে একটা পাল-মাস্তুলওয়ালা জাহাজ সব কটা পাল তুলে দিয়ে তর তর করে চলেছে অপরাহ্ন নাগাদ। আচমকা কেঁপে উঠল গোটা জাহাজটা। জলের তলায় কিসের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ লেগেছে মার্কেলের। জল সেখানে আশি নব্বই ফুট গভীর। সুতরাং জলপৃষ্ঠের কাছাকাছি চোরা পাহাড় থাকার তো কথা নয়। এক ধাক্কাতেই মড়মড় শব্দে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল গলুই আর পার্শ্বদেশ। দেখতে দেখতে জল পৌঁছোলো ডেক পর্যন্ত। ডুবতে ডুবতে কোনরকমে তীরে পৌঁছোলো মার্কেল।

"ডেক থেকে পাম্প করে জল বের করে দেওয়া হল। তীরে টেনে তোলা হল ভাঙা জাহাজকে। আঘাতের ধরন দেখে চোখ কপালে উঠল তখনি। ঠিক যেন একটা বিরাট শলাকার গুঁতো খেয়ে গুঁড়িয়ে গেছে মার্কেলের অনেকখানি জায়গা।

"আর কোনো সন্দেহ রইল না। সত্যিই তাহলে একটা ডুবোজাহাজ বিপুল বেগে জলের ঠিক তলা দিয়ে ছুটোছুটি করছে গোটা লেকে। সামনে পড়েছে বেচারা মার্কেল—জাহাজ ভেঙে সোজা বেরিয়ে গিয়েছে সাবমেরিন। অবলীলাক্রমে এ ভাবে যে সাবমেরিন ঢুঁ মেরে জাহাজ ভাঙতে পারে, তার শক্তি নিশ্চয় অবিশ্বাস্য রকমের বেশী বলতে হবে?

"এ তো বড় গোলমেলে সমস্যা। সাবমেরিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু লেকের জলে পাহাড়-পর্বত ডিঙে সাবমেরিনটা এল কি করে? এলই যদি তো জলের তলায় লুকোচুরি খেলছে কেন? জলের ওপর আসতে এত অনিচ্ছে কেন? ডুবোজাহাজ-অধিকারীর মতলব বোঝা ভার। তিনি কি চিরকালই আত্ম-গোপন করে থাকবেন? না, আরো খানকয়েক জাহাজ ডোবাবার ফিকিরে ঘুরছেন?"

বেপরোয়া ডুবোযানের চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পেশ করার পর সবশেষে দারুণ মন্তব্য করেছেন ইভিনিং স্টারের রিপোর্টার ভদ্রলোক। তিনি লিখেছেন— "রহস্য-ধূসর মোটরের পর আবির্ভূত হল রহস্যাবৃত বোট, এখন আসরে নেমেছে রহস্যকুটিল সাবমেরিন !

"তবে কি তিনটে যন্ত্রই একই উদ্ভাবকের বিস্ময়কর প্রতিভার বিকাশ, তিনটে ইঞ্জিনই কি প্রকৃতপক্ষে এক এবং অদ্বিতীয় ? একই কল-কে তিনভাবে দেখেছি আমরা ? ডাঙায়, জলের ওপর এবং জলের তলায় ?"

(৮) যে ভাবেই হোক

ইভনিং স্টার-য়ের শেষ মন্তব্য চোখ খুলে দিল চিন্তাশীল মানুষদের। প্রবন্ধের প্রতিটি অক্ষর মনোমত হল দেশবাসীর। তিনটে যন্ত্রই একই উদ্ভাবকের সৃষ্টি—শুধু তাই নয়—যন্ত্র তিনটেও এক এবং অভিন্ন !

কিন্তু মাথায় এলনা এমন কাণ্ড সম্ভব হয় কি করে। এক ধরনের যন্ত্রযান আরেক ধরনের যন্ত্রযানে রূপান্তরিত হওয়া কি সম্ভব ? মোটর কি নৌকো হতে পারে ? নৌকোই বা ডুবোজাহাজ হয় কি করে ? সব ক্ষমতাই আছে যন্ত্রযানের—একটি বাদে। পাখীর মত আকাশে উড়তে পারলেই বুঝি সর্বাঙ্গ সুন্দর হত। তিনটে যন্ত্রযানের ধরনধারণ, নির্গন্ধ বিহার, গড়নপেটন, আকার আয়তন, নির্ধূম দৌড় এবং অসাধারণ গতিবেগ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—যন্ত্র আসলে একটাই। বহুরূপে আসছে বহুবার ! জনসাধারণ মুঠোয় রাখার সবচেয়ে বড় মন্ত্রগুপ্তি হল হুজুগ তুলে দেওয়া। পরপর অনেক-গুলো উত্তেজনায় অভ্যস্ত জনসাধারণ তাই ফের চাঙা হয়ে উঠল রগরগে রহস্যের গন্ধ পেয়ে।

মওকা বুঝে খবরের কাগজগুলো সুর পালটালো। এবার আর জনগণকে ভয় না দেখিয়ে শুরু হল আবিষ্কারের গুরুত্ব নিয়ে ঢাক পেটানো। একটা মেশিন হোক, কি, তিনটে মেশিন হোক, ইঞ্জিনের ক্ষমতার নমুনা দেখে তামাম দুনিয়া হতবাক হয়ে গিয়েছে। প্রমাণের আর বাকী রইল কী ? সুতরাং যেন তেন প্রকারেন আবিষ্কারটাকে কুক্ষিগত করতে হবে। যত পয়সা লাগে লাগুক। এ-আবিষ্কার কিনতেই হবে। জাতির কল্যাণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিশ্চয় কিপটেমো করবেন না ? ইউরোপের রাষ্ট্ররাও নিশ্চয় পেছিয়ে থাকবে না। তাঁদেরও নৌ-বাহিনী আছে, স্থল-বাহিনী আছে। সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্যে তাঁরাও নিশ্চয় আদাজল খেয়ে এতক্ষণে লেগে গেছেন। আবিষ্কারকের গোপন নাটি আবিষ্কার করে তবে ছাড়বেন। এ মেশিন যে রাষ্ট্র বগলদাবা করতে

পারবেন, ডাঙায় আর জলে তাঁদের একাধিপত্য সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকবে কি ?

যন্ত্রটার বিধ্বংসী ক্ষমতার হিসেব অবশ্য আজও জানা যায় নি। তাহোক লক্ষণ দেখেই প্রকৃতি বোঝা যায়। টাকা দিয়ে দাম হয় না এই গুহ্য তত্ত্বের। লক্ষ লক্ষ ডলার যায় যাক, যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেন আবিষ্কারটা হাতছাড়া না করেন।

কিন্তু আসল ঝামেলা তো সেইখানেই। মেশিন কিনতে গেলে চাই মেশিন মালিকের নামধাম। বৃথাই তন্নতন্ন করে খোঁজা হল লেক কিরডালের জলরাশি। ডুবুরী নামানো হল, জালফেলাও হল। দড়ি নামিয়ে দেওয়া হল জলের একদম তলা পর্যন্ত। কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালা হল প্রতিবারেই। তবে কি লেক কিরডালের জল ছেড়ে চম্পট দিয়েছে আশ্চর্য যন্ত্রযান ? কিন্তু কি ভাবে ? ডুবোজাহাজ পাহাড় পেরোয় কি করে ! তার চেয়েও বড় কথা, লেকের জলে যন্ত্রটা এল কিভাবে ? নাঃ, এ সমস্যার সমাধান বুঝি আর হবে না !

বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল ডুবোজাহাজ। লেক কিরডালের জলেও আর তার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেলনা, আশপাশের অঞ্চল থেকেও নতুন কোনো খবর এলনা। রহস্য ধূসর মোটর যেভাবে ঢেউয়ের বুকেই হারিয়ে গিয়েছে, রহস্য কুটিল ডুবোজাহাজও সেইভাবে নিপাত্তা হয়েছে রঙ্গমঞ্চ থেকে। মিস্টার ওয়ার্ডের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার দেখা সাক্ষাৎ হল অনেকবার, প্রতিবারই দুরূহ প্রহেলিকা নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করলাম দুজনে। কিন্তু রহস্য-তিমিরে আলোকপাত করতে পারলাম না। অথচ শুনলাম দেশজোড়া তল্লাসি চলছে। আমাদের দুঁদে গোয়েন্দারা বাঘা কুকুরের মত মাটি শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায় যন্ত্রযান ? কোথায় তার অবিষ্কারক ?

সাতাশে জুন আমার ডাক পড়ল মিস্টার ওয়ার্ডের খাসকামরায়।

বললেন—"স্ট্রক, তোমার প্রতিশোধ নেওয়ার খাসা সুযোগ এসেছে।"

"গ্রেট আইরীতে আমার ব্যর্থতার প্রতিশোধ তো ?"

"তাছাড়া আর কি।"

"কি সুযোগ ?" বুঝলাম না চীফ আগের মতই আমাকে খেপাচ্ছেন, না, সত্যি সত্যিই কাজ দিতে চাইছেন।

"ত্রি-রূপী মেশিনের আবিষ্কারককে গ্রেপ্তার করতে চাও ?"

"আলবৎ চাই। হুকুম করুন, অসম্ভবও সম্ভব করব, দুস্তর বাধাও পেরিয়ে যাব। কাজটা অবশ্য খুবই কঠিন।"

"তাতো বটেই। গ্রেট আইরী অভিযানের চাইতেও কঠিন।"

বুঝলাম, মিস্টার ওয়ার্ড আমাকে ইচ্ছে করে খোঁচাচ্ছেন। যাতে আমি মনে মনে খেপে উঠি, নতুন তেজে অসম্ভবকে সম্ভব করার মত মনোবল ফিরে পাই, তাই ইচ্ছে করে ঘা দিচ্ছেন আমার সেন্টিমেন্টে। এটা তার নির্দয়তা নয়—আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহ ভালবাসার আবেক প্রকাশ। উনি তো জানেন, জনস্ট্রক জান দেবে, কিন্তু পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে তবে ছাড়বে। তাই খোঁচা খেয়েও উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম কাজের স্বরূপ শোনবার জন্যে

এবার আর ঠাট্টা নয়, সহৃদয় কণ্ঠে বললেন মিস্টার ওয়ার্ড—"স্ট্রক, আমি তোমাকে জানি। তোমাকে কাজের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকি এই কারণে যে আমি জানি মনুষ্য শক্তির সব শেষ শক্তি দিয়েও তুমি হাতের কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করবে। এর পরেও যদি ব্যর্থ হও, সে দোষ তোমার নয়। তবে গ্রেট আইরীতে যে কাজের ভার নিয়ে গিয়েছিলে এখনকার কাজ সে ধরনের নয়। গভর্ণমেন্ট যদি চান গ্রেট আইরীর সিক্রেট জানতেই হবে, লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে সে সিক্রেট জানা হবে খন।

তা দিও তাই বলি।'

"কিন্তু এখন যে কাজের ভার তুমি নিতে যাচ্ছে, এ কাজ ডিটেকটিভ শিরোমণি ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। ফ্যানটাসটিক আবিষ্কারের রহস্যজনক আবিষ্কারককে ধরে আনতে হবে। বুঝতেই পারছো, বড় দেরেন্দা না হলে তার কেশাগ্র স্পর্শ করবার ক্ষমতা কারো নেই।"

"আর কোনো খবর আসেনি?

"যুক্তি প্রমাণ বলছে ভদ্রলোক এখনো লেক কিরডালের তলায় লুকিয়ে আছেন। অথচ জল তোলপাড় করেও তার পাত্তা পাওয়া যায়নি। তবে কি ভদ্রলোক অদৃশ্য হওয়ার ফর্মুলাও আবিষ্কার করে ফেলেছেন? সমুদ্র দেবতা প্রোটিয়াসের বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণের মন্ত্রও জেনে গেলেছেন অসাধারণ মেক্যানিক?"

"আমার তো মনে হয় ভদ্রলোক নিজে ইচ্ছে না করলে কেউ তাকে দেখতে পাবে না।'

"বলেছো ঠিকই। তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছে, মোটা টাকার লোভ দেখালে কেমন হয়? টাকার লোভে নিজে থেকেই দেখা দেবেন ভদ্রলোক। রাজী হবেন আবিষ্কার বিক্রি করতে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। গভর্ণমেন্ট মোটা টাকা দিতে রাজী হয়েছেন অজ্ঞাত কুলশীল আবিষ্কারককে। তিনি যেন সশরীরে আবির্ভূত হয়ে গভর্ণমেন্টের

সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিটি খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। অজ্ঞাতনামা উদ্ভাবক ভদ্রলোকও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, গভর্ণমেণ্টের আসল ইচ্ছেটা কি। মোচড় দিয়ে দাঁও পেটবার এই তো সুযোগ। দরাজ হাতে টাকা দেবেন গভর্ণমেণ্ট নয়া আবিষ্কার কিনে নেওয়ার জন্যে।

মিস্টার ওয়ার্ড বললেন—"এ-মেশিন ব্যক্তিগত উপকারে লাগবে না যখন, তখন দেশের স্বার্থে বিক্রি করে দেওয়া উচিত। অরাজী হওয়ার তো কারণ দেখি না। অবশ্য মেশিন মালিক নিজেই যদি বিপজ্জনক কু লোক হন তাহলে বিক্রি করতে চাইবেন না। লোকটার স্বভাবচরিত্র ঠিকুজী কুলজী ভাল নয় বলেই কি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

কতরকমভাবে আবিষ্কারকের টিকি ধরে টেনে আনবার চেষ্টা চলছে, মিস্টার ওয়ার্ড এবার সেই ফিরিস্তি শোনালেন আমাকে। খুব সম্ভব মারাত্মক খেল দেখাতে গিয়ে মেশিন সমেত মালিক মহাশয় অক্কা পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে ভাঙা কলকব্জাগুলো বের করতে পারলেও অসীম উপকার হবে যন্ত্র বিজ্ঞানীদের। কিন্তু লেক কিবডালে মার্কেল স্কুনারকে জখম করার পর থেকেই উধাও হয়েছে মেশিনটা। কোনো খবরই আসছেনা কোনো দিক থেকে।

বিষয়টি নিয়ে খুবই উদ্বেগে পড়েছেন মিস্টার ওয়ার্ড। মনটাও খিঁচড়ে গিয়েছে নিখোঁজ ডুবোযানের তিলমাত্র খবর না পেয়ে। উদ্বেগ হওয়াটা স্বাভাবিক। তাঁর কর্তব্য জনসাধারণকে নিভয়ে রাখা। তিনি কি তা পারছেন? দীর্ঘদিন ধরে এই অসহায় অক্ষমতা মেজাজ খিঁচড়োবে না? পাবলিককে বিপদ থেকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব নিয়েও তিনি নিশ্চল অসহায় দর্শক। চোখের সামনে দিয়ে কল্পনাতীত বেগে উধাও হচ্ছে ডাঙার মোটর, জলের বোট—ধরবেন কি করে? পিছু নেবেন কিভাবে? জলের তলা দিয়ে? সমালোচকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে গায়ে যেন বিছুটির জ্বালা ধরে গেল। প্রত্যেকেরই ধারণা হয়ে গিয়েছে কতকগুলো অপদার্থকে নিয়ে তৈরী হয়েছে দেশের আরক্ষ বাহিনী। দূর করে দিলেই হয় সবাইকে।

দিন পনেরো আগে পাওয়া হুমকি পত্রটা মনে পড়ল। বদরসিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন সেই চিঠির তেতালো বয়ানে আমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করার ভয় দেখানো হয়েছে। মনে পড়ল, দু দুজন গুপ্তচরের চেহারা। বাড়ী পাহারা দিত দুজন স্পাই, পিছু নিত রাস্তায় বেরোলেই। এসব কথা কি বলব মিস্টার ওয়ার্ডকে? কি দরকার? বর্তমান সমস্যার সঙ্গে উড়ো চিঠি এবং গুপ্তচরের কি সম্পর্ক? গ্রেট আইরী শেষ ঘুমিয়ে পড়ায় অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা তিরোহিত

হওয়ায় গভর্ণমেন্ট এখন তা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। সেই কারণেই নতুন সমস্যায় আমাকে নিয়োগ করার প্রশ্ন উঠেছে। তাই ঠিক করলাম, পরে কোনো সুযোগ পেলে ঘটনাগুলো তাঁকে বলব। তখন তাঁর ঠাট্টা বিদ্রূপ সওয়া যাবে—এখন অসহ্য লাগবে।

মিস্টার ওয়ার্ড কথার খেই তুলে নিয়ে বললেন—"মেশিন-মালিকের সঙ্গে বাক্যালাপের একটা পথ আমাদের বের করতেই হবে। ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়েছেন ঠিকই, ফের তো দেখা দিতে পারেন। আমেরিকার যে-কোনো অঞ্চলেই ফের হানা দিতে পারেন। স্ট্রক, যে মুহূর্তে তাঁর খবর আসবে, সেই মুহূর্তে তুমি তার পিছু নেবে। বাড়ী থেকে কোথাও নড়বে না। রোজ অফিসে আসবার আগে আমাকে টেলিফোন করে বেরোবে—অফিসে এসে আগে আমাকে খবর দেবে।"

"তাই হবে, মিস্টার ওয়ার্ড। একটা প্রশ্নের উত্তর চাই। এ-কাজে একা নামব না, দোসর পাবো?"

"মনের মত দুজন গোয়েন্দা বেছে নাও।"

"একদিন না একদিন মেশিন মালিকের সামনে হাজির হবই। তখন কি করব?"

"চোখের আড়াল করবে না। যদি না পারে, গ্রেপ্তার করবে। ওয়ারেণ্ট তোমার পকেটেই থাকবে।"

"যদি যন্ত্রযানে লাফিয়ে পড়ে ঘণ্টায় দুশ মাইল বেগে পালান? দুশ মাইল বেগে তাড়া করবার ক্ষমতা তো আমার নেই।"

"পালাতে দেবে না। অ্যারেস্ট করেই আমাকে টেলিগ্রাম পাঠাবে। তারপরের ভাবনা আমার।"

"ধন্যবাদ মিস্টার ওয়ার্ড। এত বড় কাজের জন্যে আমাকে নির্বাচন করে সম্মান দিয়েছেন আমাকে—ধন্যবাদ সেই জন্যে। দিনরাতের যে কোনো মুহূর্তে খবর পাওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী থাকব।"

"শুধু সম্মান নয়, স্ট্রক, লাভও অনেক।" বলে আমাকে বিদায় করলেন চীফ।

বাড়ী ফিরলাম। মুহূর্তের নোটিশে অনির্দিষ্টকালের মত বেরিয়ে পড়ার জন্যে গোছগাছ করে নিলাম। বুড়ি দাসী ভাবল, আমি বুঝি ফের গ্রেট আইরীর খপ্পরে আত্মাহুতি দিতে চলেছি। গ্রেট আইরী নরকের দ্বার—এই হল ওর ধারণা। মুখ শুকিয়ে গেল বেচারীর। মুখে কিছু বলল না—গোমড়া মুখে ঘুর ঘুর করতে লাগল আশেপাশে। আমিও মুখে চাবি এঁটে রইলাম।

অন্ততঃ এই ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস না করাই ভাল—পেটের কথা পেটেই থাকুক।

অ্যাসিস্টান্ট নির্বাচন করলাম অতি সহজে। আমার ডিপার্টমেণ্ট থেকেই বেছে নিলাম দু'জন তুখোড় গোয়েন্দাকে। অতীতে বহুবার আমার হুকুম তামিল করেছে তারা, আমার সঙ্গে থেকে প্রমাণ করেছে বুদ্ধিমত্তা সাহস বা শক্তির দিক দিয়ে কম যায়না কেউই। প্রথমজন জন হার্ট, বয়স তিরিশ, ইলিনয়নিবাসী। দ্বিতীয় জন স্যার ওয়াকার, বয়স বত্রিশ, ম্যাসাচুসেটসনিবাসী। আমি তো জানি পুলিশ গোয়েন্দাদের মধ্যে এদের চাইতে দুদে গোয়েন্দা আর পাবো না।

গেল আরো ক'টা দিন। মোটর, বোট বা সাবমেরিন—কোনোটারই খবর পেলাম না। গুজব এল অবশ্য বিস্তর—পাত্তা পেল না পুলিশের কাছে। সত্যি মিথ্যে যাচাই করা পুলিশের কাছে কিছুই নয়। খবরের কাগজের রগরগে খবরা-খবর নিয়েও মাথা ঘামালাম না। কেননা, কাগজের কাটতি বাড়ানোর জন্যে অনেক সময়ে বানিয়ে বানিয়ে খবরও ছাপতে হয়। যত বড় নামকরা পত্রিকাই হোক না কেন, উত্তেজক খবর যদি অসম্ভবও হয়—ছাপতে দ্বিধা করে না।

এর ঠিক পরেই উপর্যুপরি দুটি খবর এল। মনে তো হল, দুটো খবরই বিশ্বাসযোগ্য। দুজনেই প্রত্যক্ষদর্শী। প্রথমজন খবর পাঠালো আরকানসাস থেকে। আরকানসাস জায়গাটা লিটল রকের কাছে। দ্বিতীয়জন বললে, লেক সুপিরিয়র-যের মাঝখান থেকে সে দেখেছে আশ্চর্য সেই যন্ত্রযানকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে দুটো খবরকে খাপ খাওয়ানো যায় না কোনমতে। প্রথমজন যন্ত্রযানকে দেখেছে ছাব্বিশে জুন বিকেলবেলা। দ্বিতীয়জন দেখেছে সেইদিনই রাত্রিতে। দুটো জায়গার ব্যবধান প্রায় আটশ মাইল। প্রচণ্ড গতিবেগে ছুটলেও অভিনব মোটর গাড়ি মাঝের এতগুলো জনপদ পেরিয়ে গেল কি অদৃশ্যভাবে? কারো চোখে পড়ল না? আরকানসাস, মিসৌরী, আওয়া, উইসকনসিন-যের এ প্রান্তে ঢুকে ও প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গেল, অথচ আমাদের কোনো গোয়েন্দার চোখে পড়ল না, হুজুগে লোকরাও তিলকে তাল বানিয়ে গুজব ছড়ালো না, টেলিফোন মারফৎ ছিটেফোঁটা খবরও এল না?

উপর্যুপরি দুবার আটশ মাইল ব্যবধানে দর্শনদান করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল আজব যন্ত্রযান। আবার ঝিমিয়ে পড়ল সবাই। গরম-গরম খবর নেই, চনমনে গুজব নেই, উত্তেজনাও নেই। মিস্টার ওয়ার্ড কিন্তু উড়োখবরের পেছনে আমাকে ছুটতে দিলেন না। সদলবলে আমরা বসে রইলাম তাঁর হুকুমের প্রতীক্ষায়।

দেখা না দিলেও মার্ভেলাস মেশিন যে নিশ্চিহ্ন হয় নি—তা আঁচ করা গেল প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে। সুতরাং কিছু একটা করা দরকার। মেশিন মালিক যখন বহাল তবিয়তে বিদ্যমান, তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায় একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তি বেরোলো যুক্তরাষ্ট্রের সবকটা খবরের কাগজে তেসরা জুলাই সকালবেলা। খবরের কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল কাট ছাঁট ভাষায় লেখা নীচের ইস্তাহারটি ঃ

"এ-বছরের এপ্রিল মাসে একটা মোটরগাড়ী পেনসিলভানিয়া, কেনটাকি, ওহিও, টেনেসী, মিশৌরী, ইলিনয়ের রাজপথ পরিক্রমা করেছিল। সাতাশে মে আমেরিকান অটোমোবাইল ক্লাব আয়োজিত উইসকনসিন মোটররেসের রাস্তায় গাড়ীটা ফের দেখা দিয়েছিল। তারপর থেকে এ-গাড়ী আর কোনো রাস্তায় দেখা যায় নি।

"জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে নিউ ইংল্যাণ্ডের উপকূলে (কেপ কর্ড আর কেপ সেবলের মাঝামাঝি জায়গায়) এবং বিশেষ করে বোসটনের ধারে কাছে দুর্দান্ত স্পীডে জলক্রীড়া করেছিল একটা বোট। সেই থেকেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বোটটা।

"ঐ মাসেরই শেষের দিকে একটা সাবমেরিন-বোট ক্যানসাসের লেক কিরডালের জলের তলা দিয়ে ভীষণ বেগে ছুটোছুটি করেছিল। সাবমেরিনের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি এরপর থেকে।

"লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে, একই আবিষ্কারক তিনটে যন্ত্রযান বানিয়েছেন। অথবা তিনটে যন্ত্রযানই আসলে একটাই যন্ত্রযান। এমনভাবে তৈরী হয়েছে যাতে জলে স্থলে সমানে চলে।

"যন্ত্রযানটার দখল নেওয়ার অভিপ্রায়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে যন্ত্রযান-উদ্ভাবকের সমীপে।

"গভর্ণমেণ্টের অনুরোধ, তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেন। প্রকাশ্যে আবির্ভূত হন। কি সর্তে যন্ত্রযান গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলে দেবেন, তা গভর্ণমেণ্টকে জানান। আরও অনুরোধ, তিনি যেন অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনস্থ ফেডারাল পুলিশ দপ্তরে এই বিজ্ঞপ্তির জবাব পাঠিয়ে দেন।"

সব কটা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হল চাঞ্চল্যকর এই বিজ্ঞপ্তি। যন্ত্রযান-স্রষ্টা যেই হোন না কেন, এ-বিজ্ঞপ্তি তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই পড়েছেন তিনি। বিজ্ঞপ্তির সোজা আবেদনের সোজা উত্তর না দিয়েও পারবেন না। উত্তর না দেওয়ারও তো কোন কারণ নেই। গভর্ণমেণ্ট কোনো সর্ত রাখেন নি। নিঃসর্ত প্রস্তাবের জবাব আসবেই আসবে। দুদিন আগে আর পরে।

জনসাধারণের কৌতূহল এবার তুঙ্গে পৌছোলো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাতারে কাতারে লোক উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুলিশ দপ্তরের সামনে। অজ্ঞাত নামা আবিষ্কারক কি অজ্ঞাতবাস ত্যাগ করলেন? চিঠি এসেছে? টেলিগ্রামও আসেনি? বাঘা বাঘা রিপোর্টাররা হাজির রইল পুলিশ অফিসের সামনে। আশ্চর্য যন্ত্রযানের অত্যাশ্চর্য মালিকের চিঠি যে-দৈনিক সর্বাগ্রে ছাপবে, একলাফে বৃদ্ধি পাবে তার মান-সম্মান-কাটতি! বিখ্যাত চিঠির ঐতিহাসিক বয়ান ছেপে বড়লোক হয়ে যাবে রাতারাতি। নিদেন পক্ষে অনাবিষ্কৃত অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম ধামটিও তো জানা যাবে! তার দামই বা কম কী? গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে দরকষাকষি করতে চান রহস্যঘেরা মানুষটা—এ খবর ছাপতে পারলে তো আর কথাই নেই! আমেরিকা দেশটা এমন একটা দেশ যেখানে অত্যাশ্চর্য বিষয়কে অত্যাশ্চর্য দৃষ্টি দিয়েই দেখা হয়। সোজা কথায় নজর সেখানে ছোট নয়। কোটি মুদ্রারও যদি দরকার হয় আবিষ্কারের দখল নিতে—অভাব ঘটবে না কখনো। প্রয়োজন হলে যুক্তরাষ্ট্রের সব কজন কোটিপতি কোষাগারের দরজা খুলে দেবেন—বস্তা বস্তা টাকা তুলে দেবেন গভর্ণমেণ্টের ঘরে! দামী জিনিসের দাম কিভাবে দিতে হয়, আমেরিকা তা জানে!

বিজ্ঞপ্তি বেরোলো সকালে। সারাদিন কাটল অধীর আগ্রহে। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠল জনসাধারণ। চব্বিশটা ঘণ্টাও যেন আর কাটতে চায় না! এক-একটা ঘণ্টা আবার ষাট মিনিট লম্বা! ফুরোতে যেন আর চায় না! কিন্তু না এল জবাব, না চিঠি, না টেলিগ্রাম! কাটল বিনিদ্র রজনী—ভোরেও এল না উত্তর। পরের দিনও কাটল একইভাবে—তারপরের দিনও নিরুত্তর রইলেন আশ্চর্য আবিষ্কারের মালিক। বিজ্ঞপ্তির অন্য একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অন্য মহাদেশেও। সমুদ্রের তলা দিয়ে পাতা টেলিগ্রাফ তারের মধ্যে দিয়ে খবর পেঁছে গেল ইউরোপে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে ডাক দিয়েছেন অজ্ঞাত উদ্ভাবককে। 'প্রবীণ দুনিয়া'র বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারর তো এরপর বসে থাকতে পারেন না। তাঁরাও উঠে পড়ে লাগলেন উদ্ভাবকের মাথা পর্যন্ত কিনে নেওয়ার জন্যে। ওয়াণ্ডারফুল মেশিন তাঁদেরও চাই বই কি। যে-মেশিনের এত সুবিধে, তার মালিকানার জন্যে লড়তেও রাজী তাঁরা। লক্ষ মুদ্রার প্রতিযোগিতায় তারা পেছিয়ে যাবেন? কক্ষনো নয়।

সংক্ষেপে, 'প্রবীণ দুনিয়া'র সব কটা শক্তিশালী রাষ্ট্র কোমর বেঁধে লাগলেন মেশিনের স্বত্ব কেনার প্রতিযোগিতায়। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ইটালি, অস্ট্রিয়া, জার্মানী—কেউ বাদ গেলেন না। যাঁদের অর্থবল কম, একমাত্র সেই সব

রাষ্ট্রই রইলেন দূরে। এঁরা শক্তির দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র নন। দর হাঁকার ক্ষমতাও কম। কাজেই দুদিন যেতে না যেতেই ইউরোপের খবরের কাগজগুলোতেও যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাপা হল। অসাধারণ 'ড্রাইভার' রাজী হলেই হল। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনীরাও ম্লান হয়ে যাবেন তাঁর ধনসম্পদের কাছে। রাতারাতি তিনি বড়লোক হবেন রথসচাইল্ড, মরগ্যান, অ্যাসটর, গোল্ড, ভ্যানডারবিল্টদের চেয়েও। মুখ থেকে সম্মতিটা খসালেই টাকার সমুদ্রে সাঁতার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে 'খন।

এত কাণ্ডর পরেও টুঁ শব্দটি শোনা গেল না রহস্যাবৃত উদ্ভাবকের তরফ থেকে। তখন শুরু হল দর হাঁকার রেষারেষি। টাকার লোভ দেখিয়ে আবিষ্কারের গুহ্যতত্ত্ব ধরে নেওয়ার হিড়িক আরম্ভ হল দেশে দেশে। সারা দুনিয়াটা যেন একটা বাজারে পরিণত হল। ভূগোলক নয়, যেন একটা প্রকাণ্ড নীলাম ঘর। হাঁকের পর হাঁক, ডাকের পর ডাক—সে কি কাণ্ড! এ জাতীয় নীলাম ডাকার ঘটনা ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। দিনে দুবার খবরের কাগজগুলো বড় বড় অক্ষরে ছাপতে লাগল নতুন নতুন দাম—এক একলাফে দর চড়তে লাগল। লক্ষ মুদ্রার কমে কোনো হাঁক নেই। রেষারেষি শেষ হল যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের শেষ দর শোনবার পর। স্মরণীয় অধিবেশনে ভোট নেওয়া হল। স্থির হল, ২ কোটি ডলার দরে কেনা হোক যন্ত্রযানের স্বত্ব। যুক্তরাষ্ট্রের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে তিলমাত্র প্রতিবাদ শোনা গেল না এত টাকা দিয়ে একটিমাত্র মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত শুনে। এ মেশিন সাধারণ মেশিন নয়—সুতরাং দামটিও অসাধারণ হবে বই কি। অন্তত আমি বেশ জোর দিয়েই বললুম বুড়ো দাসাকে—'ও মেশিনের দাম ২ কোটি ডলারের অনেক বেশী।'

অন্যান্য রাষ্ট্র অবশ্য অতখানি গুরুত্ব দিতে রাজী হয় নি মেশিনকে। দামের বহর শুনেই তা বোঝা গেল। দু কোটি ডলারের ধারে কাছেও আসতে পারলেন না কেউ। না পেরে সুর পালটালো 'প্রাচীন পৃথিবীর' সংবাদপত্ররা। এ কী বিড়ম্বনা! খামোকা খোলামকুচির মত টাকা ছড়ানোর চাইতেও বড় কথা হল বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অযথা কেন এই বৈরী মনোভাব? লড়াইটা কাকে নিয়ে? মেশিন স্রষ্টাকে নিয়ে তো? আদতে সে কী আছে? নেই! সব ভুয়ো। আমেরিকার কাগজগুলোর গল্প কথা। দূর! দূর! খামোকা এত নাচানাচির কোনো মানে হয়?

এইভাবেই কাটতে লাগল একটার পর একটা দিন। আশ্চর্য মানুষটি নিজেও আবির্ভূত হলেন না—উত্তরও পাঠালেন না। মেশিনকেও আর দেখা

গেল না। আমি আস্তে আস্তে হতাশ হয়ে পড়তে লাগলাম। বুঝলাম, ভাগ্য বিরূপ। সাফল্য এবারেও নাগালের বাইরে।

এরপরেই, পনেরোই জুলাই সকালবেলা পুলিশ দপ্তরের চিঠির বাক্সে একটা চিঠি পাওয়া গেল। খামের বুকে ডাকঘরের ছাপ নেই। কর্তৃপক্ষ চিঠি পড়লেন এবং তক্ষুনি ওয়াশিংটন দৈনিকগুলোয় পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিটায় হুবহু অনুলিপি ছাপা হল খবরের কাগজগুলোর বিশেষ সংস্করণে।

চিঠিটা এই—

(৯) দ্বিতীয় চিঠি

টেরর-য়ের ডেক

জুলাই ১৫

"প্রাচীন এবং নবীন পৃথিবীর উদ্দেশে,

"ইউরোপের বিভিন্ন রাস্ট্র থেকে অনেক প্রস্তাব পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাস্ট্র সরকারও অনুরূপ প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। আমার উত্তর একটা-ই। তা এই :—

"আমার আবিষ্কারের যে ক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়েছে, আমি তা প্রত্যাখ্যান করছি। দর কষাকষির কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

"আমার যন্ত্রের দখল নেওয়ার অধিকার কারো নেই, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়ান, আমেরিকান, অস্ট্রিয়ান, ইংলিশ কারও ভোগে লাগতে দেব না এ মেশিন।

"আমার আবিষ্কার আমারই থাকবে। যখন খুশী যে ভাবে খুশী কাজে লাগাব।

"এই মেশিনের দৌলতে তামাম দুনিয়াকে আমি অঙ্গুলি হেলনে ওঠবোস করাবো। আমাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীর মানুষের নেই—কোনো অবস্থাতেই নেই।

"আমাকে গ্রেপ্তার বা আমার গতিরোধ করবার চেষ্টায় কোনো লাভ হবে না। বৃথা চেষ্টা। অসম্ভব প্রচেষ্টা। আমার গায়ে কেউ আঁচড় দেওয়ারও চেষ্টা করলে একশগুণ ক্ষয়ক্ষতির জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি এক কথার মানুষ। কথার নড়চড় হবে না।

"টাকায় আমি পদাঘাত করি! টাকার দরকার নেই আমার। যেদিন দরকার হবে, হাত বাড়ালেই মুঠোয় এসে পড়বে কোটি কোটি মুদ্রা!

"প্রাচীন এবং নবীন পৃথিবীর রাষ্ট্র কর্ণধাররা এ-টুকু যেন বোঝেন যে আমার কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই, কিন্তু তাঁদের সর্বনাশ করার ক্ষমতা আমার আছে। যা খুশী করতে পারি আমি—বাধা দেবার শক্তি হুনিয়ার কারো নেই!

"চিঠি সই করছি সেই ভাবেই

মাস্টার অফ্‌দি ওয়ার্ল্ড

(১০) আইনের আওতার বাইরে

একা চিঠি! চিঠির বয়ান যে অতিশয় উদ্ধত! দাম্ভিক আবিষ্কারক সদম্ভে জানিয়েছেন কি তাঁর অভিপ্রায়। ছত্রে ছত্রে বিচ্ছুরিত হয়েছে তার অপরিমেয় শক্তির অহমিকা।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিটা চিঠির বাক্সে কে ফেলে গেল সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে, সে রহস্য কিন্তু জানা গেল না।

পুলিশ দপ্তরের সামনের ফুটপাতে সারা রাত্রি লোক দাঁড়িয়েছিল। ক্ষণেকের জন্যেও তো ফাঁকা হয়নি। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত পিল পিল করে এসেছে উৎসুক জনসাধারণ। প্রশ্নবর্ষণে অতিষ্ঠ করে মেরেছে পুলিশকে। নিজেরাই কনুই গুঁতোগুঁতি করেছে, কৌতূহলে ফেটে পড়েছে, উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে থেকেছে। ভীড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে নিশ্চয় টেরর অর্থাৎ 'আতংক' যন্ত্রযানের মহানায়ক পত্র-বোমাটি নিক্ষেপ করে গেছেন চিঠির বাক্সে। সে রাতে আকাশে চাঁদ ছিল না, তাবার আলো পর্যন্ত রাস্তায় পৌঁছোয় নি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে টুপ করে একটা খাম ফেলে যাওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

আগেই বলেছি চিঠিটা ব্লক করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশের যাবতীয় সংবাদপত্রে।

এ-ধরনের চিঠি এলে সাধারণতঃ সবাই ধরে নেয়, নিশ্চয় কেউ ফাজলামি করছে। চিঠির মারফৎ রঙ্গব্যঙ্গ জুড়েছে। উড়ো চিঠি পেয়ে আমার মনেও জেগেছিল এই জাতীয় প্রতিক্রিয়া। তাই আমি পাত্তা দিইনি হুমকিকে।

কিন্তু এ-চিঠির প্রতিক্রিয়া হল ঠিক তার উল্টো। ওয়াশিংটন থেকে আরম্ভ করে তাবৎ আমেরিকার জনগণ একবাক্যে বললে—এ-চিঠি রসিক ব্যক্তির রসিকতা নয়। দু'একজন ট্যাফু করতে গিয়েছিল। বলেছিল, আরে ছোঃ! ফাজিলের ফাজলামি নিয়ে মাথা গরম কেউ করে? দেশসুদ্ধ লোক সেই

মুষ্টিমেয় ক'জনকে এমনভাবে তেড়ে গেল যে তারা ভয়ের চোটে বোবা হয়ে গেল। সবার মুখেই শোনা গেল একই কথা, এ-চিঠি ফক্কড়ের চিঠি নয়। চিঠির সুর অন্যরকম, রচনাশৈলী সিরিয়াস, ভাষায় গাম্ভীর্য আছে—লঘুতা নেই। ধরা ছোঁওয়ার বাইরে যে মেশিন, তাঁর আবিষ্কর্তা ছাড়া এ-চিঠি লেখার সাহস আর কারো নেই। অকাট্য যুক্তি! কথাগুলো মনে ধবার আরো অনেক কারণ আছে। গোড়া থেকেই ঘটনা পরম্পরা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেছে, আবিষ্কর্তার মনের গড়ন আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা। এক কথায় ভদ্রলোকের চবিত্রটি সত্যিই অদ্ভুত অস্বাভাবিক। আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটেছে, কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। কিন্তু এই একটি চিঠি থেকেই আঁচ করা যায় অদ্ভুত ঘটনাগুলো কেন অমন অদ্ভুত ভাবে ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেকেই একবাক্যে মেনে নিলে, আবিষ্কতাব লুকোচুবিব মূল উদ্দেশ্যটি কি। তিনি গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছেন শুধু পরবর্তী ঘটনায় আবো চমকপ্রদ ভাবে জন সমক্ষে বিজ্ঞাপিত হওযাব জন্যে। বিশ্বসুদ্ধ লোককে ক্ষণে ক্ষণে চমকে দেওযার জন্যে। দুর্ঘটনায তিনি মরেন নি—পুলিশেব জানা নেই এমনি অজ্ঞাত একটা ঘাঁটিতে আত্মগোপন কবে থেকেছেন। তারপব জাঁকিযে হাজিব হয়েছেন বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে অত্যদ্ভুদ ঐ চিঠি রচনা কবে। ডাকবাক্সে চিঠি ফেললে পাছে তাঁর ঠিকানা জেনে ফেলে পুলিশ, তাই সশবীবে হাজিব হযেছেন পুলিশ দপ্তরের সামনে। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে অনুবোধ কবেছিলেন, ওয়াশিংটনস্থ পুলিশ দপ্তবে তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করেন। অবশ্যই তিনি করেছেন—ঐ চিঠিখানিই তাব প্রমাণ।

পত্র-লেখকেব উদ্দেশ্য ছিল হযত জগৎ জোড়া হুলুস্থুল ফেলা। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে অক্ষরে অক্ষবে। খবরের কাগজ খুলেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল দেশশুদ্ধ লোকের। নিজের চোখকেও যেন কেউ বিশ্বাস কবতে পাবলনা! বারবার পড়েও মনে হল চোখের ভুল অথবা মাথাব গোলমাল!

আমার কথাই আমি বলি। খববেব কাগজের পাতায হুবহু ব্লক করে ছাপানো চিঠিব প্রতিটি পংক্তি খুঁটিয়ে খুটিয়ে পড়লাম। হাতের লেখার ধবনটা কুটিল এবং কড়া। পবিহাসের বাষ্পও নেই। হাতের লেখা দেখে লোকচরিত্র অধ্যযনে যাঁরা পোক্ত, তাঁরা একনজরেই বলবেন পত্রলেখক অসামাজিক, দৃঢ় চরিত্র এবং অতিশয জাঁহাবাজ ও কড়ামেজাজী। আচমকা অস্ফুট চীৎকার বেরিযে এল গলা দিয়ে—কপাল ভালো বুড়ি দাসী শুনতে পায়নি। কী সর্বনাশ! সাদৃশ্যটা প্রথম দর্শনেই বোঝা উচিত ছিল! গ্রেট আইরার হুমকি পত্র যে-হাতে লেখা, এই চিঠিও লেখা হয়েছে সেই হাতে!

মনে পড়ল মরগানটন থেকে লেখা উড়ো চিঠির স্বাক্ষরকারী স্বাক্ষরের পরিবর্তে শুধু লিখেছিলেন—এম, ও, ডব্লিউ—অর্থাৎ মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড—দুনিয়ার মালিক!

দ্বিতীয় চিঠি লেখা হয়েছে কোথা থেকে? না, 'আতংক'র ডেক থেকে। তৈরব অর্থাৎ 'আতংক' তাহলে ত্রিরূপী সেই যন্ত্রযানের নাম? পত্র লেখক সেই যন্ত্রযানের রহস্যাবৃত ক্যাপ্টেন? এম, ও, ডব্লিউ—তারই উপাধির আদ্যাক্ষর? গ্রেট আইরীর ছায়া না মাড়ানোর হুমকি ইনি-ই দিয়েছিলেন আমাকে? বলেছিলেন ফের যদি গ্রেট আইরীকে ঘাটাতে যাই, ফলাফলটা ভাল হবে না!

টেবিলের ড্রয়ার থেকে তৎক্ষণাৎ প্রথম চিঠিটা বের করলাম। দ্বিতীয় চিঠির পাশে রেখে মিলিয়ে দেখলাম। না, কোনো সন্দেহ নেই। অদ্ভুত হস্তাক্ষরটা একজনেরই—মিস্টিরিয়াস মেশিনের মিস্টিরিয়াস ক্যাপ্টেনের! ফ্যানটাসটিক মেশিনের আবিষ্কর্তার!

তুফান বেগে চিন্তার ট্রেন ছুটল মগজের কোষে কোষে। দুটো চিঠি থেকে সিদ্ধান্ত একটাই দাঁড়ায়। অস্থির আগ্রহে আমি উপনীত হলাম সেই সিদ্ধান্তে। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত আমি ছাড়া আর কারো মাথায় আসবেনা। কেননা একমাত্র আমিই পেয়েছি প্রথম চিঠিটা—আর কেউ নয়। প্রাণনাশের হুমকি দেখিয়েছিলেন আমাকে এক ব্যক্তি, এখন দেখা যাচ্ছে সেই ব্যক্তি 'আতংক' নামক যন্ত্রযানের কম্যাণ্ডার। সার্থক নাম আতংক! মনকে জিজ্ঞেস করলাম, এরপর তদন্ত শুরু করা কি অন্যায় হবে? এখন তো আর হাওয়ার ওপর তদন্ত হবে না। সূত্র এই চিঠি যুগলের মধ্যেই রয়েছে। এখন যদি গোয়েন্দা বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া যায়। এই সূত্র ধরে রহস্যের চিচিং ফাঁক করা কি খুব কঠিন? সংক্ষেপে, 'আতংক' আর গ্রেট আইরীর মধ্যে সম্পর্কটা কিসের? ব্লু-রিজ পর্বতাঞ্চলে পিলে চমকানো ঘটনাবলীর সঙ্গে ফ্যানটাসটিক মেশিনের লোমহর্ষক ঘটনা পরম্পরার যোগসূত্রটি কোথায়?

আমি তো জানি, এরপর আমার কি করা উচিত। চিঠি খানা পকেটে পুরলাম। ছুটে গেলাম পুলিশ দপ্তরে। খবর নিয়ে জানলাম, মিস্টার ওয়ার্ড ঘরেই আছেন। ঘরে ঢুকে দেখি উনি মূল চিঠিটা টেবিলে মেলে স্থির হয়ে বসে আছেন—খবরের কাগজে ছাপা চিঠি নয়।

আমাকে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুললেন চীফ।

বললেন—"ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে—যেন বিরাট খবর এনেছো।"

"দেখলেই বুঝবেন" বলে প্রথম চিঠিখানা পকেট থেকে বের করে রাখলাম তাঁর সামনে।

মিস্টার ওয়ার্ড চিঠিখানা তুলে নিলেন। একবার দেখেই শুধোলেন "কী এটা?"

"দেখতেই পাচ্ছেন, শুধু তিনটে অক্ষর দিয়ে সইকরা একটা চিঠি।"

"কোথাকার ডাকঘরে ফেলা হয়েছিল?"

"নর্থ ক্যারোলিনার মরগানটন পোষ্ট অফিসে।"

"তুমি কবে পেয়েছো?"

"একমাস আগে তেরোই জুন।"

"তখন কি মনে হয়েছিল?"

"ঠাট্টা।"

"এখন?"

"আপনি যা মনে করছেন—তাই। চিঠিখানা খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝবেন কি বলতে চাইছি।"

ফের চিঠির ওপর ঝুঁকে পড়লেন চীফ। সতর্ক চোখ বুলিয়ে নিলেন প্রতিটি শব্দের ওপর দিয়ে।

বললেন—"তিনটে অক্ষরের সই।"

"হ্যাঁ। তিনটে অক্ষর—এম, ও, ডব্লিউ। অর্থাৎ মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড।"

"আসল চিঠি এইটা"—সামনে মেলে ধরা চিঠি তুলে দেখালেন মিস্টার ওয়ার্ড।

"দুটো চিঠিই একই হাতে লেখা না?" বললাম আমি।

"মনে হচ্ছে।"

"দেখছেন তো, গ্রেট আইরীর পাহাবাদার আমাকে কি হুমকি দেওয়া দিয়েছে।"

"প্রাণনাশের হুমকি। কিন্তু স্ট্রক, একমাস আগে চিঠি পেয়েছো। অ্যাদ্দিন দেখাওনি কেন?"

"দেখানোর যোগ্য মনে করিনি বলে। কোনো গুরুত্ব দিইনি। আজকে 'টেরর' কম্যাণ্ডারের চিঠি পড়ে মনে হল। ব্যাপারটা গুরুতর।"

"ঠিক করেছো। চিঠিখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকমত লেগে থাকলে, এই চিঠির সূত্র ধরেই আশ্চর্য লোকটার টিকি ধরে টেনে আনা যাবে।"

"আমারও তাই বিশ্বাস, মিস্টার ওয়ার্ড।"

"কিন্তু 'টেরর' আর গ্রেট আইরীর মধ্যে সম্পর্কটা কিসের?"

"জানিনা। কল্পনাও করতে পারি না।"

"সম্পর্ক একটাই আছে। যদিও তা অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব।"

"কী?"

"টেরর-য়ের আবিষ্কর্তা গ্রেট আইরীর ভেতরে মালমশলা রাখেন। যন্ত্রযান তৈরীর কারখানাও সেখানে।"

"অসম্ভব!" বললাম অসহিষ্ণু কণ্ঠে—"মালমশলা নিয়ে গেলেন কোন রাস্তায়? মেশিন তৈরী হয়ে যাবার পর বাইরে নিয়ে এলেন কোন রাস্তায়? মিস্টার ওয়ার্ড, গ্রেট আইরীর চেহারা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। আপনি যা বলছেন, তা কোনমতেই সম্ভব নয়!"

"সম্ভব হতে পারে, যদি—"

"যদি?"

"দুনিয়ার মালিক তাঁর অসাধারণ যন্ত্রযানে দুটো পাখাও লাগিয়ে থাকেন মাঝে মাঝে গ্রেট আইরীর পেটে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে!"

তাও কি সম্ভব? যে-যন্ত্র সমুদ্রের ওপর নেচে-কুঁদে বেড়িয়েছে, জলের তলায় ছুটোছুটি করে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে, সে-ই 'আতংক' আকাশের আতংকদের মত ঈগল-শকুনদের সঙ্গে পাল্লা দেবে, এ-ও কি বিশ্বাস করতে হবে? দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাই নীরবে জানিয়ে দিলাম, এ-সব আজগুবী কথাবার্তা আমি একদম বিশ্বাস করি না। মিস্টার ওয়ার্ড নিজেও যে খুব বিশ্বাস করেন, তা বুঝলাম তাঁর মুখচ্ছবি দেখে। এ-সব অলীক উদ্ভট থিওরী কল্পলোকের গল্পকথাতেই মানায়—বাস্তবে নয়।

চিঠি দুটো নিয়ে ফের মিলিয়ে দেখলেন চীফ। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে। সই দুটো বিশেষ করে যাচাই করলেন—দুটো স্বাক্ষরই যে এক ব্যক্তির, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। শুধু হাত নয়, কলম শুদ্ধ এক। একই কলমে একই হাতে লেখা চিঠি।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন মিস্টার ওয়ার্ড। তারপর বললেন—"তোমার চিঠিটা আমার কাছে থাকুক। যদিও বুঝছি না দুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্কটা কিসের। তাহলেও আমার মন বলছে, ভাগ্য তোমাকে দুটো ঘটনার সঙ্গেই জড়িয়ে দিয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দুটো ঘটনা পৃথক হলেও কোথায় যেন সুতো দিয়ে বাঁধা আছে—তুমি সেই যোগসূত্র আবিষ্কার করবে।"

"আমারও ইচ্ছে তাই, মিস্টার ওয়ার্ড। জানেন তো আগ্রহ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে এই ব্যাপারে।"

"জানি, জানি। তাই তো ফের বলছি, তৈরী থাকো। যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকো।"

সারাদিন ধরে জনসাধারণ উত্তেজনার ফেণায় বুঁদ হয়ে রইল। উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল উদ্বেগ, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা। দন্তপত্র যেন ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়েছে আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে। এতবড় স্পর্ধা আবিষ্কর্তার? দুনিয়ার মালিকের এত দম্ভ? জনমত ক্রমশঃ ফুঁসে উঠছে দেখে চিন্তিত হলেন গভর্নমেণ্ট। হোয়াইট হাউস এবং রাজধানীতে যেন ক্ষোভের ঝড় বয়ে গেল। একটা কিছু না করলেই তো নয়। মানুষ তো মারমুখো হয়ে উঠছে। কিন্তু করা দরকার বললেই তো করা যাচ্ছে না। দুনিয়ার মালিকের ঠিকানা কি? ঠিকানা পেলেও গ্রেপ্তার করার কায়দা কি হবে? দুনিয়ার মালিক নিশ্চয় ফাঁকা হুমকি শোনান নি। তার ক্ষমতার যা নমুনা পাওয়া গিয়েছে, নিশ্চয় তার বহুগুণ বেশী ক্ষমতা এখনো তাঁর কব্জার মধ্যে আছে—লোকে জানেনা। পাথর টপকে লেক কিবডালে গেলেন কি করে? বেরোলেন কিভাবে? লেক সুপিরিয়রে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বহুজনপদের ওপর দিয়ে—অথচ কেউ দেখতে পায়নি। কেন?

সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আরো গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে যত মাথা ঘুরতে লাগল, ততই গোড়া পর্যন্ত দেখার বাসনা তীব্র হল। কোটি কোটি মুদ্রায় পদাঘাত করেছেন আবিষ্কর্তা—অতএব গায়ের জোরে তাকে পাকড়াও করা হোক। স্পর্ধা তো কম নয়। টাকা দিয়ে কেনা যায় না তাকে অথবা তাঁর আবিষ্কারকে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার ধরনটাও ভ্রান্তিপূর্ণ এবং উদ্ধত। গায়ের জোর দেখিয়েছেন তো? ঠিক আছে, গায়ের জোরেই টক্কর দেওয়া যাক। শুরু হোক শক্তির লড়াই। শত্রুরূপেই এখন থেকে দেখা হোক তাঁকে। সমাজশত্রু, মানবশত্রু। কারও গায়ে আঁচড় লাগার আগেই শক্তিহীন করা হোক তাকে। মেশিন মালিক পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছেন ভেবে ত এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিলেন গভর্নমেণ্ট। এখন দেখা যাক আদা জল খেয়ে। তিনি মরেননি—বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। শুধু বেঁচে আছেন নয় তাঁর বেঁচে থাকাটাই জনগণের পক্ষে বিপজ্জনক। জনমতের চাপ এড়াতে না পেরে—নীচের ইস্তাহারটি প্রকাশিত হল সরকার থেকে

"যেহেতু 'টেরর'য়ের কম্যাণ্ডার তার আবিষ্কার প্রকাশ্যে আনতে নারাজ, যে কোনো মূল্যে বিক্রী করতে অনিচ্ছুক, এবং যেহেতু তার মেশিন জনগণের প্রভূত বিভীষিকার কারণ হতে পারে, যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় কোনমতেই, তাই 'টেরর'য়ের উক্ত কম্যাণ্ডারকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে

দেশের আইন তাঁকে রক্ষা করতে অপারগ। তাঁকে অথবা তাঁর যন্ত্রকে কয়েদ বা ধ্বংস করার যে-কোনো প্রচেষ্টা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং পুরস্কৃত হবে।"

অর্থাৎ সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা। 'জগদীশ্বর' ভদ্রলোকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চলুক সংগ্রাম। গোটা মার্কিন মুলুককে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন দুনিয়ার মালিক—এ-হল সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা!

দিন ফুরোনোর আগে ধাপে ধাপে চড়তে লাগল পুরস্কারের মাত্রা। বিভিন্ন তরফ থেকে ঘোষিত হতে লাগল একটির পর একটি পুরস্কার, বিপজ্জনক আবিষ্কর্তার গুপ্তঘাঁটির হদিশ যে দিতে পারবে, দুনিয়াধিপতির গোপন কেল্লার ঠিকানা যে বাৎলে দিতে পারবে, ভদ্রলোককে যে সনাক্ত করতে পারবে, দেশজোড়া আতংকর কারণকে যে নির্মূল করতে পারবে—মোটা টাকার পুরস্কার তাকে দেওয়া হবে।

জুলাই মাসের শেষ অর্ধাংশে পরিস্থিতি যখন এইরকম ঘোরালো, তখন ভাগ্যের হাতে সব সঁপে দেওয়া ছাড়া আর পথ রইল না। আইনভঙ্গকারী ভদ্রলোকটি এখন দণ্ডনীয় অপরাধী—আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত। সুতরাং তাকে দেখা গেলেই সবাইকে হুঁশিয়ার করতে হবে। তারপর সুযোগ মত তেড়ে গিয়ে ধরতে হবে। কিন্তু গ্রেপ্তার করাটা অত সহজ নয়। মোটরে বা বোটে আসীন থাকলে তার গাত্র স্পর্শ করার ক্ষমতাও কারো হবে না। সুতরাং প্রচণ্ড গতিবেগে উধাও হওয়ার আগেই অতর্কিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হবে—অদৃশ্য হওয়ার সুযোগ দিলে চলবে না।

সেইভাবেই তৈরী হয়ে রইলাম। মিস্টার ওয়ার্ডের হুকুম এলেই বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু হুকুম আর এলনা। আসবে কি করে? যাঁর খোঁজে বসে আছি, তিনি যে এখনো নিপাত্তা। জুলাই শেষ হয়ে এল। খবরের কাগজগুলো এখনো ঝিমিয়ে পড়েনি—জনসাধারণকে ঝিমোতে দেয়নি—সমানে তাতিয়ে রেখেছে রক্ত-গরম করা খবর ছাপিয়ে। খবর তো নেই—স্রেফ গুজব ছেপে চলেছে। অগুন্তি গুজব এই সুযোগে ছাপার অক্ষরে ঠাঁই পাচ্ছে দৈনিকগুলোয়। রোজই নাকি নতুন নতুন সূত্র পাওয়া যাচ্ছে—রহস্যের হদিশ মিলছে। সবই ভুয়ো, বোগাস, ভিত্তিহীন। গল্পবাজদের গল্পছাড়া কিছুই নয়। আসর জমানোর মৌতাতী কাহিনী। রোজই গাদা গাদা টেলিগ্রাম আসছে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে সারা আমেরিকা থেকে। কেউ এক খবর দিচ্ছে না। একজন যা বলছে, ঠিক তার বিপরীত বলছে আরেকজন—খবরে খবরে কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে—মিথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে প্রত্যেকটা টেলিগ্রাম।

পুরস্কারের পাহাড় বৃথাই গেল—ফল পাওয়া গেলনা। বৃদ্ধি পেল কেবল গাল-মন্দ, দোষারোপ এবং ভুলভ্রান্তি। ধূলি-মেঘ দেখলেই দেশশুদ্ধ লোক কখনো বলল—শয়তানের শকট। শয়তানের শকট! আবার কখনো চেঁচামেচি শোনা গেল লেকের জলে ঢেউ উঠলেই। আমেরিকার হাজার হাজার সরোবরের যে-কোনো কারণে তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা গেলেই আর রক্ষে নেই। হৈ চৈ উঠত সারা তল্লাটে—'আতংক। আতংক!' জনগণ অতি উত্তেজিত থাকলে এইরকমই হয়। অপচ্ছায়া কল্পনায় ধাবিত হয়।

অবশেষে একটা টেলিফোন পেলাম উনত্রিশে জুলাই। অবিলম্বে ডেকে পাঠিয়েছেন মিস্টার ওয়ার্ড।

ঘরে ঢুকতেই উনি বললেন—"স্ট্রক, এক ঘন্টার মধ্যে বেরোতে হবে।"

"কোথায়?"

"টোলেডো।"

"আতংক-কে দেখা গেছে?"

"হ্যাঁ। টোলেডো পৌঁছোলে চূড়ান্ত নির্দেশ পাবে।"

"এক ঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ছি দলবল নিয়ে।"

"স্ট্রক, আমার অফিসিয়াল হুকুমটা এবার শোনো।"

"বলুন, স্যার?"

"এবার সফল হতেই হবে।"

(১১) অভিযান

বটে! ধরাছোঁওয়ার বাইরে যিনি, অশরীরীর মতই যিনি বিদ্যমান অথচ নাগালের বাইরে—মহামান্য সেই কম্যাণ্ডার আবার আবির্ভূত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে। ভদ্রলোককে কদাচ ইউরোপের স্থলপথে বা জলপথে দেখা যায় নি। আটলান্টিক পেরোতে তাঁর তিন দিন লাগে, কিন্তু কখনো সে চেষ্টা করেন নি। মতলবটা কী? শুধু আমেরিকার ওপরেই তম্বি করা! ভদ্রলোক কি তাহলে নিজেই আমেরিকান?

শেষ সিদ্ধান্তটা মন থেকে তাড়াতে পারলাম না। প্রাচীন আর নবীন পৃথিবীর মাঝে রয়েছে বিশাল জলধি—এ মেশিন তা অতিক্রম করতে পারে অবলীলাক্রমে। বিশ্বের কোনো জাহাজ অত বেগে ছুটতে পারবে না। আরো সুবিধে আছে। ঝড়জলের ভয়ও নেই। 'আতংক' যাবে জলের

তলা দিয়ে—মামুলী জাহাজের মত জলে ভাসতে যাবে কেন? সুতরাং নির্বিঘ্নে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া একমাত্র 'আতংক'র পক্ষেই সম্ভব। মাত্র কয়েক ফুট জলের তলা দিয়ে গেলে তুফান তার গায়ে আঁচড় কাটতে পারবে না।

তা সত্ত্বেও কেন আমেরিকার মাটি ছেড়ে ইউরোপে পাড়ি জমান নি বিস্ময়কর এই আবিষ্কারক? কেন তিনি ফের দেখা দিয়েছেন ওহিও-র নগরী টোলেডো-তে? আমেরিকার মাটিতেই গ্রেপ্তার হবার বাসনা নাকি?

এইবার কিন্তু আর হৈ-চৈ শোনা গেল না। আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয় হয়েছিল যাতে খবরটা চর মারফৎ গোপনে পুলিশ দপ্তরে পৌঁছোয় এবং কাকপক্ষীও না জানতে পারে। আমি চলেছি সেই চরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে। দৈনিক সংবাদপত্রগুলো লুফে নিয়ে এ খবর ছাপত, টাকা ঢালত জলের মত। কিন্তু পুলিশ পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখল—কেউ জানতেও পারল না 'আতংক' ফের আবির্ভূত হয়েছে। জানবেও না—তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কানাঘুসো পর্যন্ত শোনা যাবে না। আমি বা আমার দোসররা মুখে চাবী এঁটে রাখবো শেষ পর্যন্ত।

মিস্টার ওয়ার্ডের হুকুমনামা নিয়ে যাঁর কাছে যাচ্ছি, তার নাম আর্থার ওয়েলস। টোলেডো'তে বসে রয়েছে আমাদের প্রতীক্ষায়। টোলেডো শহরটা লেক আরীর পশ্চিম পাড়ে গড়ে উঠেছে। সমস্ত রাত ধরে ট্রেন ছুটে চলল পশ্চিম ভার্জিনিয়া আর ওহিও-র বুক চিরে। এক মুহূর্ত দেরী না করে পরের দিন দুপুর নাগাদ টোলেডো গিয়ে দম নিতে লাগল মেল ট্রেন।

পকেটে গুলিভরা রিভলবার আর হাতে ঝোলাব্যাগ নিয়ে নামলাম আমি, জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার। অস্ত্রের দরকার আছে বইকি। আক্রমণ শুরু হলে আত্মরক্ষা করতে হবে অথবা আক্রমণ করবার জন্যেও রিভলবার প্রয়োজন হবে। ট্রেন থেকে নামতে না নামতেই দেখা হল আর্থার ওয়েলসের সঙ্গে। আমার মতই উদ্বিগ্ন এবং অস্থির চরণে সে প্ল্যাটফর্মের প্রতিটি যাত্রীর মুখ দেখছিল আমাকে দেখার আশা নিয়ে।

কাছে গেলাম। বললাম—"মিস্টার ওয়েলস?"

"মিস্টার স্ট্রক?" শুধোলো আর্থার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে।

"হ্যাঁ।"

"হুকুম করুন।"

"টোলেডো-তে রাত কাটাবো কি?"

"না, অবশ্য যদি আপনি হুকুম দেন। স্টেশনের বাইরে দু-ঘোড়ায় টানা

গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কালবিলম্ব না করে রওনা হতে চাই গন্তব্যস্থানের দিকে।"

"তাই চলুন। খুব দূরে নাকি?"

"বিশ মাইল।"

"কি নাম জায়গাটার?"

"ব্ল্যাক রক ক্রীক।"

ঝোলা ব্যাগ একটা হোটেলে জমা দিয়ে চললাম গাড়ী হাঁকিয়ে। অবাক হলাম খাবার-দাবারের পরিমাণ দেখে। বসবার জায়গার তলায় বেশ কয়েক-দিনের মত রসদ সাজানো রয়েছে। মিস্টার ওয়েলসের মুখে শুনলাম, ব্ল্যাক রক ক্রীক জায়গাটা বনজঙ্গল পাহাড়পর্বত ঘেরা। প্রকৃতির উদ্দাম আলয়। ধীবর বা কৃষকদের আকৃষ্ট করার মত কিছুই নেই। খিদে পেলে সরাইখানা বা ঘুম পেলে শোবার ঘর পছন্দ পাবো না বাগুয়ায়। সৌভাগ্যক্রমে জুলাই মাসে গরম কম থাকে। তাই খোলা আকাশের তলায় ঘুমোলে ক্ষতি নেই।

তার চেয়েও বড় কথা, যদি জয়যুক্ত হই, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সাঙ্গ হবে অভিযান পর্ব। হয় আতংক অধিপতি সতর্ক হওয়ার আগেই হাতকড়া পরবেন, না হয় এমন বেগে চম্পট দেবেন যে মুখ চুন করে ফিরে আসা ছাড়া আর পথ থাকবে না।

আর্থার ওয়েলসের বয়স প্রায় চল্লিশ। বিরাট এবং বলিষ্ঠ চেহারা। তার সুনাম আগেও শুনেছি। স্থানীয় পুলিশ চরদের মধ্যে এরকম দুঁদে লোক দুটি নেই। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, সহস্র ঝঞ্ঝাটেও ঝাঁপিয়ে পড়ার মনোবলের কখনো অভাব হয় না। বহু ব্যাপারে সে জীবন বিপন্ন করেছে—জয়ের মুকুট ছিনিয়ে এনেছে। টোলেডো গিয়েছিল একেবারে অন্য ধাঁচের কাজ হাতে নিয়ে। ভাগ্যক্রমে আতংক-র খবর পেয়ে গেছে।

লেক আইরীর পাড় বরাবর ছুটে চললাম দক্ষিণ পশ্চিমে। জলের এই দ্বীপ সমুদ্রের একদিকে কানাডা, আরেক দিকে ওহিও, পেনসিলভানিয়া, নিউইয়র্ক স্টেট। যে ঘটনা বলতে যাচ্ছি, তা মনের চোখে দেখতে গেলে হ্রদটির ভৌগোলিক অবস্থান, গভীরতা, বিস্তার এবং নিকটবর্তী অন্যান্য জলাশয়ের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

প্রায় দশ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে লেক আইরী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ছ'হাজার ফুটের মত। পশ্চিম অঞ্চলের আরো বড় বড় হ্রদের জলরাশি ডেট্রয়েট নদী বাহিত হয়ে এসে পড়ে এ-লেকে। লেক আইরীর নিজের নদীও আছে—যদিও কম গুরুত্বপূর্ণ। ব্ল্যাক, রকি আর কুয়া হোগা

তাদের নাম। উত্তর-পূব দিকে লেক ওনটারিও তে এ-লেকের জল ভীমগর্জনে আছড়ে পড়ছে বিশ্ববিখ্যাত নায়গারা নদী আর জলপ্রপাতের আকারে।

লেক আইরীর সর্বোচ্চ গভীরতা যদ্দুর জানা গেছে, একশ তিরিশ ফুট। তার মানে, এ-লেকের জলের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। সংক্ষেপে, জমকাল হ্রদ যদি কোথাও থাকে, তা এখানে—এই স্টেটে। স্থলভাগ যদিও খুব উত্তর-ঘেঁষা নয়, তাহলেও সুমেরুর হিমেল হাওয়া দাপট হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। উত্তর দিকের জমি ঈষৎ নীচু থাকায় সুমেরু বায়ু শৈত্যরূপী দৈত্যের মত ভীমবেগে বেয়ে আসে। শীতের কামড় মানুষ সহ্য করতে পারলেও জল পারে না। লেক আইরীর জল জমে বরফ হয়ে যায়। এ পাড় থেকে ও পাড় পর্যন্ত বরফ ছাড়া কিছু দেখা যায় না।

বিরাট সরোবরের কিনারা বরাবর গড়ে উঠেছে বহু জনপদ। নাম করা শহর বলতে পূবের বাফেলো নগর নিউইয়র্ক স্টেটের অন্তর্গত, পশ্চিমের টোলেডো নগরী ওহিও স্টেটের অন্তর্গত। দক্ষিণের ক্লেভল্যাণ্ড এবং স্যানডাসকি নগরীও ওহিও স্টেটের অন্তর্গত। এ ছাড়াও রয়েছে তীর বরাবর এত গ্রাম আর ছোট শহর আছে যে গুনে শেষ করা যায় না। যানবাহনের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেশী। বাৎসরিক আয় প্রায় বিশ লক্ষ ডলার

লেকের পাড় দিয়ে একটা অপরিসর, অসমতল এবং পার্বত্য রাস্তা বেয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল আমাদের ঘোড়ার গাড়ী। যেতে যেতে আর্থার ওয়েলস বললে, সে কি দেখেছে এবং কি শুনেছে।

দিন দুয়েক আগে, সাতাশে জুলাই অপরাহ্নে, ঘোড়ায় চেপে হাল শহরের দিকে যাচ্ছিল ওয়েলস। শহর তখনো পাঁচ মাইল দূরে, বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ওয়েলস। আচমকা গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখলে দূরে হ্রদের জল তোলপাড় করে ভেসে উঠল এক সাবমেরিন। রাশ টেনে ধরল ওয়েলস। ঘোড়া থেকে নেমে গুঁড়ির সঙ্গে লাগাম বাঁধলে। তারপর পা টিপে-টিপে গাছের আড়ালে নিজে লুকিয়ে পৌঁছোল হ্রদের পাড়ে। গুঁড়ির গায়ে গা মিশিয়ে স্বচক্ষে দেখল অদ্ভুত গড়নের একটা ডুবো জাহাজ মরাল গতিতে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ব্ল্যাকরক ক্রীকের মোহনায়। বিস্মিত হল ওয়েলস। সারা দুনিয়া অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসেছে যার পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশায়, এই কি সেই সুবিখ্যাত যন্ত্রযান?

পাথরের কাছাকাছি আসতেই ডেকের ওপর উঠে এল দুজন পুরুষ। লাফ দিয়ে নামল পাড়ে। দু'জনের একজনের নাম কি মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড? লেক সুপিরিয়রে সর্বশেষ দর্শনদান দিয়ে অদৃশ্য হয়েছিলেন কি ইনিই? এই

কি সেই রহস্যকুটিল 'আতংক' যন্ত্রযান ? দীর্ঘ আত্মগোপনের পর ফের মাথা চাড়া দিয়েছে লেক আইরীর অগাধ জলরাশির তলদেশ থেকে ?

ওয়েলস বলল—"আমি একেবারে একা। ক্রীক রের মোহানায় আর কেউ নেই। আপনারা যদি তখন থাকতেন, চারজনে মিলে ওদের দুজনকে ঐখানেই চেপে ধরতাম—যন্ত্রযানে আর ফিরতে দিতাম না। সাবমেরিন পর্যন্ত দখল করতাম—পালাতে দিতাম না।

"দুজন ছাড়া আর কেউ সাবমেরিনে না থাকলেও পারতাম। দু'জনকে ধরলেও কাজ হত বিলক্ষণ। অনেক গোপন কথা আদায় করা যেত।

"দুজনের একজন 'আতংক'র ক্যাপ্টেন হলে তো আর কথাই ছিল না।"

বললাম –"ওয়েলস, ভয় করছি শুধু একটা ব্যাপারে। তুমি ক্রীক ছেড়ে আসার পর তারাও পগার পার হয়নি তো ?"

"ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সন্দেহ ভঞ্জন করা যাবে। ভগবান করুক যেন ওরা না যায় রাতের অন্ধকারে—"

"একটা কথা। রাত না হওয়া পর্যন্ত মোহানার ওপর নজর রেখেছিলে কি ?"

'না। ঘণ্টাখানেক পরে চলে এসেছিলাম। টোলেডো এসেই সটান গিয়েছিলাম টেলিগ্রাফ অফিসে, তখন রাত হয়ে গেছে। ওয়াশিংটনে খবর পাঠিয়ে তবে বাড়ী ফিরেছি।"

"তার মানে পরশু রাতে। তারপর কি ব্ল্যাক রক ক্রীকে ফের গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ।

"সাবমেরিন দেখেছিলে ?"

"একই জায়গায় ভাসছিল।'

"লোক দুটো ?"

"ছিল। সেই দুজনকেই দেখেছি। মনে হল, অ্যাকসিডেণ্টের দরুন কলকব্জা বিগড়েছে। তাই নির্জনে এসেছে নিশ্চিন্ত মনে মেশিন মেরামত করতে।"

'হতে পারে মেশিনটা হয়ত এমন ভাবে জখম হয়েছে যে সচরাচর যে সব ঘাঁটিতে গা ঢাকা দেয়, সেখানে পৌঁছোতে পারেনি। কে জানে, এখনো আছে কিনা।"

"আমার মনে হয় থাকবে। কেননা, অনেক জিনিস ডাঙায় নামিয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। ডেকের ওপরেও মনে হল ঠুকঠাক করে মেরামতি চলছে।"

"শুধু দুজনকেই দেখেছো ?"

"হ্যাঁ, দুজন। আর কেউ না।"

"কিন্তু মাত্র দুজন মানুষের পক্ষে এত জটিল যন্ত্রযান আয়ত্তে রাখা কি সম্ভব? চক্ষের নিমেষে মোটর গাড়ী হচ্ছে, সাবমেরিন হচ্ছে, ক্ষুদে জাহাজ হচ্ছে। দুজনের পক্ষে এত কাণ্ডকারখানা সামলানো কি সম্ভব?"

"মিস্টার স্ট্রক, আমারও মনে হয় দুজনের পক্ষে এত ঝক্কি সামলানো সম্ভব নয়। কিন্তু দুজন ছাড়া আমি আর কাউকেই দেখিনি। আমি যেখানে লুকিয়ে ছিলাম, বেশ কয়েকবার ওরা তার কাছাকাছি এসেছিল। কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাটে আগুন জ্বালিয়ে রাখছিল। এমনিতেই ও-তল্লাটে জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া যায় না। তার ওপর লেক থেকে ক্রীকের মোহানা চোখেও পড়ে না। সুতরাং কেউ দেখে ফেলার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ওরা তা জানে বলেই মনে হল।"

"লোক দুটোকে দেখলে আবার চিনতে পারবে তো?"

"নিশ্চয়। একজন বেশী বেঁটে নয়। বেশী ঢ্যাঙা নয়। গাঁট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ চেহারা, বেজীর মত চটপটে, গোঁফ-দাড়িতে আধখানা মুখ ঢাকা। আরেকজন আরো খর্বকায়, কিন্তু লোহাপেটা মজবুত স্বাস্থ্য। গতকাল আগের দিনের মত বিকেল পাঁচটার আগেই বন থেকে বেরিয়ে টোলেডো ফিরে এসেছিলাম। এসেই পেলাম মিস্টার ওয়ার্ডের টেলিগ্রাম। আপনার আসার খবর পেয়ে যথা সময়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম স্টেশনে।"

সার কথায় খবরটা দাড়াল তাহলে এই রকম। প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা হল, একটা সাবমেরিনকে ব্ল্যাক রক ক্রীকের মোহানায় মেশিন মেরামত করতে দেখা গিয়েছে। কে জানে, এই মেশিনকেই আমরা হন্যে হয়ে খুঁজছি কিনা। মেশিন মেরামত করা ছাড়া আর উপায় ছিল না বলেই সাবমেরিনকে ভেসে উঠতে হয়েছিল নিশ্চয়। সুতরাং আমরা গিয়ে তাকে দেখতে পাব আশা করতে পারি। কিন্তু 'আতংক' যন্ত্রযান লেক আইরীতে ঢুকল কি করে? অনেক ভেবে আমি আর আর্থার ওয়েলস ঠিক করলাম, এ-রকম জায়গাই—তো ঐরকম যন্ত্রযানের অনুকূল পরিবেশ। সর্বশেষ তাকে দেখা গিয়েছিল লেক সুপিরিয়র-য়ের জলে। সেখান থেকে লেক আইরী আসতে হলে তাকে মিচিগানের রাস্তা দিয়ে আসতে হত। কিন্তু ও-অঞ্চলের রাস্তাঘাটে দিবারাত্র কড়া নজর রেখেছে পুলিশ আর স্থানীয় জনসাধারণ। সুতরাং স্থলপথ নিরাপদ নয়। অতএব এসেছে জলপথ দিয়ে। গ্রেট লেক-য়ের অজস্র হ্রদ আর নদী রয়েছে মাঝে। জলের তলায় চুপিসারে চলবার ক্ষমতা আছে 'আতংক'-র। সুতরাং কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

ধরে নেওয়া গেল, আমরা গিয়ে দেখব, সরে পড়েছে 'আতংক'। অথবা, আমরা হানা দিলেই চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু কোন্ পথে? যে পথেই যাক না কেন, আমরা জানি তার পাছু নেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। লেক আইরীর প্রত্যন্ত প্রদেশে বাফেলো পোতাশ্রয়ে দুটো টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার অবশ্য আছে।* পুলিশদপ্তর থেকে রওনা হওয়ার আগেই খবরটা আমাকে দিয়েছিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। টর্পেডো ডেস্ট্রয়ারের কম্যাণ্ডারদের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তৈরী থাকতে বলেছিলেন—দরকার পড়লেই যেন রওনা হতে পারে। 'আতংক'র পাছু নিতে পারে। টর্পেডো ডেস্ট্রয়ারের গতিবেগ বড় কম নয়—কিন্তু 'আতংক'র কাছে খেলার নৌকো বললেই চলে! পাল্লা দেওয়াব কোনো ক্ষমতাই নেই। তারপর যদি জলে ডুব দেয় তো কিছুই আর করার থাকবেনা। আর্থারের কাছে শুনলাম, লড়াই লাগলে অনেক বেশী নাবিক আর বিস্তর কামান নিয়েও টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার কোনো কাজ দেবেনা। তার মানে, আজ রাতে যদি সফল না হই, অভিযান ব্যর্থ হবে।

এ-অঞ্চলের বনজঙ্গলে হামেশা মৃগয়া করতে আসে আর্থার ওয়েলস তাই পাহাড় জঙ্গলের পথঘাট ওর নখদর্পনে। সারা লেক-টা চোখা-চোখা পাথর দিয়ে ঘেরা। বড় বড় ঢেউ সেই পাহাড়ে আছড়ে পড়ে ফুঁসছে। সাদা ফেণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রণালীটা তিরিশ ফুট গভীর। কাজেই প্রয়োজন হলে 'আতংক' জলে ডুবে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে—ভেসেও থাকতে পারে। দু'এক জায়গায় পাথরের ফ্রেম অনুপস্থিত। বালুকা বেলা উঠে গেছে শ'দু'তিন ফুট দূরে বনের সীমানা পর্যন্ত। বালির দুপাশে প্রস্তর প্রহরী বিস্তৃত রয়েছে বন থেকে জল অবধি।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ গাড়ী জঙ্গলে পৌছোলো। দিনের আলো তখনো লেগে ছিল বনের মধ্যে, পথ চিনতে অসুবিধে হল না। হ্রদের কিনারা পর্যন্ত যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। লোক দুজন যদি এখনো থাকে, আমাদের চেহারা দেখলেই সতর্ক হবে এবং চম্পট দেবে।

বনের সীমানায় এসো তাই শুধোলাম আর্থারকে—"এবার দাঁড়াই?"

"না, মিস্টার স্ট্রক। গাড়ীটাকে গভীর জঙ্গলে রেখে আসা দরকার আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত কেউ যেন না টের পায়।"

"গাছের তলা দিয়ে গাড়ী যাবে কি?"

*যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার চুক্তি সর্ত অনুযায়ী 'গ্রেট লেকে' রণতরী রাখা হয় না। এ-দুটি হয়ত শুল্ক বিভাগের ক্ষুদে লঞ্চ।

"যাবে। খুঁটিয়ে দেখে গেছি জায়গাটা। পাঁচ ছ'শ পা গেলেই একটা খোলা চত্বর পাওয়া যাবে। ঘোড়া দুটো খাবারও পাবে, গা-ঢাকা দিয়েও থাকতে পারবে। অন্ধকার গাঢ় হলেই পাথরের আড়ালে লুকিয়ে চুরিয়ে পৌঁছে যাব জলের ধার পর্যন্ত। 'আতংক' যদি এখনো থাকে, আমরা ওদের ফিরে যাওয়ার পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়ব।"

হাত নিশপিশ করলেও ভেবে দেখলাম আর্থার ঠিক বলেছে। রাত আঁধার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। ততক্ষণ বরং গাড়ীঘোড়া লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যাক। ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চললাম গাছপালার তলা দিয়ে—খালি গাড়ীটা এল ঘোড়ার পেছনে। সুদীর্ঘ পাইন আর দানবাকৃতি ওক আর সাইপ্রেসের দৌলতে অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। পায়ের তলায় শুকনো ডালপালা, পাইন ছুঁচ আর ঝরা পাতার গালচে পাতা। মাথার ওপরে টাঙানো মহীরুহের চাঁদোয়া পড়ন্ত আলোকেও ঢেকে দিচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলেছি এগিয়ে। বার বার কাঁটায় চুল জড়ালো এবং গাছের গুঁড়িতে আছাড় খেলাম—গাড়ীর দোর বেঁকে গেল। মিনিট দশেক পরে পৌঁছোলাম ফাঁকা চত্বরে।

চত্বর জুড়ে সতেজ সবুজ ঘন ঘাসের কার্পেট বিছানো। চত্বর ঘিরে সুবিশাল গাছের সারি। অরণ্য নিকেতনের প্রাকৃতিক উঠোন বললেই চলে। আলো তখনো টিমটিম করছে সেখানে। অন্ধকার নামতে আরও ঘণ্টাখানেক বাকি। সেই ফাঁকে জিরিয়ে নেওয়া যাবে। অনেকটা পথ এসেছি চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে। পা দুটোর ব্যথা মরবে একটু বিশ্রাম নিলে।

অন্তরে যদিও উৎকণ্ঠা উপচে পড়ছিল। হ্রদের পাড়ে 'আতংককে' এক ঝলক দেখবার জন্যে আর তর সইছিল না কারোরই। সীমাহীন উদ্বেগ আর সইতে পারছিলাম না। কিন্তু অদূরদর্শী হলে তো চলবে না। আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরলেই অন্ধকারে গা ঢেকে যেতে পারব কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে। ওয়েলস গোঁ ধরে রইল এই একটি ব্যাপারে। আমিও সায় দিলাম যুক্তির সারবত্তা দেখে।

ঘোড়ার সাজ খুলে নামিয়ে রাখা হল ঘাস জমির ওপর। কোচোয়ান ওদের ঘাস খাওয়ানোর ভার নিল। একটা প্রকাণ্ড সাইপ্রেস গাছের তলায় খাবার-দাবার সাজাতে লাগল ন্যাব ওয়াকার আর জন হার্ট। নাকে ভেসে এল জঙ্গলের মন মাতানো গন্ধ। মনে পড়ে গেল, মরগানটন আর প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের বনেজঙ্গলেও পেয়েছি এমনি সুবাস। ক্ষিদের চোটে পেট জ্বলে যাচ্ছিল। তেষ্টায় ছাতি ফাটছিল। আর্থারের সুব্যবস্থায় খাদ্য এবং পানীয়—দুটিই ছিল অঢেল পরিমাণে। খাওয়া তো হল, সময় কাটাই কি করে?

উদ্বেগে প্রত্যেকেরই মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। অগত্যা তামাক-পাইপ ধরিয়ে উত্তেজিত স্নায়ুকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলাম।

সারা বনে নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করছে। বিহঙ্গকুলের শেষ গানটিও মিলিয়ে গিয়েছে। রাত গভীর হচ্ছে, সেইসঙ্গে স্নিগ্ধ হচ্ছে সমীরণ, কমছে হাওয়ার বেগ। মহীরুহের মগডালের পল্লবও আর নড়তে চাইছে না—পত্র-মর্মরও শোনা যাচ্ছে না। সূর্য দিগন্তে ডুব দিতেই দ্রুত কালো হয়ে এল আকাশ—গোধূলি হারিয়ে গেল অমানিশার অন্ধকারে।

ঘড়ি দেখলাম, আটটা বেজে তিরিশ মিনিট।

বললাম—"গুয়েলস, সময় হয়েছে।"

"আপনি হুকুম করলেই উঠব, মিস্টার স্মিথ।"

"তাহলে উঠে পড়ো।"

কোচোয়ানকে হুঁশিয়ার করে দিলাম, ঘাস খেতে খেতে ঘোড়াগুলো যেন চত্বরের বাইরে না যায়। শুরু হল নৈশ অভিযান। গুয়েলস রইল সবার আগে, আমি তার পেছনে, জন হার্ট আর আর্থার স্পোকার আমার পেছনে। যা অন্ধকার, গুয়েলস সামনে না থাকলে এক পা-ও যেতে পারতাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম জঙ্গলের শেষ প্রান্তে, সামনেই ব্ল্যাক রক ক্রীকের তীরভূমি।

নিথর নিস্তব্ধতায় নিশ্বাস ফেলতেও ভয় হচ্ছিল। মনে হল, কেউ কোথাও নেই। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। প্রাণী বলতে আমরা চারজন। নির্বিঘ্নে এগোতে পারব—কেউ দেখতে পাবে না। 'আতংক' এখনো যদি থাকে, নিশ্চয় তার নোঙর পড়েছে পাথরের আড়ালে। কিন্তু সত্যিই কি আছে? মূল প্রশ্ন তো সেইটাই! উত্তেজনায় মনে হল শিরা উপশিরা পর্যন্ত কাঁপছে, প্রতিটি অণুপরমাণু পর্যন্ত দম সামলে উৎকণ্ঠায় ফেটে পড়তে চাইছে, হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে এসে ঠেকতে চাইছে। চরম মুহূর্ত! হাতছানি দিয়ে এগোতে বলল আর্থার। পায়ের তলায় মচমচ করতে লাগল আলগা বালি। আর মাত্র দুশ ফুট। দু'শ ফুট পেরোলেই নদীর মোহানা। মার্জারের মত লঘু-চরণে পৌঁছোলাম মোহানার কাছে পাথরের আড়ালে।

কিন্তু কিচ্ছু নেই! কেউ নেই!

'আতংক'কে যেখানে দেখে গিয়েছিল আর্থার, সে-জায়গা এখন শূন্য! মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে যেখানে ভাসতে দেখা গিয়েছিল যুগান্তকারী বিস্ময়কে, সে-স্থানে এখন হাওয়া খেলছে—জলযান নেই! ব্ল্যাক রক ক্রীক ত্যাগ করে গিয়েছেন দুনিয়াধিপতি!

(১২) ব্ল্যাক রক ক্রীক

মানুষ মাত্রই মরীচিকা দেখে ভুলে যায়। ধরে নেওয়া গেল, আর্থার সত্যি সত্যিই 'আতংক' যন্ত্রযানকে দেখেছিল। কিন্তু 'আতংক' এখন নেই—স্থান ত্যাগ করেছে। জলপথ বা স্থলপথে গুপ্ত-ঘাঁটিতে যেতে পারেনি মেশিন বিগড়েছিল বলে। মেশিন সারিয়ে নেওয়ার পর কোথায় যেতে পারে 'আতংক'? নিশ্চয় লেক ঈরীর বাইরে। লেক ঈরীতে তাকে খোঁজা বৃথা—'আতংক' এখন লেক ঈরী থেকে বহুদূরে!

অভিযান আরম্ভ করে পর্যন্ত এই সম্ভাবনা নিয়ে কত জল্পনাকল্পনাই না করেছি। মন কিছুতেই মানতে চায় নি। বার বার মনকে প্রবোধ দিয়েছি—আছে, আছে, 'আতংক' এখনো আছে লেক ঈরীর অথৈ জলে! আর্থার এখানে তাকে দেখেছে, সেইখানেই নোঙরের দড়িতে বাঁধা রয়েছে তার বিচিত্র বপু!

এত শ্রমের পর তাই নিদারুণ হতাশ হলাম! পাঁজরগুলো যেন নিমেষ মধ্যে গুঁড়িয়ে গেল। নৈরাশ্য যে এত বেদনাদায়ক হয়, তা তো জানতাম না? হতাশা, নিরাশা, ব্যর্থতা সব যেন তালগোল পাকিয়ে পুঁটুলির মত ঠেলে উঠল গলার কাছে। পণ্ডশ্রমই সার হল! এখন যদিও বা লেকের তলে গ্রেট ঈরী থাকে, আমরা তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারব না। দেখলে চিনতে পারব ঠিকই, কিন্তু পাছু নেওয়ার শক্তি তো নেই! পৃথিবীর কোনো মানুষের নেই!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর ওয়েলস। মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত সরল না—এত দমে গিয়েছিলাম। জন হার্ট আর ন্যাব ওকাকাবও কম হতাশ হয় নি। তবুও বালি মাড়িয়ে এগিয়ে গেল—যদি ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র কুড়িয়ে পাওয়া যায়, এই আশায়।

ক্রীকের মোহানায় বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা দুজন। কথা বলার দরকার ছিল না। দুজনের মনের অবস্থা উপলব্ধি করার জন্যে বাক্য বিনিময়েরও কোনো প্রয়োজন ছিল না! এত আগ্রহের পর হতাশার প্রচণ্ড ধাক্কায় ফুরিয়ে গিয়েছিলাম দুজনেই। এত পরিকল্পনার পর যদি এই দশা হয়, তাহলে কি করা উচিত? এগোবো, না, পেছোবো? কি যে করা উচিত মাথায় এলনা কিছুতেই।

প্রায় একটি ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম এইভাবে। স্থান ত্যাগ করার মত

মনোবলও ছিল না। ভূতের মত দাঁড়িয়ে অন্ধকার দেখছি নির্নিমেষে। অন্ধকারে চোখ তখন অনেকটা সয়ে গেছে। মাঝে মাঝে হ্রদের জলে তরঙ্গ-শীর্ষের ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেন জলের স্ফুলিঙ্গ। মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দ্যুতি—সেই সঙ্গে তিরোহিত হচ্ছে মূর্খের দুরাশা—হয়তো ভেসে উঠেছিল 'আতংক'—ডুব দিয়েছে আমাদের দেখে! মাঝে মাঝে মনে হল যেন অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার দিয়ে গড়া একটা জমাট অন্ধকার-পুঞ্জ—অনেকটা নৌকোর মত গড়ন—ভাসতে ভাসতে আসছে তীরের দিকে। আবার কখনো ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ এসে মাথা কুটছে পদতলে—যেন লেকের তলায় ফের লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ করেছে 'আতংক'। কিন্তু একে-একে এল আর গেল একটির পর একটি মনগড়া কল্পনা। উৎকণ্ঠা-আড়ষ্ট স্নায়ুর বিকার এমনই হয়—অন্ধকারে বার বার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে লাগল- মনের বাসনা মনে রূপ নিয়ে মনেই মিলিয়ে গেল।

অবশেষে গ্যাব ওয়াকার আর জন হার্ট এসে দাঁড়াল সামনে। আমার প্রথম প্রশ্ন—"নতুন কিছু?"

"ভো ভোঁ। কেউ নেই," জবাব দিল জন হার্ট।

"ক্রীক-য়ের দুই তীর দেখেছো?"

"দেখেছি," বলল গ্যাব ওয়াকার। "হাঁটু জল পর্যন্ত গিয়ে দেখেছি। মিস্টার ওয়েলস তীরের ওপর অনেক জিনিস ছড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। এখন কিছুই নেই।"

"কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যাওয়া যাক।" বনে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছিলাম না বলেই বললাম।

আচমকা জল যেন উজ্জ্বল হল। বড় গোছের ঢেউ ছুটে এল তীরের দিকে।

ওয়েলস বললে—"বড় নৌকো গেলে যে-ভাবে ঢেউ ছুটে আসে, এ-ঢেউ কিন্তু সেই ধরনের।"

খাটো গলায় বললাম—"ঠিক কথা। বাতাসের জোর নেই, ঢেউটা তাহলে আসছে কোত্থেকে, লেকের ওপর কিছু ভাসছে কি?"

"লেকের তলা থেকেও আসতে পারে," হেঁট হয়ে জলোচ্ছ্বাসের প্রকৃতি দেখতে দেখতে বলল ওয়েলস।

ঢেউয়ের ধরনটা সত্যি-সত্যিই নৌকোর ঢেউয়ের মত। লেকের তলদেশ থেকে জল ফুলে উঠছে, অথবা লেকের ওপর দিয়ে কিছু একটা ক্রীক-য়ের মোহানার দিকে আসছে।

স্তব্ধ প্রতীক্ষায়, নিশ্চল দেহে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম অন্ধকারের পানে কিছু একটা দেখার আশায়। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম কিছু একটা শোনার প্রত্যাশায়। রাতের অন্ধকার ভেদ করে শোনা যাচ্ছে কেবল একটাই শব্দ—জল আছড়ে পড়ছে বালুকা বেলায়। মোলায়েম ভাবে ঢেউয়ের পর ঢেউ লাফিয়ে পড়ছে বালির ওপর। জন হার্ট আর ন্যাব ওয়াকার একটু সরে গিয়ে উঁচু পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াল দূর পর্যন্ত দেখার আশায়। আমি সরে গেলাম জলের আরো কাছে—উত্তাল জলের ধরন ধারণ দেখবার জন্যে। জলোচ্ছ্বাস তো কমছে না! বরং বাড়ছে! সেই সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম মৃদু শব্দে নিয়মিত ছন্দে ধুক-ধুক-ধুক-ধুক করে একটা শব্দ। ঠিক যেন প্রপেলারের পাখা ঘুরছে ধীর স্থির গতিতে!

আমার দিকে হেলে বলল ওয়েলস—"আর কোনো সন্দেহ নেই, মিস্টার স্ট্রক। শব্দটা একটা বোট-য়ের —এদিকেই আসছে।"

"হ্যাঁ, বোটের শব্দ। লেক ঈরীতে হাঙর বা তিমি থাকলে অবশ্য অন্য কথা।"

"না, এ-শব্দ বোটের শব্দ। মোহানার দিকেই আসছে। নদীর ভেতরে ঢুকবে না তো?"

"আগের দু'বার এইখানেই বোট-টা দেখেছিলে তো?"

"হ্যাঁ, এই খানেই।"

"এ-বোট যদি সেই বোট-ই হয়, অন্য কোনো বোট না হয়, তাহলে যেখান থেকে সে রওনা হয়েছিল, সেই খানেই ফিরে আসবে।"

"ঐ! ঐ!" ফিস ফিস করে উঠল ওয়েলস। সেই সঙ্গে তর্জনী নির্দেশে দেখালো ক্রীক-য়ের প্রবেশ পথ।

সঙ্গী দুজন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চার জনে বালির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে নীরবে চেয়ে রইলাম সেইদিকে।

একটা আবছা ছায়া দেখলাম। আঁধার ঠেলে এগিয়ে আসছে একটা কৃষ্ণকায় পিণ্ড। আসছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে, ক্রীক-য়ের ভেতরে একনো ঢোকেনি, এগোচ্ছে লেকের ওপর দিয়ে, উত্তর পূর্বদিকে বোধহয় এক কেব্‌ল্ দূরে এসে পড়েছে পুঞ্জাকার ছায়া পিণ্ড। ইঞ্জিনের ক্ষীণ ধুক-ধুক-ধুক ধুক শব্দটাও আর কানে আসছে না। ইঞ্জিন বোধহয় থেমে গিয়েছে। আপনিই ভেসে আসছে বোটটা সামনের দিকে।

আর্থার সম্ভবতঃ এই জলযানটাই দেখেছিল। মাঝে ছিল না। আবার ফিরে আসছে আগের জায়গায়—ক্রীক-য়ের আড়ালে রাত কাটানোর অভিপ্রায়।

কিন্তু ফিরেই যদি আসবে তো নোঙর তুলে বেরিয়েছিল কেন? আবার ইঞ্জিন বিগড়েছে নাকি? শক্তির নতুন ঘাটতি দেখা দিয়েছে কি? নাকি, গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছিল মেরামতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই? তাই যদি হয় তো ফের আসতে বাধ্য হল কেন? ওহিওর সড়ক বেয়ে উধাও হলেই তো পারত? তবে কি মোটর-যানে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে 'আতংক'?"

অনেক প্রশ্নই তাল গোল পাকিয়ে উঠল মাথার মধ্যে—কোনোটারই জবাব দিতে পারলাম না। উল্টে আমি আর আর্থার দুজনেই মনে মনে তর্ক করতে লাগলাম, সত্যিই 'আতংক' নামক ভয়াবহ যন্ত্রযানকে দেখেছি তো? দুনিয়ার পতির অজেয় বাহন কি অবশেষে ধরা দিতে চলেছে দৃষ্টি সীমায়? এই যন্ত্রযানে বসেই কি দুনিয়ার মালিক তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ দম্ভ পত্র রচনা করে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন গভর্নমেন্টকে? তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বরাষ্ট্রবর্গের প্রস্তাবকে? এই কি সে-ই মেশিন? মোক্ষম প্রমাণ এখনো হাতে আসে নি।

বোটটা যে-ধরনেরই হোক না কেন, অব্যাহত রইল তার শম্বুকগতি—সটান আসছে এইদিকেই। জলযানের ক্যাপ্টেন এ-তল্লাটের জলতলের হালচাল ভাল ভাবেই জানেন নিশ্চয়। ডুবোপাথর আছে কি নেই, তা তাঁর নখদর্পণে। তাই কুচকুচে অন্ধকারেও ছেড়ে দিয়েছেন যন্ত্রযানকে—জল কেটে এগিয়ে আসছে মসীকৃষ্ণ বস্তুটা ব্ল্যাক রক ক্রীক অভিমুখে। আত্মবিশ্বাস অপরিসীম বলেই ডেকে আলো পর্যন্ত জ্বালাননি—কণামাত্র আলোকরশ্মিও বিচ্ছুরিত হচ্ছে না কেবিনের গবাক্ষ দিয়ে।

একটু পরেই ফের কলকব্জা চলার আওয়াজ শুনলাম। ফের উত্তাল হল লেকের জল পৃষ্ঠ—বৃদ্ধি পেল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। পরক্ষণে 'জেটি'তে ভিড়ল বোট টা।

এ অঞ্চলে 'জেটি' বলতে যা বোঝায়, পাশের তলায় চ্যাটালো পাথরটা যেন তাই। দিব্বি সমতল চাতাল, জলপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ ছ ফুট ওপরে উঠে আসছে খাড়াই সরল রেখায়। প্রকৃতির হাতে গড় নিখুঁত জাহাজঘাট।

আমার বাহু আকর্ষণ করে কানে কানে বলল ওয়েলস—"এখানে থাকা আর নিরাপদ না।"

"না আর নয়। দেখে ফেলতে পারে। বালিতে গুঁড়ি মেরে থাকতে হবে, নয়তো লুকোতে হবে পাথরের আড়ালে। এ ছাড়া আর উপায় নেই।"

"আপনি চলুন—আমরা পেছনে আছি।"

আর সময় নষ্ট করা যায় না! অন্ধকারের পিণ্ডটা আরো এগিয়ে এসেছে।

নিরেট অন্ধকারের মধ্যে আরো নিরেট একটা অন্ধকার। আঁধার পুরী হতে আবির্ভূত যেন আঁধারে গড়া একটা বিশাল দেহ। জল পৃষ্ঠ থেকে ঈষৎ উঁচু ডেক দেখা যাচ্ছে। ডেকের ওপর দেখা যাচ্ছে দুই ব্যক্তির আবছা আদল—ঠিক যেন দুটো তমিস্রা-মানব!

তাহলে কি যন্ত্রযানে এই দুজন ছাড়া আর কেউ নেই?

গুঁড়ি মেরে সরে গেলাম জঙ্গলের দিকে। পাথর যেখানে বল্লমের মত খোঁচা খোঁচা চেহারা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে অরণ্য-সীমানা, ঘাপটি মেরে রইলাম সেইখানে। আমি আর ওয়েলস একদিকে—সঙ্গী দুজন আর একদিকে। এখান থেকে নৈশ আগন্তুকরা আমাদের দেখতে পাবেনা, আমরা কিন্তু ওদের দেখতে পাবো। সুযোগ পেলেই শিকারী বাজের মত ছোঁ মারব।

বোট থেকে কতকগুলো খস খস শব্দ ভেসে এল। ইংরাজীতে কথা বলছে দুজন ব্যক্তি। বুঝলাম, নোঙর ফেলার জন্যে তৈরী হচ্ছে জলযান। ঠিক সেই মুহূর্তে ডেকের ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত হল একটা দড়ি। চাতালের যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, দড়িটা এসে সপাৎ করে আছড়ে পড়ল ঠিক সেই খানে।

ঝুঁকে পড়ল ওয়েলস। দেখল, দুজন নাবিকের একজন চাতালে লাফিয়ে উঠে দড়ি চেপে ধরেছে। তার পরেই শুনলাম পাথরের ওপরে নোঙরের লোহা ঘষার কর্কশ শব্দ।

কয়েক মুহূর্ত পরে বালির ওপর খপখপ মচমচ পদক্ষেপ শোনা গেল। দুজন পুরুষ বালি মাড়িয়ে জাহাজী লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখতে দেখতে উঠে গেল জঙ্গলের ধারে।

কোথায় যাচ্ছে ওরা? ব্ল্যাক বক ক্রীক কি 'আতঙ্ক' যন্ত্রযানের পুরোনো বিবর? খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য উপকরণের গোপন ভাঁড়ার কি এই খানেই? খাবার নিতেই কি এ-অঞ্চলে এসেছিল 'আতংক'—ব্ল্যাক রক ক্রীক-য়ের নিভৃত প্রাকৃতিক বন্দরের সন্ধান পেয়েছে কি যত্রতত্র লক্ষ্যহীন অভিযানে বেরিয়ে? এ অঞ্চলে মানুষ থাকে না বলেই জায়গাটা এত নিরাপদ—গুপ্ত ঘাঁটির উপযুক্ত। কাক পক্ষীরও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। আতংক-র কমাণ্ডার তা জানেন বলেই কি এত নির্ভয়? এত বেপরোয়া?

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ওয়েলস—"কি করব বলুন?"

"ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা—একী!"

ভীষণ চমকে উঠলাম আমি! লোক দুজন তখন প্রায় তিরিশ ফুট তফাতে পৌঁছেছে। একজন সহসা মুখ ফিরিয়ে ছিল আমাদের দিকে। লণ্ঠনের আলো সটান মুখে পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম আমি।

এ-মুখ আমি চিনি। লঙ স্ট্রীটে আমার বাড়ীর সামনে যে দুজন চোরকে দেখেছিলাম। যারা আমার পাছু নিয়েছে আমার অগোচরে—এ-লোকটি সেই দুজনের একজন। বুড়ি দাসীর ভুল হয়নি মুখ চিনতে, ভুল আমারও হল না। এ-মুখ কি ভোলা যায়? কত খুঁজেছি ওয়াশিংটনের রাস্তাঘাটে, আর দেখতে পাইনি। মুখটা কিন্তু তুলে রেখেছিলাম মনের খাতায়। না আর কোনো সন্দেহ নেই। হুমকি লেখা হয়েছিল 'আতংক'র ডেক থেকেই—লিখেছিলেন 'দুনিয়ার মালিক' স্বয়ং। কিন্তু কিছুতেই মাথায় এল না, গ্রেট ঈরীর সঙ্গে এ-মেশিনের কি সম্পর্ক!

ওয়েলস-য়ের কানে কানে বললাম সব কথা। শুনে মাথা নেড়ে ওয়েলসও বলল—"বড় জটিল ধাঁধা!"

লোক দুজন ততক্ষণে বনের ধারে পৌঁছেছে। গাছতলা থেকে কাঠকুটো কুড়োচ্ছে।

ওয়েলস বলল—"ওরা আমাদের আস্তানার সন্ধান পেলে কিন্তু সর্বনাশ হবে।"

"ঘাবড়িও না। অত ভেতরে যাবে না ওরা।"

"ধরুন ভেতরে গেল—দেখেও ফেলল আমাদের ঘোড়া— তখন?"

"ছুটে আসবে—কিন্তু বোটে উঠতে দেবনা!"

ক্রীক-য়ের দিক থেকে তিল মাত্র শব্দ আসছে না। আমি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে সন্তর্পনে পৌঁছোলাম চাতালে। নোঙর যেখানে, দাঁড়ালাম সেখানে।

দড়ির অপর প্রান্তে ভাসছে 'আতংক'। ডেকে আলোর কণাও নেই। কাউকে দেখতেও পেলাম না। এই তো সুযোগ! লাফিয়ে উঠব নাকি ডেকে? লোক দুজন ফিরে এলেই আপ্যায়ন করা যাবে ডেকে দাঁড়িয়েই?

"মিস্টার স্ট্রক!" চমকে উঠলাম মৃদু কণ্ঠে ডাক শুনে। আর্থার। বেড়ালের মত নিঃশব্দচরণে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

চকিতে পিছু হটে এলাম, বসে পড়লাম আর্থাবের গা ঘেঁসে! তাড়াহুড়ো করা কি সমীচীন হবে? ডেকের ওপর থেকে কেউ নজর রাখেনি তো?

যদি তাই হয়, তাহলে হঠকারিতার ফল ভালো নাও হতে পারে।

লোক দুজন ফিরে আসছে বালির পথ ধরে। দুজনের হাতে কাঠের বোঝা নিশ্চিন্তভাবে আসছে মচ মচ শব্দে বালি মাড়িয়ে।

বুঝলাম, আমাদের অস্তিত্ব টের পায়নি। কোনো সন্দেহও মনে দেখা দেয়নি।

চাতালে এসে দাঁড়াল দুজনে। একজন সামান্য গলা চড়িয়ে বললে—
"হ্যালো, ক্যাপ্টেন!"

"যাই!"

কানে কানে বলল ওয়েলস—"দেখলেন তো, ওরা তিনজন!"

"চারজনও হতে পারে। পাঁচ ছ'জন হলেও অবাক হব না!"

মহা ফাঁপরে পড়লাম। পরিস্থিতি দেখছি ঘোরালো হয়ে উঠছে। এত লোকের বিরুদ্ধে আমরা চারজন কি করব? প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের একটু ঘাটতিও যদি দেখিয়ে ফেলি, সর্বনাশ অনিবার্য! সামান্যতম অদূরদর্শিতার পরিণাম হবে সাংঘাতিক। ওরা তো ফিরে এসেছে। কাঠকুটো ডেকে চাপিয়ে আতংক হাঁকিয়ে সরে পড়বে নাকি? ক্রীক ছেড়ে এখুনি লম্বা দেবে, না, ভোর না হওয়া পর্যন্ত নোঙরে বাঁধা থাকবে? এখুনি রওনা হলে আর তো ওকে ধরতে পারব না! লেক ঈরীর জল থেকে উঠবে ডাঙায়, নয়তো ডেট্রয়েট নদী ধরে পৌঁছোবে লেক হুরন আর গ্রেট লেকে। ব্ল্যাক রক ক্রীক-য়ের মত সুযোগ কি আর পাব? এরকম সঙ্কীর্ণ পরিসরে আর কি তাকে বাগে পাব?

বললাম—"আমরা চারজন। আচমকা চড়াও হলে ওরা লড়বার সুযোগই পাবে না—ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবে। তারপর ভাগ্যে যা আছে তা হবে।"

সঙ্গী দুজনকে ডাকতে যাচ্ছি, ওয়েলস হাত চেপে ধরল আমার—"ঐ শুনুন!"

জেটির কাছে এগিয়ে এসেছে বোট। ডেক থেকে শুধোলেন ক্যাপ্টেন—"সব ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন।"

"আরো দু বাণ্ডিল কাঠ রয়েছে, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে আর একবার গেলেই সব কাঠ আসবে টেরর'-য়ের ডেকে।"

টেরর! এই সেই টেরর! শরীরী আতংক! মূর্তিমান বিভীষিকা!

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর একবার গেলেই হবে।"

"তাহলে সকাল হলেই রওনা হওয়া যাবে'খন।"

বোটে লোক সংখ্যা তাহলে ক'জন? মাত্র তিনজন? ক্যাপ্টেন ওরফে মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড এবং এই দুই ব্যক্তি?

ওদের প্ল্যানটা বুঝলাম। কাঠের বাণ্ডিল আতংক-র ডেকে তোলবার পর টেনে ঘুমোবে সারা রাত। আমরাও তো তাই চাই! ঘুমের মধ্যেই পিছমোড়া করে বাঁধা সহজ নয় কি? আত্মরক্ষার সুযোগ পর্যন্ত দেব না!

স্বয়ং ক্যাপ্টেন যখন 'আতংক' পাহারা দিচ্ছেন, তখন অপেক্ষা করাই ভাল। খামোকা রক্তক্ষয় করে লাভ কি? ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক দুর্দান্ত মানুষ। ওঁর চোখের সামনে দিয়ে 'আতংক' দখল করতে গিয়ে না জানি কি বিপর্যয় ঘটিয়ে বসব। তার চাইতে বরং সবুর করা যাক। আমি আর আর্থার ফিসফাস করে ঠিক করলাম, ওরা যখন ঘুমোবে, আমরা তখন হানা দেব। তার আগে নয়।

দশটা বেজে তখন তিরিশ মিনিট। আবার পায়ের আওয়াজ ফিরে আসছে। লোক দুজন উঠে গেল বনের দিকে। বেশ খানিকটা দূরে সরে যাওয়ার পর আর্থার উঠে গেল সহকারী দুজনকে সব কথা জানাতে। আমি চুপিসারে আবার এগিয়ে গেলাম জলের কিনারায়।

একই রকম ভাবে ভাসছে আতংক। নিথর, নিশ্চল, আলোহীন, শব্দহীন। দড়িটা এমন কিছু লম্বা নয়। গড়নটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। অনেকটা চুরুটের মত লম্বাটে—দুপাশ ছুঁচোলো। পাল নেই, মাস্তুল নেই, চিমনি নেই, হাল, দাঁড়, দড়িদড়া কিচ্ছু নেই। নিউ-ইংল্যাণ্ডের উপকূলে ছুটোছুটি করবার সময়ে এই চেহারাই দেখেছিল ধীবর সম্প্রদায়।

আবার ফিরে এলাম পাথরের আড়ালে। সঙ্গী তিনজনেও লুকিয়ে আছে যে-যার জায়গায়। রিভলবার বের করে দেখে নিলাম, সব ঠিক আছে কিনা।

পাঁচ মিনিট হল লোক দুজন গিয়েছে কাঠের বাণ্ডিল আনতে। ফেরবার সময় হয়ে গিয়েছে—যে কোনো মুহূর্তে শুনতে পাব বালির মচমচানি। তার পরেও ঘণ্টা খানেক ওৎ পেতে বসে থাকব। শত্রুপক্ষ ঘুমিয়ে কাদা না হওয়া পর্যন্ত হানা দেওয়া চলবে না। সামান্য হিসেবের ভুলে পাখী হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। হয়ত লেক ঈরীর জল তোলপাড় করে ছিটকে যাবে 'আতংক' নয়তো চক্ষের নিমেষে গোঁৎ দেবে জলের তলায় আমাদের বোকা বানিয়ে।

আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এরকম ভাবে কখনো অসহিষ্ণু হইনি। ব্যাপার কি? লোক দুটো এখনো ফিরছে না কেন? নিশ্চয় ফেরার পথে বাধা পড়েছে। তাই দেরী হচ্ছে?

আচম্বিতে একটা ভীষণ সোরগোল শুনলাম। নিস্তব্ধ রাত খান্ খান্ হয়ে গেল অশ্বখুরধ্বনি এবং হ্রেষারবে। তীর বরাবর টগবগিয়ে ছুটছে দু'দুটো ঘোড়া!

এ-কী! এ-যে আমাদের ঘোড়া! কোচোয়ানের অসতর্কতায় এ-কি সর্বনাশ হল! চত্বর থেকে বেরিয়ে পড়ে ঘোড়া চলে এসেছে বনের সীমানায়। এখন ভয় পেয়ে উল্কার মত মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে বালি আর পাথরের ওপর দিয়ে!

লোক দুজনকে দেখা গেল ঠিক তখনি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে দুজনে। আমাদের গোপন আস্তানা দেখে ফেলেছে নিশ্চয়। বুঝেছে পুলিশ এসেছে জঙ্গলে। নজর রেখেছে তাদের ওপরে। পুলিশ পিছু নিয়েছে, ধরাও পড়তে হবে এবার। তাই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দুজনেই চোখা-চোখা পাথর টপকে ছুটে এল তীর বেগে। একবার জেটিতে পৌঁছোতে পারলেই নোঙর খুলে ঝাঁপিয়ে পড়বে আতংক-র ডেকে এবং নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হয়ে যাবে 'টেরর'। আর ধরা যাবে না!

"পাকড়াও! পাকড়াও!" হাঁক দিলাম আমি। পাথরের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম চারজনে ওদের দুজনের পথ আটকানোর জন্যে।

আমাদের দেখা মাত্র কাঠের বোঝা ফেলে দিয়ে চক্ষের নিমেষে রিভলবার বের করে গুলিবর্ষণ করল দুজনেই। গুলি বিঁধল জন হার্টের পায়ে।

আমরাও পাল্টা গুলিবর্ষণ করলাম—কিন্তু গুলি লাগল না। সমানে ছুটে এল দুজন—টলে পড়ল না, আছাড়ও খেল না। জেটির ওপর লাফ দিয়ে উঠে দড়ি না খুলেই সটান ঝাঁপ দিল শূন্যে এবং ঝুলতে লাগল আতংক-র ডেক ধরে।

লাফ দিয়ে সামনে এলেন ক্যাপ্টেন। হাতের রিভলবার থেকে ছুটে এল অগ্নিবেগা। ওয়েলস-এর গা ঘেঁসে শন শন করে বেরিয়ে গেল বুলেট।

আমি আর ন্যাব ওয়াকার দড়ি ধরে টানতে লাগলাম বিপুলায়তন মসীকৃষ্ণ বস্তুটাকে। পারব কি টেনে আনতে জেটির গায়ে? তার আগেই দড়ি কেটে সটকান দেবে না তো?

আচমকা পাথরের খাঁজ থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিটকে বেরিয়ে গেল নোঙর। আমার বেল্টে আটকে গেল একটা আঁকশি—উড়ন্ত দড়ির ঝাপটায় ঠিকরে পড়ল ন্যাব ওয়াকার। দড়ির পাকে জড়িয়ে গিয়ে বেল্টে আটকানো আঁকশির টানে আমি ছিটকে গেলাম জলের ওপর—

পুরোদমে ইঞ্জিন চালিয়ে চক্ষের পলকে বাঘের মত লাফ দিয়ে ব্ল্যাক রক ক্রীক-এর জলরাশি ছিন্নভিন্ন করে ছিটকে গেল 'আতংক'!

(১৩) আতংক-র ডেকে

চোখ মেলে দেখলাম দিনের আলো। পুরু কাঁচে ঢাকা পোর্টহোল দিয়ে আলো ঢুকছে ছোট্ট একটা কেবিনে। জানিনা কতক্ষণ ধরে শুয়ে আছি আমি, কে এনে রেখেছে এখানে। ঘণ্টার হিসেবে বলতে না পারলেও তেরচা রৌদ্ররশ্মি দেখে আঁচ করলাম, দিগন্ত ছাড়িয়ে বেশী ওপরে ওঠেনি সূর্যদেব।

সরু বাঙ্কে শুয়ে আছি আমি। গরম চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। ভিজে জামা প্যান্ট শুকিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের কোণে। নোঙরের হ্যাঁচকা টানে দু'টুকরো কোমর-বন্ধ গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে। গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি আমার। জখম হওয়া তো দূরের কথা। খালি যা বড্ড কাহিল লাগছে। জ্ঞান হারিয়েছিলাম স্রেফ জলে ডুবে। চোট লাগেনি। আচমকা টানে দড়িতে জড়িয়ে গিয়ে তীরের মত ছুটে চলে ছিলাম জলের তলা দিয়ে। জল থেকে না তুললে দম আটকেই মারা পড়তাম।

কোথায় আমি? টেরর-য়ের ডেকে নাকি? সঙ্গী বলতে কি ঐ তিনজন? ক্যাপ্টেন আর তাঁর দুই দোসর? নিশ্চয় তাই। খণ্ড যুদ্ধের পুরো দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। হার্ট গুলি খেয়ে ধরাশায়ী, গুলির পর গুলি ছুঁড়ছে ওয়েলস, ওয়াকাব দড়ির ঝাপটায় ঠিকরে পড়ছে, আর আমি বেল্টে আটকানো আঁকশির টানে সামনে ছিটকে যাচ্ছি!

সঙ্গীরা বেঁচে গেছে। হয়ত ভাবছে আমি আর বেঁচে নেই। খণ্ড যুদ্ধের প্রথম বলি আমি—জীবন দিয়েছি দুনিয়াধিপতিকে চটিয়ে! লেক ঈরীর জলেই ওরা হয়ত খুঁজছে আমার প্রাণহীন দেহ!

কিন্তু 'টেরর' এখন কোথায়? চলেছে কোন পথে? প্রতিবেশী স্টেটের পথঘাট মাড়িয়ে ধেয়ে চলেছে কি মোটর-যানের মত? তাই যদি হয় তাহলে নিশ্চয় এতক্ষণে বহুদূরে চলে এসেছে শক্তিমান মেশিন। অজ্ঞান ছিলাম—জানতেও পারিনি। অবশ্য যদি সাবমেরিনের মত ছোটে, তাহলে নিশ্চয জলের তলায় আছি আমি?

কিন্তু না, 'আতংক' চলেছে বিস্তৃত একটা তরল পদার্থের ওপর দিয়ে মসৃণ গতিতে। পোর্ট হোল দিয়ে রোদ ঢুকছে কেবিনে—জল তো দেখা যাচ্ছে না! জলে ডুবে যায়নি পোর্ট হোল। তাছাড়া, মোটর গাড়ী চাপলে ঝাঁকুনি টের পাওয়া যায়—তেলতেলে রাস্তা দিয়ে গেলেও মোটর কখনো তৈল-মসৃণ ভাবে যায় না—ঝাঁকুনি লাগেই। কিন্তু সে-রকম ঝাঁকুনি টের পাচ্ছি না। তার মানে, ডাঙায় ওঠেনি 'আতংক'।

লেক ঈরীতে এখনো আছি কিনা, বলা মুস্কিল। ডেট্রয়েট নদী পথে লেক হুরন বা লেক সুপিরিয়রে চলে আসিনি তো?

ঠিক করলাম, ডেকে উঠে দেখতে হবে। অতিকষ্টে নামলাম বাঙ্ক থেকে। জামা-কাপড় পরলাম বটে—খুব উৎসাহ পেলাম না। কে জানে, দরজায় তালা ঝুলছে কিনা।

বেরোনোর পথ একটাই—মাথার ওপরকার 'হ্যাচ' দিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে

উঠলাম, ছাদের গোলাকার ঢাকনি ঠেলতেই খুলে গেল। অর্ধেক শরীর বের করলাম এবং অবাক না হয়ে পারলাম না।

দুরন্ত বেগে ছুটছে 'টেরর'। সামনে, পেছনে, দুপাশে ছোটার চিহ্ন জলোচ্ছ্বাসের আকারে লাফিয়ে উঠছে বহু ঊর্ধ্বে। যে দিকে দুচোখ যায়, কেবল ঢেউ আর ঢেউ! ডাঙার চিহ্নমাত্র নেই! আকাশ আর সাগরের মিলনরেখা দূরদিগন্ত ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না!

হ্রদ? না, সমুদ্র? বুঝতে পারলাম না। গলুইয়ের ধাক্কায় প্রচণ্ড তোড়ে জল ঠিকরে যাচ্ছে দুপাশে—স্প্রে-আকারে ভীমবেগে ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে।

চেখে দেখলাম জলের স্বাদ। নোনতা নয়। তবে কি লেক ঈরীতেই রয়েছি এখনো? সূর্য খ-বিন্দু থেকে মাঝামাঝি জায়গায় হেলে রয়েছে। তার মানে, ব্ল্যাক রক ক্রীকের ঘাঁটি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার পর সাত-আট ঘণ্টা কেটেছে।

আজ তাহলে একত্রিশে জুলাই। সবে সকাল হয়েছে।

লেক ঈরী নেহাত ছোট লেক নয়। লম্বায় দুশ কুড়ি মাইল আর চওড়ায় পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী। সুতরাং ডাঙার চিহ্ন দেখতে পাওয়ার আশা-দুরাশা। দক্ষিণ-পূবে যুক্তরাষ্ট্র অথবা উত্তর-পশ্চিমে কানাডা—সব অদৃশ্য।

ডেকে লোক বলতে মাত্র দুজনকে দেখলাম। একজন গলুইতে দাঁড়িয়ে নজর রেখেছে সামনে। আরেকজন দাঁড়িয়ে পেছনে। সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝলাম, প্রচণ্ডবেগে উত্তর-পূব দিকে ছুটে চলেছে 'আতংক'।

ক্যাপ্টেন ভদ্রলোকের ছায়াও দেখলাম না ধারে-কাছে। এই দুজনকেই দেখেছি লণ্ঠন হাতে কাঠের বোঝা নিয়ে বালি-রাস্তায় নামতে।

অত্যুগ্র আগ্রহে আমি তখন অস্থির হয়ে উঠেছি। য লোকটি 'দুনিয়াধিপতি' খেতাব নিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে যুদ্ধে আহ্বান জানান, যিনি 'আতংক' নামক এই ফ্যানটাসটিক যন্ত্রযানের স্রষ্টা, যিনি এই মুহূর্তে বিশ্বের প্রত্যেকের আলোচনার বস্তু—তাঁকে দেখবার জন্যে মনটা আকুল হবে—এ আর আশ্চর্য কী? অসামান্য শক্তিধর না হলে সারা মানুষ-জাতটাকে কেউ চ্যালেঞ্জ জানায়? লড়বার জন্যে প্রস্তুত থাকে? অতি-মানুষ তিনি সন্দেহ নেই—তাঁকে দেখাও তো মহাভাগ্যের ব্যাপার!

গলুইয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম তার পাশে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর শুধোলাম—"ক্যাপ্টেন কোথায়?"

অর্ধ-নিমীলিত চোখে চেয়ে দেখল লোকটা। যেন কথা বুঝতে পারছে না। অথচ না বোঝার কোনো কারণ নেই। গতরাতে জেটিতে দাঁড়িয়ে

ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছি তাকে। আমি 'হ্যাচ' খুলে বেরোচ্ছি দেখেও সে বিস্মিত হয় নি। এখন গায়ে পড়ে কথা বললাম, শুনেও শুনল না। আমার দিকে পেছন ফিরে দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করতে লাগল এক মনে।

জেদ চাপল। একই প্রশ্ন পেছনে দাঁড়ানো লোকটিকে জিজ্ঞেস করবার জন্যে পায়ে-পায়ে তার দিকে এগুচ্ছি, এমন সময়ে দূর থেকেই হাতের ইশারায় সে আমাকে কাছে যেতে নিষেধ করল।

কেউই যখন কথা বলতে চায় না, তখন আর চেষ্টা না করাই ভাল। ঠিক করলাম, যন্ত্রযানটাকে ভালভাবে দেখে নেওয়া যাক। এই ডেক থেকেই গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল আমাদের ওপর। এখানকার নোঙরের আচমকা আকর্ষণে আজ আমার এই দশা।

ধীরে-সুস্থে মেশিনের গঠন-কৌশল দেখতে লাগলাম। জানিনা কোন জাহান্নামে নিয়ে চলেছে শরীরী আতংক। যে চুলোতেই যাই না কেন, যন্ত্রযানের যান্ত্রিক বিস্ময় দেখে নেওয়া যাক দু'চোখ ভরে। ডেক এবং ডেকের ওপরকার সমস্ত জিনিসপত্র অজ্ঞাত কোনো ধাতু দিয়ে নির্মিত। অনেক ভেবেও বুঝতে পারলাম না ধাতুটা কী।

ডেকের মাঝখানে একটা মস্ত ঢাকনি পাটাতন থেকে খানিকটা উঁচু হয়ে রয়েছে—তলায় ইঞ্জিন ঘর। প্রায়-নিঃশব্দে নিয়মিত ছন্দে চলছে বিস্তর কল কব্জা। আগেও দেখেছি, এখনো দেখলাম, ডেকের ওপর পাল মাস্তুল, দড়ি দড়ার চিহ্নমাত্র নেই! নিশান ওড়াবার জন্যে পেছন দিকে ডাণ্ডা পর্যন্ত নেই। সামনের দিকে গলুইতে পেরিস্কোপের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। জলের তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে এইখান থেকে যন্ত্রযান চালানো হয়।

দু'পাশে ভাঁজ করা কি একটা জিনিস সাপটে রয়েছে যন্ত্রযানের গা বরাবর। ওলন্দাজ জলযানে একরকম গ্যাংওয়ে দেখা যায়। কাঠের পাতা থাকে জাহাজের পাশ দিয়ে যাতায়াতের জন্যে। বুঝলাম না এ জিনিসটা সেই জাতীয় কিছু কিনা।

গলুইয়ে আর একটা 'হ্যাচ' দেখলাম। তৃতীয় 'হ্যাচ'। ফোকরের তলায় নিশ্চয় কেবিন আছে। ডেকের ওপর যে দুজনকে দেখছি, তাদের ঘর।

পেছন দিকে রয়েছে একই রকম আর একটা 'হ্যাচ'। নিশ্চয় ক্যাপ্টেনের কেবিন রয়েছে নীচে। ভদ্রলোক এখনো অদৃশ্য রয়েছেন। প্রতিটা 'হ্যাচের ওপর রবারের বিশেষ ঢাকনি পরানো। যাতে জলতলে ডুব দিলে এক ফোঁটা জলও ভেতরে না ঢোকে।

যে 'মোটর'-য়ের দৌলতে তীব্রবেগে ছুটছে 'আতংক' সেই মোটর-টি কিন্তু

দেখতে পেলাম না। প্রপেলারও দেখলাম না। তীরের মত ছুটে চলেছে বেগবান যন্ত্রযান—পেছনে থেকে যাচ্ছে দীর্ঘ মসৃণ জলরেখা। আগাগোড়া এমন সূক্ষ্মভাবে তৈরী যে ছুরীর মত জল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের বিশাল তরঙ্গও এই যন্ত্রযানকে তুলে আছাড় মারতে পারবে না—ঢেউয়ের ওপর দিয়ে, তলা দিয়ে ছুঁচের মতই ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে 'আতংক—পিছলে যাবে অনায়াসে!

আগেই জেনেছি, আশ্চর্য এই যন্ত্রযান পেট্রল বা বাষ্প চালিত নয়। এ-মেশিনের বিপুল শক্তির উৎস অন্য কোথাও। সাবমেরিন বা মোটর গাড়ীতে যে ধরনের তেল ব্যবহার করা হয়, তার গন্ধটা এমন যে নাকে এলেই টের পাওয়া যায়। সে-রকম কোনো গন্ধও বাতাসে ভাসছে না। সুতরাং প্রচণ্ড শক্তির মূল উৎস নিশ্চয় ইলেকট্রিসিটি। নিশ্চয় যন্ত্রযানের মধ্যেই তৈরী হয়ে চলেছে বিদ্যুৎশক্তি। অবিশ্বাস্য উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কোনো উৎস থেকে আসছে বিরাম বিহীন তড়িৎ প্রবাহ। কিন্তু আসছে কোত্থেকে? ব্যাটারী থেকে? অ্যাকুমুলেটর থেকে? জল থেকে বা বায়ুমণ্ডল থেকে নিশ্চয় অজ্ঞাত কোনো পন্থায় ইলেকট্রিসিটি আকর্ষণ করা হচ্ছে না? তৈরী হচ্ছে যন্ত্রযানের মধ্যেই। কিভাবে? অপার আগ্রহে শক্তির উৎস খুঁজলাম হন্যে হয়ে—কোথাও পেলাম না। কোনোদিনও পাব কি? যান্ত্রিক বিস্ময়ের গুপ্ত রহস্য আদৌ আবিষ্কার করতে পারব কি?

মনে পড়ল, ব্ল্যাক রক ক্রীক-এর পাড়ভূমিতে রেখে আসা সাঙ্গপাঙ্গদের কথা। একজন ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল দুর্ধর্ষ শত্রুর গুলিবর্ষণে। কে জানে, বাকী দুজনও জখম হয়েছে কিনা। নোঙরের দড়ি হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে আমাকে—এ দৃশ্য তারা দেখেছে। 'আতংক' অধিপতি জল থেকে তুলে প্রাণদান করেছেন আমাকে, এ সম্ভাবনা নিশ্চয় কল্পনায় আসবে না কারোরই। ওরা ধরে নিয়েছে আমি মৃত। রিপোর্ট চলে গেছে মিস্টার ওয়ার্ডের কাছে সেইভাবে। টোলেডো থেকে টেলিগ্রামে দুঃসংবাদ পেয়ে কি করছেন মিস্টার ওয়ার্ড? 'দুনিয়াধিপতি'কে কাবু করার নতুন ফন্দী আঁটছেন কী?

ক্যাপ্টেনের প্রতীক্ষায় ডেকে দাঁড়িয়ে এই সব কথাই ভাবতে লাগলাম আপন মনে। কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা। দর্শন পাওয়া গেলনা ক্যাপ্টেনের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষিদের জলুনি শুরু হল পেটের মধ্যে। মনে হল যেন গত কয়েকদিন উপোস করে আছি। গতকাল যৎসামান্য খেয়েছিলাম জঙ্গলে গাছের তলায় বসে। কিন্তু ক্ষিদের যে রকম যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, কে জানে দু'দিন কি তারও বেশী টেরর-য়ের কেবিনে শুয়ে আছি কিনা।

আদৌ আমাকে খেতে দেওয়া হবে কিনা, এ-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অচিরে। গলুইয়ে দাঁড়িয়েছিল যে লোকটা, সে 'হ্যাচ' খুলে অন্তর্হিত হল নীচে। ফিরে এল খাদ্য পানীয় নিয়ে। মুখে কথা বলল না। খাবার দাবার আমার সামনে রেখে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। মাংসর ঝোল, শুকনো মাছ, সমুদ্র বিস্কুট এবং এক গেলাস এল-মদ্য। মদটি এমন কড়া যে জল মিশিয়ে নিয়ে পান করতে হল। খেলাম গোগ্রাসে।

নির্বাক নাবিক দু'জন আমার আগেই খেয়ে দেয়ে ফিরে এসেছিল যে-যার জায়গায়। কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখলাম, প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে দুজনে। ফিরেও তাকালো না—আলাপ করা তো দূরের কথা।

হাতে কোনো কাজ নেই, কথা বলার লোক নেই সুতরাং তুফান বেগে চিন্তার ট্রেন ছুটে চলল মাথার মধ্যে দিয়ে। ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক কি শেষ পর্যন্ত দেখা দেবেন? মুক্তি দেবেন আমাকে? কবে শেষ হবে এই অ্যাডভেঞ্চার? বন্দীদশার মেয়াদ কদ্দিনের? অদৃশ্য ক্যাপ্টেন দৃশ্যমান হওয়ার পর কিরকম আচরণ করবেন? যদি পালাই? পালাতে পারবো কি? তীরভূমি থেকে এত তফাতে শুধু জলের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করলে পালানো তো সম্ভব নয়! জলে ডুব দিলে তো আরো সর্বনাশ! ডাঙায় না ওঠা পর্যন্ত সে চেষ্টা না করাই ভাল!

মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে লাভ নেই। যা সত্যি তা স্বীকার করাই ভাল। 'আতংক' যন্ত্রযানের গুপ্তরহস্য না জেনেই পালিয়ে লাভ কী? আমার মন তাতে ভরবে না। পালানোটা বড় কথা নয়। অভিযানে সফল হইনি এখনো পর্যন্ত। মনের সঙ্গে ছলনা করে তো লাভ নেই। কিছুই করতে পারিনি—প্রাণটা যেতে বসেছিল, ভবিষ্যতের গর্ভে হয়ত আরো দুর্ভোগ জমা আছে। এত কাণ্ডর পর হঠাৎ ঢুকে বসেছি শয়তানের শকটের অভ্যন্তরে। ছিলাম রহস্যের গোলক ধাঁধার বাইরে। এসে পড়লাম একদম ভেতরে। দুনিয়ার মালিকের হাতের মুঠোয়। ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, হয়ত আমাকেও মানবতার আওতা থেকে সরিয়ে রাখবেন। টেরর-য়ের ভেতরে ঢুকেও লাভ কিছু হবে না। উত্তর পূবদিকেই অব্যাহত রয়েছে জল-যানের গতি। পুরোদমে নিশ্চয় যাচ্ছেনা। গেলে, ঘণ্টাকয়েক আগেই পৌঁছে যেত লেক ঈরীর উত্তর পূবসামানায়।

লেকটা ডিম্বাকৃতি, আগেই বলেছি। লম্বালম্বি ভাবে পাড়ি দিচ্ছে যন্ত্রযান। এ-ভাবে গেলে সামনেই পড়বে নায়গারা নদী। এই নদীর জল-ই গিয়ে পড়ছে লেক ওনটারিওতে। কিন্তু মাঝে পড়ছে সুবিখ্যাত নায়গারা জলপ্রপাত—

বাফেলো নগরী থেকে পনেরো মাইল দূরে। লেক ঈরীতে যন্ত্রযান ঢুকেছে ডেট্রয়েট নদী দিয়ে—বেরোচ্ছে নায়গারা নদী দিয়ে। কিন্তু পথে জলপ্রপাত পড়লে বেরোনো সম্ভব নয়! তবে—কি ডাঙায় উঠবে 'আতংক'?

মধ্যরেখা পেরিয়ে গেল সূর্য। আকাশ ঝলমল করছে। উষ্ণ রোদে ভালই লাগছে। ছোটার বেগে বাতাসের ঝাপটায় মনটাও উড়ু উড়ু হচ্ছে। সুন্দর দিন বলতে যা বোঝায়, আজকের দিনটা তাই। সতেজ, তাজা, নির্মল, হাস্যময়! দু'পাশে তীরের রেখা এখনো অদৃশ্য। কানাডার মাটি বা আমেরিকার মাটি—কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না।

ক্যাপ্টেনের মতলবটা কি? কেন আসতে চাইছেন না আমার সামনে? তবে কি সারাদিন অন্তরালে থাকবেন শুধু সন্ধ্যে নাগাদ আমাকে বিদেয় করবেন বলে? অদৃশ্য তটরেখা সন্ধ্যের সময়ে দৃশ্যমান হবে—ক্যাপ্টেন কিন্তু অদৃশ্যই থাকবেন—আমাকে নামিয়ে দেবেন ডাঙায়?

বেলা দুটোর সময়ে ঘটাং করে একটা শব্দ হল। সচমকে দেখলাম, মাঝের—'হ্যাচ' উঠছে ওপর দিকে। যার জন্যে অধীর প্রতীক্ষা, আবির্ভূত হচ্ছেন তিনি।

আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না ক্যাপ্টেন। বোবা সঙ্গীদের মত তিনিও উদাসীন রইলেন আমার সম্বন্ধে। গট গট করে গেলেন পেছনে। সঙ্গীর সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে দু'চার কথা বলে দিগন্ত দেখতে লাগলেন তন্ময় হয়ে। কম্পাস দেখে সামান্য ঘুরিয়ে দিলেন যন্ত্রযানের মুখ। সঙ্গী লোকটা সেই ফাঁকে সামনের 'হ্যাচ' খুলে নেমে গেল ডেক থেকে।

বিশ্বের বিস্ময় 'দুনিয়াধিপতি' দাঁড়িয়ে রইলেন অদূরে। এই সেই মানুষ যাঁকে এক পলক দেখবার জন্যে, যাঁর ঠিকুজি কুলজী জানার জন্যে তামাম দুনিয়া পাগল হয়েছে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের একটু বেশী। উচ্চতা মাঝামাঝি, অসুর-সমান বলিষ্ঠ কাঁধ। ঐ বয়েসেও কাঁধ বেঁকে যায় নি—মেরুদণ্ড যষ্টির মতই সিধে। কঠোর করোটি। চুল শুভ্র নয়, ধূসর। পরিষ্কার কামানো গাল। কিন্তু ছোট্ট অথচ পারপাটি দাড়ি রয়েছে চিবুকে। বুকের ছাতি কপাটের মত, চোয়াল চওড়া পাথরের মত—দেখলেই বোঝা যায় মানুষটার অস্থি মজ্জায় রক্তে অফুরন্ত শক্তি নেচে নেচে বেড়াচ্ছে—প্রচণ্ড শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে দেহে এবং মনে। ঘন ঝোপের মত ভুরুর তলায় প্রদীপ্ত চোখের তীক্ষ্ণ চাহনির মধ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অন্তরের তেজ। লোহার মানুষ বললেই চলে। নিরেট স্বাস্থ্য। রোদে পোড়া তামাটে চামড়ার নীচে উষ্ণ রুধির ছুটছে টগবগিয়ে বল্গাহীন অশ্বের মত।

দোসর দুজনের মত এঁর পরনেও সমুদ্র-পরিচ্ছদ—সবার ওপরে অয়েল-স্কিন কোট। মাথায় উলের টুপী। ইচ্ছে হলেই টেনে নামিয়ে পুরো মাথা ঢাকা যায়।

ক্যাপ্টেনকে আমি এর আগেও দেখেছি—তা বলার দরকার আছে কি? লণ্ড স্ট্রীটে আমার বাসভবনের সামনে দুজন চর মোতায়েন ছিল আমার গতিবিধি নজরে রাখার জন্যে। বড় ঘড়ির ফাঁক দিয়ে দুজনের চেহারা আমি দেখেছিলাম। একজনকে দেখে চমকে উঠেছিলাম ব্ল্যাক রক ক্রীক-য়ে লণ্ঠন হাতে। আর একজন দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে—'আতংক' অধিপতি দুনিয়ার মালিক স্বয়ং!

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন নিজেই বাড়ী পাহারা দিয়েছিলেন লণ্ড স্ট্রীটে। আমি যখন চিনেছি তাকে, তিনিও নিশ্চয় চিনেছেন আমাকে। বুঝতে পেরেছেন, গ্রেট ঈয়ার রহস্যভেদের দায়ীত্ব নিয়ে আমিই ছুটেছিলাম মরগানটনে।

চেয়ে রইলাম দুই চোখে বিপুল বিস্ময় নিয়ে। কিন্তু তিনি ভ্রুক্ষেপও করলেন না। ডেকে নতুন লোক এসেছে—অথচ কোনো খেয়াল নেই—সম্পূর্ণ উদাসীন।

পলকহীন চোখে চেয়েছিলাম বলেই কিনা জানি না, হঠাৎ মনে হল এ-চেহারা যেন এর আগেও দেখেছি। ওয়াশিংটনে খড়খড়ি তুলে প্রথমবার দেখে কেন তখন একথা মনে হয়নি ভেবে পেলাম না। হওয়া উচিত ছিল। পুলিশ দপ্তরে কোনো ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মিল আছে কী? না কি, পথ হাঁটতে হাঁটতে দোকানে সাজানো কোনো আলোকচিত্র দেখে ঠিক মনে করতে পারছি না? স্মৃতি অবশ্য স্পষ্ট নয়—কুয়াশার মত আবছা। হয়ত মনের বিভ্রান্তি।

সঙ্গীদের মত অতটা অসভ্য হয়তো নন উনি। কথা বললে জবাব না দিয়ে পারবেন কী? আমি ইংরেজী বলি, তিনিও ইংরেজী বলেন। জন্ম আমেরিকায় কিনা, তা বলা অবশ্য মুস্কিল। পাছে কথা বললেই ধরে ফেলি, এই জন্যেই কি এড়িয়ে যেতে চান আমাকে? কয়েদী বানিয়েই খালাস?

আমাকে কয়েদ করেই তিনি নিশ্চিন্ত? না, অন্য অভিপ্রায় আছে? তাঁর সম্বন্ধে যা জেনেছি, তা অতি সামান্য হলেও সাবধানের মার নেই। পৃথিবীর মানুষ এই খবর জেনে তাঁকে বিপদে ফেলতে পারে। মুখ বন্ধ করার জন্যে কি নিধন করবেন আমাকে রাত ঘনিয়ে এলেই? ছুঁড়ে ফেলে দেবেন অথৈ জলে? খতম করার উদ্দেশ্য থাকলে জল থেকে না তুললেই পারতেন? নতুন করে জলে ডুবিয়ে পাপ করতে হত না?

গটগট করে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। সোজা চাইলাম চোখের দিকে। কিছুক্ষণ পরে চোখে চোখ রাখলেন উনি। চোখ তো নয়, যেন জ্বলন্ত মালসা! যেন ফুলকি ঠিকরোচ্ছে লালাভ মণিকা থেকে।

শুধোলাম—"আপনি-ই ক্যাপ্টেন?"

নিরুত্তর রইলেন দুনিয়াধিপতি।

"এই বোট! এরই নাম কি 'টেরর'?"

এবারও কোনো জবাব এল না। এক পা এগিয়ে গেলাম। অদম্য ইচ্ছে হল দুহাতে ধরে নাড়া দিই লৌহ কাঠামোকে।

হাত ধরতে গিয়েছিলাম, কিন্তু উনি অবলীলাক্রমে সরিয়ে দিলেন আমাকে। দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করার দরকার হল না—বেশ বুঝিয়ে দিলেন অপরিমিত শক্তিকে দেহের মধ্যে সংযত করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে।

ফের এসে দাঁড়ালাম সামনে। বুক চিতিয়ে চড়া গলায় শুধোলাম "কি করতে চান আমাকে নিয়ে?"

মনে হল এই বার বুঝি কথার বাঁধ ভাঙবে। বন্যার মত বাক্যস্রোত ছুটে আসবে মুখ দিয়ে। ঠোঁট কাঁপল ক্যাপ্টেনের। কিন্তু পরক্ষণেই অসীম শক্তিবলে সামলে নিলেন নিজেকে। স্পষ্ট দেখলাম, বিরক্ত হচ্ছেন [illegible] কথা [illegible] এড়ানোর জন্যেই যেন মাথা ঘুরিয়ে রেগুলেটর জাতীয় একটা যন্ত্র স্পর্শ করতেই আরো বেগে ছুটে চলল 'আতংক'।

রাগের চোটে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ইচ্ছে হল তার স্বরে চেঁচিয়ে বলি—'কথা বলতে চান না? মুখ বুঁজে থাকতে চান? কিন্তু আমি জানি আপনি কে। আমি জানি কি নাম আপনার যন্ত্রযানের। ম্যাডিসন, বোস্টন, লেক [illegible] এই যন্ত্রযানকেই দেখা গিয়েছিল বারবার। হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনার যন্ত্রযান! আপনিই বেপরোয়াভাবে গাড়ী হাঁকিয়ে [illegible] লেন রাস্তায়, সাগরে, হ্রদে। এই সেই যন্ত্রযান—টেরর! আপনিই তার কম্যাণ্ডার। গভর্ণমেণ্টকে আপনি শাসিয়ে চিঠি লিখেছিলেন এই যন্ত্রযান থেকে। আপনিই মনে মনে তাসের প্রাসাদ কল্পনা করেছেন, ভেবেছেন সারা দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করে পার পেয়ে যাবেন। স্পর্ধা আপনার অসীম—তাই 'মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড' খেতাব নিয়ে মালিক হতে চান এই পৃথিবীর। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।"

অস্বীকার করতে পারতেন কী? পারতেন না। হালের চাকার গায়ে দেখতেই পাচ্ছি খোদাই করা রয়েছে সুবিখ্যাত আদ্যক্ষর তিনটে—এম. ও. ডব্লিউ!

কিন্তু সামলে নিলাম অনেক চেষ্টায়! কথার জবাব যখন পাবোনা, তখন বসে থাকা যাক ডেকের ওপর। কেবিনের কাছে 'হ্যাচে'র পাশে বসে রইলাম গ্যাঁট হয়ে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইলাম ঐভাবে—চেয়ে রইলাম দিগন্ত পানে—তটরেখা দেখার প্রত্যাশায়। হ্যাঁ, প্রতীক্ষা নিয়েই বসে রইলাম! ডাঙার প্রতীক্ষা! একনাগাড়ে একদিকেই ছুটে চলেছে 'আতংক'—দিক পালটায়নি। সুতরাং দিন ফুরাবে, লেক ঈরীও ফুরোবে। ডাঙা দেখা যাবে!

(১৪) নায়গারা

ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেষ হল, পরিস্থিতি পাল্টালো না। চালক আবার ফিরে এসেছে ডেকে। ক্যাপ্টেন নেমে গেছেন। ইঞ্জিন ঠিকমত চলছে কিনা দেখছেন। স্পীড বেড়েছে বটে, কিন্তু ইঞ্জিনে এখনো তেমন শব্দ নেই। মোলায়েম ছন্দে মিহি শব্দে ধুক-ধুক-ধুক-ধুক করে চলছে শক্তিশালী কলকব্জা! আশ্চর্য সত্যিই আশ্চয! মোটরের ইঞ্জিনেও পিস্টন ছন্দ হারায়। মাঝে মাঝে তাল কেটে যায়—কিন্তু অত্যাশ্চয যন্ত্রযানে বেতাল বলে কিছু নেই। মনে হল, ত্রি-রূপী যন্ত্রযান যে-রূপই গ্রহণ করুক না কেন—রোটারি ইঞ্জিন তাকে ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যায়। নিছক অনুমান অবশ্য, প্রমাণ এখনো পাইনি।

গতিমুখ এখনো পালটায়নি। উত্তর পূবদিকেই অব্যাহত রয়েছে ছুটে চলা। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বাফেলোর তীরে গিয়ে ঠেকবে যন্ত্রযান।

বুঝলাম না কেন একনাগাড়ে একদিকেই ধেয়ে চলেছেন ক্যাপ্টেন। বাফেলোর যানবাহনের ভীড়ে নিশ্চয় ঢুকবেন না। কাতারে কাতারে নৌকো, জলযান ছেয়ে রয়েছে সেখানকার জলপৃষ্ঠ। জলপথে লেক থেকে নিষ্ক্রমণের অভিপ্রায় থাকলে নায়গারা নদী ছাড়া সামনে আর পথ নেই। কিন্তু নায়গারা প্রপাত দিয়ে 'আতংক' যেতে পারবে না। যত ক্ষমতাবান যন্ত্রযানই হোক না কেন, জলপ্রপাতের কাছে জারিজুরি চলবে না। লেক ঈরী থেকে জলপথে চম্পট দেওয়ার একমাত্র পথ হল ডেট্রয়েট নদী। কিন্তু ক্রমশঃ দূরে সরে আসছি সে পথ থেকে।

আর একটা সম্ভাবনা মাথায় এল। রাত নামলে লেকের পাড়ে ওঠবার মতলব নেই তো? জলযান হবে স্থলযান—মোটর গাড়ীর আকারে দ্রুতবেগে পেরিয়ে যাবে জনপদের পর জনপদ। তখন যদি না পালাতে পারি, আর কখনো পারবো না। ডাঙায় থাকতে থাকতেই সটকান দিতে হবে—মাটির মানুষ মাটিতেই জোর খাটাতে পারব—জলে নয়।

অবশ্য আমি যে সুযোগ পেয়েছি, তা অন্যের বরাতে আজও জোটেনি। 'টেরর-য়ের গোপন তত্ত্ব আবিষ্কার করার সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাতে রাজী নই। শত্রুর শেষ রাখতে নেই জেনেও ক্যাপ্টেন আমাকে নিকেশ করেন নি। কিন্তু আমার কাজ আমি করব না কেন?

লেক ঈরীর উত্তর পূব অঞ্চল আমার নখদর্পনে। অ্যালবানি থেকে বাফেলো পর্যন্ত নিউইয়র্ক স্টেটের এই অঞ্চলের সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানি আমি। অনেকবার আসতে হয়েছে এসব জায়গায় সরকারী তদন্তে। বছর তিনেক আগে পুলিশ কর্তার হুকুমে এসেছিলাম। নায়গারা নদীর দু'তীর, জলপ্রপাতের ওপর এবং নীচ, এমন কি ঝুলন্ত সেতুটা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে গিয়েছি। বাফেলো আর নায়গারা জলপ্রপাতের মধ্যবর্তী দুটো ক্ষুদে-দ্বীপও দেখে গিয়েছি। কানাডা আর আমেরিকান প্রপাতের মধ্যরেখায় অবস্থিত নেভী আয়ল্যাণ্ড আর গোট আয়ল্যাণ্ড তন্নতন্ন করে তল্লাস করেছি সরকারী হুকুমে।

সুতরাং জায়গাটা আমার কাছে অপরিচিত নয়। যদি মুক্তি পাই, পথ চিনতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু সুযোগ কি আসবে? সবচেয়ে বড় কথা, মনকে চোখ টিপে লাভ কি? আমার মন কি সত্যিই পালাতে চাইছে? পালানোর সুযোগ সামনে এলেও মন কি সায় দেবে? দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না—ভাগ্য যখন এনে ফেলেছে যন্ত্রযানের অভ্যন্তরে—সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে পালাতে যাবো কেন?

তাছাড়া, নায়গারা নদীর তীরভূমিতে নাও যেতে পারে 'টেরর'। যাওয়া মানেই ফাঁদে পা দেওয়া। লেকের প্রান্তদেশ পর্যন্তও পৌছোবে কিনা সন্দেহ।

উত্তেজিত মগজের মধ্যে আবোল তাবোল চিন্তার দাপাদাপি চললেও চোখ কিন্তু স্থির রইল শূন্য দিগন্তের পানে।

কিছুতেই কিন্তু মূল সমস্যাটার সমাধান করতে পারলাম না। আদৎ হেঁয়ালিটা কিছুতেই স্থির থাকতে দিল না আমাকে। আমাকে হুমকি দিয়ে অমন চিঠি নিজের হাতে কেন লিখেছিলেন ক্যাপ্টেন? কেন স্পাইয়ের মত গোপনে নজর রেখেছিলেন আমার গতিবিধির ওপর? গ্রেট ঈরীর সঙ্গে তাঁর অন্তর্নিহিত সম্পর্কটা কোথায়? লেক কিরডালের তলা দিয়ে হয়ত পাতাল সুড়ঙ্গ আছে—কিন্তু ঈরীর অজেয় শিখর দেশ ভেদ করেছিলেন কিভাবে? আদৌ করতে পেরেছিলেন কী? না, পারেন নি! অসম্ভবকে সম্ভব করার সাধ্য তাঁরও নেই!

বিকেল চারটে বাজল। 'আতংক'র গতিমুখ আর গতিবেগ থেকে

আন্দাজ করে নিলাম, বাফেলো আর বেশীদূরে নেই। মাইল পনেরো দূরে ধোঁয়াটে রেখা দেখলাম দিগন্তের ওপর—বাফেলোই বটে। দু'চারটে নৌকো দেখলাম। কিন্তু অনেকদূর থেকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। কাছে ঘেঁসতে দিলেন না। ঐ স্পীডের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই কোনো নৌকোর। তাছাড়া, 'টেরর' এত পাতলা এবং ছিপছিপে যেন জলের সঙ্গে মিশে গেছে। একমাইল দূর থেকেও দেখা যায় না।

বাফেলোর ওদিকে পর্বত শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। লেক ঈরীকে বেষ্টন করে রয়েছে এই পর্বত বলয়। অনেকটা ফানেলের মত এই পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে লেক ঈরীর জল গিয়ে পড়ছে নায়গারা নদীতে। ডান দিকে দেখছি কয়েকটা বালিয়াড়ি আর বড় বড় গাছের জটলা। দূরে দেখা যাচ্ছে কলে-চলা স্টীমার আর মাছধরা নৌকো। নির্মল আকাশে ধোঁয়ার দাগ দেখতে দেখতে মুছে যাচ্ছে মৃদুমন্দ পুবের হাওয়ায়।

এতো বড় জবর ধাঁধা! এখনো ঐ দিকেই ছুটে চলেছেন ক্যাপ্টেন? বাফেলো-র দিক ছাড়া আর যেন দিক নেই! নাকি, আচম্বিতে হালের চাকায় মোচড় দিয়ে বোঁ করে ঘুরিয়ে নেবেন 'টেরর'-কে – ছুটে যাবেন লেকের পশ্চিম প্রান্তে। অথবা জলের নীচেও গোঁৎ দিতে পারেন। কিন্তু কেন উনি একগুঁয়ের মত এখনো ছুটে চলেছেন বাফেলোর দিকে? কেন? কেন? কেন?

অনেকক্ষণ পরে হালের চালক একদৃষ্টে উত্তর পূব দিগন্ত দেখতে দেখতে ইসারা করল দোসরকে। গলুইয়ের লোকটা তাই দেখে নেমে গেল মাঝের 'হ্যাচ' দিয়ে ইঞ্জিন রুমে। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন। হালধারীর সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে কথা বলতে লাগলেন।

হালধারী হাত তুলে কি যেন দেখলো। মাইল পাঁচ ছয় দূরে দুটো কালো ফুটকি দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে নয়— পাশের দিকে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। তারপর দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসলেন ডেকের ওপর আসনে—গতিপথ পালটালেন না।

সোয়া ঘন্টা পরে স্পষ্ট দেখলাম দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কালো ফুটকি দুটো যেখানে দেখা গিয়েছে, ঠিক সেইখান থেকে দুটো ধোঁযাব মেঘ ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিন্দু দুটো। লম্বাটে ধাঁচের নীচু গড়নের দুটো স্টীমার। বাফেলোবন্দর থেকে বেরিয়ে দ্রুতবেগে এগোচ্ছে এইদিকে।

বিদ্যুৎ চমকের মত খেয়াল হল—এই কি সেই টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার? মিস্টার ওয়ার্ড কি এদের কথাই আমাকে বলেছিলেন?

দুটো ডেস্ট্রয়ারই অত্যাধুনিক মডেলের—এদেশে এদের চাইতে দ্রুতগামী পোত আর নেই। সর্বাধুনিক ডিজাইনের শক্তিশালী ইঞ্জিন থাকায় গতিবেগ ঘণ্টায় তিরিশ মাইল। টেরর-য়ের গতিবেগ অবশ্য ঢের বেশী। চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেও পরোয়া করবে না—জলে ডুব দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠবে। ডেস্ট্রয়ার না হয়ে এরা যদি সাবমেরিন হত, খানিকটা পাল্লা দিতে পারত। শেষরক্ষা করতে পারত না যদিও—'টেরর' জলের তলাতেও টেরর—সাক্ষাৎ আতংক!

আর্থার টোলেডো ফিরেই তাহলে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে ডেস্ট্রয়ার কম্যাণ্ডারদের। অভিযান ব্যর্থ হয়েছে-খবর পেয়েই সাজ-সাজ রব উঠেছে রণতরীতে। টেরর-কে দেখতেও পেয়েছে নিশ্চয়। তাই পূর্ণবেগে ছুটে আসছে এইদিকে। টেরর-য়ের কম্যাণ্ডারের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথাব্যথাও নেই। বিরামবিহীনভাবে তিনি এগিয়ে চলেছেন নায়গারা নদীর দিকে।

মতলব কি টর্পেডো ডেস্ট্রয়ারের? লেক যেখানে সরু হয়ে নায়গারায় পড়ছে, সেইখানেই পথ আটকে দাঁড়াবে টেরর-য়ের! সঙ্কীর্ণ পরিসরে বাধা উপস্থিত হলে বেকায়দায় পড়বে টেরর। নায়গারা দিয়ে বেরোনোর পথ পাবে না—পিছু হটতেও পারবে না।

এবার ক্যাপ্টেন নিজে হালের চাকা ধরলেন। সঙ্গী দুজনে গিয়ে দাঁড়াল ডেকের সামনে আর পেছনে। আমি কি করব? নীচে যাওয়ার হুকুম হবে নাকি?

কিন্তু আমাকে নিয়ে কারো মাথাব্যথা আছে বলেও মনেই হল না। নীচে যাওয়ার হুকুমও হল না। আমি ডেকে হাজির আছি, তাও যেন কারো মনে নেই। অধীর আগ্রহে চেয়ে রইলাম দুই ডেস্ট্রয়ারের অগ্রগতির দিকে। মাইল দুই তফাতে এসে ওরা দুদিকে সরে গেল এবং দুপাশ থেকে কামানের আওতার মধ্যে এনে ফেলল টেরর-কে।

ক্যাপ্টেনের চোখে মুখে অপরিসীম তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কোনোভাব দেখছিনা। ডেস্ট্রয়ার দুটোয় যত মারণাস্ত্রই থাকুক না কেন; তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা যে নেই। সে বিষয়ে যেন তিলমাত্র সংশয় নেই তাঁর মনে। তাঁর দানবিক শক্তির সামনে যেন দুটো পিঁপড়ে হাজির হয়েছে, অনেকটা সেইভাবে অনুকম্পা মিশ্রিত চোখে তাকিয়েছিলেন উনি। উনি তো জানেন, আশ্চর্য মেশিনের কলকব্জা ছুঁতে না ছুঁতেই তিনি ওদের পেছনে ফেলে উধাও

হবেন। কামান ছুঁড়বে রণপোত? ছুঁড়ুক না! চক্ষের পলকে সে মোড় নিয়ে কামানের গোলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চম্পট দেবেন! নয়তো সাঁ করে ডুব মারবেন লেকের তলায়—কামানের গোলা সাবমেরিনের গায়ে আঁচড় কাটতে পারে কি?

পাঁচমিনিট পর দেখলাম মাইলখানেক দূরে এসে পৌঁছেছে রণপোত দুটো। ক্যাপ্টেন গতি বাড়ালেন না—ওদের আরো এগিয়ে আসতে দিলেন। তারপর একটা হাতল ধরে চাপ দিতেই যেন লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গেল টেরর। দ্বিগুণবেগে ঘুরছে প্রপেলার—জল তোলপাড় করে সামনে ছুটছে যন্ত্রযান!

বুঝেছি! খেলছে ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে। আশে পাশে সটকান দেওয়ার মতলব নেই—ছুটছে সামনের দিকে। ক্যাপ্টেনের সাহস তো কম নয়! এরপর হয়ত, দেখবো বোঁ করে পেছন ফিরে আগুয়ান যুদ্ধ জাহাজ দুটোর মাঝ দিয়ে ছুঁচের মত জল কেটে সাঁৎ করে বেরিয়ে যাবে টেরর। অনেকক্ষণ নাচিয়ে নাজেহাল করার পর ডুব দেবে জলের তলায় সন্ধ্যে গাঢ় হলেই।

লেকের প্রান্তে বাফেলো নগরীকে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সুউচ্চ অট্টালিকা, গির্জের চূড়ো, ফসল-লিফট—সব দেখতে পাচ্ছি। আর চার পাঁচ মাইল গেলেই নায়গারা নদী পড়বে উত্তর দিকে।

এ-পরিস্থিতিতে আমার কি করা উচিত? ডেস্ট্রয়ারের সামনে দিয়ে অথবা মাঝের ফাঁক দিয়ে যাওয়ার সময়ে জলে ঝাঁপ দেব? মাছের মত সাঁতার কাটতে পারি, এ সুযোগ কি ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে? ক্যাপ্টেনের ক্ষমতা হবে না ফের জল থেকে তোলবার। তবে হ্যাঁ, গুলি চালাতে পারেন। ডেস্ট্রয়ার দুটোর নজরে পড়ব নিশ্চয়। এতক্ষণে নিশ্চয় ওদের ডেক থেকে কম্যাণ্ডার আমাকে দেখতেও পেয়েছেন। জলে ঝাঁপ দিলেও দেখতে পাবেন—লাইফবোট নামিয়ে উদ্ধার করবেন-ই।

অবশ্য নায়গারা নদীর ভেতরে ঢুকলে পলায়নের সম্ভাবনা আরো বাড়বে। নেভী আয়ল্যাণ্ডে পা দিলে আর আমাকে রোখে কে—ওখানকার প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গা আমার চেনা। কিন্তু যদি জলপ্রপাতের টানে পড়ে 'টেরর'? অসম্ভব! অত ঝুঁকি নেবেন না ক্যাপ্টেন! অত ভেবে দরকার কি? অপেক্ষা করা যাক। ডেস্ট্রয়ার দুটো কাছাকাছি এলে ঠিক করব কি করা উচিত।

এতকথা ভাবছি বটে, মন সায় দিচ্ছে না কিছুতেই। রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত থেকেও রহস্যের চাবিকাঠি না নিয়ে যাওয়া সমীচীন কি? আমার পুলিশী সত্তা বেঁকে বসল। কর্তব্য আগে, না, পলায়নের ভাবনা আগে?

আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত মানুষটা আমার নাগালের মধ্যেই হাজির—হাত বাড়ালেই হাতকড়া পরানো যায়! তা সত্ত্বেও আমি চম্পট দেব? না, না, না! কিছুতেই না! এ-ভাবে পালানো চলবে না। কিন্তু না পালিয়েই বা যাবো কোথায়? যাচ্ছি কোথায় আমি? ডেকে থাকলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধি তো হচ্ছেই না। উপরন্তু কোথায় নিয়ে চলেছে টেরর, তাও জানি না।

সাড়ে ছটা বাজে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পূর্ণবেগে ছুটে আসছে রণপোত দুটো। গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে চিমনি দিয়ে। অত জোরে ছুটলে জাহাজ কাঁপবে বই কি! কিন্তু মাঝের দূরত্ব অনেক কমে এসেছে। টেরর-য়ের ঠিক পেছন পেছন পুরোদমে ছুটে আসছে ওরা। আর মাত্র বারো অথবা পনেরো 'কেব্‌ল লেংথ' (এক 'কেব্‌ল লেংথ' মানে ৬০০ ফুট) ব্যবধান রয়েছে দেখেও কিন্তু স্পীড বাড়াচ্ছে না টেরর।

ডেস্ট্রয়ার দুটো দুপাশে সরে যাচ্ছে। টেরর-য়ের ডাইনে আর বাঁয়ে গিয়ে তৈরী হল কামান দাগার জন্যে।

আমি জায়গা ছেড়ে নড়লাম না। গলুইয়ের কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে আমি তার পাশেই রয়েছি। পাথরের মূর্তির মত হালের চাকা ধরে জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। কুঞ্চিত ললাটে তিনি যেন সময় গুনছেন। শেষ মুহূর্তে ভেল্কী দেখাবেন।

আচম্বিতে বাঁ দিকে একতাল ধোঁয়া ভক করে লাফিয়ে উঠল ডেস্ট্রয়ারের ডেক থেকে। গোলাটা জলপৃষ্ঠ ঘেঁসে এল বটে, তবুও স্পর্শ করতে পারল না টেরর-কে। মাথার ওপর দিয়ে তীব্র শব্দে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল ডানদিকে—ডাইনের ডেস্ট্রয়ারকে ছাড়িয়ে ঠিকরে গেল বহুদূর।

উদ্বিগ্ন চোখে তাকালাম আশে পাশে। আমার পাশের লোকটা ক্যাপ্টেনের নির্দেশ শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছে। ক্যাপ্টেন কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়েও দেখলেন না লক্ষ্যভ্রষ্ট গোলাকে। মানুষের চোখে তাচ্ছিল্যের এ-হেন অভিব্যক্তি ইতিপূর্বে দেখিনি। ক্যাপ্টেনের সেই মুখচ্ছবি আমি জীবনে ভুলব না।

ঠিক এই সময়ে আচমকা আমাকে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হল 'হ্যাচ' খুলে কেবিনের মধ্যে। মাথার ওপর বন্ধ হয়ে গেল জল নিরোধক 'হ্যাচ'। শুনলাম, অন্য দুটো 'হ্যাচ'ও বন্ধ হল একে একে। একফোঁটা জলও আর ঢুকবে না। কলকব্জার ধুকপুকুনি স্পষ্ট হল; ডুব দিচ্ছে যন্ত্রযান। দেখতে দেখতে ঢেউয়ের তলায় অদৃশ্য হল সাবমেরিন। কামান-গর্জন তখনো শোনা গেল মাথার ওপর। জলের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে গুম-গুম প্রতিধ্বনি।

তারপর তাও আর শোনা গেল না। শান্তি শান্তি শান্তি। পোর্টহোল দিয়ে আবছা আলো আসছে কেবিনের মধ্যে। একদম দুলছে না সাবমেরিন—নিঃশব্দে ছুটছে হ্রদের তলা দিয়ে।

স্বচক্ষে দেখলাম কি দ্রুতবেগে অথচ কত সহজে রূপ পালটালো টেরর। নিশ্চয় মোটরগাড়ী হওয়ায় সময়েও বেগ পেতে হয় না। বরং আরো সহজে, আরো তাড়াতাড়ি সাঙ্গ হয় রূপান্তর গ্রহণ।

এবার কি অভিপ্রায় দুনিয়াধিপতির? ডাঙায় উঠে মোটর হবার সাধ না থাকলে নিশ্চয় এবার মোড় ফিরবেন। নিশ্চয় পশ্চিমদিকে রওনা হবেন, ডেস্ট্রয়ার দুটোকে দেখতে দেখতে পেছনে ফেলবেন এবং ধাবিত হবেন ডেস্ট্রয়েট নদী অভিমুখে। কামানের আওতা থেকে বাইরে থাকার জন্যেই তো ডুব দিয়েছেন, রাত নামলেই নিশ্চয় ফের ভেসে উঠবেন।

কিন্তু বিধাতার পরিকল্পনা অন্যরকম ছিল। উত্তেজনাপূর্ণ দৌড় প্রতিযোগিতা এত সহজে শেষ করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তাই দশ মিনিট যেতে না যেতেই আতংক-র ভেতরে উত্তেজিত কথাবার্তা। শুনলাম ইঞ্জিনরুমে কথা কাটাকাটির শব্দ ভেসে এল। কলকব্জাও আর নিয়মিত ছন্দে চলছেনা—বেতাল হচ্ছে। সেই সঙ্গে শব্দহীন ইঞ্জিনে বিশ্রী শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় কোনো গোলমাল দেখা দিয়েছে যন্ত্রপাতিতে—ওপরে ভেসে ওঠা ছাড়া আর পথ নেই।

ভুল অনুমান করিনি। পরমুহূর্তে কেবিনের আলো-আঁধারি কেটে গেল রোদের আভায়। পোর্টহোল থেকে জল নেমে গেছে—আকাশের আলো আসছে। টেরর জল পৃষ্ঠে ভেসে উঠেছে। ডেকের ওপর পদ শব্দ শুনলাম। 'হ্যাচ' খোলার শব্দ ভেসে এল। আমার 'হ্যাচ' খোলা হতেই মই বেয়ে লাফ দিয়ে পড়লাম ডেকে।

হালের চাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। অন্য দুজন ব্যস্ত নীচের তলায়। ডেস্ট্রয়াররা রণে ভঙ্গ দিয়েছে কি? না, যায়নি। ঐ তো ছুটে আসছে পেছন পেছন! মাত্র সোয়া মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে তাদের মারমুখো চেহারা! টেররকে ফের দেখতে পেয়েছে জাহাজের লোকজন। সরকারী হুকুমনামা বহন করে দু'দুটো শক্তিশালী লঞ্চেরে পোত ফের ধাওয়া করেছে পেছনে।

'টেরর' গতি মুখ পালটালো না। আগের মতই ছুটে চলল নায়গারা নদীর দিকে।

ক্যাপ্টেনের রণনীতি বুঝতে গিয়ে মাথার মধ্যে গোলমাল লেগে গেল।

জলের তলায় থাকা সম্ভব হল না, মেশিন বজ্জাতি জুড়েছে বলে। বেশ তো, পেছন ফিরে চম্পট দিলেই তো হয়। অবশ্য সে পথ জুড়ে কামান বাগিয়ে ছুটে আসছে রণপোত দুটো। তবে কি উনি ডাঙায় উঠে মোটরযানে রূপান্তরিত হয়ে গা-ঢাকা দিতে চান ? পারবেন কি ? টেলিগ্রাম 'টেরর'-য়ের আগে পৌঁছে যাবে সামনের পুলিশ ঘাঁটিতে। সাজ-সাজ রব পড়ে যাবে রাস্তায় !

মাত্র আধমাইল এগিয়ে আছি আমরা। ডেস্ট্রয়ার দুটো বেকায়দায় পড়েছে। পেছনে থাকায় কামান দাগতে পারছেনা। টেরর-আরো বেগে ছুটে দূরে সরে যেতে পারে। রাত ঘন হলেই অন্ধকারে গা ঢেকে ফাঁকি দিতে পারে শত্রুপক্ষকে ! কিন্তু এই সহজ চেষ্টাটাও করছেন না ক্যাপ্টেন। এক আধমাইল ব্যবধান বজায় রাখতেই যেন তিনি ইচ্ছুক।

বাফেলো নগরী মিলিয়ে গেল ডানদিকে। সাতটার একটু পরে চোখের সামনে ভেসে উঠল নায়গারা নদীর প্রবেশ পথ। ক্যাপ্টেন যদি তাড়া খেয়ে এ নদীতে ঢোকেন, তাহলে তাঁকে পাগল বলব। বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া কেউ কানাগলিতে ঢোকে পেছনে শত্রু নিয়ে? মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে কি দুনিয়াধিপতির ? পাগল না হলে কেউ নিজেকে জগদীশ্বর বলে জাহির করে ?

কিন্তু অবাক হলাম তাঁর প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখে। নিথর নিশ্চল নিষ্কম্পদেহে দাঁড়িয়ে আছেন হাল ধরে। ঘাড় ফিরিয়েও দেখছেন না রণপোত দুটো আর কতদূর। ঠোঁটের কোণে ভাসছে সেই আশ্চর্য ভাবের খেলা—তাচ্ছিল্য ! তাচ্ছিল্য ! সীমাহীন তাচ্ছিল্য !

বিস্মিত হলাম মানুষটার এ-হেন রূপ দেখে ! অসীম আত্মপ্রত্যয় দেখে !

লেকে কেউ নেই। খাঁ-খাঁ করছে। জল বিপজ্জনক বলে যাত্রিবাহী স্টীমারগুলোও এ-তল্লাটে আসে না। ছন্নছাড়া দু'একটা স্টীমার আসে বটে নায়গারার তীরভূমির বাসিন্দাদের নিয়ে—এখন তা-ও দেখা যাচ্ছে না। এমন কি জেলে ডিঙি পর্যন্ত জলে ভাসছে না। বিপজ্জনক জলপৃষ্ঠ তোলপাড় করে আরো যদি এগোই, ডেস্ট্রয়ার দুটো রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হবে। যেচে মরতে কেউ চায় কি ?

আগেই বলেছি, নায়গারা নদী বইছে নিউইয়র্ক আর কানাডার মধ্যে। চওড়ায় প্রায় পৌনে একমাইল—প্রপাতের যত কাছে এসেছে, ততই সরু হয়েছে জল ধারা। লেক ঈরী থেকে লেক ওনটারিও পর্যন্ত দৈর্ঘ প্রায় পনেরো লীগ। সারি সারি সাজানো যেন একটা হ্রদের নেকলেস—নদী দিয়ে গাঁথা হ্রদের মালা। উত্তরদিকে গিয়ে লেক সুপিরিয়র, মিচিগান, হুরণ আর ঈরীর জলরাশি হুড়হুড় করে ঢালছে পশ্চিমের লেক ওনটারিওতে। প্রকাণ্ড নদীর

মাঝামাঝি জায়গায় নিরন্তর গর্জন করে আছড়ে পড়ছে দেড়শ ফুট উঁচু নায়গারা জলপ্রপাত। কেউ কেউ এ-প্রপাতকে অশ্ব-খুর প্রপাত (হর্স-শু ফল্‌স্‌) বলে। কেননা, ভেতর দিকে জলপ্রপাতটা লোহার খুরের মত বেঁকে গিয়েছে। রেড ইণ্ডিয়ানরা নাম দিয়েছে—'জলের বজ্রনাদ'। সত্যি সত্যিই বিরামবিহীন ভাবে যেন সহস্র বজ্রপাত ঘটছে সেখানে সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকে। বহু মাইল দূর থেকে শোনা যায় জলের বজ্রনাদ—বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে!

লেক ঈরী আর নায়গারা জলপ্রপাতের ছোট্ট শহরের মাঝামাঝি জায়গায় দুটো দ্বীপ নদীর জলধারাকে দ্বিধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রপাত থেকে একলীগ ওপরে নেভী আয়ল্যাণ্ড এবং আমেরিকান আর কানাডিয়ান ফল্‌স্‌-য়ের মধ্যরেখায় গোট আয়ল্যাণ্ড। গোট আয়ল্যাণ্ডের শেষ প্রান্তে এককালে অসমসাহসিক কারিগররা বানিয়েছিল 'টেরাপিন টাওয়ার'—খাদের একদম কিনারায় নীচের দিকে ধাবমান জলরাশির ঠিক মাঝখানে! দুঃসাহস একেই বলে! ডানপিটেদের সেই কীর্তি আজ অবশ্য নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। যুগযুগ ধরে জলস্রোত তলাব পাথর নাড়িয়েছে, সরিয়েছে। পুরো পাথবের ভিতটা সরে সরে গেছে ঢেউযেব টানে। তারপর একদিন প্রপাত গ্রাস করেছে টাওয়ারকে।

নদীর প্রবেশ মুখে কানাডার মাটিতে ফোর্ট ঈরী নগরী। প্রপাতের দুপাশে রয়েছে আরো দুটো ক্ষুদে নগরী - নেভী আয়ল্যাণ্ডেরও দুপাশে বলা যায়। এইখানেই জলধাবা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসায় প্রচণ্ড বেগে ধেযে গিয়ে দুমাইল দূরে আছডে পড়ে জল প্রপাতের আকারে।

ফোর্ট ঈরী পেরিয়ে এসেছে টেরর। পশ্চিমেব সূয কানাডার দিগন্ত ছুঁয়েছে। দক্ষিণের কুয়াশা ভেদ করে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবৃত হব অন্ধকারের যবনিকায়।

ধোঁয়ার বিরাট মেঘ উঠছে পেছনেব ডেস্ট্রয়ার দুটোর চিমনি দিয়ে। মাইলখানেক পেছনে মরণ পণ করে তারাও সমানে ছুটে আসছে সর্বোচ্চবেগে। দুপাশের তীরে সবুজ গাছপালা আর বাগানসহ কুটিরের সারি দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনে।

না, 'টেরর' আর পিছু হটতে পারবেনা। সঙ্কীর্ণ পথ জুড়ে কামান বাগিয়ে ছুটে আসছে রণতরী দুটো। ওদের কম্যাণ্ডাররা অবশ্য জানেন না, টেরর-য়েব কল বিগড়েছে—ইচ্ছে করলেই ডুবোজাহাজ হতে পারবেনা। তা সত্ত্বেও চিনেজোঁকের মত ওরা আসছে পেছনে—নজর ছাড়া করতে রাজী নয় কিছুতেই! দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত!

বিপজ্জনক জলরাশি ঠেলে ওদের ছুটে আসা দেখে চমৎকৃত হলাম আমি। প্রশংসনীয় সাহস বটে। তার চেয়েও বেশী চমৎকৃত হলাম আমাদের ক্যাপ্টেনের আচরণ দেখে। বড় জোর আধঘণ্টা—তারপরেই পথ জুড়ে গজরাচ্ছে জলপ্রপাত। এ-মেশিন যত শক্তিমানই হোক না কেন, জলধারার শক্তির কাছে কিছুই নয়। স্রোতের টানে একবার বেসামাল হলেই সব শেষ। প্রপাতের জলধারা যে দুশ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়েছে প্রপাতের তলায়—'টেরর নিশ্চিহ্ন হবে সেই গর্তের মধ্যে। এখনও হয়ত সময় আছে। দুপাশের যে কোনো তীরভূমিতে উঠে মোটর হয়ে চম্পট দেওয়ার এখনো সময় আছে।

উত্তেজনা-থরথর মুহূর্তে কি করব আমি? ব্যক্তিগত ভাবে আমার কি করার আছে? নেভী আয়ল্যাণ্ড পর্যন্ত গেলে জলে ঝাঁপ দিয়ে তীরে ওঠবার চেষ্টা করব? এ সুযোগ যদি গ্রহণ না করি, দুনিয়াবিপর্যয় আর কি আমাকে মুক্তি দেবেন? যে টুকু গুহ্যতত্ত্ব জেনেছি, সেইটুকুই বর্তমান অভিযানের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

কিন্তু পলায়ন বোধহয় আর সম্ভব না। কেবিনে বন্দী নই বটে, কিন্তু নজরবন্দী রয়েছি ডেকের ওপরে। ক্যাপ্টেন হুইলের চাকা নিয়ে ব্যস্ত বটে, কিন্তু সহকারী লোকটা আমার ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না। পালানোর জন্যে পা বাড়ালেই খপ করে চেপে ধরবে এবং কেবিনে পুরে তালা দিয়ে রাখবে। না, আর কোনো পথ নেই। 'টেরর'-এর ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যও জড়িয়ে গেছে। একই পরিণতি হবে দুজনেরই।

ডেস্ট্রয়ার আর 'টেরর'-এর মধ্যখানের ব্যবধান দ্রুত কমে আসছে। দেখতে দেখতে মাত্র কয়েক কেবল্ লেংথ দূরে এসে পৌঁছোলো অনুসরণকারীরা। ব্যাপার কি? জলস্থলে অ্যাকসিডেন্টের ফলে 'টেরর'-এর মোটরটিও বিগড়েছে নাকি? ক্যাপ্টেনের কিন্তু কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়েও দেখছেন না। নিরুদ্বেগে তাকিয়ে আছেন সামনে। ডাঙায় ওঠার চেষ্টাও করছেন না।

ডেস্ট্রয়ারের ভাল্ভ থেকে বাষ্প বেরোনোর হিস্‌হিস্ শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে মেঘ উড়ে যাচ্ছে পেছন দিকে। তার চেয়েও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি মাইল তিনেক দূর থেকে ভেসে আসা জলপ্রপাতের বজ্রনাদ।

'টেরর' নেভী আয়ল্যাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে গেল বাঁ দিকের নদীশাখা দিয়ে। তীরভূমি নাগালের মধ্যে এসে গেছে, তা সত্ত্বেও সিধে সামনে ছুটে চলল যন্ত্রযান। পাঁচ মিনিট পরেই দেখলাম গোট আয়ল্যাণ্ডের প্রথম বৃক্ষসারি।

"জলস্রোত ক্রমশঃ দুর্দমনীয় হচ্ছে। 'টেরর' না থামে থামুক, ডেস্ট্রয়ারদের এবার থামতেই হবে। ক্যাপ্টেনের সখ হতে পারে খড়কুটোর মত ভয়ংকর জলরাশিতে গা ভাসাতে—অনুসরণকারীদের প্রাণের মায়া আছে! প্রপাতের তলদেশে গভীর গর্তে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছে সুস্থ মানুষের থাকে না!

ইসারা হয়ে গেল দুই ডেস্ট্রয়ারের মধ্যে—রুদ্ধ হল গতি। জলপ্রপাত থেকে ওদের দূরত্ব আর মাত্র ছশ' ফুট। ডেকের ওপর থেকে বজ্রগর্জনে কামান দাগা শুরু হল। একটার পর একটা গোলা শন্ শন্ করে উড়ে গেল 'টেরর'য়ের মাথার ওপর দিয়ে—জলের সঙ্গে প্রায় মিশে থাকায় ডেকে আঁচড়টিও লাগল না।

সূর্য অস্ত গিয়েছে। গোধূলির মধ্য দিয়ে টিমটিম করছে দক্ষিণের চাঁদ। ম্লান আলোয় ছায়াদানবের মত ছুটছে 'টেরর'। স্রোতের টানে শয়তানের শকটের গতিবেগ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। যেন একটা কক্ষচ্যুত উল্কা ধেয়ে চলছে—নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। আর দেরী নেই। এবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ব কানাডিয়ান ফল্‌স্‌-য়ের মরণ-কূপে!

আতংক বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, বিদ্যুৎরেখার মত পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গোট আয়ল্যাণ্ডের তীরভূমি। এল প্রপাতের বাষ্প আবৃত 'থ্রি-সিস্টার্স' দ্বীপ।

জ্যামুক্ত তীরের মত লাফ দিলাম আমি। খড়কুটো আঁকড়ে ধরেও প্রাণ বাঁচানোর অভিপ্রায়ে জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এমন সময়ে পেছন থেকে একজন জাপটে ধরল আমাকে।

আচম্বিতে তীক্ষ্ণ তীব্র আওয়াজ শোনা গেল ধুক-ধুক মেশিন-শব্দের মধ্যে। যন্ত্রযানের দুপাশে গুটিয়ে রাখা সুদীর্ঘ গ্যাংওয়ে দুটো খুলে গেল পাখীর ডানার মত এবং ঠিক সেই মুহূর্তে প্রপাতের কিনারায় পৌঁছেই 'টেরর' লাফিয়ে উঠল শূন্যে—বজ্রনাদ জলপ্রপাতকে নীচে ফেলে চান্দ্র-রামধনুর মাঝ দিয়ে আকাশের আতংকর মত উড়ে গেল আকাশে!

(১৫) ঈগলের বাসা

পরের দিন সকালে লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে মনে হল যন্ত্রযান স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না, দুলছে না। ডাঙাতেও ছুটছি না; জলের ওপর বা নীচ দিয়ে যাচ্ছি না; আকাশপথে উড়ছি না। তবে কি গোপন ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছেন দুনিয়াধিপতি? যে স্থানের হদিশ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি। তিনি

ছাড়া বিশ্বের আর কোনো মানব যেখানে ইতিপূর্বে পদার্পণ করেনি—অজ্ঞাত সেই বিবরে উপনীত হয়েছেন রহস্যাবৃত 'মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড'?

আমাকে নিয়ে বিব্রত নন ভদ্রলোক। তিলমাত্র বিড়ম্বনা বোধ করেন না আমার উপস্থিতিতে। সুতরাং, এইবার কি উদ্‌ঘাটিত হবে তাঁর গোপনতম রহস্য?

অবাক হলাম আমার ঘুমের বহর দেখে। মোষের মত ঘুমিয়েছি আমি। যতক্ষণ আকাশে উড়েছে 'টেরর', ততক্ষণ ঘুমিয়েছি অঘোরে। কেন? নিশ্চয় খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। হুঁশিয়ার মানুষ তো! আকাশপথে কোথায় চলেছি, আমি যেন তা দেখতে না পাই—তাই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত আমার মনের অবস্থা ভোলবার নয়। অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। জলপ্রপাতের শেষ কিনারায় গিয়েও অতিকায় পাখীর মত সুবিশাল ডানা মেলে শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছিল 'টেরর'—প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ঝপাঝপ করে বাতাস কেটে ধেয়ে গিয়েছিল আকাশের দিকে। চূড়ান্ত মুহূর্তে এ হেন নাটকীয়তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই বিহ্বল হয়ে দেখেছিলাম ত্রিরূপী যন্ত্রযানের চতুর্থ রূপ!

একা সৃষ্টি করেছেন ক্যাপ্টেন? একই মেশিন চারভাবে মানুষের সেবা করবে? একাধারে মোটর গাড়ী, বোট, ডুবোজাহাজ, উড়োজাহাজ! আকাশ, সমুদ্র, পৃথিবী—ত্রিভুবনের সর্বত্র তাঁর অবাধগতি। নিছক গতি বললে কম বলা হবে। এ-হেন প্রচণ্ড গতিবেগ, ইঞ্জিনের দুর্দান্ত শক্তি যে কল্পনাতেও আনা যায় না। স্বচক্ষে দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে রূপান্তর গ্রহণ! জলের যন্ত্রযান আকাশে উড়ল ভীমগর্জনে—ক'সেকেণ্ড লাগল? আশ্চর্য! অদ্ভুত! বিচিত্র! একই ইঞ্জিন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সমানে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে এতবড় যন্ত্রযানকে। গল্প কথা নয়—সাক্ষী আমি স্বয়ং। সুইচ টেপার সঙ্গে জলের মাছ যে আকাশের পাখী হতে পারে—অসম্ভব সেই দৃশ্য আমি যে নিজের চোখে দেখেছি! এইভাবে আকাশের পাখীও নিশ্চয় ডাঙার ক্যাঙারু হয়ে নেমেছিল উইসকনসিনে মোটর রেসের রাস্তায়?

অনেক দেখেছি, কিন্তু পরম রহস্যটা এখনো দেখিনি। এখনো জানিনা কোন মহাশক্তি বলে অসাধ্য-সাধন করে চলেছেন ক্যাপ্টেন। এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি, কোত্থেকে তিনি শক্তি আহরণ করছেন, শক্তিমান ইঞ্জিনকে চালু রেখেছেন এবং ত্রিভুবন বিজয় করেছেন। এখনো জানতে পারিনি, কে তিনি? কে এই ত্রিভুবনেশ্বর? কি তাঁর পরিচয়? কিসের প্রেরণায় তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কর্তা হয়েও এত উদ্ধত, স্পর্ধিত এবং উচ্চাকাঙ্খী?

'টেরর' যখন নায়াগার জলপ্রপাত তলায় রেখে শূন্যমার্গে পাখা মেলে দিল, তখন থেকেই আমি কেবিনে বন্দী হলাম। পোর্ট হোল দিয়ে দেখলাম, চাঁদের আলোয় নীচের পৃথিবী দেখা যাচ্ছে। 'টেরর' উড়ে চলেছে নদীপ্রবাহের ওপর দিয়ে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে এল ঝুলন্ত সেতু। এখান থেকেই শুরু হয়েছে নায়গারা নদীর দুর্দমনীয় মোড় নেওয়া। আচমকা বাঁক নিয়ে নদীর জল নেমে গিয়েছে লেক ওনটারিও'র দিকে।

এরপর থেকেই মনে হল পূবদিকে মোড় নিয়েছে 'টেরর'। ক্যাপ্টেন তখনো হাল ধরে রয়েছেন। আমি আর ওঁর সঙ্গে কথা বলিনি। বলে লাভ কী? জবাব দেবেন না, খামোকা মুখ ব্যথা করতে চাইনা। লক্ষ্য করলাম, শূন্যলোকের পথঘাট পযন্ত ক্যাপ্টেনের মুখস্ত। জলপথে অথবা স্থলপথে তিনি যেমন অবলীলাক্রমে যন্ত্রযান চালিয়েছিলেন, শূন্যমার্গেও বিচরণ করছেন একই রকমভাবে। দ্বিধা সংকোচের বালাই নেই—পাখীর মত অতি সহজে উড়ে চলেছে বিশালকায় যান্ত্রিক বিস্ময়!

বিস্ময়কর কীর্তি সন্দেহ নেই! এতখানি সাফল্য অর্জন করার পর উনি যদি অহংভাবে আচ্ছন্ন হয়ে দুনিয়ার মালিক খেতাব গ্রহণ করেন, আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে কি? পৃথিবীর কোন মানুষ আজ পযন্ত যে মেশিন আবিষ্কার করতে পারেনি, এমন কি কল্পনাতেও আনতে পারেনি—উনি তা সৃষ্টি করেছেন। মানুষের তৈরী যে কোনো যন্ত্রযানের চাইতে লক্ষ গুণ শ্রেষ্ঠ তার 'টেরর'—মানুষ জাতটা নেহাতই অসহায় তাঁর 'আতংক'র সামনে। সুতরাং 'দুনিয়াবিপতি' খেতাব তাঁকেই মানায়! ত্রিভুবনকে পদানত করার মোক্ষম যন্ত্রযান যাঁর বাহন, তিনি কেন টাকার প্রলোভনে আত্ম বিক্রয় করবেন? কেন স্বর্ণলোভে বশীভূত হবেন? কেন বিশ্বের বিস্ময়কে অর্থ মূল্যে বিক্রয় করবেন? কোটি কোটি মুদ্রায় পদাঘাত করা তাঁর পক্ষেই সাজে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বচক্ষে তাঁর কীর্তি দেখবার পর বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজ পর্যন্ত তিনি যে আচরণ দেখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে তা তাঁর অসীম আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। তবে হ্যাঁ, গগনস্পর্শী উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণামটা কি? শেষ পযন্ত মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবে না তো?

'আতংক'র শূন্যবিহার শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই ঢলে পড়লাম নিদ্রাদেবীর কোলে। নিশ্চয় ঘুমপাড়ানি ওষুধের প্রভাবে। ক্যাপ্টেনের অভিপ্রায় ছিল না তাঁর গোপন ঘাঁটির পথঘাট দেখানো।

তাই বলতে পারবনা একত্রিশে জুলাই রাত্রে কোন পথে বাকী পথটুকু পাড়ি দিয়েছিল 'টেরর'। জানি না শূন্যপথেই আগাগোড়া অগ্রগতি অব্যাহত

ছিল কিনা, ফের সমুদ্রে বা হ্রদে নামতে হয়েছিল কিনা, অথবা আমেরিকান সড়কের ধূলো উড়িয়ে আবার পথচারীদের সন্ত্রস্ত করেছিলাম কিনা—কিছুই জানা নেই।

জানি না। অ্যাডভেঞ্চারের পরবর্তী অধ্যায় কি। জানিনা, আমার কপালে কি লেখা আছে!

প্রগাঢ় সুপ্তিভঙ্গ হওয়ার পর অনুভব করলাম কোথাও কোনো দুলুনি নেই, ইঞ্জিনের ধুক-ধুক শব্দও নেই। নিথর নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যন্ত্রযান। না, আমার ভুল হয়নি। শূন্য পথে পাখীর মত উড়লেও টের পেতাম। গতি-কে নিশ্চয় অনুভব করতে পারতাম।

কিন্তু এভাবে বন্দী থাকলে তো চলবে না। যন্ত্রযান কোথায় নেমেছে, আমার, জানা দরকার বইকি। ডেকে উঠে দেখতে হবে। হঠাৎ কেন নিশ্চল হল সচল যান।

মই বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম বটে, 'হ্যাচ' খুলতে পারলাম না। ওপর থেকে বন্ধ।

'বটে! ফের যাত্রা শুরু না হওয়া পর্যন্ত বন্দী থাকতে হবে!' মনে মনে বললাম। বুঝলাম, পলায়নের আশা দুরাশা হয়ে দাঁড়াল। টেরর চলমান হলে ডেক থেকে চম্পট দেওয়া অসম্ভব।

অধীর হলাম। অস্থির হলাম। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা সব ফুরোলো। কতক্ষণ, আর কতক্ষণ এভাবে নিথর যন্ত্রযানে নীরব হয়ে বসে থাকতে হবে আমাকে?

বেশীক্ষণ থাকতে হল না অবশ্য। সোয়া ঘণ্টা পরেই ঘটাংঘট শব্দে লোহার খিল খোলার শব্দ হল। দেখলাম, মাথার ওপর 'হ্যাচ' খুলে যাচ্ছে। ওপর থেকে 'হ্যাচ' খুলতেই একঝলক আলো আর এক ঝাপটা টাটকা বাতাস ঢুকে পড়ল কেবিনে।

বাঘের মত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম ডেকে। চক্ষের নিমেষে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম আশেপাশে মাথার ওপরে।

দিগন্ত দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোথায় দিগন্ত?

বৃত্তাকার পর্বত গহ্বরের মধ্যে মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে 'টেরর'। চারিদিকে পাথরের দেওয়াল। দেড়হাজার থেকে আঠারোশ ফুট পরিধি। হলুদরঙের নুড়ি আর বালি দিয়ে ছাওয়া জমি। সবুজ ঘাসপাতার চিহ্নমাত্র নেই। হলুদ কাঁকরের কার্পেটে রাজকীয় ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ত্রিভুবন-অধিপতির যন্ত্রবাহন—'টেরর'।

গহ্বরটা বৃত্তাকার ঠিক নয়—ডিম্বাকার! লম্বাটে—ব্যাসটা উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। পর্বত প্রাচীরের উচ্চতা কতখানি, শিখর দেশের চেহারা কিরকম—কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঘন কুয়াশা জমাট হয়ে ভাসছে মাথার ওপরে। কুয়াশার স্তর ভেদ করে সূর্য কিরণ পর্যন্ত নীচে নামতে পারছে না। হলুদ রঙের কাঁকর-বালির ওপর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘের স্তর। সবে ভোর হয়েছে নিশ্চয়। রোদের তাত এখনো বাড়েনি। আর একটু পরেই কুয়াশা গলে যাবে। দৃষ্টির বাধা অপসারিত হবে।

বেশ শীত করছে। আগস্টের পয়লা হলেও আমি ভেবে দেখলাম নিশ্চয় উত্তর অঞ্চলে চলে এসেছি। অথবা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে কোথাও রয়েছি। 'নবীন মহাদেশ' ছাড়িয়ে অবশ্য কোথাও যাইনি—কিন্তু ঠিক কোন অঞ্চলে আছি ত আন্দাজ করা সম্ভব নয়। যন্ত্রযান যত বেগবানই হোক না কেন, নায়গারা থেকে রওনা হওয়ার পর, বারো ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করে নি।

ঠিক এই সময়ে দেখলাম, পর্বতপ্রাচীরের গায়ে একটা রন্ধ্রপথ থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। রন্ধ্রপথটা আসলে হয়ত প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ—বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। কুয়াশার ঢাকা রয়েছে—প্রাচীরের পাদদেশে হারিয়ে গেছে গুহার প্রবেশ পথ। মাথার ওপরকার কুয়াশার গাঢ় চন্দ্রাতপে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড পাখীর ছায়া। বন্ধহীন নীরবতা খান্‌খান্ হয়ে যাচ্ছে পক্ষীকুলের কর্কশ ডাকে। আর কোনো শব্দ নেই পর্বত গহ্বরে। সারা ধরণী বুঝি নিশ্চুপ—নৈঃশব্দ ভঙ্গ করছে শুধু ঐ উড়ন্ত বিহঙ্গরা। দানবিক পক্ষীর মত উড়ন্ত 'আতংক'কে দেখে মেজাজ খিঁচড়ে যায়নি তো পাখিদের? ইাকডাকই সার—যান্ত্রিক পাখীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তো কেউ পারবেনা!

লক্ষণ দেখে দৃঢ় বিশ্বাস হল, এই সেই গোপন ঘাঁটি যেখানে দুনিয়াবিপত্তি মাঝে মাঝে এসে বিশ্রাম নেন। ত্রিভুবনে টহল দেওয়ার পর আবেশ করেন। নিভৃত এই পর্বতকন্দরই একাধারে তার মোটরের গ্যারেজ, বোটের বন্দর, উড়োজাহাজের হ্যাঙ্গার।

এই সুযোগে 'টেরর'-কে খুঁটিয়ে দেখে নিলে হয় না? গহ্বরের তলদেশে অবতীর্ণ হয়েছে 'টেরর'। মালিক এবং তার দোসর দুজনও ফাটলের মধ্যে কের ঢুকেছেন। আমাকে নিয়ে আবার যেন কারো মাথাব্যথা নেই। মাঝখানে আমাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু আবার আমি স্বাধীন—অবশ্য যদি এর নাম স্বাধীনতা হয়। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে ওরা তিনজনে পর্বতরন্ধ্রে অন্তর্হিত হলেন। আর দেরী কেন? 'টেরর'-কে অন্ততঃ বাইরে থেকে

দেখবার এমন সুযোগ কি আর পাবো? বহির্ভাগ দেখে নেওয়া যাক, অন্তর্দেশ হয়তো দেখার সুযোগ আর হবে না।

ডেকের ওপরকার তিনটে 'হ্যাচ'-এর মধ্যে খোলা হয়েছে শুধু আমার কেবিনের 'হ্যাচ'টা—বাকী দুটো যেমন তেমনি বন্ধ। অর্থাৎ প্রবেশ নিষেধ। 'হ্যাচ' খুলতে গিয়ে নাজেহাল হব জানি। সুতরাং সে চেষ্টা না করে প্রপেলারের গড়নটা দেখলে হয় না? বহুরূপী যন্ত্রযানকে কোন্ প্রপেলার প্রভঞ্জন বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, সেটা তো দেখে নিই।

লাফিয়ে নামলাম মেঝেতে। কেউ নেই ধারে কাছে। ধীরে সুস্থে মেশিন দেখলেও বাধা পড়বে না।

আগেই বলেছি, যন্ত্রযানকে দেখতে চুরুটের মত লম্বাটে। সামনের দিকটা পেছনের তুলনায় বেশী ছুঁচোলো। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে মোড়া। শুধু ডানা দুটো ভিন্ন ধাতুতে তৈরী। ধাতুটা নতুন ধরনের, চিনতে পারলাম না। চারটে চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে যন্ত্রযান। প্রতিটি চাকার ব্যাস প্রায় দু'ফুট রবারের বায়ুভর্তি টায়ার -এত পুরু যে যে কোনো গতিবেগেও ঝাঁকুনি টের পাওয়া যাবে না। চাকার 'স্পোক' অর্থাৎ পাখীগুলো প্যাডেল বা ছোট ব্যাটের আকারে তৈরী। জলের ভেতরে বা জলের ওপর দিয়ে চলার সময়ে ঘুরন্ত প্যাডেলগুলোই জল কেটে ঠেলে নিয়ে যায় যন্ত্রযানকে।

চাকাগুলোই মুখ্য প্রপেলার অবশ্য নয়। দুটো শক্তিশালী 'পারসনস টারবাইন' বসানো আছে সামনে আর পেছনে। ইঞ্জিনের ঠেলায় দারুণ বেগে এই টারবাইন দুটোই সাংঘাতিক জোরে ঘোরাতে থাকে দুটো প্রপেলারকে। জলের মধ্যে এই প্রপেলারের জোরেই অত জোরে ছোটে যন্ত্রযান। কে জানে, আকাশ পথেও বাতাস কেটে নিয়ে যায় কিনা একই প্রপেলার-যুগল।

বাতাসে ভেসে থাকার প্রধান প্রত্যঙ্গ দুটি অবশ্য ফের ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখা হয়েছে ডেকের দুপাশে। ঠিক যেন বাসায় ফিরে ডানা গুটিয়ে রেখেছে পাখী। "বাতাসের চাইতে ভারী" মেশিনে আকাশ বিজয় যে সম্ভব—হাতে কলমে তা প্রমাণিত করেছেন 'আতংক'র আবিষ্কর্তা। শুধু প্রমাণ করেই ক্ষান্ত হননি—বিশ্বের বৃহত্তম বিহঙ্গের চাইতেও দ্রুত বেগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এত জটিল কলকব্জা চলছে কিসে? নিশ্চয় ইলেকট্রিসিটিতে। এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই আমার মনে। ইলেকট্রিসিটির ভরসাতেই তিনি বিপুলায়তন বাহনকে বাদুড়ের মতন আকাশে ওড়ান, মাছের মতো জলে ছোটান, খরগোসের মত ডাঙায় নামান। কিন্তু এত তড়িৎ শক্তি তিনি

পাচ্ছেন কোথেকে? কোন্ ব্যাটারীর দৌলতে এতগুলি অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করছেন? অন্য কোথাও গোপন বিদ্যুৎ কারখানা নেই তো? আবার কি সেখানেও যাবেন তড়িৎ সঞ্চয় করতে? নাকি নতুন মডেলের ডায়নামো বসিয়ে বিদ্যুৎশক্তি বানিয়ে নিচ্ছেন এই গহ্বরেরই কোনো সুড়ঙ্গে?

তদন্ত পর্ব শেষ হল। কিন্তু জানলাম অতি সামান্যই। মেশিনটা চাকার ওপর মাটিতে গড়ায়, টারবাইন প্রপেলার দিয়ে জল কাটে এবং ডানার ওপর ভর দিয়ে বাতাসে ভাসে। জানলাম শুধু এই তিনটে তত্ত্ব। কিন্তু ইঞ্জিনটা কি ধরনের, কোন শক্তি বলে চালু থাকে অমন শক্তিশালী যন্ত্রপাতি—তা জানলাম না। যা জেনেছি, তা জেনেও বা লাভ কী? মুক্তি পেলে তবে তো এই জ্ঞানকে কাজে লাগাবো। কিন্তু দুনিয়াবিপতি তাঁর অল্পজ্ঞানী কয়েদীকেও কোনোদিন মুক্তি দেবেন বলে তো মনে হয় না।

পালাতে আমাকে হবেই। কিন্তু কি ভাবে? চলমান যান থেকে পারিনি, বিশ্রামরত যান থেকে কি পারবো?

প্রথম সমস্যাটার সমাধান প্রথমে করা যাক। সুগভীর এই গর্তটি কোন দেশে? বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের পথ কি আকাশ পথ ছাড়া আর নেই? উড়ন্ত যন্ত্র ছাড়া বেরোনো যাবে না এখান থেকে? যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঞ্চলে রয়েছি আমি? অন্ধকারের মধ্যে নিশাচর পাখীর মত কয়েকশ মাইল নিশ্চয় উড়েছে 'টেরর'। কিন্তু কোনদিকে?

খুব সহজ, খুব স্বাভাবিক একটা অনুমিতি ঘুর ঘুর করতে লাগল মাথার মধ্যে। অনুমিতিটা গ্রহণযোগ্য না হলেও বিবেচনাযোগ্য তো বটেই। গ্রেট ঈরীর চাইতে যোগ্যতর ঘাঁটি কি আর আছে 'টেরর'এর মত যন্ত্রযানের পক্ষে? দুর্লঙ্ঘ্য শিখরদেশে পৌঁছোনো নভোচারীর পক্ষে কি খুব কঠিন সমস্যা? শকুন আর ঈগল যা পারে, 'টেরর' তা পারবে না কেন? পুলিশ যেখানে নাক গলাতে পারে না, যেখানে বহিরাগত কোনো উৎপাত পৌঁছোতে পারে না—দুনিয়াবিপতি সেই দুর্গম স্থানকেই তো নির্বাচন করবেন গোপন ঘাঁটির জন্যে। সবচেয়ে বড় কথা, নায়গারা থেকে ব্লু রিজ মাউন্টেনের দূরত্ব চারশ পঞ্চাশ মাইল—'টেরর'এর পক্ষে যা একরাতের যাত্রা পথ।

সম্ভাবনাটা ক্রমশঃ শেকড় গেড়ে বসে যেতে লাগল মাথার মধ্যে। কয়েকশ' আবোল তাবোল সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গেল এই একটি সম্ভাবনার আবির্ভাবে। অনেক উদ্ভট কথাই তো শুনেছি গ্রেট ঈরীকে ঘিরে—ঘটেছে অনেক ব্যাখ্যাতীত ঘটনা। কিন্তু কিছুই আর এখন হেঁয়ালী মনে হচ্ছে না! আমাকে লেখা 'টেরর' কম্যাণ্ডারের হুমকি পত্রের সঙ্গে গ্রেট ঈরীর যোগসূত্রটা কি

আর ধোঁয়াটে থাকছে? ফের পাহাড়ে চড়লে আমার প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কেন—এবার আর তা অস্পষ্ট থাকছে কি? দিনের পর দিন ছায়ার মত কেন পেছনে চর মোতায়েন হয়েছিল, কেন গ্রেট ঈরী রাতারাতি মস্ত থিয়েটারের মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—সব এখন জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। গ্রেট ঈরীর পেটে বজ্রনাদ আর শিখরে অগ্নিনৃত্য এখনো দুর্বোধ্য থাকলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমি এখন কোথায় আছি! গ্রেট ঈরীতে বসেই চিঠি লিখেছিলেন ক্যাপ্টেন, গ্রেট ঈরীর মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষের অগম্য এই সেই গ্রেট ঈরী! গ্রেট ঈরী!

পাহাড়ে চড়ে যেখানে ঢুকতে পারিনি, সেখান থেকে স্বইচ্ছায় বেরোতে কি পারব? 'আতংক' যন্ত্রযান ছাড়া শিখরদেশ লঙ্ঘন কি একেবারেই দুঃসাধ্য? আঃ, হতচ্ছাড়া কুয়াশা যদি ক্ষণেকের জন্যেও সরে যেত, চূড়ার চেহারা দেখে বুঝতে পারতাম সত্যিই এটা গ্রেট ঈরী কিনা। অনুমিতিকে পরিণত করতাম প্রতীতি-তে।

ধুত্তোর কুয়াশা! চুপচাপ দাঁড়িয়ে মাথা গরম না করে পর্বত-কূপের স্বরূপটা দেখা যাক। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ক্যাপ্টেন ফের অন্তর্হিত হয়েছেন ফাটলের মধ্যে। আমার প্রতি কারও দৃষ্টি নেই। আমি মুক্ত, ওঁরা রয়েছেন ডিম্বাকার চত্বরের উত্তরদিকে। আমি যাবো দক্ষিণদিকে।

পর্বত-প্রাচীরের পাদদেশে পৌঁছে পাঁচিল পরিক্রমা শুরু করলাম। দেখলাম, পাথরের গায়ে অগুন্তি ফাটল। শুকনো অ্যালুমুনিয়াম সিলিকেট সমৃদ্ধ ফেলড্স্পার জাতীয় পাথরই বেশী। অ্যালিঘ্যানিয়াম অঞ্চলে এই পাথরই হামেশা দেখা যায়। কিন্তু পর্বত কূপ কতখানি গভীর, পাথরের পাঁচিল কতখানি উঁচু—কিছুতেই দেখতে পেলাম না। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি তো! সূর্য কড়া না হলে কুয়াশা গলবেনা। চূড়োটাও দেখা যাবে না।

যাই হোক, খাড়াই পাথরের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম, পাহাড়ের গা ফাটিফাটা হলে কি হবে, কোনো ফাটলটাই সুগভীর নয়। রাশি রাশি জঞ্জাল জমে রয়েছে বড় ফাঁক ফোকরে। মানুষের জমানো জঞ্জাল। ভাঙা কাঠ আর স্তূপীকৃত শুকনো ঘাস। বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ। নিঃসন্দেহে ক্যাপ্টেন আর তাঁর অনুচর দুজনের। অবশ্য মাস কয়েক পুরোনো বলেই মনে হল।

আমার কারারক্ষক ভদ্রলোক অনুচর সহ পর্বতরন্ধ্রেই ব্যস্ত ছিলেন এতক্ষণ। এবার বেরোলেন দলবল নিয়ে। ধরাধরি করে নিয়ে এলেন অনেকগুলো বৃহদাকার বাণ্ডিল। ব্যাপার কী? যন্ত্রযানে মালপত্র তোলা হবে নাকি? ঘাঁটি ছেড়ে যাচ্ছেন নাকি জন্মের মত?

আধঘণ্টার মধ্যেই সাঙ্গ হল অভিযান। ফিরে এলাম চত্বরের মাঝখানে। রাশিকৃত ছাই ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে রোদে জলে। রয়েছে পোড়া কাঠ, তক্তা, কড়িবরগার স্তূপ। মর্চেধরা লোহার পাত লাগানো রয়েছে কাঠের খুঁটিতে। ধাতুর আর্মেচার দুমড়ে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে আগুনের দাপটে। যেন ভাবটা সূক্ষ্ম জটিল অনেক যন্ত্রপাতি আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ধ্বংসাবশেষের সর্বত্র সেই চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট।

কোনো এক সময়ে বিপুল অগ্নুৎসব হয়ে গিয়েছে পাহাড় ঘেরা এই চত্বরে। প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অনেক কলকব্জাকে। জানিনা সে আগুন ইচ্ছাকৃত, না, নিছক দুর্ঘটনা। এই আগুনকেই লকলকিয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে শিখরদেশ দিয়ে। গ্রেট ঈরীর আচমকা অগ্নুৎসব কি এই কারণেই ঘটেছিল? আকাশ লাল হয়ে গিয়েছিল কি এই কারণেই? প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেন আর মরগানটনবাসীদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল এখানকার ভয়ংকর অনল শিখা দেখে? কিন্তু আগুনটা লাগল কেন? এই যন্ত্রপাতি কোন মেশিনের? ক্যাপ্টেন কেন তা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন?

এমন সময়ে ঝিরঝিরে বাতাসে গা জুড়িয়ে গেল। পূবদিক থেকে হাওয়া বইছে। দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। সূর্যের পাণোচ্ছ্বল কিরণে ভরে উঠল পাহাড়ের পাতকুয়ো।

সূর্য দেখতে চোখ তুলেছিলাম। ভীষণ চমকে চেঁচিয়ে উঠলাম। একী দেখছি! পাথরের পাঁচিল সিধে উঠে গেছে মাথার ওপর একশ ফুট পর্যন্ত। পূব দিকে দেখা যাচ্ছে সেই বিশেষ চেহারার চুড়োটা—ঈগল পাখী যেন উড়তে যাচ্ছে! গ্রেট ঈরীর বহির্দেশে পৌঁছে মাথা তুলে এই প্রস্তর ঈগল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি আর ইলিয়াস স্মিথ!

না, আর কোনো সন্দেহ নেই। এক রাতেই 'টেরর' উড়ে এসেছে লেক ঈরী থেকে নর্থ ক্যারোলিনায়। ঈরীর গহন-কূপেই ঠাই নিয়েছে 'আতংক'! অসামান্য ধীমান ক্যাপ্টেনের হাতে গড়া দানবপাখীর উপযুক্ত বাসা-ই বটে! শক্তিমান পক্ষীর নিভৃত কুলায়! প্রকৃতির হাতে তৈরী সুদৃঢ় এই কেল্লার সুউচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তাঁর ছাড়া কারো নেই! কে জানে, ইতিমধ্যে তিনি অসংখ্য রন্ধ্র-পথের মধ্যে দিয়ে গ্রেট ঈরীর বাইরে যাওয়ার পথও আবিষ্কার করে ফেলেছেন কিনা! কে জানে, সেই পথেই তিনি সদলবলে মাঝে মাঝে লোকালয়ে নেমে যান কিনা—দানব-পাখীকে রেখে যান পর্বত-প্রহরীর জিম্মায়—জানেন মানুষের ক্ষমতা নেই সেখানে প্রবেশ করার।

এখন বুঝলাম কেন গ্রেট ঈরীর ছায়া মাড়াতে নিষেধ করা হয়েছিল

আমাকে। কোনো গতিকে যদি নিভৃত এই পর্বত-কূপে প্রবেশের পথ বের করে ফেলতে পারতাম, দুনিয়াধিপতির গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে দিতাম না কি?

নিথর নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মত অভিভূত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল বহু উচ্চে শিলাময় ঈগলের পানে। অননুভূত আবেগে বিহ্বল অন্তরে ভাবলাম, চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি দেখছি আমি? কর্তব্য করতে দ্বিধা কেন? এই তো সুযোগ· মেশিন চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার মোক্ষম এই সুযোগকে কেন নষ্ট করছি আমি? দুনিয়ার ত্রাসকে পুণরায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না দেওয়ার এমন সুযোগকে নষ্ট করা কি সমীচীন?

পদশব্দ শোনা গেল পেছনে। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। পাশে এসে দাঁড়ালেন বিশ্ববিখ্যাত মেশিনের আবিষ্কর্তা।

সটান চাইলেন আমার চোখের পানে।

নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। বন্দুকেব গুলির মত বিস্ময়ধ্বনি ছিটকে এল মুখ দিয়ে:

"গ্রেট ঈরী! গ্রেট ঈরী!"

"হ্যাঁ, এরই নাম গ্রেট ঈরী, ইন্সপেকটর স্ট্রক।"

"আপনি? আপনি কে? মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড? দুনিয়ার মালিক?"

"সেই-দুনিয়ার মালিক যে দুনিয়ায় আমি অনেক আগেই প্রমাণ করেছি আমার চাইতে শক্তিমান পুরুষ আর দ্বিতীয় নেই।"

"আপনি!" হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বিমূঢ় কণ্ঠে এর বেশী আর কিছু বলতে পারলাম না।

"আমি," বুক ঠুকে সদম্ভে বললেন ক্যাপ্টেন—"হ্যাঁ, আমিই সেই রোবার —আকাশরাজা রোবার!"

(১৬) আকাশরাজা রোবার

আকাশরাজা রোবার! রোবার দি কনকারার!

এঁর চেহারাই অস্পষ্টভাবে উঁকি মারছিল মনের খাতায়। বছর কয়েক আগে আমেরিকার সব কটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল অসাধারণ পুরুষ আকাশরাজা রোবারের প্রতিকৃতি—ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে তাঁর চাঞ্চল্যকর আবির্ভাবের পরের দিনই—তেরোই জুনের খবরের কাগজে বিস্ময়কর মানুষটার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণী ছাপা হয়েছিল বড় বড় অক্ষরে!

দিগ্বিজয়ী রোবার! রোবার দি কনকারার!

ছবির মানুষটির অসামান্য আকৃতি সেই থেকেই মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে গেঁথে গিয়েছিল। ও-চেহারা কি ভোলবার? কজন মানুষের অমন চেহারা হয়? চৌকো কাঁধ। সার্কাসের ট্রাপিজ খেলোয়াড়দের মত মজবুত পিঠ—জ্যামিতিক রেখায় শিরদাঁড়া উঠে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। ইয়া মোটা গর্দান। বিপুলকায় বর্তুলাকার করোটি। সদা ভ্রূকুটিময় ললাটের নীচে অন্তর্ভেদী চোখ—তিল মাত্র আবেগ দেখা দিলে দপ করে জ্বলে ওঠে চোখের মণিকা—বিচ্ছুরিত হয় সীমাহীন শক্তি উদ্যম উৎসাহ প্রাণশক্তি। চুল ছোট এবং কদম ছাঁট—ইস্পাতের মত চিকমিকে। কামারশালার হাপরের মত ওঠে-নামে প্রশস্ত বক্ষদেশ। অতিকায় ধড়ের সঙ্গে মানান সই করে নির্মিত উরু, বাহু এবং হাত। খাটো দাড়ি, পরিষ্কার কামানো গালে চওড়া চোয়ালের প্রকট মাংসপেশী।

মহাপরাক্রমশালী সেই রোবারই দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে! নিজের দুর্ভেদ্য দুর্গের মাঝে দাঁড়িয়ে কামানের শেলের মত নিক্ষেপ করেছেন নিজের নাম আর খেতাব—

যেন চরম হুমকি দিয়ে অবশ করতে চাইছেন আমার প্রায়-বিবশ চেতনাকে!

রোবার দি কনকারার! দিগ্বিজয়ী রোবার!

সারা পৃথিবীর চোখে রাতারাতি দিগ্বিজয়ী রোবার কিভাবে কিংবদন্তী তুল্য হয়ে উঠেছিলেন, এবার আসা যাক সেই প্রসঙ্গে।

ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউট আসলে বেলুনবাজদের একটা মহতী ক্লাব। বাতাসের চাইতে হাল্কা মেশিন অর্থাৎ বেলুন দিয়ে আকাশ বিজয়ের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁদের ক্লাব। ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফিলাডেলফিয়ার নামী পুরুষ। আঙ্কল প্রুডেন্ট, এই নামেই তিনি খ্যাত। সেক্রেটারীর নাম ফিল ইভান্স। ক্লাবের বেলুন-ভক্ত সদস্যরা উপরোক্ত দুই মোড়লের নেতৃত্বে দানব-সদৃশ একটি বেলুন নির্মাণ করছিলেন। বেলুনটার নাম, 'গো-অ্যাহেড'।

ক্লাবের অধিবেশনে এই বেলুনের নির্মাণ প্রণালী নিয়ে জোর তর্কবিতর্ক চলছে, এমন সময়ে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হলেন এই অজ্ঞাতকুল পরিচয় রোবার। এসেই মঞ্চে উঠলেন এবং বেলুনবাজদের এত সাধের পরিকল্পনাকে টিটকিরি দিয়ে ধূলিসাৎ করলেন। 'বাতাসের চাইতে ভারী' মেশিন দিয়েই আকাশ বিজয় সম্ভব—বেলুন দিয়ে নয়। এ-জাতীয় যন্ত্রযান তিনি নিজেই নাকি বানিয়েছেন।

স্বভাবতঃই ক্লাবের উগ্র-স্বভাব বেলুনবাজরা পাল্টা টিটকিরি বর্ষণে নাস্তা-

নাবুদ করার চেষ্টা করলেন তাঁকে। রোবারের কথা কেউ বিশ্বাস করলেন না। উল্টে তাকে ব্যঙ্গ করে অভিহিত করা হল 'বোবাব দি কনকাবার'—'দিগ্বিজয়ী বোবাব' নামে। 'আকাশবাজা' খেতাব গ্রহণ কবলেন রোবাব। হৈ-চৈ পড়ে গেল ভদ্রলোকের হিমালয় প্রতিম স্পর্ধায়। শুরু হল বিভলবাবের গুলিবর্ষণ। অদৃশ্য হয়ে গেলেন আগন্তুক।

সেই বাতেই বোবার গায়েব জোবে ধবে নিয়ে গেলেন ক্লাবেব প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীকে। বন্দী করলেন তাঁর আবিষ্কৃত অত্যাশ্চর্য আকাশযান "অ্যালবেট্রস"যে। বেবিয়ে পড়লেন বিশ্বভ্রমণে।

তাঁব নির্মিত মেশিনেব গুণ যে কত, বেলুনেব চাইতে 'বাতাস অপেক্ষা গুরুভাব' মেশিন যে কত শ্রেষ্ঠ, দুই গোঁড়া বেলুনবাজকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াব জন্যেই গায়েব কবে নিয়ে গেলেন ওঁদেব। 'অ্যালবেট্রস' লম্বায় একশ ফুট। চুয়াত্তবটা অনুভূমিক প্রপেলাব উড়োজাহাজকে ভাসিয়ে বাখত আকাশে এবং সামনে আব পেছনে লাগানো টেবল ফ্যানেব মত খাড়াই দুটো বৃহদাকাব প্রপেলাব উড়ন্ত মেশিনকে ছুটিয়ে নিয়ে যেত সামনে বা পেছনে। ৩০ জনেক অনুবক্ত কর্মচাবী নিয়ে এতবড় মেশিন নিয়ন্ত্রণ করতেন বোবাব।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ যখন সমাপ্ত প্রায়, তখন আঙ্কল প্রুডেণ্ট এবং ফিল ইভান্স চম্পট দিলেন 'অ্যালবেটস' থেকে। আকাশ-যানকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলেন এবং মেঘলোক থেকে অ্যালবেটসের আবিষ্কর্তা অনুচববৃন্দসহ এসে পড়লেন প্রশান্ত মহাসাগবে মেশিনেব ধ্বংসাবশেষ সমেত।

ফিলাডেলফিয়ায় ফিবে এলেন দুই বেলুনবাজ। ওঁবা জানতে পেরেছিলেন, প্রশান্ত মহাসাগবেব 'এক্স' নামক একটা অজ্ঞাত দ্বীপে 'অ্যালবেট্রস' তৈবীব কাবখানা বানিয়ে বেখেছেন বোবাব। অ্যালবেট্রসের গোপন ঘাঁটিও সেইখানে। কিন্তু সে দ্বীপ খুঁজে বেব কবাব কোনো আগ্রহ ছিল না দুজনের। কেন না, সপাবিষদ আকাশবাজাব শোচনীয় মৃত্যুসম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন দুজনে।

সুতবাং দুই কোটিপতি স্বগৃহে ফিবে এসে "গো-অ্যাহেড" বেলুন নির্মাণ নিয়ে ফেব মত্ত হলেন। বোবাবেব সঙ্গে বিশ্বেব যে অঞ্চল দিয়ে ওঁবা গিয়েছিলেন, 'গো-অ্যাহেড' বেলুনে চেপেও অনুরূপ অভিযানে বেবোনোব মতলব ছিল দুজনেব। তাহলেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যাবে যে, 'বাতাসেব চাইতে হাল্কা' বেলুনও কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। তা যদি না কবতে পাবেন, তাহলে তাঁরা নাকি খাঁটি আমেরিকান নন।

পরের বছর বিশে এপ্রিল 'গো-অ্যাহেড' বেলুন আকাশে উড়ল ফিলাডেল-ফিয়ার ফেয়ার মণ্ট পার্ক থেকে। হাজার হাজার দর্শকের ভীড়ে আমিও দাঁড়িয়ে ছিলাম। অতিকায় বেলুনটাকে রাজকীয় ভঙ্গিমায় উঠতে দেখলাম বহু উঁচুতে। শক্তিশালী প্রপেলার চালিয়ে সামনে পেছনে ছুটোছুটিও করল 'গো-অ্যাহেড'। তার পরেই বিষম চেঁচামেচি শোনা গেল দর্শক-সাধারণের মধ্যে। দূর আকাশে দেখা দিয়েছে আরেকটা আকাশ-যান। উড়ে আসছে আশ্চর্য গতিবেগে। আসছে আর একটা 'অ্যালবেট্রস'—প্রথম 'অ্যালবেট্রস'য়ের চাইতেও হয়ত বহুগুণ শক্তিশালী এই দ্বিতীয় সংস্করণটি। রোবার মরেন নি। সাহচর বেঁচে গিয়েছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিকানাহীন 'এক্স' দ্বীপে পৌঁছে ফের বানিয়েছেন আর একটা আকাশ-যান।

দানব-পাখীর মত 'গো-অ্যাহেড'কে ছোঁ মারল 'অ্যালবেট্রস'। প্রতিশোধ না নিয়ে নিশ্চয় ছাড়বেন না রোবার। প্রমাণ করে দেবেন লক্ষগুণে উৎকৃষ্ট তাঁর বাতাস অপেক্ষা গুরুভার যন্ত্র।

লড়তে ছাড়লেন দুই গোঁড়া বেলুনবাজ। ছুটে পালাতে পারবেন না বুঝে ওপরে উঠতে লাগলেন। ঊর্ধ্ব আকাশে 'অ্যালবেট্রস' সুবিধে করতে পারবে না। এই আশায় বেলুন থেকে সমস্ত বোঝা ফেলে দিয়ে উঠে গেলেন বিশ হাজার ফুট ওপরে। 'অ্যালবেট্রস'-ও উঠে গেল সেখানে এবং ক্ষুদে মাছির মত নির্বিকারভাবে প্রদক্ষিণ করতে লাগল বিশাল বেলুনকে।

আচমকা শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ। অত উঁচুতে ওঠায় বেলুনের গ্যাস প্রসারিত হয়ে বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছে।

চুপসে গিয়ে হু-হু করে পড়তে লাগল বেলুন।

এবপর সবাইকে চমকে দিয়ে 'অ্যালবেট্রস' গোঁৎ খেয়ে নামতে লাগল পড়ন্ত বেলুনের আশে-পাশে। ধ্বংসকায সম্পূর্ণ করবার জন্যে নয় বেলুনবাজদের উদ্ধার করার জন্যে। মুহূর্তের মধ্যে প্রতিহিংসা বিস্মৃত হলেন রোবার—পড়ন্ত বেলুন থেকে তুলে নিলেন আঙ্কল প্রুডেণ্ট ফিল ইভান্স এবং আরেকজন বেলুন-চালককে নিজের যন্ত্রযানের ডেকে। বেলুন আরো চুপসে গেল। আছড়ে পড়ল ফেয়ার মণ্ট পার্কের বৃক্ষশীর্ষে।

জনসাধারণ চমৎকৃত হল রোবারের উদারতা দেখে। আতঙ্কিতও হল! বেলুনবাজদের মুঠোয় পেয়ে এবার না জানি কি নৃশংসভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেন। আবার কি 'অ্যালবেট্রসে' চাপিয়ে উধাও হবেন? ইহজন্মে আর ফিরতে দেবেন না?

'অ্যালবেট্রস' কিন্তু নীচে নামতে লাগল। ফেয়ার মণ্ট পার্কে অবতরণ

করাই যেন তার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কী ঝুঁকি নিতে চলেছেন রোবার? ক্ষুব্ধ জনতা যে ছিঁড়ে ফেলবে তাঁকে? ধ্বংস করবে তাঁর যন্ত্রযান?

ভূমি থেকে ছ'ফুট ওপরে ভাসতে লাগল 'অ্যালবেট্রস'। মনে আছে, তাই দেখেই জনতা যেন বিষম রোষে ফুলে উঠে ছুটতে চেয়েছিল সেইদিকে। কিন্তু তার আগেই ধ্বনিত হয়েছিল রোবারের কণ্ঠস্বর। প্রতিটি শব্দ আমার এখনো মনে আছে:

"যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা! ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারী আবার আমার কব্জায় এসেছেন। ওঁরা আমার অনেক ক্ষতি করেছেন। সুতরাং তাঁদের কয়েদ কবার অধিকার আমার আছে কিন্তু অ্যালবেট্রস'য়ের জয়যাত্রা দেখে তাঁদের মনে যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ আমি দেখেছি। তা থেকে বুঝেছি এখনো তাঁদের মন তৈরী হয়নি। আকাশ বিজয় সাঙ্গ হবে বিপ্লবাত্মক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে—সেদিন আর বেশী দূরে নেই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সেই বিপ্লবের উপযুক্ত মনোভাব এখনো জাগ্রত হয়নি ওয়েলডন ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রেটারীর মধ্যে। আঙ্কল প্রুডেণ্ট, ফিল ইভান্স, আপনারা মুক্ত।"

লাফ দিয়ে নীচে পড়লেন তিন বেলুন বাজ। একলাফে তিরিশ ফুট উঠে নাগালের বাইরে গিয়ে ভাসতে লাগল উড়োজাহাজ।

ফের বললেন রোবার:

"যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা! আকাশ বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ আবিষ্কার এখন-ই আপনাদের হাতে তুলে দেবনা—সে সময় যখন আসবে—অ্যালবেট্রস মানব জাতির ভোগে লাগবে। তাই আমি যাচ্ছি, আমার গুপ্ত রহস্যও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ একদিন এই গুহ্যতত্ত্ব ফিরে পাবে। সেই দিনই এই আবিষ্কার আপনাদের হবে যেদিন এই যুগান্তকারী সৃষ্টিকে গালমন্দ না করে এর সুফল উপভোগ করার মত প্রকৃত শিক্ষা আর যোগ্যতা আপনারা অর্জন করবেন। আমেরিকার নাগরিকরা! আমার বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করুন!"

চুয়াত্তরটা প্রপেলার দিয়ে বাতাস কেটে নিমেষে পূবদিকে উল্কার মত ছিটকে গেল অ্যালবেট্রস—তুফান সমান জয়ধ্বনিকে উপেক্ষা করে।

শেষ দৃশ্যের বর্ণনা খুঁটিয়ে দিলাম যাতে পাঠকপাঠিকারা অসাধারণ এই পুরুষসিংহের মানসিক অবস্থার অনুধাবন করতে পারেন। ওঁর কথাবার্তায় মানুষ জাতের প্রতি বৈরীভাব প্রকাশ পায়নি মোটেই। ক্রুদ্ধ হননি, উত্তপ্ত হন নি, রুষ্ট হন নি। ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় থাকতে চেয়েছিলেন। বিদায়

নিয়েছিলেন সেই মনোভাব নিয়ে। তবে হ্যাঁ, আচার আচরণ কথাবার্তায় স্ফুরিত হয়েছিল তাঁর অসীম আত্মপ্রত্যয় আকাশচুম্বী অহংকার। অতি—মানবিক ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এলে মানুষ যেমন ধরাকে সরাজ্ঞান করে—তাঁর মনের অবস্থাও দাঁড়িয়েছিল সেই রকম।

এই ঔদ্ধত্যই তিলে তিলে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর অন্তঃকরণে দুনিয়ার মালিক হওয়ার বাসনাকে অংকুরিত করেছে। সারা দুনিয়াকে তিনি গোলাম বানাতে চেয়েছেন। জনসমক্ষে প্রকাশিত তাঁর পত্রের প্রতিটি ছত্রে সেই দম্ভই দেখা গিয়েছে। যাঁর মনে এত গনগনে আঁচ অতি উত্তেজনায় বহু দিবস আচ্ছাদিত থাকার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ সব ব্যাপারেই তাঁর মন যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

অ্যালবেট্রসের শেষ যাত্রার পর ঘটনা স্রোত কোন দিকে বয়েছে, তা অনুমান করে নিলাম। রোবারের সঙ্গে এই ক'দিন থেকে যা জেনেছি তার ভিত্তিতেই আঁচ করতে পারলাম অজ্ঞাতবাসকালে কি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কাজের মানুষ রোবার। আকাশ বিজয় করেও ক্ষান্ত হন নি তিনি। অতি উন্নত নিখুঁত উড়ুক্কু যন্ত্র বানিয়েও মন ওঠেনি তাঁর। 'অ্যালবেট্রস' তো নিছক আকাশযান—হোক না অভিনব—শুধু আকাশ বিহার করেই পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না মহাশক্তিমান রোবার। সীমাহীন আকাঙ্খা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে উচ্চাশার আরেক শিখরে। এমন একটা যন্ত্রদানব বানাতে চাইলেন যা একাধারে বিজয়কেতন ওড়াবে পঞ্চভূতের তিনটি ভূতে—অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ-কে মুঠোয় আনবে। এই ভাবেই ত্রিভুবন জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন পুরুষ সিংহ রোবার। একাধারে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ পদানত করার জন্যে অভিনব একটি যন্ত্রযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেললেন। জলে, স্থলে শূন্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে সেই মেশিন। এক্স নামক অজ্ঞাত দ্বীপেই সম্ভবতঃ অনুরক্ত চ্যালা চামুণ্ডা নিয়ে অত্যাশ্চর্য যন্ত্রযানের বিভিন্ন অংশ তৈরী করেছিলেন তিনি। বহুরূপী যন্ত্রযানের খণ্ডাকারে নির্মিত যন্ত্রাংশগুলো দ্বিতীয় অ্যালবেট্রস বয়ে এনেছিল গ্রেট ঈরীর পর্বত-কূপে। সুদূর এক্স দ্বীপের তুলনায় এখানে কারখানা পত্তনের অনেক সুবিধে। লোকালয় কাছে—প্রয়োজনমত জিনিস-পত্র নিয়ে আসা সম্ভব। পর্বত প্রাচীরের অন্তরালে বসে ধীরে সুস্থে যন্ত্রাংশ-গুলো জোড়া লাগিয়ে তৈরী হয়েছে টেরর। তারপর ধ্বংস হয়েছে অ্যালবেট্রস গ্রেট ঈরীর ভেতরেই—স্বেচ্ছায় কি আকস্মিক দুর্ঘটনা—তা অবশ্য বলতে পারবনা। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাস্তায় আবির্ভূত হয়েছে 'টেরর'—তারপর ঝাঁপ দিয়েছে হ্রদে, সমুদ্রে। তারপর যা ঘটেছে, আগেই বলেছি। লেক

ঈরীর জলে বৃথাই পাড়ি নেওয়া হয়েছে 'টেরর'-য়ের। যমদূত-সমান টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার দুটোকে নাকের জলে চোখের জলে করে শূন্যপথে বিলীন হয়েছে যন্ত্রযান।

(১৭) আইনের স্বার্থে

এহেন যন্ত্রযানের সৃষ্টিকর্তার মনে অহমিকা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু রোবার যেন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। নিঃসীম ঔদ্ধত্য ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে বিপজ্জনক স্তরে। রোবার এখন ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। নিজেকে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর প্রভু বিশ্বাস করছেন। পোকামাকড় মনে করছেন পৃথিবীবাসীদের, খোলামকুচিজ্ঞান করছেন পৃথিবীর সম্পদকে। উনি এখন চাইছেন, ভূগোলকে প্রতিটি মানুষ দাসানুদাস কেনা গোলামের মতন তাঁর পদলেহন করুক, তাঁকে ভগবানরূপে পূজা করুক।

দেখেশুনে বড় ভয় হল আমার। এত দম্ভ ভাল নয়। শেষ পর্যন্ত অত্যধিক আস্ফালন বিকারের পর্যায়ে না পৌঁছোয়।

গ্রেট ঈরীর পর্বত কূপ মধ্যস্থ স্তূপাকার যন্ত্রপাতির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। অগ্নিদগ্ধ বিস্তর কলকব্জা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় অ্যালবেট্রসেরই ধ্বংসাবশেষ। আগুন লাগাটাও নেহাৎ দুর্ঘটনা বলে মনে হয় না। হয়ত নিজের হাতেই আগুন জ্বালিয়েছেন রোবার। ত্রিভুবন জয়ী উন্নত যন্ত্রযান বানিয়ে নেওয়ার পর নিশ্চিহ্ন করেছেন আকাশযান 'অ্যালবেট্রস'কে।

কিন্তু স্মরণীয় এই অ্যাডভেঞ্চারের খপ্পর থেকে আর কি আমি মুক্তি পাব? রোবার একাই তো দেখছি এই দুঃসাহসিক অভিযানের মহানায়ক। আমি কি পারব তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে? আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্স প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে চম্পট দিয়েছিলেন। সে-সুযোগ কি আমার বরাতে জুটবে? দেখাই যাক না। কতদিন সুযোগের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে জানি না—তবুও হাল ছাড়ব না!

অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিলাম—জেনেছি অতি সামান্য। গ্রেট ঈরীর উপরে কিসের বহ্ন্যুৎসব চলেছিল, কিসের বিস্ফোরণ শোনা গিয়েছিল তা অবশ্য জেনেছি। ব্লু-রিজ পর্বতমালার বাসিন্দারা কেন চমকে চমকে উঠেছিলেন, পর্বত কন্দরে প্রবেশ করার পর সে রহস্যও জ্ঞাত হয়েছি। প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেন, মরগানটন শহর বা গ্রামবাসীদের অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে আধমরা হয়ে থাকার

আর দরকার নেই। এ পবত আগ্নেয় পর্বত নয়—পাতাল রাজ্যেও অগ্নিকাণ্ডের মহড়া চলছেনা। অ্যালিঘানিয়ান অঞ্চলে জ্বালামুখ জাতীয় কিছুই কোনো কালে ছিল না—এখনও নেই। গ্রেট ঈবীকে গোপন বিবরব্রূপে ব্যবহার করছেন দিগ্বিজয়ী রোবার। খাদ্যসম্ভার এবং যন্ত্রযানের রকমারি উপকরণ গুদামজাত করার জন্যেই বেছে নিয়েছেন দুর্গম এই পর্বত কূপ। আকাশ পথে ওড়বার সময়ে একদা হয়ত দেখেছিলেন গ্রেট ঈবীর শিখর দেশের অদ্ভুত চেহারা। দেখেই মনে ধরেছিল তাঁর। প্রশান্ত মহাসাগরের বিজন দ্বীপ 'এক্স আয়ল্যাণ্ডের চাইতে এ-স্থান যে গুপ্ত ঘাঁটির পক্ষে আদর্শ—তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বর্জন করেছেন আজও অনাবিষ্কৃত 'এক্স' দ্বীপকে।

কিন্তু এর বেশী আর কিছুই জানতে পারি নি। আমি জানি না যান্ত্রিক বিস্ময় 'টেরর'-এর নির্মাণ কৌশল অথবা গতিবেগের গোপন শক্তিকেন্দ্র। যন্ত্রযান ইলেকট্রিসিটিতে চলে টের পেয়েছি। অ্যালবেট্রস-ও চলত বিদ্যুৎ শক্তিতে। কিন্তু সরাসরি বাতাস থেকে নতুনতম কোনো পন্থায় বিদ্যুৎ শক্তি আহরণ করছেন কিনা, এখনো সে রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারিনি। ইঞ্জিনের চেহারাও দেখিনি। কোনোদিন দেখতে দেওয়া হবে বলেও মনে হয় না।

আমার মুক্তি জড়িত রয়েছে রোবারের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে। রোবার জনসমক্ষে আসতে চান না, আড়ালে থেকে তাক লাগাতে চান বিশ্ববাসীকে। অ্যালবেট্রস উদ্ভাবন করার পরেও তিনি কখনো জয়ঢাক পিটিয়ে নিজেকে জাহির করেন নি। বর্তমান ক্ষেত্রেও তো দেখা যাচ্ছে আত্মপ্রকাশে তিনি নারাজ। যে চিঠি তিনি লিখেছেন পৃথিবীবাসীকে, তা থেকে বেশ বোঝা যায় তিনি পৃথিবীর মঙ্গল যা না করবেন, অমঙ্গল করবেন তার বেশী। অতীতেও আড়ালে ছিলেন। ভবিষ্যতেও থাকবেন। শুধু একজনই জানে দিগ্বিজয়ী রোবার আর 'দুনিয়ার মালিক' একই লোক। আমি ছাড়া এ-তত্ত্ব, কেউ যখন জানে না, তখন কয়েদী হয়েও আইনের স্বার্থে গ্রেপ্তার করা উচিত আমার—

মুক্তি বাইরে থেকে আসবে কী? পৃথিবীর মানুষ কি ছিনিয়ে যাবে রোবারের কারাগার থেকে? অসম্ভব। ব্ল্যাক রক ক্রীক যে যা ঘটেছে, পুলিশ তার আদ্যোপান্ত জেনে গিয়েছে। আর্থার ওয়েলস দেখেছে 'টেরর-য়ের আঁকশি আমাকে চক্ষের নিমেষে টেনে নিয়ে গিয়েছে। জন স্ট্রক'-য়ের মৃতদেহ যখন পাওয়া যায় নি, তখন ধরে নিয়েছে হয় আমি ডুবে মরেছি, না হয় টেরর-য়ের ডেকে কয়েদী হয়েছি।

প্রথম ক্ষেত্রে আমাকে 'মৃত' ঘোষণা করেই খালাস হবে পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, জন স্ট্রককে ফের দেখবার আশা করেন কি পুলিশ দপ্তর? নায়গারা নদীতে টেরর-য়ের পাছু নিয়েও ড্রেস্ট্রয়ার দুটো দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল প্রপাতের অদূরে। তখন অন্ধকার নামছে। জলের ভীষণ টানে 'টেরর' নিশ্চয় ধ্বংস হয়েছে? এই সিদ্ধান্ত করাই তো স্বাভাবিক। প্রপাতের তলায় সুগভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়ে চিরসমাধি ঘটেছে 'টেরর'-য়ের—জন স্ট্রকও নিশ্চয় আর বেঁচে নেই। অন্ধকারে গা মিশিয়ে শেষ মুহূর্তে যে ডানা মেলে আকাশে উড়েছে 'টেরর' নিশ্চয় তা দেখা যায় নি—কল্পনাতেও ভাবা যায় নি।

আদৌ মুক্তি পাব কিনা, রোবারকে জিজ্ঞেস করব? দেখা করতে দেবেন কী? নিজের নামটা আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেই পরম পরিতৃপ্ত নন তো ভদ্রলোক? আমার সহস্র প্রশ্নের জবাব ঐ একটি নামের মধ্যেই নিহিত নেই কি?

সারাদিনে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। যন্ত্রযান নিয়ে একনাগাড়ে মেহনৎ করে চললেন রোবার। আতংক'র বড় রকমের মেরামতি দরকার হয়েছিল নিশ্চয়। গ্রেট ঈরীতে আগমন সেই কারণেই। মনে হল, শীগগিরই ডানা পাড়ি দেবেন রোবার। সঙ্গে নেবেন আমাকে। রেখে যেতেও পারেন ঈরীর তলদেশে। খাবার দাবারের তো অভাব নেই। মাস কয়েক অন্ততঃ অনাহারে থাকতে হবে না। তারপর? আমার ডানা নেই যে পাহাড় টপকে পালাব!

সারাদিন আমি দেখছিলাম শুধু রোবারকে, দেখছিলাম তাঁর মানসিক অবস্থা। মেরামত দেখার চাইতে আমার বেশী নজর ছিল তাঁর ওপর। সমানে লক্ষ্য করছিলাম ভদ্রলোকের হাবভাব, কথাবার্তা, কাজকর্ম। দেখলাম, একটা সাংঘাতিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে রয়েছেন দিগ্বিজয়ী রোবার। উত্তেজনাটা অজস্র স্ফুলিঙ্গের আকারে যেন ওঁর সব কটি ইন্দ্রিয়কে ছেয়ে ফেলছে। মুহূর্তের জন্যেও উনি আত্যন্তিক উত্তেজনার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। ক্ষণেকের জন্যেও অত্যুগ্র উত্তেজনা তাঁকে রেহাই দিচ্ছে না। কি ভাবছেন রোবার? মস্তিষ্কের কোষে কোষে কি চিন্তা প্রলয় নৃত্যে মেতেছে? কিসের ধ্যান ধারণায় তিনি এত অস্থির? ভয়ংকর কোনো ভাবী পরিকল্পনা কি স্থির থাকতে দিচ্ছে না তাঁকে? ত্রিভুবনের নতুন কোনো অঞ্চলে রওনা হওয়ার ফন্দী আঁটছেন কি? নাকি পত্রের হুমকি কাযে পরিণত করতে চলছেন? উন্মাদ ব্যক্তির মত বিকৃত ভীতি প্রদর্শন নিয়ে অসম্ভব চিন্তায় মশগুল রয়েছেন?

রাত নামল। গ্রেট ঈরীতে সেই আমার প্রথম রাত্রিবাস। পর্বতরন্ধ্রে ঘাস বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। খাবার পেতাম ক্ষিদের সময়ে ঐখানেই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও বিরামবিহীনভাবে যন্ত্রযান মেরামত করলেন রোবার পরম অনুগত দুই অনুচরকে নিয়ে। কাজের সময়ে একটি বাক্যবিনিময়ও করতে দেখলাম না নিজেদের মধ্যে। ইঞ্জিন মেরামত সম্পূর্ণ হওয়ার পর খাবার-দাবার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তোলা হল 'টেরর'-যের ভাঁড়ারে। সত্যিসত্যিই দীর্ঘদিনের জন্যে রওনা হচ্ছেন রোবার। হয়ত সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেবে 'টেরর'। নয়তো প্রশান্ত মহাসাগরের 'এক্স' দ্বীপে ফিরে যাবেন ক্যাপ্টেন।

এই ক'দিন লক্ষ্য করলাম, অবিরাম উত্তেজনা ক্রমশঃ ভয়ংকর করে তুলছে রোবারকে। প্রতিটি শিরা-উপশিরা স্নায়ু যেন থরথর করে কাঁপছে চাপা উত্তেজনায়—অফুরন্ত উৎস হতে উদ্ধত সেই সর্বনাশা উত্তেজনা প্রকাশ-মুখ না পেয়ে যেন ফেটে পড়তে চাইছে সহস্র ধারায়। মাঝে মাঝে ক্ষিপ্তের মতন মুষ্টি নিক্ষেপ করছেন আকাশপানে—যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বরকে। পায়চারী করছেন অস্থির চরণে—তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছেন—পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে স্পর্ধিত ভঙ্গিমায় এমনভাবে মুষ্টি আস্ফালন করছেন যেন তৃণজ্ঞান করছেন খোদ স্বর্গরাজ্যকেও : ভগবান ভদ্রলোক যেন রোবারের রাজ্যের আধখানা জুড়ে বসে আছেন। তাই বিষম ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছেন দখলকারীর ওপর। পৃথিবী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি যেন সইতে পারছেন না ঈশ্বরের অস্তিত্ব!

গতিক সুবিধের ঠেকল না। অত্যধিক বলদর্পে দর্পিত রোবার উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন না তো? শুধু রোবার কেন, তাঁর দুই বংশবদ অনুচরও কম উত্তেজিত হয়নি। তিনজনের একজনও তো শান্ত হতে পারছে না। উন্মত্ততা কি সংক্রামিত হয়েছে তিনজনের মধ্যেই? ভাবছেন কি রোবার? ক্ষিতি, অপ, মরুৎ-কে জয় করার অহংকারে তিনি কি এখন জল, স্থল, শূন্যের চাইতেও নিজেকে অধিক শক্তিমান মনে করছেন? শক্তি মদে মাতাল হয়েছিলেন অ্যালবেস্ট্রস-অধীশ্বর হয়ে। এখন তো আরো বেশী হবেন! হাওয়ার রাজ্যে, জলের রাজ্যে, ডাঙার রাজ্যে—কেউ কি আছে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে? তাঁকে পরাভূত করতে পারে?

ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই বড় দুশ্চিন্তায় পড়লাম। জানিনা কপালে কি লেখা আছে! কি ধরনের বিপর্যয় নাগপাশে বাঁধতে চলেছে আমাদের সবাইকে। গ্রেট ঈরীর কারাগার থেকে বেরোনো অসম্ভব—রোবারই শেষ পর্যন্ত

আমাকে টেনে নিয়ে যাবেন আরেক অ্যাডভেঞ্চারে। ফের সমুদ্র অথবা বাতাস রাজ্য পরিক্রমা করবে 'টেরর'—কিন্তু আমি পালাবো কি করে? পালাতে পারব তখনি যখন ডাঙায় অবতীর্ণ হবে 'টেরর' এবং ছুটবে গজেন্দ্রগমনে! সে আশা সুদূর পরাহত এবং দুরাশা বললেই চলে।

গ্রেট ঈরীর কারাগারে উপনীত হওয়ার পর একবার কারারক্ষকের সঙ্গে বাক্যালাপ করার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম সেবার। ঠিক করলাম, আবার সে চেষ্টা করব।

বিকেল নাগাদ দৃঢ় পদক্ষেপে হাজির হলাম ওঁদের পর্বত গহ্বরের মেরামতি কারখানায়। প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েছিলেন রোবার। আমাকে দেখেই গনগনে চোখে চেয়ে রইলেন সমানে। ব্যাপার কি? ভস্ম করতে চান? না, কথা বলতে চান?

সটান তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—"ক্যাপ্টেন, আগেও জিজ্ঞেস করেছি—জবাব পাইনি। ফের জানতে চাইছি—কি করতে চান আমাকে নিয়ে?

মুখোমুখি দাঁড়ালাম দুজনে। দুহাত বুকের ওপর ভাঁজ করে কটমটে চোখে চেয়ে রইলেন রোবার। সে কী চাহনি! রক্ত জল হয়ে গেল আমার! আতংকে দুরদুর করে উঠল বুক! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন! ভয় পেলাম সেই চাহনি দেখে! কেননা, ও-চাহনি মানুষের চোখে দেখা যায় না। অমানুষিকী এই চাহনির আড়ালে রোবার যেন আর নেই—ঠাঁই নিয়েছে কোনো অমানুষ!

আবার কড়া গলায় শুধোলাম একই প্রশ্ন! মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেন মৌনব্রত ভঙ্গ করবেন রোবার—বন্যার মত বাক্যধারা ঝরে পড়বে মুখ দিয়ে।

রোবার তখনো বুকে দু'হাত ভাঁজ করে কি যেন চিন্তা করছিলেন। আমার প্রশ্নে ক্ষণেকের জন্যে সম্বিৎ ফিরল, কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না। আবার আগের মত মুষ্টি আস্ফালন করলেন স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশে। আকাশ যেন তাঁকে দুর্দমনীয় আকর্ষণে টানছে মাটি তাঁকে আর ধরে রাখতে পারছে না ··শূন্য পথের পথিককে আহ্বান জানিয়ে চলেছে শূন্যলোক···মেঘের কোলেই যেন তিনি স্থায়ী আস্তানা গড়তে চান—সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে মর্ত্যলোকের সঙ্গে।

জবাব না দিয়ে হনহন করে সুড়ঙ্গে অন্তর্হিত হলেন রোবার। আমার প্রশ্ন মাথায় সাড়া জাগিয়েছে বলেও মনে হল না।

জানিনা আর কতক্ষণ এভাবে গ্রেট ঈরীর বন্দর-গ্যারেজ-হ্যাঙারে বিশ্রাম

নেবে 'টেরর'। শুধু লক্ষ্য করলাম, তেসরা অগাস্ট বিকালে যাত্রারম্ভের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। মালপত্র এত বেশী তোলা হয়েছে যন্ত্রযানে যে আর কোনো ঘর বোধহয় খালি নেই।

দুজন অনুচরের একজনকে এতক্ষণ চিনতে পেরেছিলাম, টম টার্ণার। 'অ্যালবেট্রস' আকাশযানে রোবারের প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন। সব কাজ শেষ হওয়ার পর ইনি শুরু করলেন আর একটা কাজ। সঙ্গীকে নিয়ে হিড়হিড় করে বাড়তি মালপত্র টেনে এনে রাখতে লাগলেন গহ্বরের ঠিক মাঝখানে। খালি বাক্স, ছুতোরের র‍্যাঁদায় কুচিকাটা কাঠকুটো, অদ্ভুত আকারের কাঠের টুকরো। শেষোক্ত কাঠের বিদঘুটে গড়ন দেখেই সন্দেহ হল আমার। নিশ্চয় 'অ্যালবেট্রস'য়ের কাঠ। সাইজ করে কাটা। 'অ্যালবেট্রস'কে বলি দিয়েই তো আরো ভয়ংকর শক্তিমান 'টেরর'এর সৃষ্টি। স্তূপীকৃত কাঠকুটোর তলায় রইল শুকনো ঘাসের পাহাড়। রোবার তাহলে ফের বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করেছেন! ইহজন্মের মত ছেড়ে যাচ্ছেন পর্বত-আলয়।

রোবার বোকা নন। গ্রেট ঈরী নিয়ে যে আলোড়ন উঠেছে পুলিশ মহলে, তা কি উনি বোঝেন নি? আবার আসবে অভিযানকারীরা, আবার চেষ্টা হবে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার। একদিন না একদিন জয়যুক্ত হবেই তারা। সেইদিন যেন তাঁর কীর্তির কোনো চিহ্ন না আবিষ্কৃত হয়, তাই ফের অগ্ন্যুৎসব করতে চলেছেন রোবার।

সূর্য অস্ত গেল ব্লুরিজ শিখরের অন্তরালে। সূর্যকিরণে ঝিকমিক করছে কেবল ব্ল্যাকডোর-য়ের সুউচ্চ চূড়ো। রোবার কি অন্ধকারের অপেক্ষায় বসে আছেন? আজ পর্যন্ত 'টেররয়ের পূর্ণাঙ্গরূপ কেউ দেখেনি। দেখাতে চান না বলেই কি আঁধারে গা ঢেকে শূন্যে উড্ডীন হতে চান রোবার? বোট, সাবমেরিন, মোটর যে উড়োজাহাজ-ও হতে পারে—রোবার তা প্রকাশ করতে চান না কেন? শেষের সেদিনের প্রতীক্ষায়? যেদিন তাঁর ভয়ংকর হুমকি কাযে পরিণত হবে, বিশ্ব থরহরি কম্প হবে—সেই দিনের প্রতীক্ষায়! মেঘলোক থেকে আচম্বিতে স্বর্গীয় দূতের মত আবির্ভূত হয়ে চমক সৃষ্টি করার প্রত্যাশায়?

উন্মত্ত বাসনা, সন্দেহ নাই।

রাত নটা বাজল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিচ্ছুই আর দেখা যাচ্ছে না। আকাশের তারারা পর্যন্ত অদৃশ্য। পূবের হাওয়ায় ছুটে চলেছে রাশি রাশি ঝোলা মেঘ। 'টেরর' মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করে অনায়াসে উড়ে যাবে—প্রতিবেশী অঞ্চলের কেউ দেখতে পাবে না। সারা আমেরিকা বা লাগোয়া সমুদ্র থেকেও দেখা যাবে না উড়ন্ত 'আতংক'কে।

ঠিক এই সময়ে এগিয়ে এলেন টার্নার। পর্বতাকার দাহ্য পদার্থের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আগুন ধরিয়ে দিলেন তলার ঘাসে।

চক্ষের নিমেষে আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোটা স্তূপে। পুঞ্জ-পুঞ্জ ধোঁয়া আর লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রেট আইরীর শিখর দেশ ছাড়িয়েও উঠে গেল আরো উঁচুতে। বেচারী প্লেজ্যাণ্ট গার্ডেন আর মরগানটনবাসীরা ফের আঁৎকে উঠবে আগুন দেখে। আবার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল নাকি? লাভা উৎক্ষেপণের সময় কি ঘনিয়ে এসেছে?

একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম আগুনের রুদ্রমূর্তির দিকে। পট-পট শব্দে আগুন লাফাচ্ছে, দুমদাম শব্দে কাঠ ফাটছে।

ডিম্বাকার পর্বতপ্রাচীরে সেই শব্দ প্রতিহত হয়ে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির আশ্চর্য ঐকতান সৃষ্টি করছে। সব মিলিয়ে একটা অশ্রুতপূর্ব গুরুগম্ভীর গর্জন উত্থিত হচ্ছে পর্বত-কূপ থেকে—মহাশূন্যের দিকে ধেয়ে চলছে অনলদেবের হু-হুংকার!

শুধু আমি নয়, রোবার নিজেও 'টেরর'য়ের ডেকে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে দেখছিলেন দাবানল-দৃশ্য। চোখের পাতাও যেন পড়ছিল না।

আগুনের রক্তরাঙা আভায় আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল তাঁর ক্রুর কঠোর ভীষণ মূর্তি!

সঙ্গীকে নিয়ে টম টার্নার অগ্নিকে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছিলেন। এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে থাকা কাঠকুটোকে আগুনের বেড়াজালে ঠেলে দিচ্ছিলেন। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল রক্তজিহ্বা অগ্নিকুণ্ড। সব কাঠ যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ধীরে ধীরে কমে এল আগুনের দাপট। তারপর এক সময়ে স্তূপীকৃত পোড়া ছাইয়ের মধ্যে অন্তর্হিত হল অগ্নিশিখা। নিস্তব্ধ হল পর্বত-কূপ। অন্ধকার ফের মসীকৃষ্ণ অবগুণ্ঠন মেলে ধরল পর্বত-গুহায়।

আচমকা টান পড়ল বাহুতে। টম টার্নার। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছেন আমাকে 'টেরর' অভিমুখে। বাধা দেওয়া বৃথা। দিতেই বা যাবো কেন? টার্নারের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাভ কী? ওঁরা যদি আমাকে ফেলে চলে যান? একলা এই ধ্বংসপুরীতে থাকতে পারব? পাহাড় টপকে পালাতে পারব?

ডেকে পদার্পণ করলাম। টার্নারের সঙ্গী গলুইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—যথারীতি চোখ ঘুরতে লাগল চারিদিকে। টানার গেলেন ইঞ্জিন রুমে। চকিতের জন্যে দেখলাম, ইলেকট্রিক বাল্ব-য়ের দ্যুতিতে ঝলমল করছে ইঞ্জিন-রুম। তারপরেই বন্ধ হল 'হ্যাচ'—ক্ষীণতম আলোকরশ্মিও বিচ্ছুরিত হল না 'হ্যাচ'য়ের ফাঁক দিয়ে।

হালের চাকা ধরে দাঁড়ালেন রোবার স্বয়ং। হাতের কাছেই রইল রেগুলেটর। তার মানে, তিনি একাই একসঙ্গে দুটি কাজের দায়ীত্ব নিলেন—গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং গতিমুখ নিয়ন্ত্রণ।

আমাকে যথারীতি ঠেলেঠুলে নামিয়ে দেওয়া হল আমার কেবিনে। বন্ধ হয়ে গেল 'হ্যাচ'। নায়গারা জলপ্রপাত থেকে রওনা হওয়ার পরেও এমনিভাবে বন্দীদশায় রাত কাটিয়েছিলাম। 'টেরর'য়ের আকাশ-যাত্রা দেখতে দেওয়া হয়নি।

দেখতে না পেলেও যন্ত্রযানের কোথায় কি কাণ্ডকারখানা চলছে, তা কলকজ্জার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারলাম! প্রথমে মনে হল, গলুইয়ের দিকে ঈষৎ উঁচু হল 'টেরর'—ভূমির সঙ্গে যেন সম্পর্ক রহিত হল সামনের অংশ। কিছুক্ষণ গেল হেলে-দুলে নড়ে-চড়ে ভারসাম্য ঠিক রাখতে! তারপরেই বিপুল বেগে গোঁ-গোঁ করে টারবাইন চলতে লাগল পায়ের তলায়। সেই সঙ্গে ঝপাঝপ শব্দে নিয়মিত ছন্দে বাতাস কাটতে লাগল সুবিশাল ডানাজোড়া।

বটে! গ্রেট আইরীর গোপন বিবর চিরকালের মত পরিত্যাগ করে ব্যোমচারী হল 'টেরর'! জাহাজ যে ভাবে জলে ঝাঁপ দেয়, 'টেরর' সেইভাবে ঝাঁপ দিয়েছে বাতাসে। অ্যালিঘানিয়ান পর্বতমালার অনেক উঁচু দিয়ে নিশ্চয় উড়বেন ক্যাপ্টেন, মেঘের কোল দিয়ে সুবৃহৎ পক্ষীরাজের মত পেরিয়ে যাবেন পাহাড়ি অঞ্চল।

কিন্তু কোথায়? কোন দিকে? নর্থ ক্যারোলিনা পেরিয়ে আটলান্টিকে ভাসবেন? না, সোজা পশ্চিমে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে অবগাহন করবেন? দক্ষিণেও যেতে পারেন—মেক্সিকো উপসাগরে ডুব-সাঁতার দেবেন কিছুক্ষণ। জল-রাজ্যে পৌঁছে গেলে শুধু দিগন্ত আর জলরাশি দেখে কি চিনতে পারবো কোথায় এসেছি? কোন সাগরের ওপর ভাসছি?

মাথার মধ্যে চিন্তার তুফান নিয়ে ঠায় বসে রইলাম বেশ কয়েক ঘণ্টা। ঘণ্টাগুলো মনে হল শতাব্দী-সমান লম্বা, কাটতে যেন আর চায় না! ঘুম এল না। ঘুমিয়ে অসহ্য চিন্তাকে বিস্মৃত হতেও চাইলাম না। বাতাসের মধ্যে দিয়ে আমাকে শন্ শন্ করে উড়িয়ে নিয়ে চলল বাতাস-দৈত্য—মনে মনে আমি কিন্তু মনপবনের নাও চেপে পৌঁছে গেলাম কল্পলোকের অবাস্তব দুনিয়ায়। না জানি রাত ভোর হলে কোথায় পৌঁছোবো। আকাশ-যাত্রার অবিশ্বাস্য বর্ণনা দিয়েছিলেন বেলুনবাজ আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স। দিগ্বিজয়ী রোবার তাঁর প্রথম উড়োজাহাজে যে ভেলকি দেখিয়েছিলেন, এখন নিশ্চয় তার চতুর্গুণ দেখাবেন চতুরূপী যন্ত্রযান দিয়ে?

অনেকক্ষণ পরে ভোরের আলো ফিকে করে আনল কেবিনের অন্ধকার। এখনো কি অবরুদ্ধ থাকতে হবে? মুক্তি পাবোনা যন্ত্রযানের ডেকে? যেমন পেয়েছিলাম লেক ঈরী অভিযানের সময়ে?

মই বেয়ে উঠে গেলাম, ঠেলা দিলাম 'হ্যাচ'-য়ে? খুলে গেল ঢাকনি। কোমর পর্যন্ত তুলে দেখলাম বহির্দৃশ্য।

চারিদিকে আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বেশ কয়েক হাজার ফুট নীচে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি দেখা যাচ্ছে—মহাসমুদ্র বলেই মনে হল। রোবার ডেকে নেই—সম্ভবতঃ ইঞ্জিন ঘরে। হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন টার্নার। সঙ্গী লোকটা গলুইতে দাঁড়িয়ে নজর রেখেছে চারিদিকে।

গতবার নৈশ অভিযানের সময়ে কেবিনে আটক থাকায় যে দৃশ্য দেখতে পাইনি, ডেকে উঠে এখন তা দেখলাম এবং হতবাক হলাম। 'টেরর' ডানা ঝাপটে উড়ে চলেছে প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাকটিলের মত। সমান ছন্দে উঠছে আর নামছে দুপাশের বিশাল ডানা—একই সঙ্গে বনবন করে ঘুরছে প্রপেলার সামনে আর পেছনে!

দিকচক্রবাল সবে ছাড়িয়েছে অরুণদেব। সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝলাম আমরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছি। 'টেরর' মাঝপথে দিক পরিবর্তন না করে থাকলে পায়ের তলার দেখছি মেক্সিকো উপসাগরকে।

দিগন্ত কামড়ে ঝুলছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ; ধ্বক ধ্বক করছে জমাট মেঘের তাল! সূচনা দেখলেই বোঝা যায়, গরম পড়বে আজ। সেই সঙ্গে আসবে ঝড়। বেলা আটটার সময়ে ডেকে এসে টার্নারের হাত থেকে হালের ভার নিজের হাতে নেওয়ার সময়ে রোবার নিজেও লক্ষ্য করলেন ঝড়ের এই পূর্ব-লক্ষণ। জানি না, সেই সময়ে তাঁর অ্যালবেট্রস-য়ের অভিজ্ঞতা মনে পড়ল কিনা। সেবারও ঝড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ায় জলস্তম্ভরা ঘেরাও করেছিল অ্যালবেট্রস-কে। সাইক্লোনের পাগলা হাওয়া শুকনো পাতার মত উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আকাশ-যানকে কুমেরু সাগরের ওপর দিয়ে। নেহাৎ আয়ু ছিল বলেই বেঁচে গিয়েছিলেন সে-যাত্রা। ফিরে এসেছিলেন যমপুরীর দরজার সামনে থেকে।

'টেরর' আর 'অ্যালবেট্রস'-য়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। ঝড়ের মত্ততার কাছে বিপুলায়তন 'অ্যালবেট্রস' পরাভূত হলেও 'টেরর' হার মানবে না অত সহজে। 'টেরর' অনেক হাল্কা এবং তার একই অঙ্গে অনেক রূপ। আকাশে যদি ঝড়-জল-বিদ্যুৎ সংহার মূর্তি ধারণ করে, টুপ করে জলে নেমে আসবে

'টেরর'। ঢেউ যদি বেশী অশান্ত হয়, ডুব দেবে ঢেউয়ের তলায়—জলতলের প্রশান্ত রাজ্যে।

রোবার অভিজ্ঞ মানুষ। আকাশের অবস্থা দেখে নিশ্চয় বুঝেছিলেন, ঝড় এলেও সেদিন আসবে না—পরের দিন হামলা জুড়বে।

তাই অব্যাহত রইল 'টেরর'-য়ের শূন্য পরিক্রমা। বিকেল হল। ঢেউয়ের নাগরদোলায় দোলবার জন্যেই যেন সমুদ্রে অবতীর্ণ হল 'টেরর'। এ-সুবিধে শুধু 'টেরর' নামক যান্ত্রিক জীবেরই আছে। উড়তে উড়তে ক্লান্ত হলেই ঢেউয়ে দুলে জিবিয়ে নিতে পারে। সামুদ্রিক পাখী 'টেরর' সত্যিই যেন দ্রুতগামী পাখী অ্যালবেট্রস। খুশীমত তরঙ্গে দুলতে পারে। উড়তেও পারে। তবে 'টেরর' সৃষ্টিছাড়া পাখী। অফুরন্ত ইলেকট্রিসিটির ম্যাজিকে তার ধাতুর দেহ কখনো ক্লান্ত হয় না।

ধূ-ধূ জলরাশি খাঁ-খাঁ করছে। ধোঁয়া বা পালমাস্তলের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না দিগন্তে। কেউ নেই সাগরে। অর্থাৎ আমাদের দেখে আঁৎকে উঠে সংকেত বার্তাও পাঠাচ্ছে না কেউ দিকে দিকে।

অপরাহ্ন গড়িয়ে এল। নতুন কোনো ঘটনা ঘটল না। মরাল গতিতে ছুটে চলেছে 'টেরর'। ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্য বোঝা ভার। কোথায় চলেছেন তিনি? এভাবে গেলে পৌঁছোবেন ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ বা তারও ওদিকে ভেনজুয়েলা অথবা কোলাম্বিয়ার উপকূলে। কিন্তু রাত হলে বোধ হয় ফের আকাশে উড়ে শূন্য পথে টপকে যাবেন গুয়াটেমালা আর নিকারাগুয়ার পর্বত প্রাচীর—পৌঁছোবেন প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপ "এক্স"-য়ে।

সন্ধ্যে নামল। রক্তরাঙা দিগন্তে ডুব দিল সূর্য। 'টেরর'দের আশেপাশে চিকমিক করছে সমুদ্র। যাওয়ার পথে যেন ফুলকি ছুঁড়ে দিচ্ছে। ঝড়ের লক্ষণ। রোবার নিজেও হুঁশিয়ার হলেন। আমাকে ফের কেবিনে নামিয়ে এঁটে দেওয়া হল 'হ্যাচ'।

কয়েক মুহূর্ত পরেই নানা ধরনের আওয়াজ থেকে বুঝলাম, ডুব-সাঁতারের জন্যে তৈরী হচ্ছে 'টেরর'। পাঁচ মিনিটও গেল না, আমরা পরম শান্তিতে ভেসে চললাম সাগরের তলা দিয়ে।

ভাবনা-চিন্তায় অনিদ্রায় এত এলিয়ে পড়েছিলাম যে আর পারলাম না দুচোখের পাতা খুলে রাখতে। এবার কিন্তু ওষুধের প্রভাবে ঘুমোলাম না। গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হলাম শরীর আর বইছিল না বলে। ঘুম ভাঙবার পর দেখলাম তখনো জলের তলা দিয়ে চলেছে 'টেরর'। বুঝলাম না কতক্ষণ ঘুমিয়েছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ভাসলাম জলপৃষ্ঠে। দিনের আলো ঢুকল কেবিনের মধ্যে। সেই সঙ্গে বুঝলাম সমুদ্র মোটেই শান্ত নয়। আথালি-পাথালি ঢেউয়ের ওপর হেলেদুলে গড়িয়ে নেচে ছুটছে 'টেরর'। এতক্ষণ ছিলাম নিস্তব্ধ রাজ্যে। সাগর তলের সেই নিশ্ছিদ্র নীরবতা যে না উপলব্ধি করেছে তাকে বোঝানো যাবে না কি অপরিসীম শান্তি সেখানে। ডুবোযানের শব্দহীন অগ্রগতির মূক সাক্ষী ছিল কেবল সামুদ্রিক গুল্ম আর প্রবাল স্তূপ, রঙবেরঙের মাছ আর সামুদ্রিক প্রাণী। নিঃশব্দে সঞ্চরমান বিপুল ছায়া-দানবের মত সমুদ্রতলের ওপর দিয়ে সারারাত ভেসে গিয়েছিল ডুবোযান। শান্তির রাজ্যে প্রশান্তির প্রলেপ চোখে লেগেছিল বলেই অত ঘুমিয়েছিলাম।

ঘুম ভাঙার পর এ আবার কি কাণ্ড শুরু হল! সমুদ্র পৃষ্ঠে ভেসে উঠতেই শুরু হল দারুণ দুলুনি। উত্তাল ঢেউ যেন লোফালুফি খেলতে লাগল 'আতংক'কে নিয়ে।

আগের মতই ডেকে উঠে এলাম—কেউ বাধা দিল না। প্রথমেই লক্ষ্য করলাম আবহাওয়ার অবস্থা। ঝড় আসছে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। জমাট কালো মেঘে ঘনঘন ঝলসাচ্ছে বিজলীর ফুলঝুরি। শূন্যপথে ভেসে আসছে চাকা গড়ানোর মত মেঘ ডাকার গুম্‌গুম্‌ শব্দ।

বুক কেঁপে উঠল আমার! আকাশ, বাতাস, সমুদ্র—সবারই চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। ক্রুর মূর্তি নিয়ে মেঘরাশি যেন তাণ্ডব নাচের সাজে সাজছে। বাতাসে ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে হুহুংকার। সমুদ্রও বুঝি মাতাল হয়ে গিয়েছে অন্তরীক্ষের দুই মিতার রণমূর্তি দেখে।

দ্রুতবেগে মাথার ওপর এসে পৌঁছোলো রুদ্ররূপী তুফান। এত দ্রুত যে পাল মাস্তুলের জাহাজ হলে পাল গুটিয়ে নেওয়ার সময় পর্যন্ত পেল না! শুধু যে লাফ দিয়ে এল ঝড় তা নয়, এল করালবদন সংহার রূপ নিয়ে!

আচম্বিতে যেন ঝনঝনিয়ে শেকল ছিঁড়ে মাতাল হল পাগলা ঝড়। যেন মেঘের কারাগার থেকে মুক্তি নিয়ে পলক মধ্যে ধরায় লম্ফ দিয়েছে মত্ত প্রভঞ্জন। যেন লক্ষ করতালি বাজিয়ে মেদিনী কাঁপিয়ে খলখল হাসি হাসছে খাঁচা ভাঙা অসুর। সমুদ্রটাও সেই সঙ্গে আকাশ ছোঁয়া ঢেউ তুলে নেচে উঠল অবিশ্বাস্য উচ্ছ্বাসে। প্রলয় নৃত্যের আসর আজ জমজমাট। হাওয়ার ঝাপটায় যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। সমুদ্র তরঙ্গ বিপুল উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছিমছাম 'টেরর'য়ের ওপর পর্বত প্রমাণ ফেণায় ঢেকে গেলাম সবাই। ভাগ্যিস শক্ত হাতে রেলিং চেপে ধরেছিলাম, তাই বেঁচে গেলাম। নইলে ছিটকে গিয়ে পড়তাম জলে।

বাঁচবার পথ একটাই—জলে ডুব দেওয়া। আবার সাবমেরিন হয়ে যাওয়া। আন্দাজ বারো ফুট নীচে নামলেই আবার পাব শান্তির রাজ্য। ঢেউ দাপাদাপি করে মরুক মাথার ওপর। ক্রুদ্ধ সমুদ্রের সঙ্গে এখন পাল্লা কষতে যাওয়া মূর্খতা হবে।

ডেকে ছিলেন রোবার। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমাকে তো ঘাড় ধরে ডেক থেকে নামিয়ে দিলেন না! ডুব সাঁতারের হুকুমও দিলেন না। আগেব চাইতেও জলন্ত চোখে চেয়ে রইলেন রুদ্র ঝড়ের দিকে। আকাশজোড়া সমুদ্র-জোড়া প্রলয়কাণ্ডের মাঝে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—ভয় বস্তুটা যেন রক্তে নেই।

তাঁর ঐ মূর্তি দেখে হকচকিয়ে গেলাম। কাকে দেখছি? মানুষ, না, অমানুষ? পিশাচ, না, দানব? অদৃশ্য লোক হতে আহুত শরীরী বিভীষিকাব মতই যে হাসছেন রোবার!

সভয়ে দেখলাম, হালের চাকা খামচে ধরে কি রকম যেন হয়ে গিয়েছেন রোবার। ধ্বক্‌ধ্বক্ করে জলছে তাঁর দুই চক্ষু। এরকম প্রদীপ্ত চোখ এর আগে কখনো দেখিনি। চোখ তো নয়, যেন আগুনের মালসা! দু'টুকরো জলন্ত অঙ্গার বসানো অক্ষি কোটরে। রুদ্র প্রকৃতির পানে উদ্ধত ভঙ্গিমায় তাকিয়ে আছেন রোবার। অধরোষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত—দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। রোবার যেন অট্ট-অট্ট হাসি হাসছেন লক্ষ লক্ষ রক্ষ-যক্ষেব রুদ্র-লীলার রূপ দেখে। সেই হাসির মধ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সীমাহীন তাচ্ছিল্য—বিধ্বংসী প্রকৃতিকেও যেন তৃণজ্ঞান করছেন রোবার—ত্রিভুবনের রাজা রোবার!

সত্যিই কি উন্মাদ হয়ে গেলেন রোবার? আর দেরী করা সমীচীন নয় মোটেই। প্রাণ বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে গোঁৎ দিয়ে নেমে যাওয়া দরকার জলের অতলে!

কিন্তু একী রূপ দেখছি রোবারের? চোখের তাবায় এ-কিসের আভাস? কার সংকেত ঝিলিক দিচ্ছে ওঁর অগ্নিগর্ভ চাহনিতে? মহাকালের টংকার শুনছি না ওঁর অট্ট-অট্ট হাসির মধ্যে? সত্যিই তিনি যেন আর মাটির মানুষ নন—অপার্থিব দুনিয়া থেকে আগন্তুক মূর্তিমান অমানুষিকী অশুভ শক্তি দিয়ে গড়া প্রলয়ংকর দানব!

ঝড়ের হাহাকার আর বাজের দামামা ছাপিয়ে আচম্বিতে একটা চীৎকার শোনা গেল।

রণ হুংকার! রোবার চেঁচাচ্ছেন বজ্রকণ্ঠে:

"আমি, রোবার! রোবার!! ছুনিয়ার মালিক!!!"

বলেই সবশরীর ঝাঁকিয়ে ইংগিত করলেন উন্মাদ বৈজ্ঞানিক। তুই স্যাঙাৎ এই হুকুমের প্রতীক্ষাতেই উন্মুখ হয়েছিল। মনিবের মত অসুখী এই ছুটি মানুষও যেন মস্তিষ্ক বিকৃতিতে ভুগছিলেন। তাই হুকুম পালিত হল মুহূর্তের মধ্যে।

চক্ষের নিমেষে খুলে গেল ছুপাশের বিশাল ডানা। জল ছেড়ে শূন্যে লাফ দিল উড়োজাহাজ। নায়গারা জলপ্রপাতকে এইভাবেই তলায় ফেলেছিল 'টেরর'—সেদিন শূন্যে উঠেছিল বাঁচার তাগিদে—আজকে উঠল মরার তাগিদে। নইলে উন্মত্তের মত সটান হারিকেনের দিকে ছুটব কেন?

হু-হু করে আকাশ অভিমুখে ধাবিত হল উড্ডুক্কু যন্ত্রযান। লক্ষ লক্ষ বিজলীর চকিত দীপ্তির মধ্যে দিয়ে, মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনির কর্ণ বিদারী নিনাদ উপেক্ষা করে ছুটে চলল 'টেরর'। এলোমেলো ছুটন্ত বিদ্যুতে প্রতিমুহূর্তে ভস্মীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও ধেয়ে চলল ক্ষিপ্তের মত।

এ-দৃশ্য বুঝি শুধু নরকেই দেখা যায়। বজ্রের ডম্বরু ধ্বনি, লকলকে বিজলীর গোলকধাঁধা প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করতে চাইল যন্ত্রযানকে।···প্রতি মুহূর্তে অলৌকিকভাবে অক্ষত অবস্থায় তড়িৎ শিখার মাঝ দিয়ে ছুটে চলল 'আতংক'।

রোবার এখনো অনড়, এখনো অবিচল। এক হাতে হালের চাকা, আরেক হাতে রেগুলেটর ধরে তিনি এখনো নিষ্কম্পদেহে দাঁড়িয়ে আছেন অমানুষিক দানবের মত। ছুপাশে ডানা উঠছে আর নামছে। সামনে আর পেছনে প্রপেলার ঘুরছে—নির্ভুল লক্ষ্যে তিনি তাঁর যান্ত্রিক বিস্ময়কে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ঝড়ের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে—যেখানে মেঘে মেঘে লাফ দিচ্ছে ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশ!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মত্ত প্রভঞ্জন যেখানে সমস্ত শক্তি নিয়ে কেন্দ্রীভূত, যেখানে লক্ষ অশনি নিষ্ঠুর সংকেত নিয়ে করালরূপে দৃশ্যমান—নিশ্চিত সেই মৃত্যুর দিকেই নক্ষত্র বেগে চলেছেন রোবার! প্রচণ্ড বেগে আন্দোলিত হচ্ছে ডানাজোড়া, ঝনঝন করে কাঁপছে ধাতব দেহ—ভ্রূক্ষেপ নেই রোবারের। ঘনঘন বিদ্যুৎ ঝলকের আলোয় দেখতে পাচ্ছি তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত মুখচ্ছবি, বিস্ফারিত জ্বলন্ত চক্ষু, শুনতে পাচ্ছি তাঁর হা-হা-হা-হা অট্টহাসি।

"আমি রোবার ··ত্রিভুবন জয়ী রোবার···স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের রাজা—কে রোধে আমার গতি?···"

কি করব আমি? মেশিন নীচে নামাতে বাধ্য করব উন্মাদ বৈজ্ঞানিককে?

আকাশ-চুল্লীর মধ্যে নিমেষ মধ্যে পোকার মত পুড়ে ছাই হওয়ার আগেই জোর করে তাঁকে দিয়ে জলের তলায় মেশিন নামিয়ে নিয়ে যাব? আকাশ বা জলের ওপর আর নিরাপদ নয়—শান্তি বিরাজ করছে শুধু জলের তলায়—ঝড়-জলের প্রতাপ যেখানে পৌছোয় না!

পরক্ষণেই বিচার-বুদ্ধি ছাপিয়ে প্রকট হল আমার তীব্র কর্তব্যচেতনা। একী উন্মত্ততা! আমার দেশকে যে-লোকটা হুমকি দেখিয়েছে, যাঁকে আমার দেশ আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করেছেন, মহা অপরাধী সেই মানুষকে এখনো কেন গ্রেপ্তার করছি না আমি? এই মুহূর্তে ওঁর কাঁধ চেপে ধরে আইনের বাণী স্মরণ করিয়ে দেওযা উচিত! আমি কি ভুলে গেলাম, আমার নাম জন স্ট্রক, ফেডারাল পুলিশের চীফ ইন্সপেক্টর? সেই মুহূর্তে আমি বিস্মৃত হলাম আমি কোথায় আছি, কি অবস্থায় আছি। ভুলে গেলাম আমি একা আর ওঁরা তিনজন, ভুলে গেলাম সাগর থেকে বহু হাজার ফুট উচ্চে সাক্ষাৎ মৃত্যু লক্ষ সর্পের মত জিহ্বা বুলিযে যাচ্ছে যন্ত্রযানে! জ্যা-মুক্ত তীরেব মত ছিটকে গেলাম গলুইযেব দিকে। রোবাবের ওপর লাফ দিযে পড়ে ঝড়ের হাহাকাবকে ডুবিয়ে দিয়ে চীৎকার করে বললাম:

"আইনের স্বার্থে আপনাকে—"

কিন্তু রোবারের এত দর্প বুঝি সইতে পারলেন না দর্পহাবী। এতক্ষণ বুঝি সকৌতুকে সহস্র চক্ষু মেলে মদমত্ত রোবারের স্পর্ধিত উর্ধ্বগতি নিবীক্ষণ করছিলেন সুরলোকের অধিপতি। অসুর নিধনের সময় বুঝি এসেছে এবার।

তাই আমি কথাটা শেষ করতে পারলাম না। আচম্বিতে যেন প্রচণ্ড সংঘাতে থরথর করে কেঁপে উঠল 'টেরর'। ইলেকট্রিক শক মানুষকে যেমন কাঁপিয়ে দেয়, ঠিক তেমনভাবে কেঁপে উঠল 'টেরর'যের পুরো কাঠামো। শক্তিশালী ব্যাটারীর ঠিক কেন্দ্রমূলে আঘাত হেনেছে বিদ্যুৎ।

লাফিয়ে উঠে মুহূর্তের মধ্যে শতধাবিদীর্ণ হযে দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল 'আতংক'র ডানা এবং অন্যান্য অংশ।

চূড়ান্ত বজ্র হেনেছেন বজ্রাধিপতি। বিদীর্ণ হযেছে 'আতংক'র বুক। বিস্ফোরিত হয়েছে তার যান্ত্রিক অবয়ব। চূর্ণ হযেছে অহংকারী রোবারের গগনস্পর্শী দর্প!

ডানাজোড়া খুলে ছিটকে গেল, প্রপেলার ভেঙে উড়ে গেল, ধ্বংসাবশেষের ওপরে তবুও একটির পর একটি বজ্র এসে পড়তে লাগল নিষ্ঠুরভাবে। জ্বলতে জ্বলতে প্রায় হাজার ফুট ওপর থেকে 'টেরর' আছড়ে পড়ল সমুদ্রে!

(১৮) বুড়ি দাদীর শেষ মন্তব্য

জানিনা কত ঘণ্টা বেহুঁশ ছিলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম একটা কেবিনে শুয়ে আছি আমি। দোর গোড়ায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে বহু নাবিক, মাথার বালিশের কাছে বসে একজন অফিসার। একটু সুস্থ হতেই উনি একটির একটি প্রশ্ন করে চললেন। আমিও মন থেকে জবাব দিলাম।

কিছুই গোপন করলাম না। যা জানি, সব বললাম। হ্যাঁ, সব। শ্রোতারা শুনলেন বটে, কিন্তু মুখ দেখে বুঝলাম কেউ বিশ্বাস করলেন না। ভাবলেন, মাথাব ঠিক নেই আমার।

আমি শুযে আছি 'ওটাকা' স্টীমাবে। মেক্সিকো উপসাগবের ওপব দিযে চলেছি নিউ অর্লিয়েন্স বন্দরের দিকে। যে-ঝড়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে 'টেবব', সেই ঝড়ের আগমনে প্রাণভযে পালাচ্ছিল 'ওটাকা'। হঠাৎ দেখা গিযেছিল অনেক ভা...া কলকব্জা ভাসছে জলে। ধ্বংসাবশেষে আটকে রয়েছে আমার দেহ। আমার জ্ঞান ছিল না।

চোখের সামনে ভেসে উঠল অবর্ণনীয় সেই নরক দৃশ্য! বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে বজ্র ফেটে পডছে, ঝড হাহাকাব করছে তাবপর ভীষণ শব্দ বজ্রপাতেব পর বজ্রপাত ··শূন্য পথে ছিটকে গেলাম

'আতংক' তাহলে আব নেই। ত্রিভুবন-জয়ী রোবারও আব নেই! চিরতরে অদৃশ্য হলেন তিনি ভৌত শক্তির সঙ্গে টক্কব দিতে গিয়ে। বজ্রবিদ্যুৎ যে কেন্দ্রবিন্দুতে সমগ্র সংহার শক্তি নিয়ে নৃত্যশীল, ঠিক সেই কেন্দ্রবিন্দুতে উনি উড়ে গিযেছিলেন শক্তির মহড়া দিতে· আপন শক্তি যাচাই কবতে। তাই দুই সাগরেদ সহ চিরতরে ত্রিভুবন থেকে বিদায নিযেছেন রোবার—মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন অসাধারণ যন্ত্রযানের গোপন রহস্য! অসামান্য কীর্তির মন্ত্রগুপ্তি! নরলোক এখন থেকে নিরাপদ!

পাচদিন পরে পৌছোলাম 'ওটাবা'। সেদিন দশই অগাস্ট। উদ্ধার কারীদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে বসলাম ওয়াশিংটনগামী ট্রেনে।

প্রথমেই গেলাম পুলিশ দপ্তর অভিমুখে! আমি যে ফিরে এসেছি, তা আগে জানানো দরকার মিস্টার ওয়ার্ডকে।

দরজা খুলে চৌকাঠে দাঁড়াতেই ভ্যাবাচাকা খেযে গেলেন পুলিশ চীফ। পরমুহূর্তে বিস্ময় আর হর্ষ যুগপৎ নেচে উঠল চোখের তারায়! উনি জানতেন আমি মারা গিয়েছি। লেক ঈরীর জলে আমার লাশ হারিয়ে গিয়েছে!

তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে, সব বললাম তাঁকে। আমার অন্তর্ধান, লেকের জলে ডেস্ট্রয়ারদের তাড়া খেয়ে নায়গারার কিনারা থেকে শূন্য পথে উড়ে যাওয়া, গ্রেট আইরীর মধ্যে বিশ্রাম, ঝড়ের আবির্ভাবে বজ্রলোকের বিপর্যয় এবং মেক্সিকো উপসাগরে বেহুঁশ অবস্থায় উদ্ধার পাওয়া!

সেই প্রথম উনি শুনলেন, ধীমান রোবারের অভিনব যন্ত্রযান শুধু স্থলে জলে নয়, শূন্যেও ভেলকি দেখাতে পারে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অত্যাশ্চর্য এই যন্ত্রযানের অধিপতি হওয়ার পর থেকেই তো উনি দুনিয়াধিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন! এ-উপাধি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে মানাতো কী? নরলোক কি কোনো দিন নিরাপদ বোধ করত দুনিয়ার মালিকের ভয়ংকর এই যন্ত্র-বাহনের উপস্থিতিতে? বিপদ ঘনিয়ে আসত যখন-তখন, প্রতিরক্ষার সব ব্যবস্থাই ভেস্তে যেত বহুরূপী 'টেরর' আবির্ভূত হলে।

কিন্তু কাল হল ওঁর অপরিসীম অহংবোধ। বুদ্ধিবৃত্তিতে অতিমানুষ ছিলেন সন্দেহ নেই। আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হয়ে লড়তে নামতে লাগলেন ভৌত শক্তিদের সাথে। নেহাত আয়ু ছিল বলে বেঁচে গেছি আমি—দৈব সহায় হয়েছিল! চণ্ডমূর্তি ভৌত শক্তিদের খপ্পর থেকে ওঁরা তিনজন বাঁচতে পারলেন না কি সেই কারণেই?

মিস্টার ওয়ার্ড স্বকর্ণে শুনেও যেন লোমহর্ষক এই কাহিনী বিশ্বাস করতে পারলেন না। সব শেষে বললেন—"যাই হোক, তুমি যে ফিরে আসতে পেরেছো। এইটাই বড় কথা। কুখ্যাত রোবারের পরেই বিশ্ববিখ্যাত হতে চলেছো তুমি। আশা করি উন্মাদ উদ্ভাবকের মত তোমার মাথাটাও অহং-বোধে বিগড়ে যাবে না।"

"তা অবশ্য যাবে না। তবে নিছক কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে মানুষ ইতিপূর্বে এ-ভাবে কখনো সবশক্তি বিনিয়োগ করেনি। আশা করি তা মানবেন?"

"মানছি, স্ট্রক। গ্রেট আইরীর আগুন রহস্য আর 'টেরর'যের রূপান্তর রহস্য তুমিই তো উদ্ঘাটন করেছো! তবে আমাদের কপাল খারাপ। তাই সবচেয়ে বড় রহস্য যেটা, মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড তা সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাহন সমেত দুনিয়া থেকে চিরতরে মুছে গেলেন দুনিয়ার মালিক! মানুষের ভোগে লাগল না তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার।"

সেইদিনই সন্ধ্যের দৈনিকে ফলাও করে ছাপা হল আমার অ্যাডভেঞ্চারের বৃত্তান্ত। মিস্টার ওয়ার্ড ঠিক বলেছিলেন। রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলাম আমি।

একটা কাগজে গদগদ স্বরে লেখা হল—"ইন্সপেক্টর স্ট্রকের দৌলতে আমেরিকান পুলিশ আজও এগিয়ে রইল বিশ্বের পুলিশ মহলে। জল আর স্থলে যৎসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন অন্যান্য পুলিশ বাহিনী, আমেরিকান পুলিশ কিন্তু অপরাধীর অন্বেষণে ধাবিত হয়েছেন হ্রদ-মহাসাগরের অতলে—এমন কি শূন্যমার্গেও গেপ্তার করতে চেয়েছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ-বৈজ্ঞানিক দুনিয়াধিপতিকে!"

সত্যিই, 'টেরর'য়ের পাছু নিয়ে শূন্য পথেও হানা দিতে ছাড়িনি আমি। ভাবীকালের গোয়েন্দারাও কি এই পথের পথিক হবেন?

বুড়ি দাসী আমাকে দেখে রীতিমত ভড়কে গেল। আমাকে স্বাগতম জানাবে কি, মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোলো না। লঙ স্ট্রীটের বাড়ীতে আমি যে আবার সশরীরে আবির্ভূত হব, এ-তো ভাবাও যায় না! সুতরাং আমার প্রেতচ্ছায়া দেখে সে আঁৎকে উঠবে, এ আর আশ্চর্য কী! কল্পনাতীত অ্যাডভেঞ্চার অন্তে আমার চেহারাটাও প্রেতচ্ছায়ার মতই দাঁড়িয়েছিল। তাই তার খাবি-খাওয়া দেখে বড় ভয় হল আমার। হার্টফেল করবে না তো? আঁৎকে উঠে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে না তো?

তারপর অবশ্য আমার কাহিনী শোনার পর সে কেঁদে ফেলল। জলভরা চোখে বারবার কৃতজ্ঞতা জানালো দয়াময়কে এত সঙ্কটের মধ্যেও আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।

বলল—"কেমন, এখন বিশ্বাস হচ্ছে তো?"

"কী?"

"গ্রেট আইরীতে পিশাচ আছে?"

"দূর, দূর! রোবার আর যাই হোক, পিশাচ নয়!"

"কিন্তু পিশাচ হবার সব গুণপনাই তার ছিল।"

হপ্তাপাঁচেক বেলুন চেপে

[ফাইভ উইক্‌স্‌ ইন এ বেলুন]

॥ ১ ॥

১৮৬২ সাল। জানুয়ারী মাস।

রয়াল ভৌগোলিক সমিতির হলঘরে এক বিরাট সভা বসল। ঘন ঘন হাততালির মধ্যে সভাপতি ভাষণ শেষ করলেন। আসন গ্রহণ করার আগে বললেন :

"ভৌগোলিক তত্ত্ব সংগ্রহের ব্যাপারে পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে ইংলণ্ড। ডক্টর ফারগুসন ইংলণ্ডের সেই গৌরব বৃদ্ধি করতে চলেছেন। যদি তিনি সফল হন (শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'নিশ্চয় হবেন') তাহলে আফ্রিকার অসম্পূর্ণ মানচিত্র সম্পূর্ণ হবে। আর যদি তিনি বিফল হন, তাহলেও প্রমাণিত হবে যে মানুষ কেবল বুদ্ধিমানই নয়, দুঃসাহসিক কার্যকলাপেও তার জুড়ি নেই।"

বক্তিমে শেষ হতে না হতেই ফারগুসনের জয়নিনাদে হল ফেটে পড়াব উপক্রম হল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা সংগ্রহ আরম্ভ হয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে তাঁর অভিযানের জন্য ৩৭৫০০ মুদ্রা সংগ্রহ হল।

ডক্টর ফারগুসন তখন সভায় হাজির ছিলেন না। সদস্যরা তাঁকে একবার দেখার জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করল। কেউ কেউ বললে, ফারগুসন নামে নাকি আসলে কেউই নেই। সমস্তটাই বুজরুকি।

তখন সভাপতি বললেন—"ডক্টর ফারগুসন, আপনি দয়া করে একবাব বাইরে আসুন।"

তৎক্ষণাৎ ধীরস্থির গম্ভীর প্রকৃতির একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। বছর চল্লিশ তাঁর বয়স। ঘন ঘন হাততালিতে ঘরের কড়িকাঠ পর্যন্ত কেঁপে উঠল। মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ফারগুসন। এবার দেখা গেল ভদ্রলোকের শরীর বেশ সুগঠিত, নাসিকা দীর্ঘ, দুই চোখ কোমল কিন্তু তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিচঞ্চল। আজানুলম্বিত বাহু। পাজোড়া দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে তিনি কাতর নন। ফারগুসন মঞ্চে দাঁড়াতেই আনন্দ-কোলাহল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। ডানহাতের তর্জনী তুলে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে তিনি বললেন—"ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

এই একটা কথাতেই শ্রোতারা যেরকম উত্তেজিত হয়ে উঠল, কব্‌ডেন বা ব্রাইটের শত বক্তৃতাতেও সেরকম কখনো হয় নি। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে হাজার ব্যক্তির হৃদয় অধিকার করে ফেললেন যিনি, তিনি কে?

ডক্টর ফারগুসনের বাবা ইংরাজ নৌসেনা বিভাগের একজন দুঃসাহসী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। বালক ফারগুসনকে নিয়ে তিনি সাগরে সাগরে পাড়ি জমাতেন, জলযুদ্ধে যেতেন, শত বিপদের মধ্যেও ছেলেকে কাছছাড়া করতেন না। তখন থেকেই বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করতে শিখলেন ফারগুসন। আর একটু বড় হয়ে ভ্রমণকাহিনী পড়া শুরু করলেন। ছেলের মনোগত অভিপ্রায় বুঝে বাবা তাকে জলতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, বল-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ভেষজবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিলেন।

বাবার মৃত্যুর পর 'সৈনিকব্রত' গ্রহণ করে বাংলাদেশে এলেন ফারগুসন। কিন্তু তরবারি তাঁর ভাল লাগল না। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তা ত্যাগ করে ভারতবর্ষ ভ্রমণে বেরুলেন এবং একদিন সকালে কলকাতা থেকে পদব্রজে সুরাট যাত্রা করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে ঘুরে এলেন অসট্রেলিয়া, রাশিয়া আর আমেরিকা।

ফারগুসন সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া বিশেষ পছন্দ করতেন না। তার বদলে 'ডেলী টেলিগ্রাফ' সংবাদপত্রে নিয়মিত কৌতূহলোদ্দীপক ভ্রমণকাহিনী লিখতেন। তাই সবাই তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল। সভাসমিতিতে বসে বাজে বিতর্কে সময় নষ্ট না করে নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টায় তন্ময় হয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করতেন ফারগুসন।

একদিন 'ডেলী টেলিগ্রাফ' সংবাদপত্রে দেখা গেল:

"নির্জন আফরিকার নীরবতা এতদিনে ভঙ্গ হবে। ছ'হাজার বছরেও যে দেশ এখনো অজ্ঞাত, এবার তার রহস্য উন্মোচিত হবে। নীলনদের জন্মস্থান আবিষ্কারের চেষ্টা এতদিনে অসম্ভব মনে হয়েছিল। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে রহস্যময় আফরিকার তিনটি প্রবেশপথ মুক্ত হয়েছিল। ডক্টর বার্থ সুদানে গেছিলেন ডেনহ্যাম আর ক্লাপার্টনের আবিষ্কৃত পথে, অনেক কষ্টে উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে জেম্বেজী পর্যন্ত গেছিলেন ডক্টর লিভিংস্টোন, আর ভিন্নপথে গিয়ে আফরিকার কয়েকটা হ্রদ আবিষ্কার করেছিলেন ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট আর ক্যাপ্টেন স্পিক্। এই তিনটে পথ যেখানে মিলেছে, আফরিকার কেন্দ্রস্থল সেখানেই। ফারগুসন অচিরে আফরিকার এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে যাত্রা করবেন। আফরিকার পূবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত তিনি যাবেন ব্যোমযানে আরোহণ করে। জানুজিবার দ্বীপে বেলুনে উঠে বরাবর পশ্চিমদিকে

যাওয়ার পরিকল্পনা তিনি স্থির করেছেন। এই যাত্রা যে কোথায় এবং কিভাবে শেষ হবে, তা বলতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর।"

'ডেলী টেলিগ্রাম' খবরটা ছাপাতেই দেশ জুড়ে দারুন হইচই পড়ে গেল। তখনো এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয়নি। অনেকেই বললে—'অসম্ভব! বেলুনে করে কি এতটা পথ যাওয়া যায়? ফারগুসন-টারগুসন বলে আসলে কেউ নেই। সবটাই ডেলী টেলিগ্রাফের সম্পাদকের ধাপ্পাবাজি—হুজুগ তুলে ইংলণ্ডের মাথা বিগড়ে দেওয়ার অপচেষ্টা!' তখন অন্যান্য খবরের কাগজেও নানারকম প্রবন্ধ বেরুতে লাগল ডেলী টেলিগ্রাফকে বিদ্রূপ করে। ফারগুসন একদম বোবা হয়ে গেলেন।

কিছুদিন পরে শোনা গেল, সত্যিসত্যিই ফারগুসনের বেলুন তৈরার ভার নিয়েছেন লায়ন কোম্পানী। ইংরেজ সরকার 'রেজলিউট' নামে জাহাজটাও দিয়েছেন ফারগুসনের ব্যবহারের জন্যে। তখন সকলের সন্দেহ গেল—চারিদিকে আবার বিষম ধন্য ধন্য রব উঠল।

ইংলণ্ডের নানা জায়গায় বাজি ধরা আরম্ভ হল। সত্যি সত্যিই ফারগুসন নামে কেউ আছে কি না, সেজন্যে বাজি ধরা হল। এরকম একটা দুঃসাহসিক পর্যটনে মাথা গলাতে কেউ আদৌ এগোবেন কিনা, সে ব্যাপারে বাজি ধরা হল। এমন কি, পর্যটন শেষ করে ফারগুসন আর ইহজীবনে ইংলণ্ডে ফিরতে পারবেন কি না, তাও ওপরেও বাজি ধরা হল।

প্রতিদিন কাতারে কাতারে লোক এসে প্রশ্নে প্রশ্নে পাগল করে তুলল ফারগুসনকে। কেউ কেউ সহযাত্রী হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করল। কিন্তু ফারগুসন সবাইকেই ফিরিয়ে দিলেন। কাউকেই সঙ্গে নিতে রাজী হলেন না।

॥ ২ ॥

ডক্টর ফারগুসনের একজন বন্ধু ছিলেন—নাম তাঁর ডিক্ কেনেডি। দুজনের স্বভাব দুরকম হলে কি হবে, বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম। ডিক্ কেনেডি ছিলেন সরল প্রকৃতির মানুষ, দৃঢ়চেতা! যা ধরতেন, তা শেষ না করে ছাড়তেন না! তিনি থাকতেন লিথে। শিকার করতে, মাছ ধরতে আর বন্দুকের এক গুলীতে দূরস্থিত ছুরীকে মাঝখান থেকে সমান দু টুকরোয় ভেঙে দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না গোটা এডিনবরা প্রদেশে। সুপুরুষ, সুদেহী, অসুরের মত শক্তিমান, রোদে পোড়া মুখ, চঞ্চল কালো চোখ আর অদম্য উৎসাহ—ডিক্ কেনেডি বলতে বোঝাত এইগুলিই।

তিব্বত বেড়িয়ে আসার পর ফারগুসন আর দুবছর কোথাও গেলেন না দেখে বেজায় খুশী হলেন ডিক্ কেনেডি। ভাবলেন, বন্ধুর বেড়ানোর সখ বোধহয় এতদিনে মিটল। দেখা হলেই তাই বলতেন ফারগুসনকে—বিজ্ঞানের জন্যে অনেক তো খাটলে, এবার ঘরসংসারে মন দাও দেখি। ফারগুসন কথার জবাব দিতেন না। সব সময়ে কি যেন ভাবতেন।

তারপরেই হঠাৎ একদিন ডেলী টেলিগ্রাফের পাতা খুলে চমকে উঠলেন ডিক্ কেনেডি। দড়াম করে টেবিলের ওপর এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বললেন—"পাগল, না, বোকা! বেলুনে চড়ে আফরিকা অভিযান! দুবছর ধরে তাহলে এই নিয়েই এত ভেবেছে ফারগুসন!"

কেনেডির চাকর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। মনিবের মন্তব্য শুনে সে টিপ্পনী কাটল—"ওটা খবর না কচু! শ্রেফ গাঁজার দম!"

"গাঁজার দম! নিশ্চয় না। আমি ওকে চিনি! উঃ, কী দুরাশা, কী দম্ভ! আমি বাধা না দিলে দেখছি কোনদিন ফারগুসন চাঁদেই যাত্রা শুরু করে দেবে!"

সুতরাং কেনেডি আর দেরি করলেন না। সেই রাত্রেই রওনা হলেন লণ্ডন অভিমুখে। ভোরবেলা ফারগুসন যখন নিজের ঘরে চিন্তাবিষ্ট, এমন সময়ে দমাদম শব্দে দরজায় ধাক্কা আরম্ভ হল।

দরজা খুললেন ফারগুসন। খুলেই অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—"একী! ডিক যে!"

মাথার টুপী খুলে কেনেডি বললেন—"হ্যাঁ, আমিই।"

"শিকার ছেড়ে লণ্ডনে কি মতলবে?"

"একজন পাগলকে ঠাণ্ডা করতে।"

"পাগল? সে আবার কে?"

ডেলী টেলিগ্রাফ কাগজটা ফারগুসনের সামনে মেলে ধরে কেনেডি শুধোলেন—"খবরটা সত্যি?"

"সত্যি।"

"সত্যিই তুমি বেলুনে যাবে?"

"নিশ্চয়ই যাব। যাবার সব ব্যবস্থাও হচ্ছে। আমি—"

বাধা দিয়ে কেনেডি বললেন—"চুলোয় যাক তোমার বন্দোবস্ত।"

"চটেছো দেখছি। খবরটা তোমায় আগে দিতে পারিনি দারুণ ব্যস্ত ছিলাম বলে। তবে তোমাকে না জানিয়েও তো যেতাম না।"

"বাঃ চমৎকার! যেন এই জন্যেই আমি চটেছি।"

"আরে, আরে তা নয়। তোমাকেও যে যেতে হবে সঙ্গে।"

যেন ইলেকট্রিক শক খেলেন কেনেডি।

"তোমার কি ইচ্ছে আমরা দুজনেই বেড্‌লেমের পাগলা গারদে আটক থাকি?"

শুরু হল তর্কবিতর্ক। প্রাতরাশ খাওয়া শেষ হয়ে গেল। তবুও বাগবিতণ্ডা থামল না। ফারগুসন বললেন—"আমি অদৃষ্টবাদী। কপালে যা লেখা আছে, তা হবেই। ফাঁসিকাঠে যার মৃত্যু লেখা আছে, সে কখনো জলে ডুবে মরে না। সুতরাং কিসের ভয়?"

এ কথার কোনো জবাব দিতে না পারলেও ঘণ্টাখানেক তর্ক-টর্ক করে কেনেডি বললেন—"যদি আফরিকা বেডানোই তোমার উদ্দেশ্য ছিল তো সবাই যে পথে যায়, সে পথে না গিয়ে এমন উদ্ভট খেয়াল মাথায় চাপল কেন?"

"সবাই যে পথে যায়, সে পথে গিয়ে আজ পর্যন্ত কি কেউ সফল হয়েছে? হয়নি। মাঙ্গোপার্ক থেকে সুরু করে ভোগেল্‌ পযন্ত কেউ সফল হতে পারেন নি। মাঙ্গোপার্ক নাইগারের তীরে নৃশংস ভাবে খুন হন। ভোগেল ওয়াদেই-এব জলে ডুবে যান! আউদনি মারা যান মুর্মুরে, ক্যাপার্টনেব সমাধি হয সাকাটুতে। মৈজানকে টুকরো টুকবো করে কেটে ফেলে অসভ্যরা। মেজর ল্যাং, রোসারের রক্তে আফরিকার মাটি ভিজে গেছে। এইভাবে কত শত পযটক যে আফরিকায় গিয়ে প্রাণ হাবিয়েছে, তাব ইয়ত্তা নেই। প্রচণ্ড খিদে, ভয়ানক শীত, সাংঘাতিক জ্বর, হিংস্র জানোয়ারের চাইতেও ভয়াবহ এই বর্বর অসভ্যরা—এদের হাত থেকে কেউই রেহাই পাযনি। যে পথে গিয়ে এঁদের এই হাল হযেছে, সে পথ পরিত্যাগ করাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? তাই তো আফরিকার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা!"

"যদি বেলুনটা পড়ে যায়?"

"তা হলে হেঁটে যাব। কিন্তু জেনো আমার বেলুন কখনই পডবে না।"

"জোর করে কি কিছু বলা যায়।"

"আমি বলছি পডবে না। আফরিকার পূব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পযন্ত না গিয়ে আমি বেলুন ছাডছি না। ঝড বৃষ্টি পশু পাখী নরখাদক মানুষ—কেউ আমার গতিরোধ করতে পারবে না। বেশি গরম হলে ওপরে উঠে যাব, ঠাণ্ডা লাগলে নীচে নেমে আসব, পাহাড পর্বত নদী নালা অনায়াসে টপকে যাব! বেড়ানোর ক্লান্তি থাকবে না, বিশ্রামের জন্যেও ভাবতে হবে না। কখনও মেঘেব আড়ালে থেকে, কখনও মাটির দু চার হাত ওপর দিয়ে হু-হু করে ভেসে যাব আমরা। পায়ের তলায় নেচে নেচে সরে যাবে অজ্ঞাত আফরিকার ভয়াবহ দৃশ্য!"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন ফারগুসন। উত্তেজনা কেনেডিকেও স্পর্শ করল। মনের চোখে তিনি দেখতে পেলেন নীল-আকাশের বুক চিরে মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে উড়ে চলেছে বিশাল এক বেলুন।

কিছুক্ষণ পরে বিস্ময়ে ভয়ে ফিস ফিস করে বললেন কেনেডি—"এখনো তো আকাশে ওড়ার কল তৈরী হয়নি। তুমি তাহলে বেলুনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার যন্ত্র আবিষ্কার করেছো বল?"

"তাও কি সম্ভব? বেলুন চালনা এখনও আকাশকুসুম।"

"তাহলে—"

"বাণিজ্যবায়ুর নাম শোনো নি? আফরিকার পূর্ব অঞ্চলে সমানভাবে বয়ে চলেছে এই বাতাস—বিরামবিহীন গতিতে। এই বাণিজ্যবায়ুর স্রোতেই গা ঢেলে দেব আমরা।"

"তাও তো বটে।"

"ইংরেজ গভর্নমেণ্ট একখানা জাহাজ আমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। আফরিকার পশ্চিম তীরে পৌঁছে আমরা খানতিনচার জাহাজকে আমাদেরই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাব। খুব সম্ভব, তিনমাসের মধ্যেই জানজিবারে পৌঁছোব। সেখান থেকেই বেলুন গ্যাস ভর্তি করে নিয়ে বেরোনো যাবে।"

"আমরা মানে? তুমি আর কে?" চমকে গিয়ে বললেন কেনেডি।

"তুমি। যেতে আপত্তি আছে নাকি?"

"একশবার আছে। কিন্তু দেশ দেখতে গেলে তো তোমাকে অনেকবার ওঠানামা করতে হবে। গ্যাস ছেড়ে না দিলে বেলুন নামবে না। এমনি কয়েকবার নামলেই তো বেলুনের গ্যাস ফুরিয়ে যাবে।"

"ঐ খানেই ভুল করলে ডিক। গ্যাস একটুও নষ্ট হবে না।"

"পাগল নাকি? গ্যাস না ছেড়েই নামবে?"

"নামব বৈকি।"

"কি করে?"

"আমার গুপ্ত কৌশল তো সেইটাই। বন্ধু, আমার ওপর ভরসা রাখ, ভগবানের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।"

যন্ত্রচালিতের মত ডিক কেনেডি বললেন—"ভগবানের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।"

॥ ৩ ॥

ডিক কেনেডি কিন্তু হাল ছাড়লেন না। বোজই ফারগুসনকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ফারগুসন কিন্তু যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। দরকার হবে বলে আরবী আর মাণ্ডিন গুইয়ান ভাষা দুটোও শিখে নিলেন। ডিক কেনেডির কাকুতি মিনতিতে কর্ণপাত করলেন না।

ভাবতে ভাবতে কেনেডি সাহেব রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। কয়েকবার স্বপ্ন দেখলেন বেলুন থেকে তিনি পড়ে যাচ্ছেন এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই খাট থেকে গড়িয়ে পড়লেন মেঝের ওপর।

বন্ধুর পতন কাহিনী শুনে ফারগুসন বললেন—"ঘাবড়াও মাৎ। বেলুন থেকে আমরা পড়ব না।"

শুকনো মুখে কেনেডি বললেন—"যদি পড়ে যাই?"

"পড়ব না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।"

"কিন্তু নীলনদের জন্মস্থান আবিষ্কার করে লাভটা কি শুনি?"

"এখন যাঁরা আফরিকা পর্যটনে গেছেন বা ভবিষ্যতে যাঁরা যাবেন, আমাদের ভ্রমণকাহিনী তাদের অনেক উপকারে আসবে"

"কিন্তু—"

"আফরিকার এই ম্যাপখান দেখ।"

পুতুলের মত মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন কেনেডি। ফারগুসন বললেন—"নীলনদ থেকে গনডোকোরো নগর কতটা পথ দেখ।"

"দেখছি।"

"এই নাও কম্পাশ। কম্পাশের একটা কাঁটা গনডোকোরোর ওপর বসাও। অতিবড় দুঃসাহসী পর্যটকও আজ পর্যন্ত গনডোকোরো নগরের ধারে কাছে পৌঁছোতে পারেন নি। গনডোকোরো থেকে জানজিবার কত পথ দেখ। পেয়েছ?"

"পেয়েছি।"

"এবার কাজে-নগরটা খোঁজো।"

"পেয়েছি।"

"৩৩ ডিগ্রীর দ্রাঘিমা ধরে বরাবর ওপরে ওঠো।"

"উঠেছি।"

"বরাবর উঠে আউকেরিউ হ্রদের ধারে যাও।"

"এই তো হ্রদটা। আর একটু হলে জলের মধ্যে পড়ে যেতাম!"

"এই হ্রদের তীরে যারা থাকে, তাদের কথা থেকে কি জানা যায় জানো?"

"না।"

"এই হ্রদের উত্তর মাথা থেকে একটা জলধারা বেরিয়ে নীল নদে পড়েছে। এই জলধারাটাই নিশ্চয় নীলনদ।"

"বটে!"

"তোমার কম্পাশের আর একটা কাঁটা আউকেরিউ হ্রদের উত্তর মাথায় লাগাও। এখন দেখ, কম্পাশের দুই কাঁটার মধ্যে ব্যবধানটা কত ডিগ্রীর।"

"প্রায় দু ডিগ্রী।"

"দু ডিগ্রীতে কত মাইল হয় জান?"

"ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

"১৫০ মাইলেরও কম। আর কিছু খবর রাখ?"

"কি খবর?"

"ভৌগোলিক সমিতি মনে করেন, এই হ্রদটায় অভিযান চালানো একান্ত প্রয়োজন। ক্যাপ্টেন স্পেকে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের সঙ্গে এই কাজে নেমেছেন। খার্টুম থেকে একটা ষ্টিমার তাদের গনডোকোরো পর্যন্ত নিয়ে গেছে। ওখানে নেমে তাঁরা বেরোবেন হ্রদের সন্ধানে। যতদিন ফিরে না আসেন, ষ্টিমারখানা সেখানেই মোতায়েন থাকবে।"

"বন্দোবস্ত ভালোই বলতে হবে"

"ভায়া, এঁদের এই আবিষ্কার অভিযানে সাহায্য করতে হলে আমাদের তাড়াতাড়ি বেরুনো দরকার।"

"অনেকেই যখন বেরিয়েছেন, তখন আমরা আর নাই বা গেলাম!"

ফারগুসন আর কোনো জবাব দিলেন না। শুধু একবার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। তাই দেখে কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল ডিক কেনেডির।

॥ ৪ ॥

ফারগুসনের একজন চাকর ছিল। নাম তার জো। জো ছিল অত্যন্ত প্রভুভক্ত এবং বলতে গেলে সংসারের কর্তা। মনিবের মুখে বেলুন অভিযানের প্রস্তাব শুনে সে নির্বিকার রইল। কিন্তু মাঝে মাঝে বাদানুবাদ চলতে লাগল ডিক্ কেনেডির সঙ্গে। সেদিনও জো কেনেডিকে বললে—"মিচেলের কারখানায় গিয়ে বেলুনটা দেখেছেন?"

"না দেখিনি। দেখতে চাইও না। তুমি বুঝি ফারগুসনের সঙ্গে যাচ্ছ ?"

"বাঃ, আমি না গেলে তাঁর দেখাশুনা করবে কে ? সেবা করবে কে ? কেন, আপনি যাচ্ছেন না ?"

"যতক্ষণ পর্যন্ত ওকে ফিরিয়ে আনতে না পারি, ততক্ষণ সঙ্গে থাকতেই হবে। যত্তোসব পাগলামি।"

"আফরিকা কিন্তু শিকারের উপযুক্ত জায়গা। ভাল কথা, আজ আমাদের ওজন নেওয়া হবে।"

"তার মানে। আমরা রেসের জকি নাকি যে ওজন হতে হবে ?"

"না হলে তো চলবে না। বেলুনটার জন্যেই আমাদের ওজন দরকার।"

"ওজন না নিলেও বেলুন উড়বে।"

"কতটা ভার বেলুনকে বইতে হবে, তা তো জানা দরকার।"

"আমি ওজন হবোই না।"

ঠিক এই সময়ে ফারগুসন ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই স্থির চোখে বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন—"ডিক্, জো'র সঙ্গে একবার এস। তোমাদের ওজনটা দরকার।"

"কিন্তু—"

"এই নাও তোমার টুপী। চলে এস, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

এবার আর বাধা দিতে পারলেন না কেনেডি। নীরবে ফারগুসনের পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন।

মিচেলের কারখানায় গিয়ে তুলাদণ্ডে ওজন নিয়ে দেখা গেল, ডিক কেনেডির ওজন একশ তিপ্পান্ন পাউণ্ড জো'র একশ বিশ পাউণ্ড এবং ফারগুসনের একশ পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড।

খাতায় ওজন লিখে নিয়ে ফারগুসন বললেন—"তিনজনের ওজন মিলিয়ে চারশ পাউণ্ডের সামান্য বেশি।"

জো চট করে বললে—"দরকার হলে আরও বিশ পাউণ্ড ওজন কমাতে পারি। খাওয়াটা কমিয়ে দিলেই হল।"

ফারগুসন হেসে বললেন—"তার দরকার হবে না জো। তোমার যত খুশী খাও।

যতই দিন যেতে লাগল, ততই চিন্তা বৃদ্ধি পেতে লাগল ডক্টর ফারগুসনের। হিসেব করে তিনি দেখলেন, মোট ৪০০০ পাউণ্ড ভার নিয়ে উড়তে হবে বেলুনটাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস বাতাসের চেয়ে সাড়ে চোদ্দগুণ হাল্কা। তাই হাইড্রোজেন দিয়েই তিনি বেলুন ফোলানোর বন্দোবস্ত করলেন। ২৭৬ পাউণ্ড

গ্যাসের জায়গা করা হল বেলুনের মধ্যে। ৪০০০ পাউণ্ড ভার নিয়ে উড়তে গেলে ৪৪৮৪৭ ঘনফুট বাতাস সরিয়ে বায়ুমণ্ডলে নিজের জায়গা করে নিতে হবে বেলুনকে। ৪৪৮৪৭ ঘনফুট বাতাসের ওজন ৪০০০ পাউণ্ড, কিন্তু সমপরিমাণ হাইড্রোজেনের ওজন মাত্র ২৭৬ পাউণ্ড। তবে এই গ্যাস নিয়ে পুরোপুরি ফুলে ওঠার পর বেলুন যতই ওপরে উঠবে, ততই তার ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে আসবে। নিজ ধর্ম অনুযায়ী বেলুনের গ্যাস বিস্তার লাভ করতে চাইবে এবং শেষ পর্যন্ত বেলুন ফেটে গ্যাস বেরিয়ে যাবে। তাই বেলুনের অর্ধেক হাইড্রোজেন গ্যাসে ভর্তি করা স্থির করলেন ফারগুসন।

আর একটা কৌশল অবলম্বন করলেন ডক্টর। বড় বেলুনের মধ্যে গ্যাসে ভাসিয়ে রাখলেন আর একটা ছোট বেলুন। তাতে লাভ হল দুটি। প্রথমতঃ একটা বেলুন দৈবাৎ ফুটো হয়ে গেলে সেটি ফেলে দিয়ে আর একটা নিয়ে ভেসে যাওয়া যাবে। ছোট বেলুনের গ্যাস বড় বেলুনের মধ্যে ছেড়ে দিলেই ওঠানামার সময়ে গ্যাসও নষ্ট হবে না।

আরোহীদের থাকবার জন্যে একটা গোলাকার দোলনা বা গনডোলা বেলুনে লাগানো হল। বেত, নল আর লোহার পাত দিয়ে মজবুত করে তৈরী হল সেই দোলনা। তলায় স্প্রিং বসিয়ে আরোহীদের শোয়াবসার আরামের ব্যবস্থাও করলেন ফারগুসন। লোহার পাত দিয়ে চারটে বাক্স তৈরী করলেন। তারপর নল দিয়ে পর-পর চারটে বাক্স জুড়ে দিলেন। প্রতিটি নলেব মুখ খোলা বা বন্ধ করার ব্যবস্থাও করলেন। দু ইঞ্চি বেধের দুটো লম্বা নল বাক্সেব সঙ্গে লাগিয়ে বাক্স আর নলগুলোকে দোলনার গায়ে বেশ করে আটকে দিলেন। একটা বাক্সে জল বাখাব ব্যবস্থা হল। তিনটে নোঙর, পঞ্চাশ ফুট লম্বা সিল্কের দড়ির মই, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার, ক্রনোমিটার প্রভৃতি কয়েকটা অত্যন্ত দরকাবী জিনিস, চা, কফি বিস্কুট, নোনা মাংস, অন্যান্য খাবার, ব্র্যাণ্ডি, খাবার জল রাখার জন্য বইল দুটো পাত্র ছাড়াও বন্দুক, গুলী, বারুদ সমস্তই চাপানো হল বেলুনে। সেই সঙ্গে ওঠানো হল ছোট্ট একটা তাঁবু, আর কম্বল। দরকারী কিছুই বাদ দিলেন না ফারগুসন। তারপর সব কিছুর ওজন নিয়ে দেখা গেল, ঠিক ৪০০০ পাউণ্ড।

আকাশপথে এই ৪০০০ পাউণ্ড বোঝা নিয়ে উড়তে হবে ডক্টর ফারগুসনের বিচিত্র বেলুনযানকে!

॥ ৫ ॥

১৬ই ফেবরুয়ারী ইংরাজ সরকারের 'রেজলিউট' জাহাজে যাত্রীদের নিয়ে রওনা হল জানজিবার অভিমুখে। বেলুনটাকে অতি সাবধানে তোলা হল

জাহাজে। হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরী করে বেলুনের শূন্য উদর পূর্ণ করার জন্যে প্রচুর পুরানো লোহা আর সালফিউরিক অ্যাসিড নেওয়া হল সঙ্গে।

সমুদ্র পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটল না। অবসর মত পূর্ববর্তী পর্যটকদের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়ে নাবিকদের তাক লাগিয়ে দিতে লাগলেন ডক্টর ফারগুসন।

একদিন বললেন—"আপনারা যেন ভুলেও মনে করবেন না, অনেক দিন ধরে আমাদের বেলুনে উড়তে হবে। জানজিবার থেকে সেনেগাল নদী খুব জোর ৪০০০ মাইল। আকাশপথে বেলুনে তা মাত্র ৭ দিনের পথ।"

"অত তাড়াতাড়ি গেলে দেশ দেখাই তো হবে না," একজন বলল।

"বেলুন যদি আমার হুকুমে ওঠানামা করে, তা হলে দেশ দেখা হবে বইকি।"

ক্যাপ্টেন বললেন - "ওপরে উঠলে অবশ্য জোরালো বাতাসের স্রোত পাবেন। শুনেছি কখনও কখনও ঘণ্টায় ২৪০ মাইল বেগেও ঝড়ের মত বাতাস বয়। অত ঝড়ের মুখে আপনার বেলুন কি টিঁকবে?"

"আলবৎ টিঁকবে। ১৮০৪ সালে নেপোলিয়নের রাজ্যাভিষেকের সময়ে এ ঘটনা একবার ঘটেছিল। পর্যটক ভার্নোবিন প্যারিতে বেলুন ছেড়েছিলেন রাত এগারোটার সময়ে। পরদিন সকালেই ব্রাসিয়ানা লেকে গিয়ে পড়েছিল সেই বেলুন।"

শুনতে শুনতে ভয়ে কেনেডির বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ঢোঁক গিলে বললে—"অত ঝাঁকুনিতে বেলুন যদিও বা টেঁকে, মানুষের হাড়গোড় তো গুঁড়ো হয়ে যাবে।"

"আরে দূর! বেলুন তো আর বাতাসে নড়ে না, বাতাস যত জোরে এগোয়, বেলুনও টানের চোটে তত এগিয়ে যায়। স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে যায়। তাই উড়ন্ত বেলুনে মোমবাতি জ্বাললে দেখা যায় শিখা কাঁপে না। আমরা অবশ্য অত তাড়াতাড়ি যাব না। সঙ্গে দুমাসের খাবার তো আছেই, দরকার হলে কেনেডি শিকার করে আনবেন।"

* * *

এই ক'দিনেই নাবিকদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছিল জো। সাধারণ নাবিকরা তার লম্বা চওড়া বক্তৃতা শুনে তাজ্জব বনে যেত।

একদিন জো বললে—"এখন এঁরা বেলুনে চড়ার সুবিধে অসুবিধেটা বুঝে নিচ্ছেন। তারপর তোমরা শুনবে, বেলুন নিয়ে আমরা সিধে ওপরে চলে যাচ্ছি।"

একজন বললে—"তাহলে তো আপনারা একেবারে চাঁদে গিয়ে পড়বেন।"

"আরে ছোঃ! চাঁদে যাওয়া এমন কি আর শক্ত ব্যাপার। যে কেউ যেতে পারে। শুনেছি সেখানে বাতাস নেই—জলও নেই। বোতলে করে জল আর বাতাস না নিয়ে গেলে আমাদের চলবেই না।"

"জল না-ই বা থাকল। যতদিন জিন-মদ সেখানে আছে ততদিন ভাবনা কিসের," বললে একজন জিন-ভক্ত।

"চাঁদে জিন্‌ও নেই।"

"তাহলে আর আমাদের চাঁদে যাওয়া হল না। তার চাইতে বরং ঝকঝকে ঐ তারার দেশে এক চক্কর ঘুরে আসা যাবে।"

"তারার দেশ?" ভুরু তুলে বললে জো। "ওসব গ্রহ-তারার গল্প আমার কাছে ডালভাত হয়ে গেছে। ভাবছি শনিগ্রহটা একবার দেখতে যাব।"

"শনিগ্রহ কোনটা? যার চারদিকে গোলমত আংটি আছে?"

"হ্যাঁ। আমরা অবশ্য আংটিটাকে শনির বিয়ের আংটি বলি—যদিও বউটার হদিশ আজও পাইনি।"

"অত উঁচুতে যাবেন? সর্বনাশ! আপনার মনিব তো তাহলে খুদে দত্যি।"

"দত্যি কি হে! ওরকম ভালমানুষ আর দুটি হয় না।"

"শনিগ্রহ থেকে কোথায় যাবেন?"

"বৃহস্পতি গ্রহে। সে এক সুন্দর দেশ। সেখানকার দিনগুলো মোট সাড়ে ন ঘণ্টা। কুঁড়েদের স্বর্গরাজ্য। লম্বা রাত—খাও দাও আর বসে ঘুম দাও। সেখানকার একটা বছর আমাদের বারো বছরের সমান। এই পৃথিবীতে যারা আর ছ মাসের মধ্যে মরবে, বৃহস্পতি-গ্রহে গেলে তারা আরো কিছু দিন বাঁচতে পারবে।"

"সেখানকার এক বছর আমাদের বারো বছর!" অবিশ্বাসীসুরে বললে একজন ছোকরা চাকর।

"কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এখানে তো দিব্বি বড়সড়টি দেখাচ্ছে তোমাকে, কিন্তু বৃহস্পতিতে গেলে এখনও অনেক দিন মায়ের দুধ খেতে হবে। আর ঐ যে ঐ পঞ্চাশ বছরের বুড়ো, বৃহস্পতিতে ওর বয়স আর কতই বা বড়জোর তিন চার বছরের খোকা।"

"ভাল মানুষ পেয়ে বোকা বানাচ্ছেন নাকি?"

"আরে ছিঃ ছিঃ তাও কি হয়। দুনিয়ার সব খবরই আমাদের রাখতে হয়। বৃহস্পতিতে গেলেই বুঝবে সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি। অবশ্য

সে গ্রহে যেতে গেলে জামাকাপড়টা ভাল হওয়া চাই। বৃহস্পতির লোকগুলোর এদিকে আবার কড়া নজর।"

নাবিকরা মুখ টিপে হাসাহাসি করছে দেখে আরও গম্ভীর হয়ে জো বললেন—"তোমরা বুঝি নেপচুন গ্রহেরও খবর রাখ না? আহা রে, সেখানে নাবিকদের বড় আদর। নৌবিদ্যার কদর করতে জানে নেপচুনের লোকেরা! মঙ্গলগ্রহে আবার সৈন্যদের দারুণ সম্মান। বুধ গ্রহে শুনেছি চোর ডাকাতের বড় হামলা। সেখানে সওদাগরের অভাব নেই—লোকজনও মেলাই। চোরে-সওদাগরে সে গ্রহে খুব একটা ফারাক্ দেখা যায় না।"

॥ ৬ ॥

জো যখন গালগল্পে সাদাসিদে নাবিকদের আক্কেলগুড়ুম করে দিচ্ছে, ফারগুসন তখন জাহাজের অফিসারদের বোঝাচ্ছেন বেলুনের আরোহণ অবরোহণের বিচিত্র কৌশল।

"বেলুনের নীচের মুখটা আমি এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছি যে এক ফোঁটা বাতাসও বেলুনের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। দুটো নল ঢোকানো আছে বেলুনের ভেতরে। একটা নলের মুখ খোলা আছে বেলুনের হাইড্রোজেনের ওপরের অংশে, আর একটা নীচের অংশে। বেলুন ঝাঁকুনি খেলেও গাটাপার্চা দিয়ে মোড়া থাকবে বলে বেলুনে কোনো ঘা লাগবে না। নল দুটো বেলুনের বাইরে নেমে এসে একটা গোলমত বাক্সের ওপরকার ঢাকনার সঙ্গে লাগানো থাকবে। বাক্সটা হল গ্যাস গরম করার যন্ত্র। বেশ শক্ত করে তা বাঁধা থাকবে বেলুনের দোলনার সঙ্গে।"

"বুঝলাম না। বাক্স দিয়ে বেলুনের গ্যাস গরম হবে কি করে?" শুধোলে একজন।

"বেলুনের ওপর থেকে যে নলটা নেমে আসবে, তা এই বাক্সের মধ্যে দিয়ে স্প্রিংয়ের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছোবে বাক্সের তলায়। পরে প্লাটিনামের আবরণের ভেতর দিয়ে বাইরে আসবে। এই নলের মধ্যে যে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকবে, তা গরম করলেই গ্যাসটা হাল্কা হয়ে ওপরে উঠবে। গ্যাসের ধর্মই তাই। গরম করলেই হাল্কা হয়, বিস্তারলাভ করে। নলের মধ্যেকার গ্যাসও হাল্কা হয়ে ওপরে উঠে যাবে। আর ওপরকার ঠাণ্ডা ভারী গ্যাস নেমে আসবে নীচে। মুখের কাছে এলেই আবার তা তাপ পেয়ে গরম হয়ে ওপরে উঠে যাবে। তখন আবার খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস নীচে

নেমে আসবে। এ ভাবে গরম আর ঠাণ্ডা গ্যাসের একটা স্রোত শুরু হয়ে যাবে বেলুনের মধ্যে।

"এক ডিগ্রী তাপ পেলেই ৪৮০ ভাগের ১ ভাগ বেশি বিস্তার লাভ করাই গ্যাসের ধর্ম। অর্থাৎ আমি ১৮ ডিগ্রী তাপ দিলে বেলুনের গ্যাস ৪৮০ ভাগের ১৮ ভাগ বেশি ফুলে উঠবে। তার মানে, আয়তনে ১৬৭৪ ঘন ফুট বৃদ্ধি পাবে। কাজেই বেলুনও ফুলে উঠে ততখানি জায়গা জুড়ে বসবে—ফলে বেলুন সাঁ-সাঁ করে ওপরে উঠে যাবে।"

হাঁ করে অফিসাররা তাকিয়ে রইল ফারগুসনের মুখের দিকে। ধীর গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন—"গ্যাস নষ্ট না করে, ভার ফেলে না দিয়ে কি করে বেলুনকে ইচ্ছামত ওঠানো নামানো যায়, সে চেষ্টা চলেছে অনেকদিন ধরে। এর আগে একজন ফরাসী আর বেলজিয়ামবাসী সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। আমি তাঁদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরেছি। ভারের ব্যবহার একেবারে কমিয়ে দিয়েছি। সামান্য যা থাকবে, তা বিশেষ প্রয়োজন না হলে ফেলবই না।"

"এতো মশায় বিরাট আবিষ্কার।"*

"এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। বেলুনে গ্যাস থাকবে, সেই গ্যাসকেই আমি ইচ্ছামত হাল্কা করব। তাপ পেয়ে হাল্কা হলেই বেলুন ফুলে উঠে ওপরে উঠবে। ঠাণ্ডায় গ্যাস ঘন হলেই বেলুনও ভারী হয়ে নীচে নেমে আসবে।"

"কিন্তু সেটা করবেন কি করে?"

"দেখেছেন তো আমার সঙ্গে পাঁচটা লোহার বাকস আছে। একটাতে থাকবে জল। জলের মধ্যে ইলেকট্রিক কারেণ্ট চালালেই তা ভেঙে গিয়ে ভুস ভুস করে তৈরী হবে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস। যাতে সমান সমান গ্যাস হয়, সে জন্যে জলের সঙ্গে খানিকটা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দেব।"

"তারপর?"

"প্রথম বাক্সে গ্যাস তৈরী হবে, নলের মধ্যে দিয়ে তা জমা হবে দুটো আলাদা বাক্সে। এই তিনটা বাক্সের ওপর আর একটা বাক্স থাকবে। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন নলের মধ্যে দিয়ে দুটো গ্যাস এনে মিশিয়ে নেব। কাজেই ব্যাপারটা এমন কিছু নতুন নয়। শীতকালে ইংলণ্ডের ঘর গরম করা হয় যে পদ্ধতিতে, আমি তা নকল করেছি। বেলুনের গ্যাসে যদি ১৮০ ডিগ্রী উত্তাপ দিতে পারি, তবে তা বিস্তার লাভ করবে ৪৮০ ভাগের ১৮০ ভাগ বেশী। সুতরাং সেই বিস্তৃত গ্যাস বেলুনকে ফুলিয়ে তুলে ১৬৭৪০ ঘনফুট বাতাসের জায়গা দখল

*এ কাহিনী যখন লেখা হয়েছে, তখন কিন্তু এরোপ্লেন আবিষ্কার হয়নি।

করবে। ফলে, বেলুন থেকে ১৩০০ পাউণ্ড বোঝা ফেলে দিলে বেলুন যতটা তাড়াতাড়ি ওপরে উঠবে, এই পদ্ধতিতে ঠিক তত দ্রুত উঠবে। বেলুনে যতটা গ্যাস ধরে, নেব তার অর্ধেক। কাজেই গরম না হওয়া পর্যন্ত বেলুন বাতাসে ভেসে থাকবে—ওপরে উঠতে চাইবে না। তাপ দিলেই ওপরে উঠবে। আবার তাপ কমিয়ে দিলেই বেলুন নেমে আসবে।"

॥ ৭ ॥

'রেজলিউট' জাহাজ জানজিবারের বন্দরে নোঙর করল। সেখানকার ইংরেজ কনসাল পরম সমাদরে বেলুন-যাত্রীদের নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। এদিকে চারদিকে খবর ছড়িয়ে গেল, খ্রীষ্টানরা আকাশে গিয়ে চাঁদ আর সূর্যের অকল্যাণ করবার ষড়যন্ত্র করেছে। আঘাত লাগল কাফ্রিদের অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসে। চাঁদ-সূর্য তাদের উপাস্য দেবতা। সুতরাং তারা ক্ষেপে গেল। ঠিক করলো, যেভাবেই হোক, দরকার হলে বল-প্রয়োগ করেও এই অভিযান তারা ভণ্ডুল করে দেবে।

কনসাল তো মহা ভাবনায় পড়লেন। অনেক ভেবেচিন্তে কুম্বেনী দ্বীপে গিয়ে বেলুনটাকে নামানো হল এবং গ্যাস ভর্তি করার আয়োজন চলল।

দূর থেকে অঙ্গভঙ্গী করে চেঁচামেচি শুরু করে দিলে কাফ্রিরা। কেউ কেউ মন্ত্র আউড়ে বজ্রকে ডাকতে লাগল। অলৌকিক শক্তিধর জাদুকররা অনেক মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আস্তে আস্তে গ্যাসের চাপে ফুলে উঠল বেলুন, দুলতে লাগল হাওয়ায়। দেখে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল কাফ্রিরা।

দ্বীপে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে সে-রাতের মত সবাই ফিরে এলেন কনসাল ভবনে। পরদিন সকালে কুম্বেনী দ্বীপে নেমে দেখা গেল, মৃদুমন্দ হাওয়ায় দিব্বি দুলছে বেলুনটা। নাবিকরা দড়ি ধরে টেনে রেখে দিয়েছে নীচ থেকে।

যাত্রার সময় উপস্থিত হল। ডিক্ কেনেডি এগিয়ে এসে ফারগুসনের করমর্দন করে বললেন—"বন্ধু, তুমি তাহলে সত্যিই যাবে?"

"এখনও সন্দেহ?"

"তোমার মত পাল্টানোর অনেক চেষ্টা করলাম আমি।"

"তা করেছ বইকি।"

"সুতরাং আমার আর দোষ নেই। ষোল আনা দায়িত্ব তোমারই। আমিও মনস্থির করে ফেলেছি। তোমার সঙ্গেই যাবো।"

আনন্দে ফারগুসনের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল।

বললেন—"আমি জানতাম তুমি যাবে।"

ফারগুসনের এবার আগুন জ্বালিয়ে গ্যাস গরম করতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে বেলুন ফুলে উঠল—দড়িতে টান পড়ল।

ফারগুসন তখন সহযাত্রীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে টুপী খুলে বললেন—"বন্ধুগণ, আমাদের এই বিচিত্র ব্যোমযানের একটা মাঙ্গলিক নাম দেওয়া দরকার। আমি বলি, আজ থেকে এই বেলুনের নাম হোক ভিক্টোরিয়া।"

সমবেত জনমণ্ডলী উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল। বেলুন তখন এমন ওপর দিকে চাড় মারছে যে বেচারী নাবিকরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে দড়ি ধরে টেনে রাখতে। ফারগুসন চেঁচিয়ে উঠলেন—"ছাড়ুন এবার দড়ি ছাড়ুন সবাই হুঁসিয়ার।"

সঙ্গে সঙ্গে খুঁটির দড়ি ছেড়ে দিলে নাবিকরা। একলাফে শূন্যে ঠেলে উঠল ভিক্টোরিয়া। তৎক্ষণাৎ রেজলিউট জাহাজ থেকে চাররার কামান দেগে শেষবারের মত অভিনন্দন জানানো হল অভিযাত্রীদের।

হু-হু করে ওপরে উঠতে লাগল বেলুন। ১৫০০ ফুট উঠে ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোতে ভেসে চলল দক্ষিণ পশ্চিমে। পায়ের তলায় কালিমাখা প্রান্তরের মত দেখাল জান্‌জিবারকে। মানুষগুলোকে দেখাতে লাগল খুদে পিঁপড়ের মত। নাবিকদের জয়োল্লাস ক্ষীণ হয়ে এল। কিন্তু তখনও অস্পষ্টভাবে ভেসে আসতে লাগল কামান-নিনাদের প্রতিধ্বনি।

পুলকিত চিত্তে জো বললে—"বাঃ, কী সুন্দর!"

২৫০০ ফুট ওপরে উঠল ভিক্টোরিয়া। জেলের নৌকোর মত ছোট্ট হয়ে গেল বিশাল রেজলিউট জাহাজ। ঘণ্টায় ৮ মাইল বেগে সমুদ্র পেরিয়ে চলল ভিক্টোরিয়া। দু ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়ল আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলে। গ্যাসে তাপ দেওয়া কমিয়ে আনলেন ফারগুসন। নীচে ঘন জঙ্গলের মধ্যে থেকে গ্রামবাসীরা দেখল, একটা বিশাল আকাশ দানব ভেসে চলেছে মাথার ওপর দিয়ে। অদ্ভুত জিনিসটা দেখে প্রথমে তারা ভয় পেল। তারপর রেগে গেল। ঘন ঘন ছুঁড়তে লাগল বিষ মাখানো তীর। কিন্তু তা বেলুন স্পর্শও করল না। নির্বিঘ্নে হিংস্র জনতার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চললেন অভিযাত্রীরা।

গনডোলার মধ্যেই জো কিছু খাবার বেঁধে ফেলল। খেতে খেতে নীচের অদৃষ্টপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে উড়ে চললেন যাত্রীরা। কখনও দেখা গেল এঁকা-বেঁকা রাস্তা, কখনও তামাক-ভুট্টা-ছোলা-ধানের বিশাল ক্ষেত। গ্রামের

ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে রাক্ষস মনে করে তেড়ে এল গ্রামবাসীরা। তাদের সেই বিকট হুংকারে রক্ত হিম হযে যায়। কিন্তু একটা তীরও গনডোলার ধারে কাছে এসে পৌছোলো না।

দুপুরবেলা নির্মল আকাশতলে আউজ্‌রামো প্রদেশ অতিক্রম করে গেল ভিক্টোরিয়া।

ডক্টর বললেন—"দেখছো, দেশেব চেহারা এবাব পাল্টে যাচ্ছে। ঘন ঘন গ্রাম আর চোখে পড়ছে না। খালি কাঁকর আর পাথর। নিশ্চয় কাছেই পাহাড় আছে।"

কেনেডি বললেন—"আমার মনে হয় পশ্চিমের ঐ মেঘমালা আসলে পাহাড়ের শ্রেণী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

দূরবীন দিয়ে দেখে ফারগুসন বললেন—"ঠিক বলেছ। ঐ হল আউরিজারা শৈলমালা। সামনের পাহাডটার নাম ডুথুমি। আজ রাতে আমরা ডুথুমিব ওপারে বিশ্রাম করব। ৫০০।৬০০ ফুট ওপবে না উঠলে পাহাডেব চূড়ো পেবোনো যাবে না।"

এগিয়ে চলল বেলুন। জো চেঁচিযে বললে—"বাস্‌রে! কি বিরাট গাছ! এরকম বারোটা গাছ এক জাযগায় থাকলেই একটা জঙ্গল হযে যায়!"

ফারগুসন বললেন—"ও গাছের নাম বাওবাব্‌। গাছের গুঁড়িটা দেখেছ— প্রায় ১০০ ফুট ব্যাস। কে বলতে পারে, এই গাছের তলাতেই ফরাসী পর্যটক মেইজান ১৮৪৫ সালে মারা যাননি। দূরের ঐ গাঁযের নাম জিলামোরা। মেইজান একলা ওখানে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। গাঁযের সর্দার তাঁকে বাওবাব্‌ গাছের শেকডেব সঙ্গে বেঁধে টুকরো টুকরো কবে কেটেছিল! কণ্ঠনালী কেটে কাঁধ থেকে মাথাটা টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল! ভাবো দেখি কী নৃশংস খুন! মাত্র ২৬ বছর বয়সে এইভাবে জীবন দিয়েছিলেন বেচারী মেইজান।"

গ্যাস গরম করতে লাগলেন ফারগুসন। দেখতে দেখতে প্রায় আট হাজার ফুট ওপরে উঠল ভিক্টোরিয়া। অবলীলাক্রমে পেরিয়ে গেল ডুথুমি পাহাড়। ওপারে গিয়ে নীচে নেমে একটা নোঙর ছুঁডে দেওযা হল। মস্ত একটা গাছের ডালে আটকে গেল নোঙর। দড়ির মই বেযে নেমে গিয়ে ডালের সঙ্গে বেশ করে নোঙরটা বেঁধে দিল জো।

তখন সন্ধ্যে হয়েছে। রাতে পালা করে বেলুন পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে খেতে বসল তিনজনে।

॥ ৮ ॥

পরের দিন সকালে দারুণ জ্বর হল ডিক্ কেনেডির। মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। শুরু হল বৃষ্টি। ভিক্টোরিয়া তখন উড়ে চলেছে জাঙ্গেমেরো জনপদের ওপর দিয়ে। জানুয়ারী মাসের দিন পনেরো ছাড়া সে দেশে বারোমাসই বৃষ্টি হয়। গন্ধকের গ্যাসের মত একরকম বিশ্রী গন্ধ ভেসে এল এবার সবার নাকে।

ফারগুসন বললেন—"বার্টন ঠিকই বলেছেন। এখানকার প্রত্যেক ঝোপেই যেন মানুষ মরে আছে—এমন বিষাক্ত এখানকার বাতাস। ডিক্, ওপরে উঠছি। বিষাক্ত হাওয়ার ওপরে উঠলেই তোমার জ্বর সারবে।"

উঠতে উঠতে ভিক্টোরিয়া মেঘের আড়ালে চলে গেল। দূরে দেখা গেল সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে রুবেহো পর্বতমালা। ঘণ্টা তিনেক যাওয়ার পরই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন কেনেডি।

বেলা দশটায় মেঘ কেটে যেতে লাগল। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ভূ-পৃষ্ঠ। সারি সারি পাহাড়ের চূড়ো জ্বলতে লাগল তপনকিরণে।

ফারগুসন বললেন—"জাঙ্গোমেরোর কাদাজমি পায়ে হেঁটে পেরোতে গেলেই হয়েছিল আর কি। এখানকার দিনের রোদ্দুর যেমন চামড়া ঝলসে দেয়, রাতের ঠাণ্ডা তেমনি হাড়শুদ্ধ যেন গুঁড়িয়ে দেয়। এদেশে এমন কতক-গুলো পোকামাকড় আছে যাদের কামড় মোটা কাপড় ভেদ করে চামড়ায় গিয়ে পৌছোয়! কামড়ে জ্বালিয়ে দ্যায় সারা গা।"

দূরে দেখা গেল অনেক উঁচুতে রুবেহো শৈলমালা। আফরিকার ভাষায় রুবেহো মানে বাতাসের গতি। পাহাড় এখানে এত উঁচু সে বাতাস ধাক্কা খেয়ে অন্য দিকে বয়ে যায়।

বেলুনকে ক্রমশ ওপরে তুলতে লাগলেন ফারগুসন। কেনেডি বললেন—"এত ওপরে কি বেশিক্ষণ থাকা চলে?"

"বেশি ওপরে উঠলে অবশ্য কান নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল পর্যটক ব্রিয়োসি আর গেফ্সাকের। আমরা এখন প্রায় ছ হাজার ফুট ওপরে উঠেছি।"

শৈলশৃঙ্গের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় পাহাড়ের ছবি এঁকে নিলেন ফারগুসন। রুবেহোর পর বাগানের মত সুন্দর গাছের সারি। তারপর একটা মরুভূমি। ধীরে ধীরে বেলুন নেমে এল। নোঙর আটকানো হল গাছের ডালে। দড়ির মই বেয়ে কেনেডি আর জো নেমে গেল শিকারের সন্ধানে।

ফারগুসন বললেন—"বেশি দেরী করো না। ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি। বিপদ বুঝলে বন্দুকের আওয়াজ করব।"

মৃগয়ালোলুপ কেনেডি বিপুল আনন্দে ছুটলেন বন্দুক হাতে। কপাল ভাল তাঁর। অল্পক্ষণের মধ্যেই এক গুলীতে বধ করলেন একটা হরিণ। মৃগমাংস আগুনে ঝলসানো শুরু করলো জো।

ঠিক এই সময়ে দূর থেকে ভেসে এল বন্দুকের নির্ঘোষ।

ফারগুসনের বিপদ সঙ্কেত।

তৎক্ষণাৎ পোড়া মাংসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জো দৌড়লো বেলুনের দিকে। পেছনে কেনেডি। ঘন বনের জন্যে বেলুন দেখা যাচ্ছিল না। আবার শোনা গেল বন্দুকের আওয়াজ। বনের প্রান্তে এসে উদ্বেগ খানিকটা কমল। কেননা দেখা গেল বেলুন যথাস্থানেই আছে।

জো বলে উঠল—"সর্বনাশ।"

"কী হল।"

"কাফ্রিরা বেলুন আক্রমণ করেছে।'

দূর থেকে দেখা গেল মানুষের মত গোটা তিরিশ প্রাণী গাছের তলায় নেচে বেই করে নাচছে, অঙ্গভঙ্গী করছে, চেঁচাচ্ছে। কেউ কেউ উঠেছে গাছের মগডালে। আবার বন্দুকের গর্জন শোনা গেল। বেলুনের দড়ি ধরে যে প্রাণীটা ওপরে উঠতে গেছিল, গুলী খেয়ে সে পড়তে পড়তে মাটি থেকে দশবারো হাত ওপরে ঝুলতে লাগল গাছের ডালে।

জো বললে—"অবাক কাণ্ড তো! বেটা পড়ছে না কেন? গুলী লাগেনি বোধ হয়।"

পরক্ষণেই অট্টহাস্য করে বললে—"আরে আরে! লেজ দিয়ে ডাল জড়িয়ে ধরেছে যে! কাফ্রি নয়—ওরা হনুমান।"

সত্যিই তাই। গোটাকতক পিস্তলের আওয়াজ করতেই চম্পট দিল শাখামৃগের দল। গনডোলায় উঠে কেনেডি বললে—"আমরা ভয় করেছিলাম নিগ্রোরা আক্রমণ করেছে।"

"কপাল ভালো দলটা হনুমানের। তবে কাফ্রিদের থেকে বিশেষ তফাৎ নেই। নোঙরটা খুলে দিলেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেত।"

সন্ধ্যের আগেই মাবুংগুরু পার্বত্য প্রদেশ পেরিয়ে জিহোলামোরা শৈলমালার পশ্চিমপারে রাত কাটালেন অভিযাত্রীরা। সকালে ম্যাপ দেখে ফারগুসন বললেন—"উজিজি, কাজে নগর এখান থেকে শখানেক মাইল। বাতাস ঠিক থাকলে আজই সেখানে পৌচোচ্ছি আমরা।"

॥ ৯ ॥

মধ্য আফরিকায় 'কাজে' একটি বিখ্যাত এবং বিচিত্র নগর। ছটা বিশাল গহ্বরের মধ্যে কয়েকটা কুটির নিয়ে গড়ে উঠেছে কাজে নগর। উঠোন, বাগান, ক্ষেত, ক্রীতদাসের কুঁড়ে—কিছুরই অভাব ছিল না সুশোভিত সেই নগরে।

কাজে নগর সে যুগে ছিল বণিকদের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ক্রীতদাস, হাতীর দাঁত, তুলো আর কাঁচের জিনিসপত্র নিয়ে সওদাগররা আসত সেখানে। শিঙা বাজত, দামামা বাজত, কোলাহলচঞ্চল থাকত প্রতিটি দোকান। সেদিনও দেখা গেল কেউ অশ্বতর আর গাধার পিঠে মাল নিয়ে অপেক্ষা করছে, কেউ কাঁচ দিয়ে হাতীর দাঁত কিনছে। এখান থেকে ধনী-বণিকরা পণ্য নিয়ে যাবে আরব পর্যন্ত।

অকস্মাৎ ম্যাজিকের মত স্তব্ধ হয়ে গেল হট্টগোল—নিমেষে শ্মশান-নৈঃশব্দ নেমে এল কাজে নগরে। উর্ধ্বশ্বাসে সবাই দৌড়োতে লাগল মালপত্র ফেলে। সভয়ে সবিস্ময়ে সবাই দেখলে একটা অদ্ভুত প্রকাণ্ড পদার্থ স্বর্গ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে!

গাছের ডালে নোঙর আটকালো ভিক্টোরিয়ার। গুটি গুটি তখন অনেকেই জমায়েৎ হল দূরে। জাদুকররা মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল, যোদ্ধারা ধারণ করল অস্ত্র। বেজে উঠল দামামা। নাগরিকরা হাত তুলে সম্মান দেখাতে লাগল বেলুনযাত্রীদের।

ফারগুসন বললে—"ওরা আমাদের পুজো করছে। ওদের পুজোর পদ্ধতিই এই রকম।"

হঠাৎ বাজনার নিনাদ থেমে গেল একজন জাদুকরের নির্দেশে। উচ্চৈঃস্বরে কি যেন সে বললে অভিযাত্রীদের উদ্দেশে। কিছুই বোঝা গেল না। ফারগুসন দুচারটে আরবী শব্দ উচ্চারণ করলেন। জাদুকর তখন আরবী ভাষায় নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললে।

ফারগুসন সঙ্গীদের বললেন—"ওরা বেলুনটাকে চাঁদ মনে করেছে। আর আমরা চাঁদের তিন ছেলে। সূর্য এদের উপাস্য দেবতা। তাই সূর্যের দেশে চাঁদের আগমনে ওরা ধন্য হয়েছে।"

চীৎকার করে আরবী ভাষায় বললেন ফারগুসন—"হাজার বছর পর একবার করে চাঁদ তাঁর রাজ্যপাট দেখতে আসেন। পূজারীদেরও দেখে যান। তোমাদের যদি কোনো বর থাকে তো প্রার্থনা কর।"

জাদুকর বললে—"আমাদের সুলতান দীর্ঘদিন ধরে রোগশয্যায়। আপনারা তাঁকে আরোগ্য করুন।"

"তথাস্তু," বললেন ফারগুসন।

বলে ওষুধের বাক্স নিয়ে তড়তড় করে নেমে গেলেন নিচে। কারও নিষেধ শুনলেন না। যাবার সময়ে বলে গেলেন—"বার্টন আব স্পেকে এখানে এসেছিলেন। তাঁরা লিখেছেন, এরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তাহলেও সাবধানের মার নেই। বিপদ যে কোন দিক থেকে আসতে পারে। গ্যাসনলে অল্প তাপ দিয়ে রাখো যাতে ঝট করে উঁচুতে উঠে যেতে পারে বেলুন। জো, তুমি মইটার কাছে থাকবে!"

ফারগুসন নীচে নামতেই বিপুল উল্লাসের চিহ্ন দেখা গেল চারদিকে। মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি, গানবাজনায় নিমেষে যেন ফেটে পড়ল গোটা কাজে নগর।

বেলা তখন তিনটে। গম্ভীর মুখে রাজকুটিরের দিকে এগোলেন ফারগুসন! কিছুদূর এগোতেই সুলতান-তনয় এসে মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম করল ফারগুসনকে!

ছায়াচ্ছন্ন পথে ঘুরতে ঘুরতে শোভাযাত্রা এসে পৌছোলো রাজভবনে। বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হল ফারগুসনকে। দেখবার মত চেহারা রাজার পারিষদ, আত্মীয় আর রক্ষীদের। গালে লাল কালো ইত্যাদি রঙের বাহার। বিশাল কানের ফুটোয় কাঠের চাকতি। সৈন্যদের হাতে বিষবাণ আর ক্ষুদে তরোয়াল।

রাজকক্ষে প্রবেশ করতেই পেতলের 'উপাতু' ঝন ঝন করে বেজে উঠল। জয়ডঙ্কা 'কিলিন্দো'র গুরুগম্ভীর নির্ঘোষে চারদিক কেঁপে উঠল। সুশ্রী রাজরমণীরা লম্বা নলে তামাক খেতে খেতে হাসাহাসি করতে লাগল। ছজন সুন্দরী বসে ছিল পৃথকভাবে। মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে সুলতান যাতে অতৃপ্ত না থাকেন, তাই তাঁর সঙ্গেই জীবন্ত কবর দেওয়া হবে এই ছয় সুন্দরীকে!

ফারগুসন মুমূর্ষু সুলতানের পাশে গিয়ে দেখলেন, লোকটার বয়স বছর চল্লিশ। অতিরিক্ত মদ্যপান আর অত্যাচার করেই শেষ করে এনেছে জীবনীশক্তি। এ রুগীকে বাঁচানো যাবে না। তাই একডোজ কড়া ওষুধ খাইয়ে দিলেন ফারগুসন। সঙ্গে সঙ্গে চনমন করে উঠল সুলতান। কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরল। হাত পা নড়তেই আনন্দধ্বনি করে উঠল রাজপরিবার। ফারগুসন আর দেরী না করে চম্পট দিলেন ঘর থেকে।

মইয়ের কাছেই হাজির ছিল জো। কাফ্রি যুবতীরা তাকে ঘিরে নাচগান করছে, পুজো দিচ্ছে দেখে পুলকিত হয়ে জো নিজেও নাচতে শুরু করেছিল।

তার উদ্দাম হাস্যকর নাচ দেখে কাফ্রিরা ভাবছিল, আহারে! স্বর্গের নাচ কি সুন্দর!

আচম্বিতে দারুণ গোলমাল শোনা গেল দূর থেকে। চমকে উঠে জো দেখলে নাগরিক আর জাদুকর চেঁচাতে চেঁচাতে বেলুনের দিকে এগোচ্ছে। সবার আগে প্রায় দৌড়োচ্ছেন ফারগুসন। প্রমাদ গণল জো।

চটপট বেলুনে উঠে পড়লেন ফারগুসন, পেছন পেছন জো। উঠেই আদেশ দিলেন ডক্টর—"বেলুন ছাড়ো! আর সময় নেই, নোঙর খোলার সময় নেই—দড়ি কেটে দাও!"

"ব্যাপার কি? সুলতান পটল তুলল নাকি?"

"আরে না, না, ঐ দেখ!" বলে আকাশের দিকে আঙুল তুললেন ফারগুসন।

"কি দেখব?"

"চাঁদ উঠছে।"

বাস্তবিকই, আকাশ আলো করে উঠে আসছে চন্দ্রদেব।

হুংকার দিলে কাফ্রিরা। প্রতারিত হয়েছে বুঝতে পেরে কেউ ধনুকে তীর লাগাল, কেউ বন্দুক তুলল। জাদুকর সবাইকে শান্ত করে গাছে উঠতে লাগল বেলুনের নোঙর ধরবার জন্যে।

জো দড়ি কাটবার জন্য ছুরী তুলল।

ফারগুসন বললেন—"দাঁড়াও। নোঙরটা বাঁচাতে পারি কিনা দেখি। হুঁশিয়ার! গ্যাস তৈরী?"

"হ্যাঁ।"

জাদুকর নোঙরের কাছাকাছি আসতেই বিকট উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কাফ্রিরা। উৎসাহিত হয়ে নোঙর খুলে দিলে জাদুকর। সঙ্গে সঙ্গে একবার কেঁপে উঠে তাকে নিয়েই শূন্যে লাফিয়ে উঠল ভিক্টোরিয়া। যারা এতক্ষণ রেগে দাঁত কিড়মিড় করছিল, তারাই এবার ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

ভিক্টোরিয়া যতই ওপরে উঠতে লাগল, ততই মহানন্দে হাততালি দিতে লাগল জো। আর সমানে দড়ি ধরে ঝুলে রইল কাফ্রি জাদুকর।

জো বললে—"আর কেন? দড়িটা কেটে দিই?"

ফারগুসন বললেন—"না।"

কাজে নগর পেরিয়ে গেল বেলুন। কিছুদূর গিয়ে যখন দেখা গেল ধারে কাছে আর কোথাও মানুষবাসের চিহ্ন নেই, তখন ধীরে ধীরে উত্তাপ কমিয়ে

বেলুন নামিয়ে আনলেন ফারগুসন। মাটি থেকে ১৫।১৬ গজ ওপরে আসতেই নোঙর ছেড়ে ভূতলে লাফিয়ে পড়ল কিম্ভূতকিমাকার জাদুকর এবং মাটি স্পর্শ করেই টেনে লম্বা দিল কাজে নগরের দিকে।

॥ ১০ ॥

আকাশে ক্রমশঃ মেঘ জমতে লাগল। প্রবলবেগে বইতে লাগল বাতাস। ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে উড়ে চলল ভিক্টোরিয়া।

ফারগুসন বললেন—"আমরা এখনও চন্দ্ররাজ্যেই আছি। এদেশে চাঁদ পূজো পায় বলে দেশের নামও চন্দ্ররাজ্য। এমন উর্বর জমি পৃথিবীতে বড একটা দেখা যায় না।"

আপশোষ করে জো বললে—"আহারে! এমন অসভ্য দেশেও এমন চমৎকার জায়গা থাকে!"

ফারগুসন বললেন—"কে জানে এদেশও একদিন হয়ত সভ্যতার চরম শিখরে উঠবে।"

কেনেডি হেসে বললেন—"তোমার কি তাই বিশ্বাস?"

"আলবৎ। ইতিহাসের পাতা খুলে দ্যাখো মানুষ কিভাবে দেশ-দেশান্তরে সভ্যতার মশাল বয়ে নিয়ে গেছে। একদিন এশিয়া ছিল সমস্ত মানুষজাতির আদিবাসভূমি। চার হাজার বছর ধরে কি ছেলের মত মানবজাতিকে লালনপালন করেনি এশিয়া? এশিয়ার বন-জঙ্গল উষর ভূমিকে শস্যশ্যামলা করে তুলেছে মানুষ। তারপর একদিন ফুরিয়ে গেল এশিয়ার সোনার খান, সোনার বদলে উঠতে লাগল পাথর, তখন এশিয়ার মানুষরা ছড়িয়ে পড়ল সারা ইউরোপে। এখন ইউরোপের দশাও এশিয়ার মত হয়ে আসছে—শস্য আর ফলতে চায় না সেখানকার অনুর্বর জমিতে। ফুরিয়ে আসছে ইউরোপের বুকের মধু। শেষ হয়ে আসছে তার জীবনীশক্তি। তাই মানুষ এবার ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকায়। আমেরিকারও এই দশা আসবে, পরিণত হবে উষর ক্ষেত্রে। আজ যে জমিতে বছরে দুবার ফসল ফলে, তখন সেখানে ঘাসও জন্মাবে না। নীরস আমেরিকা ছেড়ে মানুষ তখন আশ্রয় নেবে এই আফ্রিকার দুর্গম অঞ্চলে। এখানকার বিষ তখন অমৃত হবে, জঙ্গলে রাজ্যপাট বসবে, নগর গড়ে উঠবে, মরুভূমি সুজলা-সুফলা হবে। কে জানে তখন এদের মধ্যেই এমন বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করবে যাদের আবিষ্কারের কাছে আমাদের সব আবিষ্কারই নেহাত ছেলেখেলা মনে হবে।"

আবেগরুদ্ধকণ্ঠে জো বললে—"আহারে, সেদিন কি দেখে যেতে পারব ?"

সিনেমার ছবির মত বিচিত্র দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে যেতে লাগল পায়ের তলায়। দুর্গম বাগান, দুর্ভেদ্য অরণ্য আর সাজানো গ্রামের পরেই খরস্রোতা মালাগাজারি নদী, দুই তীরে হাজার হাজার গরু মোষ। কোথাও বিশাল গাছ আর লতার আড়ালে বাঘ হায়েনার আনাগোনা। ভয়ংকর অথচ সুন্দর সেই দৃশ্যের ওপর দিয়ে বিশাল পাখীর মতই নিঃশব্দে হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলল অভিনব বেলুন ভিক্টোরিয়া।

উল্লসিত কণ্ঠে কেনেডি বললে—"আহারে, মৃগয়ার উপযুক্ত দেশ। ওহে ফারগুসন, একটু শিকার করে গেলে হয় না ?"

"আজ আর কাজ নেই, ডিক। রাত হয়ে আসছে। মেঘের ভাবগতিক দেখে মেনে হচ্ছে ঝড়ও হবে। এদেশের ঝড় বড় ভয়ংকর। আর এখানকার মাটি যেন ইলেকট্রিক কারেন্টের আকর। বায়ুমণ্ডলও ইলেকট্রিক কারেন্টে ভরে উঠেছে। গাছে বেলুন বাঁধা থাকলে ঝড়ে আছড়ে পড়ে বেলুন ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ফারগুসনের আশংকাই শেষে সত্যি হল।

রাত নটার সময়ে দেখা গেল বেলুন আর চলে না। নিষ্কম্প গাছের পাতা, নিশ্চল মেঘমালা আর নিস্তব্ধ প্রকৃতি দেখেই বোঝা গেল ঝড় আসছে। ভয়ংকর ঝড়। নেমে হ্রদের ওপর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ভিক্টোরিয়া।

কেনেডি আর জো শুয়ে পড়লেন। পাহারা দিতে লাগলেন ফারগুসন। একটু পরেই ওপরের রাশি রাশি মেঘ যেন ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল। আঁধার আরও গাঢ় হল। সে কী অন্ধকার। আলকাতরার চাইতেও কালো সেই তমিস্রা ছেয়ে ফেলল চরাচর। শংকিত হলেন ফারগুসন।

আচম্বিতে লকলক করে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বজ্রগর্জনে।

ফারগুসন ডাক দিলেন—"উঠে পড়ো। হুঁসিয়ার।"

ধড়মড় করে উঠে বসে কেনেডি বললেন—"বেলুন ছেড়ে নামব না কি ?"

"পাগল। তাতে বেলুনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তার চাইতে চল ওপরে উঠি। ঝড়বৃষ্টি নিয়ে মেঘ আরো নেমে আসার আগেই মেঘ ছাড়িয়ে উঠে যাই ওপরে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসপাইপে তাপ দিতে লাগলেন ফারগুসন। আবার আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে গেল বিদ্যুৎরেখা। আবার শোনা গেল মেঘের ধমক।

আবার—আবার…! দেখতে দেখতে ২০।২৫ বার বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল, আকাশ বাতাস পৃথিবী কাঁপিয়ে বিপুল নিনাদে গর্জাল মেঘ।

তার পরেই নামল বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। সমস্ত আকাশে যেন দাবানল লেগে গেল!

ফারগুসন বললে—"আরো আগে ওঠা উচিত ছিল। এখন এই আগুনের স্তর ভেদ করে ওপরে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। দাহ্য পদার্থে ভর্তি বেলুন, যে কোনো মুহূর্তে আগুন লেগে যেতে পারে—"

"তবে চল নেমে পড়ি।"

"নামলে বাজ তোমাকে রেয়াৎ করবে না। তাছাড়া, গাছের ডালে লেগে বেলুনটা খামোকা ছিঁড়বে।"

দেখতে দেখতে খ্যাপা ঘোড়ার মত ছুটতে লাগল দুরন্ত বাতাস। বুনো ঘোড়ার কালো কেশের মত ফুলে উঠল কালো মেঘরাশি, ঘন ঘন জ্বলতে লাগল আগুন তার মধ্যে। সেই মাতামাতি দাপাদাপি আর ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে সমানে ওপরে উঠতে লাগল বেলুন। কখনও টলতে লাগল, কখনও ঘুরতে লাগল, কখনও কাৎ হয়ে পড়ল। ভীমবেগে বাতাস এসে আছড়ে পড়তে লাগল বেলুনের গায়ে। মনে হল এখনি বুঝি ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে যাবে সিল্কের বহিরাবরণ। কখনও কুঁচকে, কখনও চেপ্টে, কখনও সরু হয়ে গিয়েও উঠতে লাগল ভিক্টোরিয়া! এই সময়ে শুরু হল শিলাবৃষ্টি। ফারগুসন তখনও গ্যাসপাইপে তাপ দিতে লাগলেন। বেলুনের ওপরে নীচে ডাইনে বামে তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে বিদ্যুৎ। দশদিক কাঁপিয়ে ডাকছে বাজ!

ফারগুসন ভয় পেলেন না, ক্ষান্ত হলেন না। শুধু বললেন—"ভগবান ছাড়া এখন আর আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

কিন্তু সেকথা তখন সঙ্গীদের কানে ঢুকল না। প্রলয় দৃশ্য চোখের সামনে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেছিল জো আর কেনেডি। বেলুন কিন্তু তখনও হেলেদুলে উঠে যেতে লাগল ওপরে ওপরে আরো ওপরে! দারুণ শিলাবৃষ্টির ঘায়ে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে আগুনের বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে তীর বেগে ওপরে উঠতে লাগল ভিক্টোরিয়া।

মিনিট পনেরো পরে ঝড়ের সীমা পেরিয়ে এল বেলুন। চোখের সামনে দেখা গেল এক অপূর্ব দৃশ্য! মাথার ওপর তারার চুমকি বসানো ঝকঝকে তকতকে আকাশ। আর পায়ের নীচে যেন লক্ষ মুখে আগুন বমি করতে করতে অট্টহাসি আর অট্টরোলে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে দাপিয়ে ছুটোছুটি করছে লক্ষ

ড্রাগন! ভীমগতি বায়ু ছুটছে, তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে মেঘরাশি—বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পৃষ্ঠের মতই! চাঁদের স্নিগ্ধ মোলায়েম কিরণ পড়েছে চঞ্চল কালো মেঘের ওপর! এ দৃশ্য মানুষ কখনও দেখেনি! কল্পনাতেও আনতে পারে নি।

নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন তিন অভিযাত্রী।

॥ ১১ ॥

নির্বিঘ্নে রাত কাটল। পরের দিন মৃদুমন্দ পবনে কয়েকবার ওঠানামা করে অভীপ্সিত বায়ু-প্রবাহের সন্ধান পেলেন ফারগুসন। দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল বেলুন।

দুপুরের দিকে কয়েকটা গাঁ পেরিয়ে গেল ভিক্টোরিয়া। এখনকার কাফরিরা অনেকটা সভ্য। ফারগুসন বেলুনের উত্তাপ কমিয়ে এনে নোঙর ফেলে ছিলেন। লম্বা ঘাসের মাথা ছুঁয়ে এগিযে চলল নোঙর। গাছের ডালে বা উঁচু জমিতে আটকালো না।

মাইলের পর মাইল এই ভাবে তৃণশিব স্পর্শ করে চলল নোঙর। অধীর হযে পড়লেন কেনেডি। ওঁর মতলব ছিল বেলুন থামিয়ে শিকার-টিকার করবেন। খাবার জলও জোগাড় করবেন। কিন্তু নোঙর আটকাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল।

জো বললে—"পাহাড়ে নোঙর লেগেছে।"

উল্লাসে কেনেডি বললেন—"নামাও মই।"

কথা ফুরোতে না ফুরোতেই একটা প্রচণ্ড গর্জনধ্বনিতে কেঁপে উঠল তৃণ-প্রান্তর। সে কী হুংকার! গাযেব রক্ত জল হয়ে যায়!

পরমুহূর্তেই আবার ছুটে চলল নোঙব এবং সেই সঙ্গে বেলুন।

"নোঙর খুলে গেল বোধহয়।"

জো দড়ি টানাটানি করে বললে—"উঁহু, খোলেনি।"

"তবে কি পাহাড়টাই ছুটছে!"

যেন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে নীচের ঘাসবন। হঠাৎ জো'র চোখে পড়ল, কি যেন কিলবিল করে নড়ে উঠল ঘাসের মধ্যে।

"সাপ নাকি! কি বিরাট সাপ রে বাবা!"

বন্দুক তুললেন কেনেডি।

ফারগুসন বললেন—"সাপ নয়, হাতীর শুঁড়!"

"হাতী ?" বন্দুক তাগ করতে করতে বললেন কেনেডি।

"ডিক, একটু সবুর করো।"

"কি মুস্কিল, হাতীর টানে যে আমরাও ছুটছি।"

"তাতে ভয়ের কিছু নেই। আমরা যেদিকে যেতে চাই, সেই দিকেই তো দৌড়চ্ছে।"

দুপদাপ করে ছুটে চলল হাতী। দেখতে দেখতে ঘাসবন পেরিয়ে এসে পড়ল খোলা জমিতে। এবার দেখা গেল বৃংহিতধ্বনি করতে করতে দৌড়চ্ছে এক বিশাল দাঁতালো হাতী। সাদা দাঁত দুটোর দৈর্ঘ্য কম করে পাঁচ হাত! নোঙরটা আটকে গেছে দুটো দাঁতের ফাঁকে। হি-হি করে হাসতে লাগল জো। হাতী-বাহন দিয়ে বেলুন টানা একি সোজা কথা!

শুঁড় আস্ফালন করে, নানারকম লম্ফঝম্প করেও কিছুতেই নোঙরটা খুলতে পারছিল না দাঁতালো। তাই আবার শুরু হল দৌড়! কুড়ুল তুলে তৈরী হয়ে রইলেন ফারগুসন। দরকার বুঝলেই দড়ি কাটবেন।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল জো। আর হাত নিশপিশ করতে লাগল কেনেডি সাহেবের।

প্রায় দেড়ঘণ্টা এক নাগাড়ে ছুটে চলল হাতী আর বেলুন। তারপর দূরে দেখা গেল ঘনজঙ্গল! এবার আর নিশ্চেষ্ট হয়ে রগড় দেখা চলে না। বেলুনটাকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে হাতীর দাঁত থেকে নোঙর মুক্ত করা দরকার।

দড়াম করে বন্দুক ছুড়লেন কেনেডি। গুলী মাথার খুলিতে লেগে ছিটকে গেল—ফুটো করতে পারল না।

এদিকে বন্দুকের আওয়াজে আরও জোরে দৌড়োতে লাগল দাঁতালো। কেনেডি এবার কাঁধে গুলী করলেন। প্রান্তর কেঁপে উঠল আহত হাতীর ভীষণ আর্তনাদে! আরও বৃদ্ধি পেল ছোটার বেগ।

এবার জো আর কেনেডির গুলী একসাথে গিয়ে বিঁধল হাতীর দুই পাশে। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ল দাঁতালো। তারপরেই শুঁড় তুলে উল্কাবেগে ছুটে চলল বনের দিকে। হু-হু করে রক্ত ঝরতে লাগল ক্ষতস্থান থেকে।

সামাল সামাল রব উঠল বেলুনের গনডোলায়। বনের মধ্যে দাঁতালো ঢুকে পড়লেই গাছের ডালে লেগে ফর্দাফাঁই হয়ে যাবে বেলুন। দারুণ উৎকণ্ঠায় চেঁচিয়ে উঠলেন ফারগুসন—"চালাও গুলী! আরো—আরো!"

উপর্যুপরি গুলীবর্ষণ করে চললেন কেনেডি আর জো। দশটা গুলী গেঁথে গেল কালো চামড়ার নীচে। বিকট হুংকারে কাঁপতে লাগল চারিদিক।

মাথা আর শুঁড়ের ঝটকানি দেখে মনে হল এই বুঝি ছিঁড়ে গেল বেলুনের দোলনা—আছড়ে পড়ল জমির ওপর। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ধাক্কায় থর থর করে কাঁপতে লাগল গনডোলা। আচমকা এমনি একটা ধাক্কায় ফারগুসনের হাত থেকে কুড়ুলটা ঠিকরে গিয়ে পড়ল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুরী বার করে নোঙরের দড়ি কাটতে আরম্ভ করলেন ফারগুসন। কিন্তু চেষ্টা বিফল হল। পবনবেগে বনের দিকে ধেয়ে চলল বেলুনসহ হাতী।

আবার বন্দুক ছুঁড়লেন কেনেডি। এবার গুলী লাগল হাতীর চোখে। থমকে দাঁড়াতেই আবার চলল বন্দুক। এবার বুলেট বিঁধল হৃদ্‌পিণ্ডে।

অসহ্য যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে বিশাল পাহাড়ের মত হুমড়ি খেযে পড়ে গেল দামাল হাতী। এক আছাড়েই ভেঙে গেল দাঁতজোড়া। শূন্যে মিলিয়ে গেল শেষ নিঃশ্বাস।

বেলুন থেকে নেমে হাতীর শুঁড়ের নরম মাংস কেটে নিয়ে মাংস রাঁধতে বসল জো!

॥ ১২ ॥

ভোরবেলা ফারগুসনের কুড়ুলটা খুঁজে বার করল জো।

বেলুন ছেড়ে দিলেন ফারগুসন। ঘণ্টায় ১৮ মাইল বেগে উড়ে চলল ভিক্টোরিয়া। বারবার দূরবীন দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন ডক্টর। আজ তিনি অত্যন্ত চঞ্চল। ভিক্টোরিয়া ক্রমেবি পাহাড়ের চূড়ো ডিঙিয়ে কারাগোয়া পর্বতশ্রেণীর প্রথম পাহাড় টেঙ্গার কাছে এসে পৌঁছোলো।

ফারগুসন জানতেন, নীল হ্রদের প্রথম ভাগ লুকিয়ে আছে এই কারাগোয়া শৈলমালার মধ্যেই। আরও একটু এগোতেই দিগ্‌রেখার কাছে বিশ্ববিখ্যাত আউকেরিউ হ্রদের ঝকঝকে জলরাশি দেখা গেল।

দেখতে দেখতে কারাগোয়ার প্রধান নগরের কাছে এসে গেল বেলুন। নগর বলতে ৫০টা কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি। হল্‌দে আর পিঙ্গল রঙের কাফ্রিরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ভিক্টোরিয়ার দিকে। এদেশের মেয়েরা অস্বাভাবিক স্থূলাঙ্গী। চর্বিবহুল ইয়া মোটা বপু নিয়ে অতিকষ্টে নড়াচড়া করছিল তারা নগরমধ্যে।

ফারগুসন বললেন—"এ দেশের মেয়েদের সৌন্দর্যের লক্ষণ হল মোটা হওয়া। স্থূল করার জন্যে মেয়েদের এক ধরনের আশ্চর্য ঘোল খেতে দেওয়া হয় ছেলেবেলা থেকেই।"

বেলুন তখন উড়ে চলেছে ভিক্টোরিয়া-নায়াঞ্জা হ্রদের উত্তর দিকে। এদিকে মানুষের চিহ্ন নেই। কাঁটা বনের পর বন। অগণিত পিঙ্গলবর্ণের মশা ছেয়ে রেখেছে সেই কাঁটা-প্রান্তর। শ'য়ে শ'য়ে সিন্ধুঘোটক খেলা করছে লেকের জলে।

সন্ধ্যে নাগাদ একটা দ্বীপের ওপর নোঙর করে ফারগুসন বললেন—"এ হ্রদে যে কটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটা আসলে জলে ডোবা পাহাড়ের চূড়ো। আমাদের কপাল ভাল, এরকম একটা দ্বীপে নোঙর করতে পেরেছি। কেননা, হ্রদের তীরে বুনো জানোয়ারের চাইতেও হিংস্র মানুষের আস্তানা বেশী। তোমরা ঘুমোও। কোনো ভয় নেই।"

কেনেডি বললেন—"তুমি ঘুমোবে না ?"

"ডিক, ভাবনাচিন্তায় মাথা গরম হয়ে গেছে আমার, চোখে ঘুম আসছে না। ভাল বাতাস পেলে কালই দেখতে পাব নীলনদের উৎপত্তি স্থান। যে তীর্থ দর্শনের জন্য এই অভিযান, তার সিংহদ্বারে এসে কি আর ঘুম হয় !"

কেনেডি আর জো নীলনদের উৎপত্তিস্থান দেখার জন্য মোটেই ব্যগ্র ছিলেন না। সুতরাং অচিরেই নাক ডাকতে লাগল দুজনের।

ভোর চারটার সময়ে আবার বেলুন উড়ে চলল। এবার জোরালো বাতাসে ভর করে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে। বেলা নটার সময়ে নায়াঞ্জো হ্রদের পশ্চিম তীরে এসে পৌঁছোলো ভিক্টোরিয়া। মরুভূমি আর নিবিড় অরণ্য ছাড়া আশেপাশে কিছুই চোখে পড়ল না। আরো এগিয়ে চলল বেলুন। দূরে দেখা গেল সুউচ্চ শৈলমালার শীর্ষ। মনে হল, যেন একটা খরস্রোতা নদী এঁকাবেঁকা পথে বইছে গিরিমালার খাঁজে খাঁজে।

চীৎকার করে উঠলেন ফারগুসন—"দেখছো। আরবদের কথাই ঠিক। ওরা বলেছিল আউকেরিও হ্রদের জল একটা নদী দিয়ে উত্তর মুখে বয়ে যায়। এই সেই নদী। আর এই নদীই হল নীল নদী !"

অবাক হয়ে বললেন কেনেডি—"নীল নদী ! বলো কি হে !"

বেলুন তখন নদীর ওপর দিয়ে শূন্যপথে ভেসে চলেছে। বিশাল বিশাল পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঘনঘন গতিপথ পরিবর্তন করে ফুলে ফেঁপে গর্জন করে বয়ে চলেছে দুরন্ত পাহাড়ী নদী। কোথাও তা ভয়ংকর জল-প্রপাতের আকার নিয়েছে, কখনও বা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্যে উঁচু উঁচু পাহাড় থেকে কত শত জলধারা এসে যে নদীতে মিশেছে তার ইয়ত্তা নেই।

ফারগুসন বললেন—"এই হল নীলনদ।"

"এটাই যে নীলনদ, তার প্রমাণ কি ?" শুধোলেন ডিক কেনেডি।

"অকাট্য প্রমাণ আছে।"

"কিন্তু এখানে নামা তো সমীচীন হবে না। ঐ দেখ কাফ্রিরা বেলুন দেখে তর্জনগর্জন লম্ফঝম্প শুরু করেছে!"

"তাহলে আমাকে নামতে হবে।"

"নামলেই বিপদ।"

"উপায় নেই। বন্দুক চালিয়ে শত্রু তাড়িয়েও নামতে হবে আমাকে।"

ওপরে বেলুন তুললেন ফারগুসন। আড়াই হাজার ফুট ওপরে উঠে দেখলেন এক সুন্দর দৃশ্য। চারিদিক থেকে হাজার হাজার ক্ষীণকায়া জলধারা এসে মিশেছে নীলনদে।

ম্যাপ দেখে ফারগুসন বললেন—"উত্তর দিক থেকে যাঁরা এসেছিলেন, এখনও তাঁদের আবিষ্কৃত জায়গায় যেতে পারিনি। এখান থেকে ৯০ মাইল গেলে তবে গনডোকোরো পাওয়া যাবে। এখন আস্তে আস্তে নামা যাক। তোমরা সাবধান!"

নামতে লাগল বেলুন। গাঁয়ের লোকেরা বেলুনটাকে আকাশ রাক্ষস মনে করে অশান্ত হয়ে উঠল। ফারগুসন দেখলেন, অদূরে নীলনদের গভীরতা মাত্র সাত আট হাত। কিন্তু স্রোত অত্যন্ত প্রবল।

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর—"ঐ দ্যাখো সেই জলপ্রপাত! পর্যটক ডিবোনা এর কথাই বলে গেছেন।"

যতই এগোতে লাগল বেলুন, ততই চওড়া হয়ে যেতে লাগল নীলনদ। এবার নদীর মধ্যেই ছোট ছোট দ্বীপ অথবা দ্বীপপুঞ্জ দেখা যেতে লাগল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি দ্বীপ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন ফারগুসন। কতকগুলো কাফ্রি তীর-ধনুক নিয়ে ডোঙায় চেপে বেলুনের তলায় আসামাত্র কেনেডি বন্দুক ছুঁড়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

ফারগুসনের তখন আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। দূরবীন নিয়ে নদীর ঠিক মাঝখানে ছোটো একটা দ্বীপের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন—"ডিক, দ্বীপটায় চারটে গাছ দেখা যাচ্ছে না? ঐখানেই নামতে হবে আমাদের।"

তখন দুপুরের সূর্য অনল বর্ষণ করছে মাথার ওপর। দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিলে দ্বীপের কাফ্রিরা। সংখ্যায় তারা জনাকুড়ি। একজন বাকলের তৈরী টুপী নিয়ে নাড়তে লাগল। কেনেডির এক গুলীতে টুপী টুকরো টুকরো হয়ে যেতেই প্রাণভয়ে পালালো কাফ্রিরা। কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। সঙ্গে সঙ্গে নদীর দুতীর থেকে হাজার হাজার জ্যামুক্ত বাণ এসে বৃষ্টির মত পড়তে লাগল জলে।

বেলুন থেকে নামলেন কেনেডি আব ফাবগুসন।

ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড ছিল দ্বীপে। কেনেডি সাহেবকে সেইদিকেই টেনে নিয়ে গেলেন ফারগুসন। কাঁটালতাগুল্মে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবশেষে বিপুল হর্ষে চীৎকাব কবে উঠলেন ডক্টব:

"ডিক, প্রমাণ চেযেছিলে? এই ত্থাখো।"

"পাথরেব গায়ে কি যেন লেখা দেখছি।"

"ভাল কবে দেখ। তুটো অক্ষব। ইংবেজী অক্ষব।"

"ে ডি "

'৷া, এ ৮- অর্থাৎ আন্দিন ডিবোনো। ইনিষ্ট এসে দেখে গেছেন নীলনদের সবচাইতে উত্তবেব সীমা।"

মহানন্দে কবমর্দন কবলেন তুই বন্ধু।

॥ ১৩ ॥

নীলনদেব উৎস দর্শনেব পব তুটো দিন কেটে গেল। তৃতীয দিন ভিক্টোরিযা এসে পডল একটা গ্রামেব কাছে। একটা বেজায উঁচু গাছ মাথা তুলে দাঁডিয়ে ছিল গ্রামেব ঠিক মাঝখানে।

সাদা সাদা জিনিসগুলো সবার আগে জো'র চোখেই পডেছিল। দেখেই চেঁচিয়ে বলেছিল—"দেখেছেন! কত সাদা ফুল ফুটে বয়েছে গাছের ডালে।"

তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে দেখতে ফাবগুসন বললেন—"জো, ওগুলো ফুল নয়। মানুষেব কঙ্কাল। মানুষেব মাথা। ছোবা দিযে গাছেব গাযে বিঁধে রেখেছে।"

শুনেই শিউবে উঠল জো।

দেখতে দেখতে সে গ্রাম পডে বইল অনেক পেছনে। এবাবে দেখা গেল আব একটা গ্রাম। আব দেখা গেল আধখাওযা নবদেহ, কাটা হাত, টুকবো টুকবো পা, সাদা নবকঙ্কাল। গ্রামেব চাবদিকে ছডানো বয়েছে এমনি অস্থি আব মাংস, মেদ আব মজ্জা। বুনো জানোয়াববা নরদেহ নিযে টানাটানি কবছে। বীভৎস দৃশ্য।

ফাবগুসন বললেন—"এবা এককালে অপবাধী ছিল। অপবাধেব শাস্তিস্বরূপ জঙ্গলে বুনো জানোযারদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এদের। হিংস্র পশুদেব আক্রমণে এই হাল হয়েছে। আফবিকার দক্ষিণ অঞ্চলে কি করে জানো? অপরাধীদেব ধরে একটা ঘরে বন্ধ করা হয। তাদের ছেলেবউ পবিবাবকে ঘরেব মধ্যে ঢুকিয়ে আগুন দিযে-দেওযা হয় বাইবে থেকে।"

"কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! এ যে ফাঁসীর মতই নৃশংস কাণ্ড!" বললেন কেনেডি সাহেব।

জো হঠাৎ আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল—"ওগুলো কি পাখী? দেখেছেন কত ওপরে উঠছে?"

দূরবীন দিয়ে দেখতে কেনেডি বললেন—"ঈগলপাখী। কি সুন্দর দেখেছো?"

শশব্যস্তে ফারগুসন বলে উঠলেন—"ঈগলদের হাত থেকে ভগবান যেন আমাদের রক্ষে করেন। নরমাংসখেকো অসভ্যদের আমি ডরাই না। ডরাই এই ঈগলদের।"

বন্দুক উঁচিয়ে হাসতে হাসতে কেনেডি বললেন—"অত ভয় কিসের, বন্ধু? হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে—"

"থামো, ডিক, থামো! তুমি যতবড় শিকারীই হও না কেন, ঈগলের ঠোঁটের ধারটা ভুলে যেও না। এক ঠোকরেই বেলুন ফেঁসে যাবে।"

তখন প্রায় বেলা দুপুর। হঠাৎ বাঁশির শব্দে পর্যটকদের দৃষ্টি পড়ল নীচের দিকে। দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য!

ভীষণ লড়াই লেগেছে দুটো দলে। তীরে তীরে আকাশ ছেয়ে গেছে। বেলুনটা হঠাৎ যোদ্ধাদের চোখে পড়তেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কাফ্রিরা। চেঁচামেচি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। কয়েকটা তীর ছুটে এল বেলুন লক্ষ্য করে। একটা তীর এত কাছে এসে পড়ল যে খপ করে ধরে ফেলল জো।

ফারগুসন তৎক্ষণাৎ গ্যাসে তাপ দিয়ে বেলুন ওপরে তুলতে লাগলেন। আবার শুরু হল যুদ্ধ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল আগের মতই। আগের মতই অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন মুণ্ড ছিটকে পড়তে লাগল রুধিররঞ্জিত মাটির ওপর। কেউ ধরাশায়ী হবামাত্র শত্রুপক্ষের লোক এসে ঘ্যাঁচ করে কেটে নিয়ে যাচ্ছে মুণ্ড। দেখা গেল মেয়েরাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। কাটা মুণ্ড তারাই আহরণ করে জড়ো করছে রণক্ষেত্রের দুপাশে। বাধা পেলে হাতিয়ার হানতেও দ্বিধা করছে না। জোর করে একজন আরেকজনের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে নরশির।

কেনেডি বললেন—"কী ভয়ংকর দৃশ্য!"

ফারগুসন বললেন—"ইউনিফর্ম পরিয়ে দিলে সুসভ্য সৈন্য আর অসভ্য কাফ্রির মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে কি?"

কেনেডি বন্দুক তুলে বললেন—"যুদ্ধে বাধা দেব?"

"না", ফারগুসন বললেন। "আমরা বরং এখান থেকে পালাই। এ রকম

নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর দেখা যায় না। যুদ্ধ নিয়ে যারা ব্যবসা করে, তাদের ঘাড় ধরে এনে এই দৃশ্য দেখানো উচিত। তাহলেই রক্তের তৃষ্ণা মিটে যেত। পৃথিবীতে শান্তি আসত। মানুষ তার হিংসাবৃত্তি ছাড়ত!"

দুই দলের দুই নেতার মধ্যে একজন হিপোপটেমাসের মত মোটা আর অসুরের মত বলবান। শত্রু সংখ্যা যেদিকেই বেশি, সেই দিকেই তীক্ষ্ণ বর্শা নিয়ে ধাওয়া করছে সে। আর এক হাতে ক্ষুরের মত ধারালো কুঠারের ঘায়ে কচুকাটা করছে শত্রুদের। কখনও বা শোণিতসিক্ত দেহে জখম শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঠারের এক কোপে বাহু কেটে নিয়ে কমমচ করে চিবুচ্ছে পরম গর্বে!

"রাক্ষস! দানব! পিশাচ!" শিউরে উঠে চীৎকার করে উঠলেন কেনেডি। "ফারগুসন, দেখেছো? বেটা মানুষ খাচ্ছে!"

মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই গুলী ছুটল। অব্যর্থ লক্ষ্য কেনেডির। এক গুলীতেই নরখাদক সর্দারের খুলি ফুটো হয়ে গেল।

আচমকা সর্দারকে লুটিয়ে পড়তে দেখে একদল যেমন ঘাবড়ে গেল, অপরদল তেমনি উৎসাহিত হল। ফলে, নেতাহীন যোদ্ধারা পড়ি কি মরি করে দৌড়োতে লাগল সমরপ্রাঙ্গণ ছেড়ে।

ফারগুসন তখন বেলুন নিয়ে ওপরে উঠছেন। উঠতে উঠতেই দেখলেন বিজয়ীরা মরা আর আধমরা যোদ্ধাদের হাত-পা নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগিয়েছে। রক্তমাখা নরদেহ নিয়ে বিপুল আনন্দে মহাভোজ শুরু করে দিয়েছে!

॥ ১৪ ॥

রাত্রি। নিকষ অন্ধকার। আকাশ মেঘে ঢাকা। বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই।

গাছের ডালে বেলুন লাগিয়ে শোবার আয়োজন করলেন পর্যটকরা। কেনেডি পাহারায় রইলেন। শোবার আগে ফারগুসন বললেন—"ডিক, একটু সাবধানে থেকো। অনেকক্ষণ থেকে একটা গুন্‌গুন্‌ শব্দ পাচ্ছি। অন্ধকারে কোথায় এসেছে, তাও বুঝতে পারছি না।"

রাত গভীর। হঠাৎ যেন একটা ক্ষীণ আলোকরেখা দেখতে পেলেন কেনেডি। কিন্তু আলোকরশ্মি আর দেখা গেল না। কেনেডি ভাবলেন, মায়া, না মরীচিকা?

কিছুক্ষণ গেল। আচম্বিতে কোত্থেকে ভেসে এল বংশীধ্বনি। বাঁশির আওয়াজ, না, নিশাচর পাখীর উল্লাস? মহাদ্বিধায় পড়লেন কেনেডি সাহেব।

মুহূর্তের জন্যে মেঘ সরে যেতেই চাঁদের আলোয় দেখা গেল কতকগুলো অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে। ভাল করে দেখতে না দেখতেই আবার মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল চন্দ্রকিরণ।

ফারগুসন আর জো'কে ডেকে তুললেন কেনেডি। তারপর দড়ির মই বেয়ে জোকে নিয়ে বন্দুক হাতে গাছের ডালে গিয়ে বসলেন কেনেডি সাহেব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। খচমচ··· খচমচ· সড়···সড় সড়!

কারা যেন গাছে উঠছে! সাপও হতে পারে, বুনো জানোয়ারও হতে পারে, অথবা···

গাছের দুদিকে বন্দুক তাগ করে এসে রইবেন কেনেডি আর জো। নিদারুণ উৎকণ্ঠায় টানটান হয়ে উঠল স্নায়ুমণ্ডলী।

কিছুক্ষণ যেতেই দেখা গেল ছায়ার মত কয়েকজন কাফ্রি গাছে উঠছে। এবার শোনা গেল ফিস ফিস স্বরে তারা কথা কইছে নিজেদের মধ্যে। দুটো মানুষ-মূর্তি সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই হেঁকে উঠলেন কেনেডি সাহেব—"মারো!" সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ রাত খান্ খান্ করে একসঙ্গে গর্জে উঠল দু দুটো বন্দুক। যেন আচম্বিতে ধরিত্রী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল—অন্ধকারের বুক চিরে ধেয়ে গেল দুটো অগ্নিশিখা।

বন্দুক নির্ঘোষের সঙ্গে কাফ্রিদের আর্তনাদের রেশ মিশে বহুদূর কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল সেই ভয়াবহ ধ্বনি। হুংকার দিয়ে উঠল কাফ্রিরা। কিন্তু পরক্ষণেই থ হয়ে গেলেন কেনেডি।

হুংকার আর আর্তনাদের মধ্যে ও কার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে? ফরাসী ভাষায় কে যেন আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"রক্ষা কর! বাঁচাও!" আবার আবার শোনা গেল সেই ব্যাকুল সাহায্য প্রার্থনা!

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ রোমাঞ্চকর। গায়ে কাঁটা জাগানো। গনডোলায় মিলিত হলেন তিন পর্যটক। গোঁয়ারের মত কেনেডি বললেন—"যতো অন্ধকারই হোক না কেন, এখুনি আমি আর জো গিয়ে তুলে নিয়ে আসব ফরাসী ভদ্রলোককে। নিশ্চয় অসভ্য বর্বরগুলো আজ রাতেই মেরে ফেলবে ওঁকে।"

"কখ্খনো না," বাধা দিয়ে বললেন ফারগুসন। "সূর্যের আলো ছাড়া বন্দীদের হত্যা করে না এরা। তাহলেও তুমি যখন বলছ তখন এক কাজ করা

যাক। ফরাসী ভদ্রলোকের ওজন নিশ্চয় আমাদেরই একজনের সমান হবে। বরং একটু কম হওয়ারই কথা। কেননা, অনাহারে অত্যাচারে শরীর নিশ্চয় আধখানা হয়ে গেছে। বেলুনে যা ভার আছে, তা থেকে আমাদের সমান ওজনের ভার ফেলে দিলেও প্রায় ৬০ পাউণ্ড ভার থেকে যাবে। সেটাও যদি ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে এক লাফে বেলুন উঠে পড়বে ওপরে।"

"মতলব কি তোমার?"

"বেলুনটা যদি বন্দীর কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ভদ্রলোককে দোলনায় তুলে নিয়ে সমান ওজনের ভার ফেলে দিলেও বেলুন ভাসতে থাকবে। বাকী ভারটাও তৎক্ষণাৎ ফেলে না দিলে কাফ্রিরা আমাদের জ্যান্ত ছিঁড়ে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস গরম করে বেলুন তুলে ফেলতে হবে। রাজী?"

"রাজী। চলো, বেরিয়ে পড়ি।"

"এক সেকেণ্ড। সামান্য একটা অসুবিধা আছে। আবার নামবার সময়ে ৬০ পাউণ্ড ওজনের গ্যাস ছেড়ে না দিলে আর নামা যাবে না। গ্যাসই এই বেলুনের জীবন। যাকগে, সে যা হবার হবে।"

"ঠিক বলেছ। আগে ভদ্রলোক বাঁচুন, তারপর বেলুন।"

"নোঙর খুলে দাও।"

তুলে নেওয়া হল নোঙর। মৃদুমন্দ বাতাসে ধীর গতিতে ভেসে চলতে লাগল ভিক্টোরিয়া। মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে গা ঢেকে দুলে দুলে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। এই ফাঁকে ব্যাগ থেকে দুটুকরো কয়লা বার করলেন ফারগুসন। ঘসে ঘসে ডগা দুটো বেশ ছুঁচোলো করলেন। তারপর জলকে গ্যাস করার জন্যে জলের মধ্যে যে দুটো ইলেকট্রিক তার ছিল, তা বার করে কয়লা দুটো বাঁধলেন তার দুটোর প্রান্তে। অবশেষে কয়লার টুকরোর সুতীক্ষ্ণ প্রান্ত দুটো কাছাকাছি আনতেই চোখের নিমেষে সুতীব্র আলোকবন্যায় ভেসে গেল চারিদিক। চোখ ধাঁধানো আলোয় অন্ধকারের চিহ্নও আর রইল না।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সার্চলাইটের মত চারিদিকে আলো ফেলতে লাগলেন ফারগুসন। যেদিক থেকে আর্তনাদ শোনা গেছিল, সেই দিকে আলো পড়তেই দেখা গেল এক বিচিত্র দৃশ্য।

আখের ক্ষেতের মধ্যে গোটা চল্লিশ কুঁড়ে ঘর। অসংখ্য কাফ্রি দাঁড়িয়ে কুঁড়েগুলো ঘিরে। বেলুনের প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত নীচে মাঠের মধ্যে একটা শূল পোঁতা! শূলের গোড়ায় লুটিয়ে রয়েছে একটি দেহ। একজন অর্ধনগ্ন ফরাসী পাদরী। দু হাতে একটা ক্রুশ চেপে রয়েছে বুকের ওপর।

পাদরীর দেহ শোণিতসিক্ত। অজস্র ক্ষত দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে!

আর, কাফ্রিরা দেখল এক কল্পনাতীত ভয়াবহ দৃশ্য। দেখল মহাশূন্য থেকে নেমে আসছে এক বিপুল ধূমকেতু। আগুনের মত উজ্জ্বল পুচ্ছে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত।

নিদারুণ আতংকে চেঁচামেচি শুরু করে দিলে অসভ্যরা। হট্টগোল শুনে মুমূর্ষু পাদরী মাথা তুললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ফারগুসনের হুকুমে গ্যাস নিভিয়ে দিল জো। ধীরে ধীরে বন্দীর দিকে এগিয়ে চলল বেলুন। ভয়ের চোটে কাফ্রিরা চোঁ-চা দৌড় দিল কুঁড়ের দিকে। শূলের কাছে কেউই রইল না।

অতি কষ্টে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসলেন ফরাসী পাদরী। কয়েদী পালায় দেখে কয়েকজন কাফ্রি দৌড়ে এল। কেনেডি বন্দুক রেখে চট করে তাঁকে তুলে নিলেন গনডোলায়। সঙ্গে সঙ্গে তিরিশ সের ভার ফেলে দিল জো।

কিন্তু বেলুন উঠল না।

দারুণ উৎকণ্ঠায় গলা কেঁপে গেল কেনেডির—"একী! বেলুন ওঠে না কেন?"

জো বললে—"একজন কাফ্রি আমাদের টেনে রেখেছে।"

"ডিক···ডিক···জলের বাক্স ফেলো!"

তৎক্ষণাৎ জলভর্তি একটা বাক্স নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন কেনেডি।

অমনি এক লাফে প্রায় ৩০০ ফুট ওপরে উঠে গেল ভিক্টোরিয়া।

বিপুল আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন কেনেডি আর জো।

আচম্বিতে, আরো লাফিয়ে উঠল বেলুন। উঠে গেল প্রায় হাজার ফুট ওপরে।

ঝাঁকুনির চোটে আর একটু হলে পড়ে যেতেন কেনেডি। কোন মতে সামলে নিয়ে বললেন রুদ্ধশ্বাসে—"ব্যাপার কি?"

"কাফ্রিটা বেলুন ছেড়ে দিয়েছে" বললেন ফারগুসন।

বিকট চীৎকারে প্রান্তর কাঁপিয়ে শূন্য পথে ঘুরপাক খেতে খেতে সশব্দে মাটিতে আছাড় খেয়েই নিস্পন্দ হয়ে গেল দুঃসাহসী কাফ্রিটা।

বৈদ্যুতিক তার দুটো আলাদা করে দিলেন ফারগুসন। চক্ষের নিমেষে উধাও হল আলোক রাশি। নিবিড় তামস্রার মধ্যে ভোজবাজির মতই অদৃশ্য হয়ে গেল অতিকায় বেলুন ভিক্টোরিয়া!

এত কাণ্ড করে ফরাসী পাদরীকে উদ্ধার করেও কিন্তু তাঁর প্রাণ রক্ষা করা গেল না। দিন কয়েক পরেই বেলুনের দোলনাতেই দেহ রাখলেন তিনি। মারা যাওয়ার আগে বলে গেলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মকাহিনী।

বললেন, "ব্রিটানি প্রদেশে আরাভান নামে একটা ছোট্ট গাঁ আছে। আমার বাড়ী সেই গাঁয়ে। আমি বড় গরীব। কুড়ি বছর বয়সে আমি ঘর ছাড়ি। আসি এই সুদূর আফরিকায়। ক্ষিদে, তেষ্টা, পথশ্রম, ব্যাধি,—কিছুই আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। অতি কষ্টে অল্প অল্প করে এগোতে এগোতে এসেছি এতদূর।"

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন পাদরীসাহেব—"ন্যামবরা জাতের কাফ্রিরা ভয়ানক নিষ্ঠুর। এরা আমাকে যে কত যন্ত্রণা দিয়েছে, তার ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করতে পারব না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝগড়ি করে ন্যামবরারা যখন ত্যাগ করলে আমায়, যখন আমি ফিরে গেলেও যেতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম, ধর্মপ্রচার কবাই আমার আদর্শ। তাই আর ফিরলাম না। ক্রমাগত এগোতে লাগলাম। কাফ্রিরা ভাবল আমি বদ্ধ উন্মাদ। এ ধারণা যদ্দিন ওদের মধ্যে ছিল, তদ্দিন আমি ছিলাম নিরাপদ। আস্তে আস্তে শিখে নিলাম এদের ভাষা। ন্যামন্যাষ জাতের মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস আর হিংস্র হল বারাফ্রি সম্প্রদায়। অনেকদিন ধরেই ছিলাম এদের মধ্যে। দিনকয়েক পরে মারা যায় ওদের সর্দার। ওরা ভাবলে বুঝি আমিই ঝাড়ফুঁক করে নিকেশ করেছি সর্দারকে। তাই রাত ভোর হতে না হতেই শূলে চড়িয়ে আমাকে খতম করার আয়োজন হয়েছিল। দেবদূতের মত আপনারাই এসে আমাকে বাঁচালেন।

"প্রথমে বন্দুকের শব্দ শুনে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। তারপর অনেকক্ষণ পরেও যখন কারো সাড়া পেলাম না, ভাবলাম বুঝি আমারই শোনার ভুল। কিন্তু আমি যে এখনো বেঁচে আছি, এইটাই তো আশ্চর্য!"

একটানা এতটা কথা বলে দুর্বল হয়ে পড়লেন পাদরী। সন্ধ্যার দিকে দেখা গেল পশ্চিম দিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। লালে লাল হয়ে গেছে গোটা আকাশ।

ফারগুসন বললেন—"আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখা!"

"সে কি! বাতাস যে ঐ দিকেই টেনে নিয়ে চলেছে আমাদের" তাড়াতাড়ি বললেন কেনেডি।

"ভয় পেও না, ডিক। আগুনের ওপর দিয়েই আমরা চলে যাবো।"

তিন ঘণ্টা পর আগ্নেয়গিরির কাছে এসে পৌছোলো ভিক্টোরিয়া।

পর্বতগর্ভ থেকে গলিত গন্ধক ফোয়ারার মত উঠে ভীষণ আওয়াজ করে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মাঝে মাঝে বহু উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে তপ্ত পাথরের চাঁই।

গ্যাসে তাপ দিয়ে দেখতে দেখতে বেলুনকে ছ'হাজার ফুট ওপরে তুলে ফেললেন ফারগুসন। অনায়াসে পেরিয়ে গেলেন আগ্নেয় পর্বত।

তখন রাত্রি। মাথার ওপর নির্মল আকাশে জ্বলছে অগণিত তারা। সেইদিকে তাকিয়ে ভগবানের নাম করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ফরাসী পাদরী।

রাত ভোর হল। ভিক্টোরিয়া একটা গিরিচূড়ার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে। নীচে কোথাও মরা আগ্নেয়গিরির হাঁ-করা মুখ, কোথাও শুক্‌নো পাহাড়ী নদীর গভীর গিরিখাত। পাহাড়ের সারি যেন একেবারে নীরস, জলের কণামাত্র নেই কোথাও। স্তূপীকৃত পাথরের টুকরো আর বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এ অঞ্চল একেবারেই বারিহীন, কঠিন, ঊষর। গাছপালা গুল্ম লতার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। যতদূর চোখ যায় কেবল শুকনো নীরস পাথরের স্তূপ ঝকঝক করছে সূর্যের আলোয়।

দুপুরের দিকে একটা বহু পুরোনো গিরিবর্ত্মের মধ্যে নামা স্থির করলেন ফারগুসন। উদ্দেশ্য: ফরাসী ধর্মযাজককে কবর দেওয়া।

গ্যাসের উত্তাপ কমাতেই ধীরে ধীরে নীচে নেমে পাথর ছুঁয়ে গেল বেলুন। সঙ্গে সঙ্গে জো এক লাফে নেমে পড়ে চটপট কয়েকটা ভারি পাথর তুলে দিলে গনডোলায়। বেলুন তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেল। নেমে এলেন ফারগুসন আর কেনেডি।

তিনজনের চেষ্টায় অচিরেই সমাহিত হলেন ফরাসী পাদরী।

নতমস্তকে ফারগুসন কি যেন ভাবছিলেন। কেনেডি তাই শুধোলেন—"এত ভাবনা কিসের?"

"ভাবছি, বিধাতার কি বিচিত্র ব্যবস্থা। যেখানে কেবল আরাম সেখানে পুরস্কার নেই। যেখানে বিপদ, কুবেরের ঐশ্বর্য আর বিপুল সম্মান শুধু সেইখানেই। এই বীর পাদরী সাহেবকে আজ কোথায় কবর দিলাম জানো?"

"কোথায়?"

"সোনার খনিতে! এই গিরিবর্ত্ম আসলে একটা বিরাট স্বর্ণক্ষেত্র! সারাজীবন যিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন, চিরনিদ্রায় তিনি শয়ন করলেন বিরাট সোনার খনিতে।"

"সোনার খনি! বল কি হে!"

"যে পাথরগুলো তোমরা সামান্য পাথর ভেবে পায়ে মাড়াচ্ছ, তার মধ্যেই রয়েছে খাঁটি সোনা!"

"অসম্ভব!" বললে জো।

"একটু খুঁজলেই বুঝবে অসম্ভব কি না।"

পাগলের মত পাথরগুলো নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া আরম্ভ করে দিলে জো।

ফারগুসন বললেন—"জো মাথাটা ঠাণ্ডা কর। এ কুবের সম্পদ তো তোমার কোনো কাজেই আসবে না? এ সোনার খনি তো আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না।"

"কেন? কেন?"

"অত ভার বেলুন সইবে কেন?"

"বলেন কি? এত সোনার কিছুই আমরা নেব না? বড়লোক হব না?"

"জো, সাবধান, সোনার মোহ তোমায় পেয়ে বসেছে। খুব খারাপ। পাদরী সাহেবের সমাধি দেখেও কি বুঝতে পারছ না, সঙ্গে কিছুই যাবে না?"

বিরক্ত হয়ে জো বললে—"ও সব বক্তিমে শুনতেই ভাল লাগে। এত ভারি ভারি সোনার ডেলা কিছুই নেব না? তাও কি হয়? মিঃ কেনেডি, আসুন, চার-পাঁচ কোটি টাকার সোনা আমরা তুলে নিই।"

হেসে কেনেডি বললেন—"আমরা তো টাকার সন্ধানে বেরোই নি কাজেই কি হবে সোনা নিয়ে? তাছাড়া দু পকেটে কত সোনাই বা আর ধরবে?"

"কেন? ভার তো নিতেই হবে। বালির বদলে সোনা তুলি না কেন?"

"তা নিতে পার। কিন্তু দরকার পড়লেই সে সোনা ফেলে দিয়ে ওজন কমাতে হবে।"

"যা দেখছি, সবই কি সোনা?"

"হ্যাঁ। লোক চক্ষুর আড়ালে আফ্রিকার এই নিভৃত প্রদেশে কুবেরের ভাঁড়ার সাজিয়ে রেখেছেন প্রকৃতি। কালিডোনিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার সব কটা সোনার খনি এক করলেও এর সমান হবে না।"

"এত সোনা এমনিভাবে নষ্ট হবে? কারো ভোগে লাগবে না?"

"জায়গাটার ঠিকানা আমি লিখে নিচ্ছি। ইংলণ্ডে গিয়ে সোনার খনির কথা সবাইকে জানিও। যার দরকার হবে, এসে নিয়ে যাবে।"

হুম্-হুম্ করে বিপুল ওজনের সোনার ভার তুলতে লাগল জো।

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন ফারগুসন।

সোনা উঠছে তো উঠছেই। দেখতে দেখতে হাজার পাউণ্ড সোনা তুলে ফেলল জো। একটিও কথা না বলে ফারগুসন কেনেডি বেলুনে উঠে বসলেন। তখনও সোনা তুলে যেতে লাগল জো।

ফারগুসন কিছুক্ষণ গ্যাস গরম করে হাঁক দিয়ে বললেন—"জো, বেলুন নড়ে না যে!"

জো'র তখন জবাব দেওয়ারও অবসর নেই! তন্ময় হয়ে স্বর্ণসন্ধানে সে ব্যস্ত।

ফারগুসন আবার ডাকলেন—"জো।"

মুখটাকে বাংলা পাঁচের মত করে বেলুনে উঠল জো—"বলুন।"

"কিছু ওজন ফেলে দাও।"

"সে কি, আপনিই তো বললেন ওজন তুলতে।"

"তা বলেছি। কিন্তু এত বেশি তুললে বেলুন চলবে কি করে?"

"বেশি আর কোথায়? এই তো সামান্য!"

'জো, তুমি কি চাও বাকী জীবনটা আফ্রিকার এই পাহাড়ের খাঁচায় বন্দী থাকি?"

করুণ চোখে কেনেডির দিকে তাকাল জো। কেনেডি কোনো কথা বললেন না।

ফারগুসন বললেন—"জো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জলও ফুরিয়ে এসেছে—এদিকে চারদিকে পাহাড়ের পাঁচিল। খানিকটা ওজন ফেলে দাও—"

"হয়ে· বেলুনের যন্ত্রটা খারাপ হয়নি তো?"

"কল তো চলছে, গ্যাসও গরম হচ্ছে। দেখছ না, বেলুন কি রকম ফুলে উঠেছে!"

কাঁদো কাঁদো মুখে মাথা চুলকোতে লাগল জো। অবশেষে নাচার হয়ে সবচেয়ে ছোট্ট একটা সোনার ডেলা তুলে হাতের তালুতে রেখে ওজনটা অনুভব করে নিলে, তারপর ফেলে দিলে বাইরে। কিন্তু বেলুন নড়ল না।

জো বললে—"দেখলেন তো, মেশিন বিগড়েছে। এই তো ওজন ফেললাম, তবুও বেলুন নড়ে না কেন?"

"আরো ফেল।"

জো আরও পাউণ্ড দশেক সোনা ফেলে দিলে। বেলুন তবুও অনড় রইল। বিশ পাউণ্ড…তিরিশ পাউণ্ড·· চল্লিশ পাউণ্ড। সর্বনাশ কাণ্ড! তবুও তো বেলুন নড়ে না!

ফারগুসন বললেন—"আমরা তিনজনে প্রায় ৪০০ পাউণ্ড। সুতরাং ৪০০ পাউণ্ড সোনা ফেলে দাও!"

"চা-র-শ পাউণ্ড!" জো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

কিন্তু উপায় নেই। কাজেই আরো কিছু সোনা নিক্ষেপ করতে হল।

জো বললে—"হলো তো! এই দেখুন বেলুন উঠছে!"

"কোথায় উঠছে? যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।"

"না উঠলেও নড়ছে তো। এই দেখুন নড়ছে!"

"ওজন কমাও…আরো সোনা ফেল… জলদি!"

ফেলতে লাগল জো। সোনা তো নয়, যেন নিজের পাঁজর গুঁড়িয়ে নিক্ষেপ করতে লাগল বেলুনের বাইরে। অনেকক্ষণ পরে বেলুন নড়ে উঠে প্রায় শখানেক ফুট ওপরে উঠে গেল।

ফারগুসন বললেন—"এখনও যা ওজন আছে—"

"আর যদি ফেলতে হয় তো এবার আমাকেই ফেলে দিন" ঝটিতি বললে জো।

অট্টহাস্য করে উঠলেন ফারগুসন আর কেনেডি।

মুখ গোঁজ করে সোনার স্তূপের ওপর শুয়ে পড়ল জো। মন্থর গতিতে ভেসে চলল ভিক্টোরিয়া।

পরদিন সকালে ফারগুসন বললেন—"আমরা এত আস্তে যাচ্ছি যে দশ দিনে মাত্র অর্ধেক পথ এসেছি! এদিকে জলও ফুরিয়ে আসছে।"

বাস্তবিকই মহাচিন্তায় পড়লেন ফারগুসন। যে দিকে দুচোখ যায়, গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই। গাছপালাও যেন ক্রমশ কমে আসছে। দূরবীন কষে দেখা গেল দূরে দূরে দৈত্যের মত খাড়া ছোট ছোট পাহাড়। এদিকে সেদিকে সামান্য শুকনো গাছ আর কাঁটাঝোপ।

দিনশেষে হিসেব করে দেখা গেল, সোনার পাহাড় থেকে তাঁরা এসেছেন মাত্র তিরিশ মাইল। অথচ জল এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন গ্যালন। ভবিষ্যতে যদি দরকার লাগে, তাই গ্যালন পাঁচেক জল সাবধানে সরিয়ে রাখলেন ফারগুসন। মেশিনের জন্যে রইল এক গ্যালন। দু'গ্যালন জলে কম করে ১৮০ ঘনফুট গ্যাস হয়। প্রতি ঘণ্টায় বেলুনে ৯ ঘনফুট গ্যাসের দরকার।

ফারগুসন বললেন—"আমরা আরো চুয়ান্ন ঘণ্টা যেতে পারব। রাত্রে এগুলো ঠিক হবে না। নদী বা ঝরণা দেখতেই পাবো না। জল আমাদের চাই-ই চাই। এখন থেকে খুব কম করে জল খেতে হবে।"

রাত নির্বিঘ্নে কাটল। ভোর হতেই আবার রওনা হলেন বেলুন যাত্রীরা। মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল বেলুন। এদিকে মাথার ওপর ধীরে ধীরে গনগনে হয়ে উঠতে লাগল সূর্যদেব। উঃ, সে কি রোদ্দুরের তেজ! ইচ্ছে করলে অনেক ওপরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় উঠে যেতে পারতেন ফারগুসন। কিন্তু অনেকটা

জল গ্যাস করতে হবে, তাই সে চেষ্টা করলেন না। দুপুরের দিকে দেখা গেল মাত্র বারো মাইল পথ এসেছে ভিক্টোরিয়া।

গরমে হাঁসফাঁস করতে লাগলেন সবাই।

ফারগুসন বললেন—"পাদরীকে বাঁচাতে গিয়ে একশ পাউণ্ড জল ফেলে দিতে হয়েছে। থাকলে সূর্যের তাপেই হাইড্রোজেন গ্যাস ফুলে উঠে আমাদের ওপরে নিয়ে যেতো।"

ক্রমে ক্রমে সোনার পাহাড় শ্রেণীর সানুদেশ পেরিয়ে এল ভিক্টোরিয়া। দেখা গেল সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে দু একটা শুকনো লতা বা নীরস গাছ।

"আফরিকার রুক্ষ নগ্ন মূর্তি দেখো," বললেন ফারগুসন।

সারাদিন আগুন ঢেলে সূর্য অস্তাচলে নামল। দেখা গেল, মাত্র বিশ মাইল পথ এসেছে বেলুন।

পরদিন সকালে প্রকাণ্ড আগুনের গোলার মত সূর্য লাফিয়ে উঠল পূর্ব দিগন্তে। আবার শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি। দূরবীনের মধ্যে দেখা গেল, সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ধূ-ধূ মরুভূমি। লক্ষ লক্ষ হীরের কণার মত জ্বলছে অন্তহীন বালুকারাশি:

হতাশ হয়ে পড়লেন ফারগুসন। ভাবলেন, "কেনই বা আনলাম কেনেডি আর জো'কে। আমিই ডেকে নিয়ে এলাম এদের অকাল মৃত্যুকে।"

সারাদিন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ঢিমেতালে এগিয়ে চলল ভিক্টোরিয়া। বাতাসের অভাবে মধ্যে মধ্যে মনে হল এই বুঝি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আবার রাত এল। ভোর হল। ফারগুসন দেখলেন, মাত্র পাউণ্ড ছয়েক জল আছে। নির্মেঘ আকাশে অগ্নিগোলকের মত দপ দপ করছে মরুসূর্য। ৫০০ ফুট ওপরে উঠল বেলুন। কিন্তু সেখানেও বাতাস নেই। বাতাস নেই ওপরে, নেই কোথাও!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফারগুসন বললেন—"মরুভূমির ঠিক মাঝখানে পৌঁচেছি আমরা। আফরিকার একদিকে গভীর জঙ্গল, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রান্তর, খাল বিল হ্রদ নদী ঝরণা। আর একদিকে ধূ-ধূ মরুভূমি! গাছপালা লতাপাতার চিহ্নমাত্র নেই। প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা! কি নিগূঢ় রহস্য!"

ঠিক এই সময়ে আচমকা চীৎকার করে উঠল জো—"মেঘ! মেঘ!"

বাস্তবিকই, পূবেই আকাশে বুনো ঘোড়ার কালো কেশের মতই দেখা দিয়েছে এতটুকু মেঘ!

হই-হই করে উঠলেন অভিযাত্রীরা। মেঘ মানেই বৃষ্টি! মেঘ মানেই বাতাস!

বেলা এগারোটা নাগাদ সূর্যকে ঢেকে ফেলল মেঘের টুকরো। কিন্তু তারপরেই দেখা গেল, মেঘের কিনারা দিগন্ত রেখা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে।

গম্ভীর মুখে ফারগুসন বললেন—"ও মেঘকে বিশ্বাস নেই। সকালেও যা এখনো তাই।"

কেনেডি বললেন—"মেঘ আমাদের কাছে না এলে আমরাই তো মেঘের কাছে যেতে পারি।"

তৎক্ষণাৎ তাই স্থির হল। ওপরে উঠতে লাগল ভিক্টোরিয়া। দেড় হাজার ফুট উঠে মেঘের ভেতর সেঁধিয়ে গেল বেলুন। কিন্তু সেখানেই বাতাস নেই, নেই মেঘের মধ্যে জল।

আচম্বিতে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল জো—"আরে· আরে দেখেছেন? আর একটা বেলুন এসেছে· ·মানুষও এসেছে!"

"জো কি পাগল হয়ে গেল?" বললেন কেনেডি।

আকাশের দিকে আঙুল তুলে জো বললে—"দেখুন।"

অবাক হয়ে গেলেন কেনেডি—"ফারগুসন, জো মিথ্যে বলেনি—"

ধীরস্থির কণ্ঠে ফারগুসন বললেন—"ডিক, ওটা মরীচিকা।"

"মরীচিকা না তোমার মাথা। স্পষ্ট দেখছি বেলুনে কয়েকজন লোক রয়েছে। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, বেলুনও চলেছে সেই দিকে।"

ফারগুসন বললেন—"পতাকা দেখিয়ে সঙ্কেত করো।"

তাই করলেন কেনেডি। ওদিকের বেলুন অভিযাত্রীরাও নিশান নেড়ে সঙ্কেত করল।

ফারগুসন বললেন—"এবার·বিশ্বাস হলো তো? যা দেখছ, তা মরীচিকা। ও বেলুন আমাদের ছায়া।"

জো বললে—"অসম্ভব! আকাশ কি আয়না যে বেলুনের ছায়া পড়বে?"

"বেশ তো, হাত নেড়ে ইসারা কর।"

জো হাত নাড়তেই অবিকল সেই ভাবেই আর একজন হাত নাড়লে ওদিকের বেলুন থেকে।

জো ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললে—"তাও তো বটে! মায়া বলেই মনে হচ্ছে!"

"মরুভূমিতে অমন চোখের ভুল সবারই হয় জো। বাতাস হাল্কা থাকলে ওরকম কত কি দেখা যায়।"

দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল মরুভূমির মরীচিকা-দৃশ্য। মেঘের টুকরোটাও উঠে গেল ওপরে। সেই সঙ্গে যেটুকু বাতাস ছিল, তাও গেল।

নিরুপায় হয়ে আবার নেমে এলেন ফারগুসন। খামোকা খানিকটা গ্যাসই নষ্ট হল।

মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল বেলুন। বিকেলের দিকে আবার চেঁচিয়ে উঠল জো—"গাছ! গাছ! দূরে দুটো তালগাছ দেখা যাচ্ছে না?"

সঙ্গে সঙ্গে চোখে দূরবীন লাগালেন ফারগুসন। এবার আর মায়া নয় সত্যিই দুটো শুকনো তাল গাছ দেখা গেল বহু দূরে!

জো কাতর কণ্ঠে বললে—"জল তো পাবেনই। এবার আমাকে একটু জল দিন। আমি আর পারছি না।"

জল পাওয়া যাবে ভেবে ফারগুসন তৎক্ষণাৎ খানিকটা জল দিলেন জোকে।

ছটার সময়ে তাল গাছের কাছে পৌঁছোলো ভিক্টোরিয়া। গাছের অবস্থা দেখে মুখ শুকিয়ে গেল অভিযাত্রীদের। গাছ তো নয়, গাছের কঙ্কাল! শীর্ণ শুষ্ক পত্রবিহীন!

ভয়ার্ত চোখে এহেন বৃক্ষ-প্রেতচ্ছায়ার দিয়ে চেয়ে রইলেন ফারগুসন। গাছের নিচে রোদে পোড়া কতকগুলো পাথর পড়ে। কুয়োর পাথর। কিন্তু জল নেই। ছিটে ফোঁটাও নেই।

এই সময়ে চীৎকার করে উঠলেন কেনেডি আর জো। চমকে উঠে ফারগুসন দেখলেন এক ভয়াবহ দৃশ্য!

দেখলেন, যতদূর চোখ চলে শুধু নরকঙ্কাল। অগ্নিকটাহতুল্য বালুকারাশির ওপর রাশি রাশি কঙ্কাল। কতকগুলো কঙ্কাল শুকনো পাতকুয়োর চারদিকে ছড়িয়ে!

নিদারুণ সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে একমুহূর্তও গেল না ফারগুসনের। মরুযাত্রীরা দূর থেকে ছুটে এসেছে জলের আশায়। অত্যন্ত কাহিল শরীর নিয়ে কয়েক-জন ছাড়া বাকী সবাই পথেই মরেছে। যারা পৌঁচেছে, তারাও জলহীন পাতকুয়োর বিকট রূপ দেখে ইহলীলা সম্বরণ করেছে!

ঢোক গিলে কেনেডি বললেন—"ফারগুসন, চলো পালাই।"

"পাগল। পাতকুয়োর তলা পর্যন্ত না দেখে আমি ছাড়ছি না। জল আমাকে পেতেই হবে।"

কিন্তু বৃথাই কুয়োর কাছে দৌড়ে গেলেন কেনেডি আর জো। বৃথাই কুয়োর তলার শুকনো বালি খুঁড়লেন এক ফোঁটা জলের আশায়। নিদারুণ শ্রান্তিতে চোখ অন্ধকার হয়ে এল। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। মাথা ঘুরতে লাগল।

কিন্তু জল পাওয়া গেল না!

॥ ১৭ ॥

পরদিন সকালে বেলুন ছাড়লেন ফারগুসন।

বললেন—"আর বড়জোর ছ'ঘণ্টা যাওয়া যাবে। তারপর সব শেষ।"

থার্মোমিটারে দেখা গেল উত্তাপ ১১৩ ডিগ্রী। শুয়ে পড়লেন কেনেডি আর জো!

যতই রোদ উঠতে লাগল, ততই অসহ্য হয়ে উঠল উত্তাপ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল তেষ্টা। জল না খেয়ে কয়েক চুমুক ব্রাণ্ডি খেযে অবস্থা আরো কাহিল হয়ে পড়ল। যেন তরল আগুন নেমে গেল গলা বেয়ে। মাত্র দু বোতল জলের দিকে আরক্ত নয়নে তাকিয়ে রইলেন অভিযাত্রীরা। সে জলও তেতে উঠেছিল রোদের ঝাঁঝে। তবুও তো জল! কিন্তু স্পর্শ কবার সাহস কারো হল না। ধূ-ধূ মরুভূমি। সম্বলের মধ্যে ঐটুকু জল!

এদিকে অনুতাপে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগলেন ফাবগুসন। কেন তিনি গ্যাস তৈরী করতে গিয়ে জল নষ্ট কবলেন? এই ৬০ মাইল না এলে যা জল থাকত তা দিয়ে আরও ন'দিন চালানো যেত। কেন তিনি জলের আশায় মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিযে ভাঁড়াবেব জল নষ্ট কবলেন? ভার ফেলে দিলেই তো হতো—নামবার সময়ে না হয খানিকটা গ্যাস ছাড়তে হত! কিন্তু গ্যাস যে বেলুনেব প্রাণ—তা কি ছাড়া যায়?

কেনেডি আব জো তখন আচ্ছন্নেব মত বসে। কোনো দিকে হুঁশ নেই।

ফারগুসন ভাবলেন, শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক। মেশিনে তাপ দিযে দিয়ে তিনি বেলুন তুলতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বেলুন উঠে এল বহু ওপরে। কিন্তু জোরালো বাযুস্রোতের সন্ধান মিলল না।

এদিকে শেষ হয়ে গেল জল! মরুভূমিব একমাত্র পাথেয় জল—যেটুকু জল ছিল—তাও ফুরিয়ে গেল! জলেব অভাবে বন্ধ হযে গেল ইলেকট্রিক মেশিন। ধীবে ধীরে নেমে এল ভিক্টোরিয়া। যেখান থেকে উঠেছিল, নামল ঠিক সেইখানেই।

তখন দুপুর। সূর্য মাথার ওপবে। ফারগুসন হিসেব কবে দেখলেন, সেখান থেকে চ্যাড হ্রদ প্রায় ৫০০ মাইল, আফ্রিকাব পশ্চিম উপকূলও প্রায় ৪০০ মাইল!

বেলুন বালি স্পর্শ করতেই ঘোব কেটে গেল কেনেডি আর জো'র।

তিনজনেই নেমে পড়লেন বেলুন থেকে। সমান ওজনের বালি তুলে

বেলুনে রাখতেই বেলুন অনড় হল। রাত্রে মাখন বিস্কুট বার করল জো। কিন্তু খাবার স্পৃহা কারোরই ছিল না। এক এক গণ্ডুষ গরম জলে গলা ভিজিয়ে শেষ করলেন রাতের খাওয়া।

পরদিন সকালে দেখা গেল আর মাত্র আধসেরটাক জল আছে খাবার জন্যে। ফারগুসন তা সরিয়ে রাখলেন।

কিছুক্ষণ পরে ১৪০ ডিগ্রী তাপে ককিয়ে উঠল জো—"বাবাগো! আমার যে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে!"

ফারগুসন সাহস দিতে লাগলেন। বললেন—"মরুভূমিতে বেশি গরম পড়লে ঝড়বৃষ্টি হয়। কাজেই মাভৈঃ।"

কিন্তু এ আশ্বাসে কাজ হল না। নির্মেঘ রোদ্দুর-ঝকঝকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুক কাঁপতে লাগল কেনেডির। ধীরে ধীরে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলেন তিনি।

আবার এল রাত। ফারগুসন ভাবলেন, খানিকটা হাঁটলে হয়ত এই বিকারের ভাবটা চলে যাবে। ডাক দিলেন সঙ্গীদের। কিন্তু কেউ এলো না।

কেনেডি বললেন—"আমি একপাও চলতে পারছি না।"

জো বললেন—"আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

অনেক পীড়াপীড়ি করেও যখন কাজ হল না তখন ফারগুসন একাই বেরোলেন, হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গেলেন। তারপর এক সময়ে মাথা ঘুরে গেল। সেই ভীষণ নিস্তব্ধ মরুভূমির তারা বসানো কালো আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনে। ফারগুসন জ্ঞান হারালেন।

বালির ওপর লুটিয়ে পড়ার আগে বুঝি বার দুয়েক আর্ত চীৎকার করে সঙ্গীদের ডেকেছিলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলেন, মুখের ওপর উদ্বিগ্ন ভাবে ঝুঁকে রয়েছে প্রভুভক্ত জো।

সেই রাতেই জো প্রস্তাব করলে মনিবের প্রাণরক্ষার জন্যে সে প্রাণ দেবে। কিছু খাবার নিয়ে হেঁটে রওনা হবে যে দিকে দুচোখ যায়। যদি কোথাও জল পাওয়া যায়, নিয়ে ফিরে আসবে। নইলে আর ফিরবে না।

কিন্তু এ প্রস্তাবে ফারগুসন রাজী হলেন না।

ভোর হল। ব্যারোমিটার পরীক্ষা করে হতাশ হলেন ফারগুসন। ঝড় আসার কোনো লক্ষণই নেই বায়ুমান যন্ত্রে, নেই আকাশে বাতাসে। সূর্য তেমনি জ্বলন্ত, বালি তেমনি গনগনে, আকাশ তেমনি নির্মেঘ।

তখন বেলুনেও রাখা সামান্য জলটুকুর জন্যে উন্মাদ-প্রায় হয়ে উঠলেন তিন অভিযাত্রী। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেনেডি, দারুণ তেষ্টায় তাঁর

গলায় আর জিবে এমন ঘা হয়ে গেছিল যে কথাও বলতে পারছিলেন না। থেকে থেকে একটা অমানবিক ভাব জেগে উঠতে লাগল তিনজনের মধ্যে। তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগলেন পরস্পরের পানে!

অবশেষে ক্ষেপে গেলেন কেনেডি। জল…জল…একফোঁটা জল। অস্থির ভাবে একবার তিনি বালিতে নামতে লাগলেন, আবার গনডোলায় উঠতে লাগলেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিজের আঙুল কামড়ে ধরলেন। ছুরী থাকলে শিরা কেটে রক্ত পান করতেও তখন তিনি দ্বিধা করতেন না!

কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ শক্তিবিন্দুটুকুও নিঃশেষ করে লুটিয়ে পড়লেন কেনেডি। বিকেলের দিকে বৃদ্ধি পেল উন্মত্ততা। বুদ্ধিনাশ হল জো'র। বিকারের ঘোরে সামনে ঠাণ্ডা জলের সরোবর দেখে গরম বালিতে লাফিয়ে পড়েই ছটফটিয়ে উঠল ফোস্কার জ্বালায়। কখনো বা বালির মধ্যে মুখ গুঁজে গোঙাতে লাগল অকথ্য যন্ত্রণায়।

ফারগুসন আর কেনেডি তখন মড়ার মত পড়ে। জো আর সহ্য করতে না পেরে অতিকষ্টে কোন মতে বুকে হেঁটে গিয়ে জলের বোতলটা নিয়ে সবে চুমুক দিয়েছে, এমন সময়ে চোখ খুললেন কেনেডি।

টলতে টলতে মূর্ছিতের মত কাছে এসে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"জো ··আমাকে দাও ··আমাকে!"

জো তখন আত্মবিস্মৃত। ঢক ঢক করে জল খেয়েই চলেছে।

কেনেডি আবার ভীষণ ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন—"একটু দাও·· জো···কথা শোনো· একটু দাও···একফোঁটা জল· উঃ মরে গেলাম·· বাঁচাও· বাঁচাও··· তোমার পায়ে পড়ি···জো··!"

বিনা বাক্য ব্যয়ে জলের বোতলটা কেনেডির হাতে তুলে দিল জো। ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল তার দুই চোখ বেয়ে!

॥ ১৮ ॥

সে রাতে তিন জনের কারোরই সংজ্ঞা রইল না। সকাল হল। আবার শুরু হল অনলবর্ষণ। আবার যেন দাউ দাউ করে দাবানল জ্বলতে লাগল আকাশে বাতাসে বালিতে। নিদারুণ হলকায় মূর্চ্ছাভঙ্গ হল কেনেডি আর জো'র। দুজনেরই মনে হল, যেন পায়ের আঙুল থেকে শুরু করে সমস্ত দেহটা পুড়ছে। অপরিসীম অবর্ণনীয় সেই যন্ত্রণার বুঝি আর কোনো তুলনা নেই।

ফারগুসন কিন্তু কাঠের পুতুলের মত বসেছিলেন বেলুনের মধ্যে। দুই

চোখ তাঁর সুদূর দিগন্তে নিবদ্ধ। দুই হাত বুকের ওপব রাখা, সারা শরীর নিশ্চল—যেন পথের কুঁদে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি!

কেনেডি আর সহ্য কবতে পাবলেন না। হঠাৎ চোখ পড়ল বন্দুকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে গিযে বন্দুকেব নলটি ঢুকিয়ে দিলেন নিজের মুখেব মধ্যে।

ট্রিগাব টিপতে যাবেন কেনেডি, এমন সময়ে জো এসে বাধা দিলে। আরম্ভ হল টানা হ্যাঁচড়া, চেঁচামেচি, অবশেষে মল্লযুদ্ধ। কেনেডি আত্মঘাতী হয়ে সব জালা জুড়োবেনই। কিন্তু জো বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই সম্ভব হবে না। ক্ষিপ্তেব মতো বন্দুক আঁকড়ে ধবে ঝটাপটি কবতে লাগলেন দুজনে।

ফারগুসন কিন্তু তখনও লৌহমূর্তিব মত নিশ্চল নির্বিকাব—দৃষ্টি দূব দিগন্তে নিবদ্ধ।

আচমকা হাত থেকে ছিটকে পডল বন্দুকটা এব মাটিতে পডতেই প্রচণ্ড শব্দে গুলী বেবিয়ে গেল।

বন্দুক নির্ঘোষে সম্বিৎ ফিবে এল ফারগুসনেব। আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন জলন্তঙ্গীব কণ্ঠে—"দেখ চেযে দেখ ওই হোথায়!"

ফাবগুসনেব অস্বাভাবিক স্ববে যেন যাদু ছিল। নিমেষে কুস্তি থামিয়ে চোখ তুললেন কেনেডি আব জো। আকাশেব পানে তাকিয়েই যেন সম্মোহিত হযে গেলেন।

ঝড আসছে। মরুঝড। সমস্ত মরুভূমি যেন আচমকা জীবন্ত হযে উঠেছে, উদ্দাম হযে উঠেছে, আনন্দে উল্লোল তাথৈ তাথৈ নৃত্য জুড়েছে। পাহাড়েব মত উঁচু ঢেউ তুলে ছুটে আসছে বালিব সমুদ্র। দেখতে দেখতে ঝটিকা সংক্ষুব্ধ মরুসমুদ্রের বালুকাবাশি ছেযে ফেলল সাবা আকাশ। ঢাকা পডে গেল সূর্য।

আব ধক ধক করে জ্বলতে লাগল ফাবগুসনেব দুই চোখ—"আসছে আসছে মরুঝড আসছে।"

উন্মাদের মত অট্টহাসি হেসে কেনেডি বললেন—"আসছে আসছে আমাদের শেষ কবে দিতে যম আসছে।"

ফাবগুসনও ততক্ষণে গনডোলাব বাডতি ওজনগুলো ছুঁডে ছুঁডে ফেলে দিচ্ছেন বাইবে। কেনেডিব কথায বললেন—"যম নয়, ডিক। বন্ধু! আমাদেব প্রাণ বাঁচানোব জন্যেই এসেছে পরম সুহৃদ এই মরুঝড। নাও—হাত লাগাও। চটপট বেলুন হাল্কা করে দাও। ফেলো পঞ্চাশ পাউণ্ড।"

দ্বিরুক্তি না কবে পঞ্চাশ পাউণ্ড সোনা নিক্ষেপ কবল জো। দেখতে দেখতে

সেই বিপুল বালুকা সমুদ্র ধেয়ে এল অতি কাছে। সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেলুনের ওপর এবং মুহূর্তের মধ্যে বাতাসের টানে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলল ভিক্টোরিয়া।

"জো···আরো সোনা ফেলো···আরো ওজন কমাও···আরো···আরো!" ফারগুসনের মুখের কথা খসতে না খসতেই আরো তাল তাল সোনা বাইরে ফেলে দিলে জো। নিমেষে হাল্কা হয়ে গেল ভিক্টোরিয়া, এক লাফে উঠে গেল গরম বায়ু প্রবাহের উর্ধ্বে এবং বালির ঝড়ের ওপর দিয়ে খসে পড়া তারার মতই ধেয়ে চলল।

বেলা তিনটে নাগাদ ঝড় থামল। আকাশ তখন শান্ত, স্নিগ্ধ। নীচে দেখা গেল এক মনোহর দৃশ্য।

বেলুন ভাসছে সবুজ শ্যামল জমির ওপর। বাতাসের তাড়া খেয়ে বালি এসে জমা হয়েছে হেথায় সেথায়—যেন ছোট ছোট অগুন্তি বালির পাহাড়।

খানিকটা গ্যাস ছেড়ে দিয়ে বেলুন নামিয়ে আনলেন ফারগুসন।

বললেন—"মরুঝড়ের কেরামতিটা দেখলে? চার ঘণ্টায় প্রায় ২৪০ মাইল উড়িয়ে নিয়ে এল!"

লাফিয়ে নেমে পড়লেন কেনেডি আর জো। ছুটলেন জলের সন্ধানে। দারুণ পিপাসায় তখন তাঁদের গলা শুকনো, জিব ক্ষতবিক্ষত। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে দৌড়োতে কারোরই খেয়াল রইল না কোন দিকে ছুটেছেন। দৃষ্টি পড়ল না মাটির ওপরে আঁকা বিরাট বিরাট অমানুষিক পায়ের চিহ্নগুলোর ওপর।

অকস্মাৎ বনভূমি কেঁপে উঠল কিসের গর্জনে। থমকে দাঁড়ালেন পিপাসাকাতর দুই অভিযাত্রী। আবার মেঘ ডাকার মত সেই গর্জন। আবার··· আবার! থর থর করে কেঁপে উঠল গাছপালা লতাগুল্ম।

দু চার পা এগুতেই দেখা গেল, একটা তালগাছের নীচে লেজ আস্ফালন করছে প্রকাণ্ড একটা সিংহ। ঝাঁকড়া কেশর দুলছে, ফুলছে। আগুনের ভাঁটার মত ধক ধক করছে দুই চোখ, লক লক করছে জিব! চোখের পলক ফেলার আগেই লাফ দিল পশুরাজ।

এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল পাকা শিকারী কেনেডির হাতের বন্দুক।

অব্যর্থ লক্ষ্য। এক গুলীতেই খতম। প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ে দুচার-বার ছটফট করে স্থির হয়ে গেল কেশরী।

কেনেডির কিন্তু তখন সেদিকে দৃষ্টি নেই। দৌড়ে গেল সামনের কুয়োটার কাছে। শ্যাওলায় পিছিল পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন জলের ওপর।

আঃ কি আরাম! আকণ্ঠ জলপান করলেন কেনেডি। আঁজলায় করে নিয়ে মুখে ছিটোলেন। মাথা আর পা ধুয়ে ফেললেন।

জলপান শেষ করে জো বললে—"করছেন কি, অসুখ করবে যে? চলুন, ডক্টর ফারগুসন জলের আশায় বসে রয়েছেন।"

কেনেডি তাড়াতাড়ি বোতল ভর্তি করে উঠে পড়লেন। কিন্তু কুয়োর মুখে পৌছোনোর আগেই সেখানে আবির্ভূত হল একটা সিংহ।

সিংহনিনাদ শুনেই বোতল রেখে বন্দুক বাগিয়ে ধরলেন কেনেডি। দুই চোখ জ্বলে উঠল তাঁর। বললেন—"জো, এ দেখছি সিংহটার বিধবা বউ। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি?"

চোখের নিমেষে বন্দুকে গুলী পুরে ট্রিগার টিপলেন কেনেডি। জখম হয়ে একলাফে দৃষ্টির আড়ালে সরে গেল সিংহীটা। কেনেডি বেরুতে যাচ্ছিলেন। জো তাঁকে আটকে রাখল। বলল—"সিংহী কিন্তু এখনো মরেনি। কাছেই ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। দাড়ান।"

বলে, জামা খুলে নিজের বন্দুকের নলচেতে বেঁধে তুলে ধরল কুয়োর বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হুংকার ছেড়ে নলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আহত সিংহী এবং তৎক্ষণাৎ আবার দড়াম করে গর্জে উঠল কেনেডির বন্দুক।

বন্দুক সমেত জো-র ওপর গড়িয়ে পড়ল সিংহী। প্রচণ্ড ধাক্কায় জো নিজেও ধুপোকাৎ হল। শেষ আঘাত দেওয়ার জন্য জো-কে লক্ষ্য করে বিরাট থাবা তুলল সিংহী। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে চোখ মুদল জো।

ঠিক এই সময়ে আবার শোনা গেল বন্দুকনির্ঘোষ। পাতকুয়োর মধ্যেই গম গম করতে লাগল পশুরাজের বিধবা বউয়ের যন্ত্রণা-বিকৃত ভয়াবহ আর্তনাদ। তারপর শেষ হয়ে গেল সব কিছু।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল জো। দৌড়তে দৌড়তে বেলুনের কাছে ফিরে এসে ফারগুসনের হাতে তুলে দিলে জলের বোতল।

পরদিন সকালেও সুবাতাস পাওয়া গেল না। অভিযাত্রীদের দুর্বল শরীর তখন অনেকটা সুস্থ। মনের আর দেহের শক্তি ফিরে আসছে আস্তে আস্তে। তাই দুপুরেরই যাত্রার আয়োজন করলেন ফারগুসন। বেলুনকে হাল্কা করার জন্যে আরও কিছু সোনার তাল ফেলে দিতে হল এবং বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল বেচারী জো-র।

তার পরের দিন ভোরের দিকে আবার ঝড় এল। প্রবল বাতাসে আবার নক্ষত্রবেগে উড়ে চলল বেলুন। দেখতে দেখতে মরুভূমি পড়ে রইল পেছনে। ভিক্টোরিয়া এসে পড়ল একটা হ্রদের ওপর।

হ্রদের তীরে ষাঁড় আর হাতীর দল দেখে হাত নিশপিশ করতে লাগল শিকারী কেনেডি সাহেবের। কিন্তু বেলুন চলতে লাগল। দেখা গেল কত শত জলধারা এসে পড়েছে হ্রদের জলে। রঙবেরঙের হরেকরকম পাখী কলকাকলিতে চারপাশে মুখর করে উড়ছে এ-গাছ থেকে সে-গাছে, এ পাহাড় থেকে সে-পাহাড়ে।

সন্ধ্যের দিকে একটা গাছের ডালে বেলুনের নোঙর বাঁধলেন ফারগুসন। রাত ভোর হলে জোর হাওয়ায় বেলুন ছুটে চলল মিনিক পর্বতের জোড়াচূড়োর দিকে। কিছুতেই গতি পরিবর্তন করতে না পেরে অগত্যা গ্যাস গরম করতে লাগলেন ফারগুসন। দেখতে দেখতে ৮০০০ ফুট ওপরে উঠে গেল ভিক্টোরিয়া। দারুণ শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে কম্বল জড়িয়ে বসলেন অভিযাত্রীরা।

পাহাড় পেরিয়ে এল বেলুন। সন্ধ্যের সময়ে নোঙর করা হল একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে।

ভোর হল। ছাড়া হল বেলুন। অচিরেই ভিক্টোরিয়া এসে পৌঁছোলো মোসেইয়া নগরের কাছে।

ভারী সুন্দর এই মোসেইয়া নগর। দু দিকে খাড়া পাহাড়। একদিকে বাগান। আর একদিকে কাদা ভর্তি জলাভূমি। নগরের প্রবেশ পথ একটিই। প্রধান শেখ তখন সেই পথেই আসছিলেন শোভাযাত্রা করে। অশ্বারোহীরা পরেছে রঙীন পোষাক, পুরো ভাগে বাজছে বাঁশ। তারও সামনে একদল অস্ত্রধারী পুরুষ গাছপালা কেটে পথ পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলেছে।

ইচ্ছে করেই শোভাযাত্রার ওপর বেলুনে নামিয়ে আনলেন ফারগুসন। তাই দেখে দারুণ আতংকে চম্পট দিল শেখের সাঙ্গপাঙ্গরা। শেখ পালালেন না। লম্বা বন্দুকে গুলী পুরে ঘোড়ায় বসে রইলেন অনড় দেহে।

শ দেড়েক ফুট ওপর থেকে আরবী ভাষায় শেখকে সাদর সম্ভাষণ করলেন ফারগুসন। দৈববাণী শুনে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন শেখ—সটান শুয়ে পড়লেন মাটিতে—জানালেন ভক্তি-ঘন প্রণাম।

কেনেডি বললেন—"ফারগুসন, আমাদের আগে কি এখানে কোনো ইংরেজ এসেছিলেন?"

"এসেছিলেন বৈকি! মেজর ডেনহামের সব কিছু লুঠ হয়ে গেছিল এই অঞ্চলে। কোনো রকমে একটা ঘোড়ার পেটের তলায় লুকিয়ে প্রাণে বেঁচে যান সে যাত্রা।"

"আমরা যাচ্ছি কোন দিকে?"

"বাৰ্ঘিমি রাজ্যের দিকে। ভোগেল এসেছিলেন সেই দেশে। কেউ বলে, উনি নাকি ওখানেই খুন হন। মতান্তরে, বন্দী অবস্থায় ছিলেন আমৃত্যু।"

সারি নদীর ওপর দিয়ে এল বেলুন। কিছু দূরে দেখা গেল আর একটা শহর।

জো জিজ্ঞেস করলে—"এটা আবার কি নগর?"

"কার্ন্যাক। প্রামাণিক টুলির গর্দান গেছিল এই শহরে। এদেশকে ইউরোপের কবরখানা বললেও চলে!"

কার্ন্যাকের ওপর এসে পৌছোলো বেলুন। বহু নীচে গাছের ডালে নতুন বোনা কাপড় ঝুলিয়ে দপাদপ শব্দে পিটছে কাফ্রি তাঁতীরা। চওড়া রাজপথের দুধারে সারি সারি বাড়ী সুন্দর ভাবে সাজানো। এক জায়গায় ক্রীতদাস বিক্রী হচ্ছিল। আকাশচারী বেলুন দেখে আর্ত চীৎকার করতে সবাই দৌড়োলো যে যেদিকে পারে।

আরও নীচে বেলুন নামালেন ফারগুসন। দেখা গেল, একটা নীল নিশান নিয়ে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াল নগরপাল। ত্রিভুবন কাঁপিয়ে বাজতে লাগল উদ্ভট সব বাজনা। শিঙে ফোঁকার আতীব্র আওয়াজে ঝালাপালা হয়ে গেল কান। আবও দেখা গেল সৈন্যরা জড়ো হচ্ছে। উদ্দেশ্য: বেলুনের সঙ্গে লড়াই করা।

নানা রঙের রুমাল নেড়ে জো ইসারা করল। কিন্তু সে ইসারা কেউ বুঝল না। নগরপাল সৈন্যদের কি যেন বলতে লাগলেন। ফারগুসন এইটুকু বুঝলেন যে এ অঞ্চল ছেড়ে তাঁদের মানে মানে সরে পড়তে বলা হচ্ছে।

এ হেন বদলোকদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারলেই বাঁচতেন ফারগুসন। কিন্তু কিন্তু বাতাস কই? বাতাসের অভাবে বেলুন আর নড়ল না!

রেগে গিয়ে লম্ফঝম্প শুরু করে দিল নিগ্রোরা। সব চাইতে বেশি তর্জন গর্জন করতে লাগল নগরপালের পারিষদরা। অদ্ভুত তাদের পোষাকের বাহার। এক-একজনের অঙ্গে পাঁচ-ছটা করে জামা।

ফারগুসন বললেন—"যে পারিষদের ভুঁড়ি সব চাইতে বড়, জামার সংখ্যাও সব চাইতে বেশি, বুঝতে হবে রাজসভায় তার পদমর্যাদাই সব চাইতে বেশি। এই কারণেই যারা পেটমোটা নয়, তারা নানা রকম কায়দায় ভুঁড়ি বানিয়ে লোকের সামনে হাজির হয়!"

অত হুংকারের পরও ভয় পেয়ে যখন বেলুন-রাক্ষস চম্পট দিল না, তখন কাফ্রি-তীরন্দাজরা সারি সারি দাঁড়িয়ে লক্ষ্যস্থির করল। ফারগুসন তখন গ্যাস গরম করে চলেছেন, অত্যন্ত মন্থর গতিতে বেলুন ওপরে উঠছে। এমন

সময় নগরপাল নিজেই একটি বন্দুক বাগিয়ে ধরে বেলুনকে তাগ করছে দেখে কেনেডি এক গুলীতে ভেঙে দিলেন তার বন্দুক। আচমকা এই দুর্দৈবে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল নিগ্রোরা।

রাত নামল। কিন্তু তখনও বাতাস এল না। নগরের শ'তিনেক ফুট ওপরে নিঃশব্দে ভাসতে লাগল ভিক্টোরিয়া। নগরেও আলো জ্বলল না, কোথাও কোন শব্দ শোনা গেল না। এমন কি দারুণ আতংকে ঘর ছেড়ে রাস্তাতেও কেউ বেরোলো না।

রাত দুপুরে আচম্বিতে দেখা গেল কার্নাক শহরে আগুন লেগেছে। ভাল করে দেখতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অভিযাত্রীরা। আগুন নয়। যেন অসংখ্য হাউই আর তারাবাজি নগরের বিভিন্ন স্থান থেকে অগণিত অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে ওপরে উঠছে!

সেই সঙ্গে রাতের নৈঃশব্দ খান খান হযে ভেঙে গেল বুক কাঁপানো হট্টগোলে। বিকট চীৎকার আর মুহুর্মুহু বন্দুকধ্বনির মধ্যে হাউই আর তারাবাজিগুলো যেন বেলুনকে লক্ষ্য করেই ঘুরে ঘুরে উঠে আসছে ওপবে। আসছে! আসছে! আসছে তো আসছেই! সে এক কল্পনাতীত দৃশ্য!

নিকষ রাত্রি যেন শিউরে উঠল অগণিত তারাবাজিব সেই ভযাবহ অগ্নিদৃশ্যে। তার পরেই চমকে উঠলেন কারগুসন।

আতসবাজী নয়, হাউই নয়, তারাবাজী নয—পাযরা! হাজার হাজার পায়রার পুচ্ছে আগুনের পুঁটলি বেঁধে বেলুন অভিমুখে উড়িযে দিয়েছে কাফ্রিরা। উদ্দেশ্য আকাশ-রাক্ষসকে আকাশেই পুড়িযে মাবা।

বিশালকায বেলুন দেখে ভয় পেয়ে গেছিল পায়রাবাহিনী। তাই উড়ছিল এলোমেলোভাবে। অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় হাজার হাজার আগুনের রেখা যেন হিজিবিজি ছবি আঁকছিল। দেখতে দেখতে হিজিবিজি অগ্নিরেখা-গুলো ঘিরে ধরল বেলুনকে। চমকপ্রদ সেই আগুনসাগবে ভাসতে লাগল ভিক্টোরিয়া।

বিপজ্জনক পরিস্থিতি। আর দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ কিছু ওজন ফেলে বেলুন নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন ফারগুসন। ঘণ্টাদুই আকাশ বিহারের পর নেমে গেল পায়রাগুলো।

স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে ফারগুসন বললেন—"বাঁচা গেল। নাও এবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। বেটারা কায়দা বার করেছে ভাল। লড়াই লাগলে এরা এইভাবে শত্রুদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয।"

ভোর হলে ফারগুসন বললেন—"ঠিক, বোধহয় আজই আমরা চ্যাড লেক

দেখতে পাব। ১৮ই এপ্রিল জাঞ্জিবার ছেড়েছি। আজ ১২ই মে। আর দশদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাব আমরা।”

“কোথায় ?”

“তা জানি না।”

সারি নদীর ওপর দিয়ে বেলা নটা নাগাদ চাড হ্রদের দক্ষিণ তীরে এসে পৌঁছোলো ভিক্টোরিয়া।

॥ ২০ ॥

বেলা একটা নাগাদ দেখা গেল কোকানাব। ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠল নগরের সাদা পাথরের পাঁচিল, মসজিদ আর ঘর-বাড়ী। শহরটা ভাল করে দেখার আগেই হঠাৎ একটা বিপরীতগামী বায়ুস্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়ল বেলুন। সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করে বেলুন উড়ে চলল চাড হ্রদের ওপর দিয়ে।

হ্রদের মধ্যে ছোট দ্বীপে বোম্বেটেদের আস্তান। তীর ধনুক নিয়ে তারা বারবাক্রমে বেলুন আক্রমণ করল। কিন্তু বৃথাই। দেখতে দেখতে দ্বীপপুঞ্জ পড়ে রইল পেছনে।

হঠাৎ দেখা গেল বহুদূর থেকে উড়ে আসছে বিশালকায় পাখীর ঝাঁক।

দূরবীনে চোখ লাগিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল ফারগুসনের।

বললেন—“একরকমের বাজপাখী। আকারে খুব বড়। কাছে না এলেই মঙ্গল।”

কেনেডি বললেন—“ঘাবড়াও মাৎ। বেলুনে এত গুলাবারুদ আছে যে কটা পাখীকে যমালয়ে পাঠাতে বেগ পেতে হবে না।”

দেখতে দেখতে কাছে এসে গেল পক্ষীবাহিনী। কর্কশ চীৎকারে বুক কেঁপে উঠল অভিযাত্রীদের। বেলুন দেখে ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল যেন বেজায় রেগেছে তারা।

কেনেডি বললেন—“কি ভীষণ চেহারা! ভাগ্যিস বন্দুক নেই ওদের কাছে।”

ফারগুসন শুকনো হেসে বললেন—‘ডিক, ওদের বন্দুক লাগে না। ওই যে ধারালো ঠোঁট দেখছো, ওই ঠোঁট দিয়েই শত্রুনিপাত করে আত্মরক্ষা করে।”

বেলুনের আরো কাছে এসে পড়ল পাখীর দল। গোল হয়ে উড়তে লাগল চারদিকে। ক্রমশই ছোট হয়ে আসতে লাগল বৃত্ত।

আবও ওপরে উঠল বেলুন।

পাখীরাও উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

কেনেডি বললেন—"এবার চালাই গুলী।"

"খববদার", হাত চেপে ধবলেন ফারগুসন। "ভুলে যেও না, আমরা আট হাজাব ফুট ওপবে বয়েছি। তুমি কটাকে মাববে? চোদ্দটা পাখীর একটাও যদি ধারালো ঠোট দিয়ে বেলুনেব সিল্কেব কাপডটা ছিঁডে দেয়, পবিণামটা কল্পনা কবতে পাব?"

ঠিক এই সময়ে একটা বাজপাখী হাঁ কবে তেডে এল ভিক্টোরিয়াব দিকে।

ফাবগুসন সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠলেন—"ডিক, চালাও গুলী।"

দডাম কবে গজে উঠল কেনেডিব বন্দুক। অতি সাহসী বাজটা গুলীবিদ্ধ হয়ে ঘুবতে ঘুরতে পডতে লাগল নীচে।

ক্ষণেকের জন্যে থমকে গেল বাজেব দল। পব মুহূর্তেই দ্বিগুণ বিক্রমে আক্রমণ করল বেলুন।

আবাব একটা শ্যেনকে নিধন কবলেন কেনেডি। গুলী একটাব ডানা ভেঙে দিলে।

তৎক্ষণাৎ আক্রমণের ধাবা পালটালো বাজ বাহিনী। এক সঙ্গে এগাবোটা পাখী সাঁ কবে উঠে গেল বেলুনেব ওপবেব দিকে—দৃষ্টি পথেব অন্তবালে।

ছাইয়েব মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেনেডিব মুখ। শংকিত চোখে তাকালেন ফাবগুসনেব পানে।

শব্দটা শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে। ছ্যাং কবে উঠল অভিযাত্রীদেব বুক ফব্—ফব্—ফব। ফব—ফব—ফব।

শাণিত চঞ্চুর আঘাতে ছিঁডে গেছে বেলুনেব বেশম আববণ।

মুহূর্তেব মধ্যে নীচেব দিকে নামতে শুরু কবল ভিক্টোরিয়া।

চীৎকাব কবে উঠলেন ফাবগুসন—"গেল! গেল! সব গেল! সর্বনাশ হয়ে গেল! বেলুন ছিঁডে দিয়েছে বাজেব দল! ওজন ফেলো, যত পাবো ফেলো।"

মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই যা কিছু বাডতি ওজন বেলুনের ওপব ছিল সব নিক্ষিপ্ত হল চ্যাড হ্রদেব জলে—জো ব এত সাধেব সোনাব তালগুলোও বাদ গেল না।

তবুও বেলুনের নিম্নগতি বন্ধ হল না।

জলের বাক্স ছুঁডে ফেলে দিলে জো। বেলুন থামল না। প্রতি মুহূর্তে পায়ের তলায় চ্যাড হ্রদের জল দ্রুত থেকে দ্রুততব বেগে উঠে আসতে লাগল অভিযাত্রীদের দিকে।

ভীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন ফারগুসন—"জো, খাবারগুলো ফেলে দাও জলদি।"

সঙ্গে সঙ্গে খাবার বোঝাই বাক্স ধেয়ে গেল জল লক্ষ্য করে। বেলুনের পড়ার বেগ তাতে সামান্য কমল বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হল না।

আবার হাঁক দিলেন ফারগুসন—"আর কি আছে? যা আছে সব ফেলে দাও···সমস্ত ·সব কিছু···ফেলো · ফেলো!"

আকুল কণ্ঠে কেনেডি বললেন—"ফেলবার মত তো আর কিছুই নেই!"

অদ্ভুত স্বরে জো বললে—"কে বললে নেই? আছে···এখনো আছে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে বেলুন থেকে শূন্যে ঝাঁপ দিল জো।

ভয়ার্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন ফারগুসন—"জো· ·জো!"

জো তখন কক্ষচ্যুত উল্কার মত ছুটে চলেছে হ্রদের বারিরাশি লক্ষ্য করে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মেরে চোখের পলকে হাজার ফুট ওপরে লাফিয়ে উঠল বেলুন। বাইরের বেলুনের ছেঁড়া রেশমের ভেতর দিয়ে বাতাস ঢুকে ভিক্টোরিয়াকে উড়িয়ে নিয়ে চলল হ্রদের উত্তর তীরে।

বাষ্পাকুল কণ্ঠে কেনেডি হাহাকার করে উঠলেন—"গেল সব গেল।"

"নিজে মরে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেল প্রভুভক্ত জো।"

জল ভরে উঠল দুই বন্ধুর চোখ। জোকে একবারটি দেখবার জন্যে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নীচে।

কিন্তু জো'কে আর দেখা গেল না!

॥ ২১ ॥

ঝড়ো বাতাসের পাল্লায় পড়ে প্রায় ষাট মাইল পথ এক নাগাড়ে উড়ে এসে অনেক চেষ্টায় ফারগুসন নোঙর গাঁথলেন চ্যাড হ্রদের উত্তর তীরে একটা নির্জন জায়গায়।

রাত ভোর হলে দেখা গেল, চারিদিকে থই-থই করছে শুধু কাদা আর কাদা। তারই মাঝে ছোট্ট একটা শক্ত জমি। বেলুনের নোঙর গেঁথেছে এই শক্ত জমির বিশালাকার গাছের সারির একটি ডালে।

কাদাভর্তি এই প্রান্তর পেরিয়ে বেলুনের কাছে আসা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় বুঝে নিশ্চিন্ত হলেন ফারগুসন। চ্যাড হ্রদের দিকে চেয়ে দেখলেন, দিগন্তব্যাপী জলরাশি ঝিকমিক করছে সূর্য কিরণে, অস্থির-ছন্দে হিল্লোলিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

শোকাচ্ছন্ন স্বরে কেনেডি বললেন—"জো মরে নি, মরতে পারে না। আমার মন বলছে, আবার ও ফিরে আসবে। ও যে ভাল সাঁতারু।"

"ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়, ডিক। এখন এস, দুজনে মিলে ছেঁড়া সিল্কের আবরণটা খুলে ফেলি। তা হলেই প্রায় সাড়ে ছ'শ পাউণ্ড ওজন কমে যাবে!"

চার ঘণ্টা চেষ্টার পর খুলে ফেলা হল বাইরের রেশম আবরণ। দেখা গেল, ভেতরের বেলুনটা অক্ষত রয়েছে!

হাড়ভাঙা খাটুনির পর বাকী দিনটা বিশ্রাম নিলেন দুই বন্ধু। নির্বিঘ্নে রাত কাটল। ভোরবেলা ফারগুসন বললেন—"জো'কে খুঁজে বার করতেই হবে। আমি একটা মতলব ঠিক করেছি।"

"কি মতলব?" শুধোলেন কেনেডি।

"আমরা জলদস্যুদের দ্বীপটা পেরিয়ে আসার পরেই জো জলে লাফিয়ে পড়েছিল, মনে আছে?"

"আছে। সাঁতার দিয়ে যদি সে দ্বীপেও ওঠে, তাহলেও কি বোম্বেটেদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে?"

"আমার বিশ্বাস পারবে। চলো, বেলুন দেখলেই ছুটে আসবে জো।"

"কিন্তু বেলুন তো বাতাসের আজ্ঞাবহ। অন্য দিকে উড়ে যাবে।"

"যাবে না। দেখছ না বাতাসটা হ্রদের দিকেই বইছে। সারাদিন হ্রদের ওপরেই কাটাবো আমরা। সুতরাং জো নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। সঙ্কেতও করবে।"

নোঙর তুলে ভিক্টোরিয়া রওনা হল। জমি থেকে অল্প উঁচুতে বেলুন রাখলেন ফারগুসন! মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ করতে লাগলেন। যেখানেই থাকুক না কেন, শব্দ শুনলেই ঠিক ছুটে আসবে জো। দ্বীপের কাছাকাছি এসে আরো নীচে বেলুন নামালেন ফারগুসন। এত নীচে যে দ্বীপের প্রতিটি ঝোপ পর্যন্ত ছুঁয়ে যেতে লাগল বেলুন। এইভাবে মাঠ বন গুহায় সে সন্ধান করা হল জো-র, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবুও দেখা পাওয়া গেল না।

বেলা ১১টার সময়ে দেখা গেল প্রায় ৯০ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে বেলুন। এদিকে হতাশায় ভেঙে পড়লেন কেনেডি সাহেব। জোর বাতাসে বেলুন এসে পৌঁছোলো ফারম দ্বীপের কাছে। কিন্তু এখানেও আশায় ছাই পড়ল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে মহাউল্লাসে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে বেরিয়ে এল না প্রভুভক্ত জো।

বেলা ২টা নাগাদ বাতাসের গতি পরিবর্তন হল না দেখে মহাভাবনায়

পড়লেন ফারগুসন। আবার কি সেই ভয়াবহ মরুভূমির মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে? ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল তাঁর।

বেলুন তুলতে লাগলেন ফারগুসন। তুলতে তুলতে হাজার খানেক ফুট ওপরে উঠে উত্তর-পশ্চিমগামী একটা জোরালো বায়ু-স্রোত পাওয়া গেল। বেলুন গা ভাসিয়ে দিলে তারই টানে।

কিন্তু জো-র সন্ধান তো পাওয়া গেল না!

রাত্রে এক জায়গায় নোঙর আটকে কাঁদতে লাগলেন দুই বন্ধু। নিরাশায় বুক ফেটে যেতে লাগল। অপরিসীম বেদনায় অশ্রু আর বাধা মানতে চাইল না।

রাত তিনটা নাগাদ ঝড়ো বাতাসে বেলুন কাৎ হয়ে পড়তে লাগল। নোঙর আটকে ছিল বাঁশ বনের জমিতে। তাই প্রবল বাতাসে বারবার এই বাঁশঝাড়ের ওপরেই আছড়ে পড়তে লাগল ভিক্টোরিয়া।

মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন ফারগুসন। ভিক্টোরিয়ার রেশমের আবরণ তখন মাত্র একটি—দুটি নেই। বাঁশের খোঁচায় যদি ফেঁসে যায় সিল্ক, তাহলেই সর্বনাশ!

বললেন—"ডিক, এখানে আর নয়। বেলুন ছাড়।"

কেনেডি নোঙরে টান দিলেন, উঠল না। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নোঙর খুলতে পারলেন না। ঝড়ো বাতাসে বেলুনের টানে মাটিতে এমন শক্তভাবে গেঁথে গেছে নোঙর যে দুই বন্ধুর মিলিত শক্তি প্রয়োগেও তা খুলে এল না। অগত্যা দড়ি কেটে দিলেন ফারগুসন। এক লাফে শ তিনেক ফুট ওপরে উঠে গেল ভিক্টোরিয়া। বায়ুবেগে ছুটতে লাগল উত্তর দিকে। বাতাসের গতি ফিরোনোর বা বেলুনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ফারগুসনের ছিল না। তাই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন তিনি।

ভীষণ ঝড়। জ্যামুক্ত তীরের মত উড়ে চলল ভিক্টোরিয়া। এসে পড়ল বোনাদ-উল-জেরিদ মরুক্ষেত্রের ওপর। এ অঞ্চলে সব সময়েই ঝড় হয়। তখনও হচ্ছিল। দেখতে দেখতে গাছপালার সব চিহ্ন মুছে গেল। শুধু বালি আর বালি! তপ্ত জ্বালাময় নীরস! চোখ টাটিয়ে যায়।

ফারগুসন বললেন—"ডিক, আর আমাদের নামার উপায় নেই। আমরা এখন সাহারা মরুভূমির ওপর দিয়ে চলেছি।"

"সা-হা-রা!

আচম্বিতে দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য!

মরুক্ষেত্রের উত্তর দিকের বালি উড়ছে। ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে উড়ছে।

ঘূর্ণিবায়ু! ঘূর্ণিবায়ু!

দেখতে দেখতে সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্ট বালুকা স্তম্ভের মধ্যে জীবন্ত সমাধি ঘটতে লাগল একদল মরু-পথিকের! যন্ত্রণায় রক্ত-জমানো চীৎকার করতে লাগল উটের দল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল!

পাগলা হাওয়ায় তখনো তাণ্ডব নাচ নেচে চলল সাহারার নিষ্ঠুর বালিরাশি। চিহ্ন রইল না উট আর বণিক দলের। যেখানে ছিল সমতল ভূমি, দেখতে দেখতে সেখানে বালির পাহাড় গড়ে উঠল। আর এই পাহাড়ের গোড়ায় জীবন্ত কবর হয়ে গেল মানুষ আর পশুর।

লোমহর্ষক সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন দুই বন্ধু! বেলুন তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ভীষণ সাহারার ওপর বিপরীতগামী বায়ুপ্রবাহের কবলে পড়ে কখনো তা ঘুরতে লাগল, উড়তে লাগল, ঘুরপাক খেতে খেতেই নক্ষত্র বেগে ছুটতে লাগল!

প্রচণ্ড দুলুনিতে ঝাঁকুনিতে ভেতরে বসে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠল। গড়াগড়ি যেতে লাগল জলের বাক্স। বেঁকে গেল গ্যাসের নল। আচমকা কখন দোলনাটি ছিঁড়ে পড়ে, এই দুশ্চিন্তায় বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল দুই বন্ধুর।

আচম্বিতে দাঁড়িয়ে গেল বেলুন। খেয়ালী বাতাসের গতি পরিবর্তন হল। উল্টোদিকে বইতে লাগল প্রবল বায়ুপ্রবাহ। উল্কার মত ধেয়ে চলল বেলুন।

কেনেডি সভয়ে বললেন—"এ আবার কোন দিকে চললাম?"

"যে দেশ আর কোনো দিন দেখতে পাব না বলে ভয় হয়েছিল, সেই দিকে। সেই চ্যাড হ্রদের দিকে—যেখানে ফেলে এসেছি জো-কে।"

বেলা নটা নাগাদ দেখা গেল দূরে ধূ-ধূ করছে মরুভূমি। কিন্তু চ্যাড লোকের চিহ্ন নেই।

ফারগুসন বললেন—"ঘাবড়াও মাৎ! দক্ষিণ দিকে যাওয়া দরকার, সেই দিকেই চলেছি। আবার বোর্নোউ, কে- - নগরগুলোও পথে পড়বে। দূরবীন নিয়ে বসে থাকো, কিছুই যেন বাদ যায় না।"

॥ ২২ ॥

বেলুন থেকে লম্বা লাফ মেরে চ্যাড হ্রদের গভীর জলে প্রথমে অনেকটা তলিয়ে গেল জো। তারপর ভেসে উঠে দেখলে, অনেক দূরে বেলুন ক্রমশই ওপরে উঠে যাচ্ছে। ছোট হতে হতে অবশেষে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল বিচিত্র বাহন ভিক্টোরিয়া!

মনিবরা প্রাণে বেঁচে গেল দেখে নিশ্চিন্ত হল জো। শান্ত মনে সাহস ফিরে এল। ভাবতে লাগল কি ভাবে সূর্যকিরণে জলন্ত অনন্ত এই জলরাশির মধ্যে থেকে প্রাণটাকে রক্ষা করা যায়।

বেলুন থেকে যে দ্বীপটা দেখা গিয়েছিল, সেই দিকেই সাঁতরে চলল জো। জামাকাপড় যদ্দুর সম্ভব খুলে ফেলে শরীর হাল্কা করে নিলে।

ঘণ্টা দেড়েক একটানা সাঁতারের পর দ্বীপের কাছাকাছি এল জো। এমন সময়ে বাতাসে ভেসে এল কস্তুরির গন্ধ।

নিজের মনেই বলে উঠল জো—"সাবধান জো! কাছেই কুমীর আছে!"

মনে পড়ল, বেলুন থেকেই সে দেখেছে শাল গাছের মত ইয়া লম্বা একটা কুমীর দ্বীপের চারদিকে ভেসে বেড়ায়, নির্বিবাদে রোদ পোহায়। এ তো মহা জ্বালা! জলে কুমীর, আর ডাঙায় মানুষ খেকো মানুষ!

আচম্বিতে সাঁৎ করে কি যেন একটা প্রাণী জল তোলপাড় করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে!

দারুণ চমকে উঠে জো বুঝল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল কুমীরটা।

প্রাণপণে অন্য দিকে সাঁতরাতে লাগল জো। হঠাৎ মনে হল কে যেন পেছন থেকে তাকে ধরেছে। চোখ মুদল জো। বুঝল, সব শেষ!

কিন্তু একি! কুমীরে ধরলে তো জলের নীচে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু জো তো এখনও জলে ভাসছে! ব্যাপার কি?

চোখ খুলল জো। দেখল কাঠকয়লার মত কালো কুচকুচে দুটো নিগ্রো তাকে সাঁড়াশির মত শক্ত আঙুলে চেপে ধরেছে।

তীরের দিকে জো-কে টেনে নিয়ে চলল কাফ্রিরা। জো ভাবল, আকাশ থেকে এরা একে পড়তে দেখেছে নিশ্চয়। তাহলে দেবতাজ্ঞানে জামাই আদরেই রাখতে পারে।

হলও তাই। তীরে উঠতেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিকট চীৎকার করতে লাগল কাফ্রিরা। তারপর সবাই ভক্তি সহকারে তাকে প্রণাম করল। খেতে দিল মধু মিশানো দুধ আর চালের গুঁড়ো। পুজোর পরেই ভোগ নিবেদন! মন্দ কি!

বিনা বাক্যব্যয়ে দুধটুকু মেরে দিল জো। দেখে মহানন্দে নাচতে লাগল ভক্তের দল। সন্ধ্যে হলে গাঁয়ের জাদুকররা সসম্মানে তাকে নিয়ে গেল একটা কুঁড়ের মধ্যে। নানারকম কবচ আর তাবিজ ঝুলছে সেখানে। কাছেই পাহাড়ের মত সঞ্চিত নরকঙ্কাল। বলাবাহুল্য, কাফ্রিদের ভুক্তাবশেষ!

জো-কে বন্দী করা হল সেই কুঁড়ের মধ্যে। বাঁশ দিয়ে তৈরী কুঁড়ের

দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে জো দেখলে তাণ্ডব নাচ নাচছে কাফ্রিরা, সেই সঙ্গে উদ্ভট গান। ভাবল, তবে কি এরা পুজো-টুজো করে দেবতাকেই প্রসাদ মনে করে খেয়ে ফেলে?

মহাচিন্তার ব্যাপার! কিন্তু নিদারুণ ক্লান্তির ফলে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল জো। ঘুম ভাঙল ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে। দেখলে, কেউ নেই, কাফ্রিরা উধাও। হু-হু করে জল ঢুকছে কুঁড়ের মধ্যে।

দেখতে দেখতে জলে ভরে উঠল ঘর। লাথি মেরে ঘরের দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে এল জো। সাঁতার দিতে শুরু করল।

কাফ্রিদের একটা লম্বা ডোঙা বাতাসের টানে ভেসে আসছিল সেই দিকেই। অতিকষ্টে ওপরে উঠে বসল জো। প্রবল জল-স্রোতে আপনা হতেই ভেসে চলল ডোঙা। ধ্রুব নক্ষত্র দেখে জো বুঝল, ডোঙা চলেছে হ্রদের দিকে।

গভীর রাতে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল জো। নেমেই দেখলে একটা বিরাট গাছ ডালপালা মেলে ভূতের মত দাঁড়িয়ে সামনে। চটপট গাছের ডালে উঠে পড়ল জো।

ভোর হতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। নিদারুণ আতংকে দেহের রক্ত জল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। কাঁটা দিয়ে উঠল সর্বাঙ্গে।

দেখা গেল, যে গাছে জো উঠেছে, সে গাছ ভর্তি শুধু সাপ। সরীসৃপ গাছের ডালে, পাতায়, কাণ্ডে, মাটিতে। কিলবিল করছে তারা, হিসহিস করছে, বিষাক্ত চোখ মেলে তাকাচ্ছে এদিকে সেদিকে। জো নড়তেই একসাথে গর্জন করে উঠল কাছের সাপ কটা। সাপ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য জোঁক আর অন্যান্য কীট।

কালবিলম্ব না করে লাফিয়ে পড়ল জো। কুণ্ডলী থেকে আড়মোড়া ভেঙে ফণা তুলল কয়েকটা সাপ। কিন্তু জো ততক্ষণে পগার পার।

অজ্ঞাত জঙ্গল। হুঁশিয়ার হয়ে এগোলো জো। দুপুর নাগাদ খিদে আর তেষ্টায় বেজায় কাহিল হয়ে পড়ল বেচারী। নাম-না-জানা ফলমূল যা পেল, তাই দিয়ে খিদের জ্বালা খানিকটা কমিয়ে আবার রওনা হল। কাঁটায় পা রক্তাক্ত হয়ে গেল, সারা দেহ ছড়ে গেল, থেঁতলে গেল। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সন্ধ্যে নাগাদ এসে পৌছোলো হ্রদের তীরে।

সেখানেও নিস্তার নেই। লক্ষ লক্ষ মশা আর অন্যান্য কীটপতঙ্গ বীরবিক্রমে আক্রমণ করল তাকে। আধ ইঞ্চি লম্বা ভীষণ পিঁপড়ের কামড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কোট আর প্যান্ট। কামড়ের জ্বালায় পাগলের মত এদিকে-সেদিকে ছুটতে লাগল জো। রাত যতই বাড়তে লাগল, ততই শোনা যেতে

লাগল হিংস্র শ্বাপদের গর্জনধ্বনি। নিরুপায় হয়ে রাতটা গাছের ডালে কাটাল জো। খিদেয় তেষ্টায় তখন তার আধমরা অবস্থা।

ভোর হলে হ্রদের জলে স্নান করে গাছের কয়েকটা পাতা খেয়ে আবার রওনা হল জো। অবশেষে আর হাঁটতে না পেরে—অবসন্ন দেহে একটা গাছের শেকড়ের ওপর বসে ভাবছে কি করা যায়, এমন সময়ে হঠাৎ দেখতে পেল গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিষ মাখানো তীর তৈরী করছে কয়েকজন কাফ্রি। নিঃশব্দে একটা ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিল জো।

আর, ঠিক এই সময়ে দেখা গেল বেলুনকে।

দেখা গেল, চ্যাড হ্রদের মাত্র ৭০।৮০ হাত ওপরে আকাশে ভাসছে বিচিত্র ব্যোমযান ভিক্টোরিয়া। কাফ্রিদের বিষবাণের ভয়ে জো চেঁচাতেও পারল না, ঝোপ থেকে বেরিয়ে সঙ্কেতও করতে পারল না। অসহায় অবস্থায় বসে বসে কাঁদতে লাগল ঝর ঝর ধারায়। মনিব আর মনিববন্ধু তাকে উদ্ধার করার জন্যেই যে ফিরে এসেছেন, একথা ভাবতেই আর নিজেকে সামলাতে পারল না জো। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল ঝোপের আড়ালে। কৃতজ্ঞতার অশ্রু বইতে লাগল অঝোরধারে।

কিছুক্ষণ পরে কাফ্রির চলে গেলে দৌড়ে বেরিয়ে এল জো। ছুটতে লাগল হ্রদের তীর বরাবর। কিছুক্ষণ পরে ভিক্টোরিয়াকে আবার দেখা গেল। কিন্তু জোরালো বাতাসের টানে উড়ে গেল পূবদিকে।

উদ্ধশ্বাসে দৌড়োতে দৌড়োতে চীৎকার করে ডাকতে লাগল জো। কিন্তু বেলুন থেকে কেউ শুনতে পেল না।

নিরাশায় বুক ভেঙে গেল জোর। ধপ করে বসে পড়ল মাটির ওপর। আবার উঠে দৌড়োতে লাগল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে। তখন কি হয়েছে আচমকা পাঁকের মধ্যে পড়ে গেল জো।

যতই ছটফট করতে লাগল সে পাঁক থেকে বেরোনোর জন্যে, ততই পা ডুবে যেতে লাগল পাঁকের মধ্যে। দেখতে দেখতে হাঁটু পর্যন্ত গেল ডুবে, তারপর কোমর পর্যন্ত।

জো বুঝল, এইবার তার মৃত্যু অবধারিত। জনহীন বনাকীর্ণ এই অঞ্চলে পাঁকের মধ্যেই জীবন্ত সমাধি লেখা ছিল তার ললাটে।

আর্তকণ্ঠে বার বার চীৎকার করে উঠল জো। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কাতর কণ্ঠ মিলিয়ে গেল শূন্যে। নিবিড় তিমিরে ঢাকা রইল সবকিছু।

॥ ২৩ ॥

সতর্ক চাহনি মেলে চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ বললেন কেনেডি—"দূরে যে রকম ধুলো উড়ছে, মনে হচ্ছে ফৌজ চলেছে। বেশ জোরেই চলছে।"

"ফৌজ কি? ঘূর্ণি বাতাসও তো হতে পারে।"

"উঁহু। আমার তা মনে হয় না!"

"আন্দাজ কদ্দুর?"

"৮।৯ মাইল তো বটেই। ফৌজই বটে…ঘোড়সওয়ার…দেখা যাচ্ছে।"

ফারগুসন এবার দূরবীন চোখে লাগালেন।

বললেন—"বেদুইন বলেই মনে হচ্ছে। কে জানে, হয়ত টিব্বুসও হতে পারে। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, দেখছি ওরাও ছুটেছে সেইদিকে। এখুনি নাগাল ধরে ফেলব আমরা।" বলে কেনেডির হাতে তুলে দিলেন দূরবীন।

কেনেডি বললেন—"ঘোড়সওয়ারদের দুটো দল দেখছি। কারো পাছু নিয়েছে মনে হচ্ছে! ব্যাপার কি বলো তো? কাকে তাড়া করছে ওরা?"

"সবুর! সবুর! ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে গিয়ে এখুনি ওদের নাগাল ধরে ফেলব আমরা।"

"প্রায় জনা পঞ্চাশেক আরব দেখতে পাচ্ছি। হাওয়ায় উড়ছে আলখাল্লা। ফারগুসন! ফারগুসন! একি কাণ্ড! ওরা কি যেন শিকার করছে মনে হচ্ছে।"

"শিকার করছে? মরুভূমির মধ্যে শিকার!"

"আরে, আরে তাই তো। শিকারই তো। মানুষ-মৃগয়া! মানুষ মৃগয়া! কি সর্বনাশ! প্রাণের ভয়ে লোকটা কি জোর ছুটছে দেখেছো।"

"মানুষ শিকার! ডিক। চোখ রাখো ওদের ওপর।"

আচম্বিতে অদ্ভুত গলায় চীৎকার করে উঠলেন কেনেডি—"ফারগুসন! ফারগুসন! একি দেখছি ভায়া!"

"কি হয়েছে? কি দেখছো, ডিক?"

"অসম্ভব! অসম্ভব! না, না…এ কখনো সত্যি হতে পারে না! নিশ্চয় ভুল দেখছি আমি! মরীচিকা দেখছি!"

"ডিক! ডিক! কি দেখছো? বলো শীগগির!"

"এ যে…এ যে…সে-ই!"

"সে-ই! বলো কি?"

"হ্যাঁ, সেই। দেখ, দেখ, বিশ্বাস না হয় দেখ! ঐ দেখ খসে পড়া তারার মত প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে আমাদের জো। জো! জো! শত্রুরা এখনও প্রায় ৮০।৯০ হাত দূরে। ফারগুসন· ফারগুসন।"

ফারগুসনের মুখ থেকে নিমেষে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। আবেগ ঘন কণ্ঠে তিনি শুধু বললেন—"জো ।' গলা দিয়ে আর কোনো শব্দ বেরুলো না।

কেনেডি বললেন—"জো আমাদের দেখতে পায়নি। বাতাসের মত ছুটছে ওর ঘোড়া।"

গ্যাসের তাপ কমাতে কমাতে ফারগুসন বললেন—"এখনি যাতে দেখতে পায়, তার ব্যবস্থা করছি। আর পনের মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব জো'র মাথার ওপরে।"

"বন্দুকের আওয়াজ করব?"

"আরে, না, না। শব্দ শুনে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে শত্রুর

কিছুক্ষণ পরে আবার আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন কেনেডি—"ফারগুসন! ফারগুসন!"

"কি হল? কি হল, ডিক?"

"এইমাত্র ঘোড়া থেকে পড়ে গেল জো। সর্বনাশ হয়ে গেল! আহারে, আহারে, ঘোড়াটাও যে আর নড়ছে না। শেষ হয়ে গেল বুঝি গেল, গেল, সব গেল!"

দূরবীনটা কেড়ে নিয়ে চোখে লাগিয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ফারগুসন—"যায় নি, যায় নি, এখনো যায় নি। জো উঠে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেখতে পেয়েছে। হাত নেড়ে ইসারা করছে। বাঃ বাঃ বাহাদুর! বাহাদুর! সাবাস! সাবাস!"

হিংস্র শার্দুলের মত অপেক্ষা করছিল জো। একজন আরব ডাকাত কাছে আসতেই লাফ দিয়ে তার ঘোড়ার পিঠে উঠে গল টিপে সওয়ারকে ফেলে দিলে বালির ওপর। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে যেন বায়ুবেগে উড়ে চলল বালুকারাশির ওপর দিয়ে।

হুংকার দিয়ে উঠল পেছনের বেদুইন দস্যুরা।

বেলুন তখন জমি থেকে প্রায় তিরিশ ফুট ওপর দিয়ে যাচ্ছে। একজন আরব ঘোড়সওয়ার জো'র ঘোড়ার কাছাকাছি এসে বর্শা তুলতেই গুলী চালালেন কেনেডি। অব্যর্থ লক্ষ্য। পাকসাট খেয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে স্থির হয়ে গেল তার দেহ।

উল্কাবেগে ধেয়ে চলল জো।

বন্দুক নির্ঘোষে থমকে দাঁড়াল একদল আরব। বিশালকায় বেলুন তেড়ে আসছে দেখে সটান শুয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল বালির ওপর। কিন্তু সামনের দলের আরবরা বেলুন দেখতে পায়নি। তাই সমান বেগে ছুটে চলল জো'র পেছনে।

দেখতে দেখতে দেখতে আরবদের মাথার ওপর এসে পড়ল অতিকায় আকাশ-রাক্ষসের মত বিশাল বেলুন। হেঁকে উঠলেন ফারগুসন—"ডিক হুঁশিয়ার!"

"আমি তৈরী।"

দড়ির মই ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উৎলেন ফারগুসন—"জো, মই ধরো।"

জো ঘোড়ার বেগ না কমিয়েই মই চেপে ধরল।

"ডিক, ফেলো ওজন।"

দেড়শ পাউণ্ড হাতের কাছেই সাজানো ছিল। মুহূর্ত মধ্যে তা নিক্ষেপ করলেন কেনেডি। সঙ্গে সঙ্গে মই সমেত জো'কে ঘোড়ার পিঠ থেকে তুলে নিয়ে ভিক্টোরিয়া লাফিয়ে উঠে গেল ওপরে!

ঝুলন্ত মই থেকেই আরবদের উদ্দেশ্যে ভেংচি কেটে চটপট গনডোলায় উঠে এল জো। এসেই আবেগঘন স্বরে 'মাষ্টার, এসেছেন' বলেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল ফারগুসনের দু'হাতের মধ্যে।

জো'কে তখন প্রায় উলঙ্গ বললেই চলে। সারা দেহে অসংখ্য ক্ষত। রক্তাক্ত শরীর। সারারাত সেবাশুশ্রূষার পর সুস্থ হয়ে আপন কাহিনী শোনাল জো। তার প্রথমাংশ আমরা জানি। জো যখন পাঁকে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে, আর্তকণ্ঠে চীৎকার করছে, তখন আমরা তাকে ত্যাগ করে এসেছিলাম। তারপর থেকে জো বললে:

"বেশ বুঝলাম, মৃত্যু অবধারিত। নিস্তব্ধ রাতে কেউ আসবে না আমাকে বাঁচাতে! কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে? হঠাৎ দেখলাম কাছেই পড়ে রয়েছে একগাছা দড়ি। মরিয়া হয়ে তাই চেপে ধরলাম। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেখলাম অপর দিকটা বেশ শক্ত করে বাঁধা। প্রাণের দায়ে তখন এই দড়ি ধরেই টেনে তুলতে লাগলাম নিজেকে। অনেক কষ্টে শেষে উঠে এলাম শক্ত জমির ওপর। এসে দড়িটা কিসের সঙ্গে বাঁধা দেখতে গিয়ে কি দেখলাম জানেন?"

"কি?"

"আমাদেরই বেলুনের নোঙর!"

"ফারগুসন, সেই নোঙরটা। খুলতে না পেরে যার দড়ি কেটে দিয়েছিলাম আমরা," সোল্লাসে বললেন কেনেডি। "তারপর? তারপর?"

"নোঙর দেখে আমার সাহস ফিরে এল। বুঝলাম, আপনারা আমার সন্ধানেই ঘুরছেন। তাই হেঁটেই আবার রওনা হলাম। সারা গা ছেঁচে গেল, পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তবুও থামলাম না। রাত ভোর হল। তখন আর চলতে পারছি না। শরীরে একবিন্দুও শক্তি নেই। এমন সময়ে দেখলাম এক জায়গায় কতকগুলো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে লাফিয়ে উঠলাম একটার পিঠে। ঘোড়া দৌড়োতে লাগল উত্তর দিকে। পথঘাট কিছু বুঝলাম না, কোন অঞ্চলে চলেছি, তাও জানলাম না। ঠায় বসে রইলাম ঘোড়ার পিঠে। পেরিয়ে এলাম কত বাগান, মাঠ, গ্রাম। আমি তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। শেষকালে ঘোড়াটাই নিয়ে এল মরুভূমির মধ্যে। এইখানেই হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলাম একদল বেদুইনের সঙ্গে। আমাকে তাড়া করল ওরা। কেউ কেউ বর্শা ছুঁড়ে খোঁচা মারতে লাগল। বেশ বুঝলাম, আমাকে নিয়ে খেলা করছে ওরা! আমরা যাকে শিকার করা বলি, আমাকে নিয়েও সেই খেলায় মেতেছে। উঃ, সে কি ভীষণ অভিজ্ঞতা! এর পরের ঘটনা তো আপনারা জানেন।"

॥ ২৪ ॥

দু তিন দিন পর বেলুন টিম্বাক্টু নগরের কাছে এল। ভ্রামণিক বার্থ টিম্বাক্টুর যে ম্যাপ এঁকে ছিলেন, তার সঙ্গে শহরটা মিলিয়ে নিলেন ফারগুসন। সাদা বালির ওপর তিন কোণা শহর দূর থেকে দেখতে মন্দ না। কাছে এলে দেখা যায়, সরু সরু রাজপথ, কাঁচা ইটে গাঁথা বাড়ীর সারি, বাঁশ আর খড়ের কুঁড়ে। গোটাতিনেক মসজিদও দেখা গেল।

ফারগুসন বললেন—"এ দেশের মেয়েরা খুব রূপবতী হয়। এককালে এখানে আরও মসজিদ ছিল। একটা ভাঙা কেল্লার পাঁচিলও দেখা যাচ্ছে। একাদশ শতাব্দী থেকে অনেকেই টিম্বাক্টু নগরকে দখলে রাখতে চেষ্টা করে আসছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে এ অঞ্চল যথেষ্ট সুসভ্য ছিল। আহম্মদ বাবার লাইব্রেরীতেই যে ১৬০০ হাতে লেখা পুঁথি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আজ শহরের কি হালই না হয়েছে।

গরমের জন্যে বেলুনের আবরণের ওপর জমানো গাটাপাচা জায়গায় জায়গায় গলে গেছিল। তাই অল্প অল্প গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছিল বেলুন থেকে।

কেনেডি বললেন—"বেলুনটা সারিয়ে নিতে পারলে ভাল হত।"

"তা সম্ভব নয়, ডিক। আমাদের এখন চটপট যেতে হবে। এই কদিনেই

অনেকটা গ্যাস কমে গেছে বেলুনের, বেশি ওপরে উঠতেও পারছি না : সমুদ্রতীর পর্যন্ত যেতে পারব কিনা সন্দেহ। খানিকটা ওজন ফেলে দাও-হাল্কা করে দাও বেলুন।"

সকালে টিম্বাক্টুর ষাট মাইল উত্তরে নাইগার নদীর তীরে এসে পৌছোলো ভিক্টোরিয়া। বেশ কয়েকবার ওপর নীচ করে খামোকা খানিকটা গ্যাস নষ্ট করলেন ফারগুসন, মনের মত বাতাস পেলেন না। দিন দুয়েক পরে জেন্নে, ফেগো ইত্যাদি নগর পেরিয়ে নাইগার আর সেনেগালের মাঝের অঞ্চল এসে পৌছোলেন। জায়গাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মাঙ্গোপার্কের সাঙ্গপাঙ্গর অধিকাংশই মারা গেছিলেন এই অঞ্চলে। কাজেই এ-হেন শত্রু পুরীতে না নামাই মনস্থ করলেন ফারগুসন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অবাধ্য বেলুন নেমে আসছে।

আজেবাজে জিনিসের সঙ্গে কিছু দরকারী জিনিসও ফেলে দিযে বেলুন হাল্কা করলেন ফারগুসন। একটু ওপরে উঠে দু চারটে পাহাড়ের চূড়ো ডিঙিযে গেল ভিক্টোরিয়া। তারপর আবার একগুঁয়ের মত নামতে লাগল।

শশব্যস্তে কেনেডি বললেন—"বেলুনে ফুটো হয়নি তো ?"

"ফুটো নয়, ডিক। গরমের চোটে গাটাপার্চা গলে গেছে। সিল্কের কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তাই গ্যাস বেরিযে যাচ্ছে। জিনিস পত্র সমস্ত ফেলে দিয়ে ভার না কমালে তো পাহাড়ের চূড়োগুলো টপকানো যাবে না।"

"অনেক কিছুই তো ফেলা হল।"

"তাঁবুটা ফেলে দিলেই আরো খানিকটা হাল্কা হওয়া যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে নেমে গেল ভারী তাঁবুটা। কিছুক্ষণের জন্যে ওপরে উঠল বেলুন। তার পরেই আবার শুরু হল অধোগতি।

কেনেডি বললেন—"কোথাও নেমে বেলুনটা মেরামত না করলেই নয়।"

"পাগল নাকি।"

"তা না হলে উপায় কি ?"

"যা না রাখলেই নয়, তাই রাখো। বাকী সব ফেলে দাও। এ দেশের মানুষ বনের পশুর মতই হিংস্র। এখানে কোনমতেই নামা চলবে না।"

সামনে দেখা গেল এক বিশাল পাহাড়। দূরবীন দিয়ে পাহাড় দেখতে লাগলেন কেনেডি। দেখতে দেখতে কাছে এগিয়ে এল পাহাড়ের নগ্ন গা।

হেঁকে উঠলেন ফারগুসন—"খাবার জল ফেলে দাও—শুধু একদিনের মত রাখো।"

জল ফেলে দিয়ে জো বললে—"বেলুন উঠছে কি ?"

"সামান্য। খুব জোর পঞ্চাশ ষাট ফুট। কিন্তু আমাদের যে আরও শ পাঁচেক ফুট ওঠা দরকার। মেশিনের জলটাও ফেলে দাও জো।"

ফেলে দেওয়া হল কলের জল। কিন্তু বৃথাই।

"ফেলে দাও জল রাখবার আধারগুলো।"

কথা শেষ হতে না হতেই তাও নিক্ষেপ করল জো।

ফারগুসন বললেন—"জো, কথা দাও। যাই ঘটুক না কেন, বেলুন ছেড়ে আর লাফিয়ে পড়বে না।"

"কথা দিলাম," বলল জো।

তখনও পাহাড়ের চূড়ো অনেক উঁচুতে। কাঁপা গলায় ফারগুসন বললেন—"হুঁশিয়ার। আর দশ মিনিটের মধ্যেই বেলুন আছড়ে পড়বে পাহাড়ের চূড়োয়। খাবার দাবার কিছু ফেলে দাও।"

পঞ্চাশ পাউণ্ড খাবার নিক্ষেপ করল জো। বেলুন একটু উঠল বটে, কিন্তু চূড়োর নাগাল পেল না।

ফারগুসন বললেন—"ডিক, আর তো কিছুই নেই। ফেলো তোমার বন্দুক।"

"আরে দূর। বন্দুক কি ফেলা যায়।

"ডিক, আর মাত্র পাঁচ মিনিট। ফেলো, ফেলে দাও, নইলে সবাইকে মরতে হবে

চীৎকার করে উঠল জো—"পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়লাম বলে। বলেই কম্বলগুলো ফেলে দিলে সে। বেলুন উঠল না। তখন কতকগুলো বন্দুকের গুলী নিক্ষেপ করলে বাইরে। বেলুন চূড়ো ছাড়িয়ে উঠল বটে, কিন্তু দোলনাটা রয়ে গেল নীচে।

ভয়ার্তকণ্ঠে ফারগুসন বললেন—"কেনেডি, দোহাই তোমার, বন্দুকগুলো ফেলে দাও। মরণ যে এসে পড়ল।"

গভীর স্বরে জো বললে—"সবুর! সবুর!

বলেই, টপ করে দোলনা থেকে নেমে পড়ল পাহাড়ের চূড়োয়। সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা হয়ে দোলনা উঠে এল চূড়োর ওপর। পাহাড়ের গা ঘসে ঘসে এগিয়ে চলল অপর পারে।

জো নেমে পড়তেই ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠেছিলেন ফারগুসন। জো কিন্তু দোলনা ধরে বেলুনের সঙ্গেই দৌড়োচ্ছিল। কুড়িফুট প্রায়-সমতল পর্বতশীর্ষের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসতেই সামনে পড়ল ভীষণ খাদ! নিতল অন্ধকার।

চোখের পলক ফেলার আগেই গহ্বরের ওপর এসে পড়ল দোলনা আর বেলুন। জো গণ্ডোলার দড়ি ধরে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে চীৎকার করে উঠল বিপুল আনন্দে—"মিঃ ডিক যে বন্দুক দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, তা এবার ফিরিয়ে দিলাম।"

বলে, ওপরে উঠে এসে বন্দুকটি কেনেডির হাতে সমর্পণ করল জো।

বেলুন আবার নেমে এল নীচে। প্রায় তিনচারশ ফুট নামার পর সামনে পাহাড়ের সারি দেখে আর এগুতে ভরসা পেলেন না ফারগুসন! রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরের দিন সকালে যাত্রা শুরু করা মনস্থ করলেন।

॥ ২৫ ॥

রাতের আকাশে তারার হাট বসল। নক্ষত্রের অবস্থান দেখে ফারগুসন দেখলেন, সেনেগাল নদী তখনও পঁচিশ মাইল দূর।

বললেন—"যে করেই হোক নদীটা পার হতে হবে। বেলুনে বসেই পেরোতে হবে। কি করে ভিক্টোরিয়াকে আরো হাল্‌কা করা যায় বলো তো?"

কেনেডি বললে—"ফেলে দেওয়ার মত আর যখন কিছুই নেই, তখন একজন নেমে থাকলেই ল্যাটা চুকে যায়।"

জো ফস করে বললে—"তাহলে আমিই নামি। বেলুন থেকে বারবার নেমে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।"

কেনেডি বললেন—"জো, লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়া আর আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া এক জিনিস নয়। তোমার চাইতে আমি বেশি হাঁটতে পারি, তা জানো?"

ফারগুসন বললেন—"কাউকেই নামতে হবে না। নামলে তিনজনেই নামব। ভাবো দেখি আর কি ফেলা যায়।"

মুখ কালো করে কেনেডি বললেন—"আমার বন্দুক—"

"আরে না, না, গ্যাস গরম করার মেশিনটা ফেলে দিলেই তো প্রায় সাড়ে নশ পাউণ্ড ওজন কমে যাবে।"

"বলো কি! তাহলে গ্যাস গরম করব কি দিয়ে?"

"ওটাকে বাদ দিয়েই যেতে হবে, উপায় নেই। বেলুন আমাদের তিনজনকে নিয়ে দিব্বি উড়তে পারবে।"

কাজটা খুবই কঠিন। কিন্তু তিনজনের প্রচেষ্টায় অবশেষে বেলুন থেকে

খুলে এল ভারী মেশিনটা। বেলুনের ওপরের দিকে যন্ত্রের নলগুলো লাগানো ছিল লোহার তার দিয়ে। নির্ভীক জো তর তর করে উঠে গেল বেলুনের দড়ি বেয়ে। সিল্ক না ছিঁড়েই সাবধানে খুলে দিল পাইপগুলো।

রাত গভীর হল। ফারগুসন পাহারা দিচ্ছেন একাকী। বনমধ্যে শোনা যাচ্ছে নিশাচর জানোয়ারের গর্জন। ফারগুসন খুবই চিন্তিত। অঞ্চলটা মোটেই ভালো নয়ত। বর্বর দেশ। বাসিন্দারা নৃশংস।

হঠাৎ চমকে উঠলেন ফারগুসন। বনের মধ্যে কি যেন একটা আওয়াজ শোনা গেল না? চকিতের জন্যে একটা আলো জ্বলে উঠেই যেন নিভে গেল।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলেন ফারগুসন, উৎকর্ণ হয়ে রইলেন আরো শোনার আশায়।

কিন্তু না, আর কোনো শব্দ নেই। আবার রাত নিশুতি, অরণ্য নিস্তব্ধ, প্রকৃতি নিথর।

রাত দুটো নাগাদ কেনেডিকে পাহারায় বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ফারগুসন।

চুরুট ধরিয়ে বসলেন কেনেডি। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম গেছে। তাই ঘুমে চোখ ঢুলে আসতে লাগল। বারবার চোখ রগড়াতে লাগলেন কেনেডি। আর একবার চুরুট ধরালেন। কিন্তু আবার দু'চোখ মুদে এল তার।

হঠাৎ পট পট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কেনেডির।

চোখ মেলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! লেলিহান শিখায় গাছপালা লতাপাতা সবই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে আগুনের সাংঘাতিক হল্কা। ধোঁয়ায় চোখ মেলা যায় না, এমনি অবস্থা। সমুদ্র গর্জনের মত ফুঁসে ফুঁসে উঠছে চারপাশের বিশাল সেই অগ্নিকুণ্ড।

চীৎকার করে উঠলেন কেনেডি—"আগুন! আগুন!"

উঠে বসল জো। অরণ্য মধ্যে শোনা গেল কাফ্রিদের বিজয়োল্লাস।

ফারগুসন বললেন—"হতভাগারা আমাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চায়—!

বেলুনের চারদিকে তখন প্রচণ্ড শব্দে জ্বলছে অতি তীব্র অগ্নিবলয়। কাঠপোড়ার ভয়ানক আওয়াজ, আগুনের বুক কাঁপানো হু হু শব্দের সঙ্গে তালিবা ডাকাতদের বিকট হুংকার শুনে মুহূর্তের জন্য রক্ত হিম হয়ে গেল ফারগুসনের। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন দেখলেন আগুনের একটা লকলকে জিহ্বা বেলুন স্পর্শ করতে এগিয়ে আসছে আর কেনেডি নীচে লাফিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছেন, তখন আর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে ঘ্যাঁচ করে কেটে দিলেন নোঙরের দড়ি। এক লাফে হাজার ফুট ওপরে উঠে এল ভিক্টোরিয়া।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। বেলুন খেয়ে চলল পশ্চিম দিকে।

এই সময়ে দেখা গেল, প্রায় বিশজন ঘোড়সওয়ার তাড়া করেছে ভিক্টোরিয়াকে। স্পষ্ট দেখা গেল তাদের বল্লম আর মাসকেট বন্দুক।

কারগুসন বললে—"এরাই হল এ অঞ্চলের বিভীষিকা—তালিবা ডাকাতের দল। এদেরকে মানুষ-পিশাচ বললেই চলে। বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে জঙ্গলেও থাকা যায়, কিন্তু এদের সঙ্গে একদণ্ডও নয়।"

সবকটা বন্দুকেই কার্তুজ পুরে কেনেডি বললেন -"আমরা কত উঁচুতে রয়েছি, ফারগুসন?"

"৭৫০ ফুট তো বটেই। কিন্তু খুশী হলেই বেলুন মহাপ্রভু নেমে পড়তে পারে। আমাদের কোনো হাত আর নেই। খুশীমত উঠতেও পারব না, নামতেও পারব না।"

"ব্যাটাদের বন্দুকের পাল্লায় পেলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম।"

"ওরাও ছাড়ত না। ওদের গুলীতে বেলুন ফুটো হয়ে গেলে কি বিপদে পড়ব সে খেয়াল রেখো।"

॥ ২৬ ॥

বেলা তখন প্রায় এগারোটা। ডাকাতরা তখনও ছুটে চলেছে বেলুনের পেছনে পেছনে। আকাশে মেঘ দেখলেই বুক দুরদুর করে উঠছে ফারগুসনের। এই বুঝি মেঘের সাথে এল প্রতিকূল বায়ু।

একটু একটু করে নীচে নামছিল ভিক্টোরিয়া। সেনেগাল নদীর তীর তখনো প্রায় মাইল বারো দূরে। এত আস্তে গেলে ঘণ্টা তিনেকের আগে নদী তীরে পৌছোনো যাবে না ভেবে চিন্তিত হলেন ফারগুসন।

ঠিক এই সময়ে ভেসে এল তালিবা ডাকাতদের বিকট উল্লাসধ্বনি।

কেনেডি বললেন—"আমরা তো ক্রমশই নীচে নামছি, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

পনের মিনিটের মধ্যেই প্রায় ছ'শো ফুট নেমে এল বেলুন। কিন্তু নীচে জোরালো বাতাস থাকায় ভেসে চলল দ্রুত বেগে।

তাই দেখে দস্যুরা ঘোড়ার জিনের ওপর দাঁড়িয়ে উপর্যুপরি গুলীবর্ষণ করতে লাগল ভিক্টোরিয়াকে লক্ষ্য করে।

জো বন্দুক তুলে নিয়ে মুখ ভেংচে বললে—"মাস্কেট বন্দুকের গুলী কি এতদূর আসে?" বলেই লক্ষ্যস্থির করে অগ্নিবর্ষণ করল।

পুরোবর্তী তালিবা দস্যু বিকট চীৎকার করে ছিটকে পড়ল ঘোড়া থেকে। রাশ টেনে ধরল বাকী ডাকাতরা। সেই ফাঁকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল ভিক্টোরিয়া।

ফারগুসন বললেন—"ওদের হাতে পড়ার চাইতে না খেয়ে মরাও ভাল। ফেলো খাবার-দাবার যা কিছু আছে!"

আদেশ পালিত হল সঙ্গে সঙ্গে। অনেকখানি নেমে গিয়েও আবার দুলে দুলে খানিকটা উঠে পড়ল বেলুন।

ভেসে এল তালিবাদের রণহুংকার।

আধঘণ্টা পরে আবার নামতে লাগল ভিক্টোরিয়া। সশব্দে সিল্কের কাপড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল বেলুনের গ্যাস।

নামতে লাগল ভিক্টোরিয়া। আরও··আরও···আরও···শেষে গনডোলা এসে ঠেকল জমিতে।

রক্ত জল করা চীৎকার ছেড়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ধেয়ে আসতে লাগল তালিবা বাহিনী।

ভূ-তল স্পর্শ করেই এক ধাক্কায় লাফিয়ে উঠে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল ভিক্টোরিয়া। কিন্তু মাইল খানেক গিয়েই আবার ভূমি স্পর্শ করল।

হেঁকে উঠলেন ফারগুসন—"জো, জো, ব্র্যাণ্ডি ফেলো, যন্ত্রপাতি ফেলো, যা পাও সব ফেলে দাও।"

ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার প্রভৃতি সবই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। কিন্তু বৃথাই। মাত্র কয়েক হাত ওপরে উঠে আবার ভূ-পৃষ্ঠ আশ্রয় করল ভিক্টোরিয়া।

কক্ষচ্যুত উল্কার মত তালিবাদের ধেয়ে আসতে দেখে হাঁক দিলেন ফারগুসন—"ফেলে দাও···ফেলে দাও···বন্দুকগুলো ফেলে দাও!"

কেনেডি বন্দুক আঁকড়ে ধরে বললেন—"ওদের শেষ না করে ফেলব না।"

ঘন ঘন ধমক দিতে লাগল কেনেডির বন্দুক। পাকা হাতের অব্যর্থ নিশানায় অক্কা পেল চারজন তালিবা। বাকী সবাই প্রচণ্ড রাগে গর্জন করে উঠল হিংস্র পশুর মত।

আবার উঠল ভিক্টোরিয়া। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আবার নেমে পড়ল। রবারের বলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল বেলুন।

বারবার ধাক্কায় সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যেতে লাগল গ্যাস। শেষে এমন অবস্থা হল যে বাইরের আবরণের বেশ কয়েকটা জায়গা দেবে গেল, টোল খেয়ে গেল।

কেনেডি বললেন—"বেলুন আর উড়বে না। এস, নেমে পড়া যাক।"

ফারগুসন বললেন—"কে বললে উড়বে না? এখনো দেড়শ পাউণ্ড মত ওজন কমানো যায়।"

কেনেডি ভাবলেন ভয়ের চোটে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে ফারগুসনের। তাই শুরু হয়েছে প্রলাপ বকুনি।

বললেন—"কি আবোল তাবোল বকছ?

"ডিক, গনডোলা ফেলে দাও, তাহলেই দেড়শ পাউণ্ড ওজন কমে যাবে। দড়ি ধরে ঝুলে থাকব আমরা। ফেলে দাও ফেলে দাও আর দেরী না।

গিরিগিটির মত তিন অভিযাত্রী বেলুনের বাইরের আবরণের ওপর পাতা দড়ির জাল বেয়ে উঠে গেলেন ওপরে। দ্রুত হাতে দড়ির বাঁধন কেটে দিল জো। বেলুন নীচে নামতে নামতে অকস্মাৎ একলাফে উঠে গেল শ দিনেক ফুট ওপরে। দোলনাটি আছড়ে পড়ল ভূপৃষ্ঠে।

ওপরে জোরালো বাতাস পেয়ে হাল্কা বেলুন তীরবেগে উড়ে চলল। ক্রমশই পেছিয়ে পড়তে লাগল তালিবাদের ছুটন্ত ঘোড়া। সামনেই পড়ল একটা পাহাড়। খুব উঁচু নয়। অবলীলাক্রমে চূড়োর ওপর দিয়ে চলে গেল ভিক্টোরিয়া। কিন্তু বাধা পেল তালিবারা। তারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল পাহাড় ঘুরে ওপাশে যাওয়ার জন্য।

পাহাড় পেরিয়েই চীৎকার করে উঠলেন ফারগুসন—'নদী! নদী! ঐ দেখো সেনেগাল নদী।"

সত্যি সত্যিই মাইল দুয়েক দূরে সূর্যকিরণে ঝকঝক করছিল সেনেগালের জলস্রোত।

"আর মাত্র মিনিট পনেরো—তারপরেই প্রাণ আমাদের রক্ষে হবে।"

কিন্তু পনেরো মিনিটও শূন্যপথে থাকতে পারল না বেলুন। আস্তে আস্তে নেমে পড়ল জমিতে। ভূমি স্পর্শ করেই এক লাফে আবার উঠে পড়ল শূন্যে। আবার পড়ল আবার উঠল। শেষে একটা গাছের ডালে জড়িয়ে গেল বেলুনের জাল।

চটপট নীচে নেমে নদীতীরে দৌড়ে গেলেন তিন অভিযাত্রী। যেতে যেতেই শুনলেন মেঘগর্জনের মত গুরুগম্ভীর নিনাদ। প্রচণ্ড তোড়ে জল পড়ার কর্ণবধিরকারী শব্দ।

ফারগুসন বললেন—"গুইনা জলপ্রপাত! গুইনা জলপ্রপাত!"

নদীর তীরে এসে পৌঁছোলেন তিনজন। কিন্তু নৌকো বা ডিঙি জাতীয় কিছুই দেখতে পেলেন না।

সাঁতরে সে নদী পেরোনো বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। কেন না, মাইল

দেড়েক চওড়া জলপ্রবাহ ভীমবেগে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পড়ছে প্রায় শ-দেড়েক ফুট নীচে।

কেনেডি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

কিন্তু দমবার পাত্র নয় ফারগুসন। সঙ্গীদের সাহস দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেন পরিত্যক্ত বেলুনের কাছে।

রাশি রাশি শুকনো ঘাসপাতা পড়েছিল সেখানে। ফারগুসন হুকুম দিলেন—"পাহাড়কে বেড় দিয়ে এখানে পৌঁছোতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে ডাকাতদের। কাজেই, যত পার ঘাসপাতা জড়ো করো। বাঁচার এই একটা পথই এখন খোলা আছে।"

"শুকনো ঘাসপাতা! ঘাসপাতা দিয়ে কি হবে?"

"বেলুনের গ্যাস নেই যখন, তখন গরম বাতাস ভেতরে পুরে নদী পেরিয়ে যাব।"

আর কিছু বলতে হল না। পাগলের মত ঘাস সংগ্রহ করতে লাগলেন কেনেডি আর জো।

ফারগুসন ছুরি দিয়ে বেলুনের তলার দিকে একটা বড়সড় ফুটো বানিয়ে নিলেন। ফলে, যেটুকু গ্যাস ভেতরে ছিল, তাও গেল বেরিয়ে।

এবার ফুটোর নীচে জড়ো করা ঘাস পাতায় আগুন দেওয়া হল। গরম বাতাস ঢুকতে লাগল বেলুনের চুপসোনো উদরে। দেখতে দেখতে আবার আগের মতই ঢাউস হয়ে ফুলে উঠতে লাগল ভিক্টোরিয়া।

দুপুর একটা নাগাদ মাইল দুয়েক দূরে দেখা গেল অশ্বখুরে ধুলো উড়িয়ে ধেয়ে আসছে নাছোড়বান্দা তালিবা ডাকাতের দল।

কেনেডি বললেন—"আর বিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওরা।"

অচঞ্চল গলায় ফারগুসন বললেন—"পৌঁছোক। জো, আরো শুকনো ঘাস দাও। আর দশ মিনিট তারপরেই ওদের বোকা বানাব আমরা।"

ততক্ষণে ভিক্টোরিয়ার বিশাল খোল মাত্র অর্ধেক ভর্তি হয়েছে গরম বাতাসে।

ফারগুসন বললেন—"তৈরী হও। আগের মতই বেলুনের জাল ধরে উঠে পড়ো।"

প্রস্তুত হলেন সবাই। শুকনো ঘাসপাতা দাউ দাউ করে পুড়তে লাগল বেলুনের নীচে। হু-হু করে গরম বাতাস ঢুকতে লাগল ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে। বেশ বোঝা গেল, আবার শূন্য পথে পাড়ি জমানোর মত শক্তি সঞ্চয় করেছে ভিক্টোরিয়া।

ডাকাতরা তখন আর মাত্র পাঁচশ গজ দূরে। বিকট উল্লাস-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল তাদের সম্মিলিত বন্দুক নির্ঘোষ।

আগুনের মধ্যে আরও কিছু ঘাস ঠেলে দিয়ে হেঁকে উঠলেন ফারগুসন—"হুঁশিয়ার! আঁকড়ে ধরো জালের দড়ি!"

দুলতে দুলতে গাছের মাথায় উঠে পড়ল বেলুন। আবার গুলীবর্ষণ করল তালিবারা। একটা গুলী কাঁধ ছুঁয়ে গেল জো-র। কেনেডি তখন এক হাতে দড়ি ধরলেন, আরেক হাতে বন্দুক চালালেন। ঘোড়া থেকে ডিগবাজী খেয়ে পড়ল একজন ডাকাত। বেলুন তখন প্রায় আটশ ফুট ওপরে উঠে উড়ে চলেছে। নিষ্ফল আক্রোশে ভয়ানক সোরগোল শুরু করে দিল ডাকাতরা।

কপাল ভাল। ওপরে জোরালো বাতাস ছিল। ভীষণ ভাবে দুলতে দুলতে বায়ুপ্রবাহে গা ভাসিয়ে পরপারের দিকে উড়ে চলল ভিক্টোরিয়া। ফারগুসন নীচে তাকিয়ে দেখলেন, মেঘ ডাকার মত গর্জন করতে করতে সেই ভয়ংকর জলধারা লাফিয়ে পড়ছে দেড়শ ফুট নীচে।

বেলুন জলপ্রপাত পেরিয়ে এল দশ মিনিটের মধ্যেই। পারের কাছাকাছি এসে জলের মধ্যে ভিক্টোরিয়া নামতেই তিন জনেই ঝাঁপ দিলেন জলে।

ফরাসী উপনিবেশের কয়েক জন সৈন্য তীরে দাঁড়িয়ে ভয়ে বিস্ময়ে দেখছিল এই আশ্চর্য দৃশ্য। তারাই জলে নেমে টেনে তুললে অভিযাত্রীদের। বেলুন দুলতে দুলতে চোখের পলক ফেলার আগেই হারিয়ে গেল গুইনা জলপ্রপাতের মধ্যে।

ফরাসী লেফটেনান্ট সাদরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ফারগুসনকে শুধোলেন—"আপনিই কি ডক্টর ফারগুসন?"

"হ্যাঁ, আমিই ফারগুসন। এঁরা আমার সঙ্গী। একই বেলুনের অভিযাত্রী।"

"কেল্লায় চলুন! আপনাদের এই অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী আমি আগেই খবরের কাগজে পড়েছি।"

সহযাত্রীদের নিয়ে ফরাসী কেল্লা অভিমুখে রওনা হলেন ফারগুসন।

কাহিনীরও শেষ এইখানে।

ফিল্মে 'হপ্তা পাঁচেক বেলুন চেপে'

"ফাইভ উইক্স্ ইন এ বেলুন" ফিল্মটি যখন ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আমেরিকায় প্রথম মুক্তিলাভ করে, তখন 'পিরামিড পেপারব্যাক পকেট বই' সংস্করণে সম্পূর্ণ কাহিনীটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে ১০ লক্ষ কপি নিঃশেষ হয়ে যায়।

১১২ বছর আগে ১৮৬২ সালে প্রখ্যাত লেখক জুল ভের্ণ তাঁর প্রথম উপন্যাস "ফাইভ্ উইক্স্ ইন এ বেলুন" প্রকাশ করেন। জুল ভের্ণ-এর শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে ১৯৬২ সালে চিত্র-প্রযোজক আরউইন অ্যালেন টোয়েনটিয়েথ সেনচুরী-ফক্সের স্টুডিওতে সিনেমাস্কোপে ডিলুক্স রঙীন ফিল্মে উপন্যাসটি সিনেমায়িত করেন।

কাহিনীটি সোজাসুজি দুঃসাহসিক কল্পনারঙীন। ভের্ণের পরবর্তী উপন্যাস-গুলিতে সায়ান্স-ফিকশ্যনের যত উপাদান দেখা যায়, এ গল্পে তা নেই। পাঁচজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা আফ্রিকার ওপর দিয়ে ৪০০০ মাইল বেলুন-ভ্রমণের যে উদ্দাম দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তারই নিখুঁত বর্ণনা এই ফিল্মটি। কি-হয় কি হয় মনের ভাব গোড়া থেকেই জাগে আর ক্রমশঃ রুদ্ধশ্বাসী হতে থাকে এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা জানজিবার থেকে হেজ্জাক, সেখান থেকে টিমবকটু, তারপর গোল্ড কোস্টের দিকে এগুতে থাকে—তারা চলেছে সেখানে বৃটিশ পতাকা রোপন করতে—সে-দেশ ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাওয়ার আগেই এই কাজ তাদের সারতেই হবে।

ছবিটির প্রযোজক আরউইন অ্যালেন এটির পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার হিসাবেও কাজ করেছেন। এর আগে তাঁর আরো তেরো খানি ছবিতে এই ভাবেই তিনটি দায়িত্ব একাই পালন করেছেন তিনি। ১৯৫২ সালে তিনি ওদেশের অ্যাকাডেমী পুরস্কার লাভ করেছেন।

১৯৬২ সালে যখন সারা জগতে ভের্ণের প্রথম উপন্যাসের আন্তর্জাতিক শতবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছিল, তখন উপন্যাসটির ছায়াচিত্ররূপটি মুক্তিলাভ করে। উৎসব উপলক্ষ্যে ঐ বছর ৩রা জানুয়ারী লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার উদ্যোগে একদল বৃটিশ বেলুনিস্ট ভের্ণের গল্পে বর্ণিত কায়দায় একটি বেলুনে চেপে আফ্রিকা পার হবার সত্যিকারের অভিযান শুরু করেছিলেন। ঝড়ের জন্যে তাঁরা মাত্র ৪০০ মাইল এলোমেলো ওড়বার পর অভিযান খতম হয়ে যায়। অভিযাত্রীরা প্রযোজক অ্যালেনকে

এক চিঠিতে লেখেন: "ভের্নের পক্ষে লেখা যত সহজ হয়েছিল, ওবকম ভাবে সত্যি সত্যি আকাশপাড়ি দেওয়া তত সহজ হলো না।"

ছবিতে অ্যাকাডেমী-পুবস্কৃত অভিনেতা বেড বাটন অভিনয় কবেছেন বিপজ্জনক অনির্দিষ্ট বেলুন অভিযানের যাত্রীরূপে। উনবিংশ শতাব্দীর 'অন্ধকাব মহাদেশ' আফ্রিকাব বর্বব ক্রীতদাস-ব্যবসাযীদেব হাতে বন্দিনীরূপে দেখা যাবে বিংশ শতাব্দীব হলিউডেব প্রখ্যাত চিত্রতাবকা বাববাবা ইডেনকে। পাগলাটে বেলুন-আবিষ্কারকেব ভূমিকায বিখ্যাত টেলিভিশন অভিনেতা স্যাব সেডবিক হার্ডউইক আশ্চয গাম্ভীযেব অভিনযেব মধ্যে দিয়েই মজাব মজাব হাস্যকব দৃশ্যেব অবতাবণা কবেছেন।

আমেবিকাব বক'এ রোল সঙ্গীতে নামকবা, এবং ওদেশেব তরুণ সম্প্রদায়েব অত্যন্ত প্রিয শিল্পী ফেবিযান এই ছবিতে পাগলাটে বেলুন আবিষ্কাবকেব সহকাবী হযে বেশ জমিযেছেন। তিনি বলেছেন, "বক'এ বোলেব ঘুণ কেটে যাচ্ছে, এখন টুইস্ট আমি তাই ওসব ছেড়ে অভিনযেব দিকেই বেশি মন দিয়েছি, সিনেমায অভিনয তাই সুরু করলাম। অবশ্য গান একেবারে ছাড়েন নি, আলোচ্য ফিলমটিব প্রথমেই যে টাইটেল মিউজিক শোনা যাবে, সেটি ফেবিযানেবই গাওযা।

এই ফিলমেব আব একজন নামী অভিনেতা হলেন পিটাব লোব। চলচ্চিত্র জগতে এঁব অভিনয ভঙ্গী আজ বিশ্ববাপী অনুকবণ-যোগ্যতাব মর্যাদা পেয়েছে লোবেব বিশেষ ধবনেব সুপবিচিত কুটকৌশলিক চবিত্রস্ফুবণ দেখে সমালোচকবা বলেন, তাঁর অভিনযেব "ভার' আছে। কিন্তু এ কথাটা লোবেব খুব ভাল লাগে না, তিনি মাঝে মাঝে সোজা হালকা মানুষেব চবিত্রে অভিনয় চান। তাঁব সেই আকাঙ্ক্ষা এই ফিলমে অন্তত খানিকটা পূর্ণ হযেছে বলে মনে হয। ক্রীতদাস ব্যবসাযী আহমেদেব ভূমিকায় লোব একটা ক্রূর শয়তানরূপে প্রথমে আত্মপ্রকাশ কবেছেন। তাবপব অ্যাডভেনচাব যতোই এগুচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে, মানুষেব জীবন নিযে নির্মম ব্যবসাদাবী কবতে করতে তিনি ক্রমশই বীবপুরুষেব মর্যাদায় উন্নীত হচ্ছেন। লোব এক জায়গায় বলেছেন, "দেখুন, কোনো লোক একেবাবে পুবোপুবি খাবাপ হয় না আমিও নয়।"

ফিল্মেব অন্যতম অভিনেতা বিচার্ড হেডনকে সাহাবা মরুভূমিব বিধ্বংসী ঘাতক 'সিমুন' বালিঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে হযেছে। অবশ্য বাস্তব জীবনে সর্বনাশা প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে তাব মোকাবিলা এব আগেই হয়েছিল—ওয়েষ্ট ইনডিজে ছিল তাঁব কলার চাষ, একদিন বিধ্বংসী হাবিকেন ঝড়ে সে সব

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরে তিনি নিঃস্ব হয়ে আমেরিকায় চলে এসে প্রমোদ জগতে আত্মপ্রকাশ করেন।

এ ছাড়া ফিল্মে অভিনয় করেছেন নিউইয়রকের মঞ্চ ও চিত্রতারক বারবারা লুনা, দুষ্টবুদ্ধি আদিবাসী মেয়ে মাকিয়ার ভূমিকায়। আর আছে চেসটার নামে বিস্ময়কর এক শিমপানজির অভিনয়। চেসটার পাইপে ধূমপান করে, চা খায়, বন্দুক ঘাড়ে করে, গুলী করতেও পারে, দাড়িতে সাবান মেখে কামাতেও জানে। যেদিন তাকে চরিত্র নির্বাচনের জন্যে অফিসে আনা হয়েছিল, সেদিন পুরো এক গেলাস মদ খেয়ে ফেলে এবং অফিস সেক্রেটারী ভদ্রমহিলার একটা পেন্সিল হাতিয়ে নেয়। এইসব দেখে প্রযোজক আর কোনো কথা না বলে তৎক্ষণাৎ তার নামে কনট্র্যাক্ট সই করে ফেলেন। শিমপানজি চেসটারকে নিয়ে প্রথম সুটিং হয়ে গেলে সেই ছবি ষ্টুডিওর প্রেক্ষাগৃহে যখন কেবলমাত্র অভিনেতাদের দেখানো হচ্ছিল, সেখানে চেসটারও প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। ছবিটুকু দেখানো হয়ে গেলে অভিনেত্রী বারবারা ইডেন বলেছিলেন, "চেস্টারের সঙ্গে বসে ফিল্ম দেখতে কোনো আপত্তি নেই, তবে পর্দায় নিজের ছবি দেখে চেসটার এত জোরে উল্লাসধ্বনি করে ওঠে যে, আমরা ছবির কথা শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি।

ফিল্মে ব্যবহৃত যে বেলুন গনডোলাটি ছবির প্রধান আকর্ষণ, সেটি প্রায় পাঁচ টন ভারী। সাধারণতঃ ফিল্মের জন্যে সেট সেটিং তৈরী হয় চোখ ভোলানোর জন্যে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর গঠন রহস্য যথাসম্ভব সরল করা হয়। কিন্তু আলোচ্য ফিল্মে বেলুনটিকে আকাশে সত্যি সত্যি ওড়াতে হবে, এই সমস্যাটা কর্তাদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল—চারতলার সমান উঁচু, একটা বড় নৌকোর মতো লম্বা এই প্রকাণ্ড বেলুন গনডোলাটিকে সত্যিই খুব মজবুত করে গড়তে হয়েছিল, কারণ এতে অভিনেতারা চড়বেন, অনেক রকম মালপত্র ওঠানো হবে, আবার এমন কৌশলও রাখা হয়েছিল যাতে সামান্য সংকেতেই জিনিসটার বিভিন্ন অংশ একের পর খুলে খুলে পড়ে যাবে। এ সম্ভব হয়েছিল সুদক্ষ টেকনিসিয়ানদের জন্যেই পরিপূর্ণ বোঝা নিয়ে ঐ বেলুন গনডোলাটি ফিল্ম তোলার জন্যে মোটমাট প্রায় ১০০ ঘণ্টা আকাশে ভেসে থাকার বিস্ময় অভিনয় করে তবে নেমেছে।

১৯৬১ সালে মার্কিন সরকারী ডাক বিভাগ থেকে বেলুন ছাপা একটি বিশেষ ডাকটিকিট ছাড়া হয়েছিল বেলুনে ডাক বিলি করার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে। ডাকটিকিটের বেলুনটিতে নাম ছাপা ছিল 'জুপিটার'—ফিল্মের বেলুনটিরও নাম হলো—'জুপিটার'—তাই ফিল্ম প্রযোজকের হলিউড

অফিস থেকে চিত্রমুক্তির সময়ে যতো চিঠিপত্র ছাড়া হয়েছিল, সে সব চিঠিতে ঐ ডাকটিকেটই ব্যবহার করা হয়েছিল।

জুল ভের্ন ৬৯ বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর বহুমুখী ধারার প্রচুর রচনা থেকে অন্তত ৭-৮টি দেখবার মতো ভাল ভাল ফিল্‌ম আজ হয়েছে, তার মধ্যে "ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন" অন্যতম। এই ফিল্‌মখানি তাঁর রচনা অবলম্বনে চিত্রায়িত "অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ", "টোয়েনটি থাউজ্যাণ্ড লীগ্‌স আনডার দ্য সী" এবং "জারনি টু দি সেনটার অব দি আর্থ" ফিলম তিনখানির মতোই অসামান্য সাফল্য লাভ করতে পেরেছে।

ফিল্‌মখানিতে বেলুন সংক্রান্ত বিষয়ে যিনি প্রযোজকের টেকনিকাল উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি সত্যিই একজন অভিজ্ঞ বেলুনিস্ট, নাম তাঁর ডোনাল্ড পিকার্ড। বেলুনে চড়ে সবচেয়ে উঁচুতে ওঠার বিশ্ব রেকর্ড অর্জন করেছেন এই ডোনাল্ড পিকার্ড। এঁর বাবা জাঁ পিকার্ডও নামকরা আবহাওয়া বেলুনিস্ট, কাকা পরলোকগত অগাস্ট পিকার্ডও ছিলেন বেলুন অভিযানে বিগত যুগের অগ্রণীদের অন্যতম।

এঁদের সবার অবদান মিলিয়ে কাল্পনিক অ্যাডভেনচারের এই ফিল্‌মখানি হয়ে উঠেছে পরম উপভোগ্য। একখানি অভিনব অ্যাডভেনচার ফ্যানটাসি ফিল্‌ম।

রবিনসনদের পাঠশালা

[দি স্কুল ফর রবিনসনস্‌

হাসি কৌতুক, রোমাঞ্চ-উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ-উত্তেজনা ! বিজন দ্বীপে নির্জনে বাস করতে গিয়ে শ্বাসরোধী অ্যাডভেঞ্চারের ঠেলায় শেষকালে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কোত্থেকে এল জাহাজডুবির সিন্দুক, বোম্বেটে আর বাঘ-সিংহ ? অলৌকিক ম্যাজিক, না, লৌকিক ইন্দ্রজাল ? জাহাজডুবি নিয়ে রচিত ভের্নের 'মিষ্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড', 'অ্যাড্রিফ্‌ট ইন দি প্যাসিফিক' এবং 'আলবাট্রস-এর মধ্যেও যা নেই, তা আছে এই কাহিনীতে মজা ! মজা ! ! ছত্রে ছত্রে শুধু মজা ! ! !

সামান্য একটা দ্বীপ নিয়ে এমন এলাহি কাণ্ড হবে কে জানত !

দ্বীপটা প্রশান্ত মহাসাগরে। অত্যন্ত নিরিবিলি। জাহাজ চলাচলের রাস্তায় পড়ে না। কারো কোনো কাজে লাগে না। মানুষ-পশু কিচ্ছুই থাকে না। চাষবাসও নেই।

সংক্ষেপে, দ্বীপটা নেহাতই অদরকারী এবং বসবাসের অযোগ্য। সুতরাং যে দ্বীপ কোনো কাজেই লাগছে না, তা বেচে দেওয়ার ফন্দী আঁটল মার্কিন সরকার।

দ্বীপটার নাম স্পেনসার আইল্যাণ্ড।

বেশ কয়েক মাস ধরে কাগজে কাগজে স্পেনসার আইল্যাণ্ড নিয়ে গরম গরম প্রবন্ধ ছাপা হল। দ্বীপ কিনে যে কোনো লাভ হবে না, তাও ফলাও করে জানিয়ে দেওয়া হল। আমেরিকায় টাকার কুমীরের অভাব নেই। টাকা যাদের হাতে কুট কুট করে, খরচ করতে না পারলে অস্বস্তি হয়, দ্বীপটা তাদের কাউকেই বেচে দেওয়ার জন্যেই নীলাম ডাকার আয়োজন করল আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট।

নীলাম ডাকার দিন তিলধারণের স্থান রইল না নীলাম ঘরে। ফালতু টাকা উড়িয়ে বদ্দিমার্কা দ্বীপ কিনতে কাদের মাথায় পোকা নড়ে, সেই রগড় দেখার জন্যেই লোক এসেছে সমাজের সব শ্রেণী থেকে। নীলামওলা দ্বীপের গুণকীর্তন (!) করে চলেছে চড়া গলায়। গুণ না থাকলেও ফেরিওয়ালাদের

মত কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে কত কথাই না বলছে। শ্রোতাদের মধ্যে থেকেও অন্ত নেই টীকাটিপ্পনীর। শেষ নেই টিটকিরি-তামাসা-পরিহাসের। কেউ জানতে চাইছে আগ্নেয়গিরি আছে তো দ্বীপে? নেই? সেকি কথা! পাখীও নেই? জন্তু-জানোয়ার সাপখোপ কিস্সু নেই? হরি! হরি! সেই জন্যেই বুঝি এত সস্তা দ্বীপটা!

হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে বচনমালা শুনিয়ে নীলামওলা প্রাণপণে বকে চলেছে। কিন্তু কেউ আর দর হাঁকছে না। ঘরশুদ্ধ লোক হাসছে, ব্যঙ্গ করছে আর মজা করছে।

শেষকালে নীলামওলা হুমকি দিল, নীলাম বন্ধ করে দেওয়া হবে। কেনবার মুরোদ না থাকলে যে-যার ঘরে কেটে পড়লেই হয়! হাতুড়ির বাড়ি ঠোকা হল—এক! দুই!...

হাঁকটা শোনা গেল ঠিক তখনি!

পিস্তল নির্ঘোষের মত হট্টগোল ডুবিয়ে দিয়ে চড়া গলায় দর হেঁকেছেন একজন!

কে? কে সেই উজবুকটা, এতগুলো টাকা এক কথায় জলে ঢালতে চায়?

হল শুদ্ধ লোক জিরাফের মত ঘাড় লম্বা করে খুঁজতে লাগল মহা-আহাম্মক ধনকুবেরটিকে।

প্রস্তরমূর্তির মত নিথর-দেহে বসেছিলেন ডাকদেনেওলা ভদ্রলোকটি। দেখেই হলশুদ্ধ লোকের জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল, চোখ গেঁড়ির চোখের মত ঠেলে বেরিয়ে এল!

ইনি উইলিয়াম ডব্লিউ কোল্ডরুপ—সানফ্রান্সিসকোর ডাকসাইটে বড়লোক!

কোলডরুপই মার্কিন মুলুকের বুঝি একমাত্র ধনকুবের যিনি ডলার খরচ করতে পারেন খোলামকুচির মত!

কোটি কোটি টাকার মালিক তিনি। বিশ্বজোড়া তার কারবার। নানা ধান্দায় তাঁর মগজ সদাই ব্যস্ত। অথচ শান্ত ধীর চোখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। মানুষটা বিরাট, মাথাটিও মস্ত। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, ইয়াঙ্কি ধাঁচের দাড়ি, ইয়া লম্বা জুলপী। সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যক্তিত্ব যা লাখে একজনের মধ্যেও দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

সংক্ষেপে, কোলডরুপকে টাকার কুমীর না বলে টাকার অক্টোপাস বললে বুঝি মানায়। ধুলো থেকে সোনা তুলতে উনি জানেন। ভূগোলক জুড়ে

অগুন্তি শাখা-প্রশাখা মারফৎ লাভের কড়ি গুণতে ওঁর জুড়ি আর নেই। লক্ষপতির রত্নপুরীও নাকি হার মেনে যায় তাঁর কোষাগারের কাছে।

এ-হেন কোলডরুপ হাঁক দিয়েছেন! আর কি রক্ষে আছে? ওঁর ওপর হাঁক দেবার সাধ্যি আর কারও তো নেই!

জোড়া-জোড়া চোখ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল কোলডরুপের অটল মূর্তির পানে। কত টাকা থাকলে স্পেনসার আইল্যাণ্ড কিনে টাকা নষ্ট করার সখ হয়?

গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হয়ে গেল নীলাম ঘরের মধ্যে। নীলামওলা কিন্তু তার মধ্যেই হেঁকে চলেছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এত সস্তায় বিক্রী হয়ে যাবে স্পেনসার আইল্যাণ্ড? আসুন! এগিয়ে আসুন! দর দিন! এখনো জলের দর যাচ্ছে মশাইরা!

কিন্তু কার এমন বুকের পাটা আছে কোলডরুপের ওপর হাঁক দেবে?

কেউ নেই। সুতরাং বকে বকে মুখে ফেণা উঠে গেল নীলামওলার। বেদম হয়ে একবার হাতুড়ি ঠুকল—কেউ সাড়া দিল না। দুবার হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। তখনও কারো সাহস দেখা গেল না। শেষকালে হাতুড়ি বিদ্যুৎবেগে নেমে এসে যেই তৃতীয়বার ঠক শব্দ করতে যাচ্ছে, অমনি হাঁক শোনা গেল!

কোলডরুপের দরকে একলাফে ছাড়িয়ে গিয়েছে নতুন দর!

কিন্তু কে সে? কার এতখানি কলজের জোর কোলডরুপের সঙ্গে টক্কর দিতে আসে? বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষুগুলো তৎক্ষণাৎ খুঁজে পেল কোলডরুপের প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

মোটা টাসকিনার! ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত ধনাঢ্য টাসকিনার কুমড়োর মত বিশাল বপু নিয়ে সটান চেয়ে আছেন কোলডরুপের পানে!

টাসকিনারের সঙ্গে কোলডরুপের রেষারেষি আজকের নয়—অনেক পুরোনো। টাকার লড়াই, বুদ্ধির লড়াই, ব্যবসার লড়াই—টাসকিনার সব সময়ে পাঞ্জা কষতে যান কোলডরুপের সঙ্গে। কোলডরুপ কিন্তু তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনেই করেন না, আমোলও দেন না। ফলে, ঈর্ষায় অপমানে আরো জ্বলেপুড়ে মরেন টাসকিনার।

অসম্ভব মোটা সেই টাসকিনারই হাঁক দিয়েছেন নীলাম ডাকে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—দর তুলে দিয়ে কোলডরুপকে বেইজ্জৎ করা!

কিন্তু কোলডরুপ বেইজ্জৎ হবেন? কখনোই নয়। শুরু হলো দর হাঁকার খেলা! উত্তেজনা যেন মাদক দ্রব্যের মত নেশা এনে দিল উপস্থিত প্রতিটি

মানুষের রক্তে। উৎকণ্ঠায় প্রতিটি মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীতে যেন বৃশ্চিক দংশনের মত জ্বালা ধরে গেল। উদ্বেগে যেন নিঃশ্বেস ফেলতেও ভুলে গেলেন সবাই।

কিন্তু পারলেন না টাসকিনার। ধাপে ধাপে দর চড়তে লাগল।

প্রথমে ঢিমেতালে। পরে তুরঙ্গ গতিতে, শেষে জ্যামিতিক প্রগতিতে। আকাশছোঁয়া অসম্ভব সেই দরের বজ্রগর্জন শুনে চিঁ চিঁ করে কুপোকাৎ হলেন মোটা টাসকিনার।

স্পেনসার আইল্যাণ্ডের মালিক হলেন কোলডরুপ

'ইয়াঙ্কি ডুডুল' গেয়ে এবং 'হিপ হিপ-হুররে' ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানানো হল তাঁকে।

টাসকিনার কিন্তু শাসিয়ে গেলেন, এর শোধ তুলবেন।

গডফ্রে আর ফেণা। কিশোর আর কিশোরী অথচ ঝটপট দুজনের বিয়ে দিতে চাইছিলেন কোলডরুপ।

তার কারণ, ফেণা পঞ্চদশী, কোলডরুপের পালিত কন্যা। গডফ্রে বিংশতিবয়স্ক। কোলডরুপের ভাগ্নে। দুজনের চার হাত এক করে দিলেই কোলডরুপের অগাধ সম্পত্তিও একটা হিল্লে হয়ে যায়।

কিন্তু ছেলেছোকরাদের মতিগতি বোঝা ভার। বিয়ের কথা বললেই খেঁকিয়ে ওঠে। বিয়ে যেন একটা পায়ের শেকল। গডফ্রে মরগ্যানও তার ব্যতিক্রম নয়।

গডফ্রে শিক্ষিত, ভদ্র, বিনয়ী কিন্তু বড্ড জেদী। তার ইচ্ছে পৃথিবীটাকে এখনো ভাল করে দেখাই হল না। এর মধ্যে বিয়ের খাঁচায় ঢুকব কেন? আগে ঘুরে ফিরে নিই, রবিনসন ক্রুশোর মত চুটিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করে জাহাজে চেপে রেলে বসে পৃথিবীটাকে চক্কীপাক দিই--বিয়ের শেকল তার পরে।

ফেণা বুদ্ধিমতী মেয়ে। নাবালক স্বামীর চাইতে পোড় খাওয়া বর অনেক ভালো। সুতরাং তারও ইচ্ছে, যাক না গডফ্রে। সাতঘাটের জল খেয়ে আসুক। সেই রকম বরের ওপরেই তো ভরসা রাখা যাবে।

অগত্যা কোলডরুপও রাজী হলেন।

কোলডরুপের অনেক ব্যবসার মধ্যে অন্যতম ব্যবসা ছিল জাহাজের ব্যবসা। বিস্তর জাহাজের মালিক ছিলেন তিনি।

সুতরাং পরের দিনই কোলডরুপের ঘরে ডাক পড়ল ছোটখাট একটি

জাহাজের ক্যাপ্টেনের। তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, দিন কয়েকের মধ্যেই ভাগ্নে বিশ্বভ্রমণে বেরোবে। জাহাজে মাল-টাল কিসসু থাকবে না। বিশ্বের যেখানে-যেখানে কোলডপের কারবার, সেইসব বন্দরে ছুঁয়ে যাবে জাহাজটা।

এ ছাড়াও গুজগুজ ফুসফুস করে ক্যাপ্টেনকে আরো অনেক কথা বললেন গডফ্রের মামা। শুনে চোখ কপালে উঠে গেল ক্যাপ্টেন সাহেবের!

কোলডরুপের হুকুমে আরো একটা ব্যবস্থা হল। ভাগ্নেকে একলা ছেড়ে দেওয়াটা নিশ্চয় ঠিক হবে না। সুতরাং অফিস ঘরে তলব পড়ল গডফ্রের নাচের মাস্টারের।

নাচের মাস্টার মানুষটি না-রোগা, না-মোটা। দিনরাত নেচে নেচে দিব্বি সুঠাম দেহ। শরীরের দিক দিয়ে এত হিসেবী এবং হুঁশিয়ার যে পান-তামাক-মদের নেশা করেন না পাছে 'ফিগার' টসকে যায়, বিয়েও করেন নি পাছে বউয়ের স্বাস্থ্যহীনতা নিয়ে নিজেকে মাথা ঘামাতে হয়।

ভদ্রলোক সবসময়ে হাঁটেন নাচের ছন্দে, কথা বলেন নাচের ছন্দে। হাত আর আঙুলের দশা রকমারি মুদ্রা দেখানো তাঁর কাছে নেহাতই ছেলেখেলা।

মালিকের তলব শুনে নেচে কুঁদে দেঁতো হাসিতে মুখ ভরিয়ে বিরাট অফিস ঘরে প্রবেশ করলেন নাচের মাস্টার।

কিন্তু বেরিয়ে এলেন স্রেফ হাঁটার ছন্দে। পায়ের ছন্দে প্রকাশ পেল নিরস গদ্য—পদ্য হয়েছে উধাও। চোয়াল পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে।

কোলডরুপ তাকে হুকুম করেছেন সমুদ্র যাত্রায় গডফ্রের সঙ্গী হতে!

যথাসময়ে ভোঁ দিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। বিদায়কালে গডফ্রের মত অ্যাডভেঞ্চার-পাগলও চঞ্চল হল। কিন্তু নির্বিকার রইল ফেণা। নাচের মাস্টারের অবস্থা হল সবচাইতে শোচনীয়। এতদিন যিনি অটল ডাঙায় টলায়মান নাচের সাধনা করেছেন, এখন তাঁকে টলায়মান ডেকে অটল থাকার সাধনা করতে হল। ছাত্রের এমন বদ সখ হবে কে জানত!

দেখতে দেখতে মার্কিন উপকূল মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

প্রথম দুদিন ভালই কাটল। জাহাজ চলেছে নিউজিল্যাণ্ডের দিকে— এইটুকুই কেবল জানে গডফ্রে। বাদবাকী ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামানোর দরকার কি? তাছাড়া জাহাজি বিদ্যায় সে একেবারেই গোমুখ্যু বললেই চলে। তাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার তার নজর এড়িয়ে গেল।

প্রতিদিন সূর্য মাথার ওপর এলেই ক্যাপ্টেন কেবিনে ঢুকে জাহাজ-অফিসারের সঙ্গে গোপনে কি যেন পরামর্শ করতেন। এবং প্রতিরাত্রেই জাহাজের গতিপথ পালটে যেত! সকাল হলেই শুরু হত নতুন উদ্যমে সমুদ্র যাত্রা!

ব্যাপার কী? গডফ্রে অত খেয়াল না করলেও মাঝিমাল্লারা অবাক হল ক্যাপ্টেনের কাণ্ড দেখে! কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে রইল প্রত্যেকেই।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা হইচই শোনা গেল জাহাজে। হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল একজন খালাসী—"ক্যাপ্টেন! জাহাজের খোলে একজন চীনেম্যান লুকিয়ে রয়েছে।"

"চীনেম্যান! জাহাজের খোলে! ফেলে দাও সাগরের জলে!" মহাখাপ্পা হয়ে হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন।

"যো হুকুম!" বলে খালাসী ছুটল হুকুম তামিল করতে।

ইতিমধ্যে গডফ্রে আর নাচের মাস্টারকে নিয়ে নীচে নেমে এলেন ক্যাপ্টেন। চীনেদের ওপর তাঁর ভারী রাগ। তাই হাতকড়া পরা চীনেটাকে দেখেই রেগে কাঁই হয়ে চোটপাট আরম্ভ করে দিলেন তিনি।

জেরার মুখে জানা গেল, চীনেম্যানটি কৌতুকাভিনেতা। বিনা ভাড়ায় সাংহাই যাবার তালে খোলে লুকিয়েছে। সংগে শুকনো খাবার দাবার আছে। তাই খেয়েই পৌঁছে যাবে গন্তব্যস্থানে। ফাঁকা খোলে তার মত হিলহিলে চেহারার একটা মানুষ থাকলে কি এমন ক্ষতি?

কিন্তু ক্যাপ্টেন তা শুনবেন না। তার এক কথা—"সাঁতরে সাংহাই যাও!"

শেষকালে গডফ্রে এসে রক্ষা করল। কি দরকার খামোকা চেঁচামেচি করে? বিনামাশুলে যাচ্ছে বটে, জাহাজের খাবার দাবার তো স্পর্শও করে না। এমন কিছু ভারী নয় লোকটা যে জাহাজডুবি হবে তার ভারে।

অগত্যা নিমরাজী হলেন ক্যাপ্টেন!

কিন্তু কি আশ্চর্য! দুর্ঘটনাটা ঘটল ঠিক তারপরেই!

হঠাৎ আকাশের মুখ পুড়ে গেল যেন। একটানা কয়েকদিন বর্ষা বাদলা, ঝড়ঝাপটা। ঢেউ হল অশান্ত। হাওয়ার মাতন আর ঢেউয়ের নাচনে নাচের মাস্টারের প্রাণ পাখী হল উড়ু-উড়ু। এ-যেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো! কি দরকার ছিল বাপু ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোনোর? এইটুকু জাহাজের দুলুনিতেই যদি নাড়ি ভুঁড়িশুদ্ধ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় তো বিশ্বপর্যটনের শেষে মাস্টারমশায় কি আস্ত থাকবেন?

গডফ্রের প্রাণের অবস্থা কিন্তু ঠিক তার উল্টো; অর্থাৎ ফুর্তিতে ময়ূরের মত নেচে নেচে উঠছে। জাহাজ দুলছে, পাহাড়ের মত ঢেউ তেড়ে আসছে, ঝড় ফুঁসছে, বৃষ্টির একটানা ঝাঁঝর বাজছে! মন্দকী! এরই নাম তো অ্যাডভেঞ্চার!

বেচারী নাচের মাস্টার! শিষ্যের এহেন উল্লাস দেখে আরো মনমরা হলেন এবং বিষম আতংকে একটা লাইফ-বেল্ট কোমরে বেঁধে রাখলেন!

ঝড় জল মাথায় নিয়ে ডুবতে ডুবতে কাঁপতে কাঁপতে দুলতে দুলতে জাহাজ কিন্তু চলল!

এই সময়ে গডফ্রের মনে খটকা লাগল একটা ব্যাপারে। সারাদিন জাহাজের মত্ত নাচনে পাকস্থলীটা পর্যন্ত পাক খেয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু রাত হলেই সুবোধ বালকের মত জাহাজ ভেসে চলে। কেন? রাত্রে কি ঝড় জলরা ঘুমিয়ে পড়ে? ভোর হলেই জেগে ওঠে?

একদিন মাঝরাতে জাহাজের এরকম শান্তশিষ্ট আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে এসেছিল গডফ্রে। আকাশের দিকে দেখল, কই, ঝড় তো কমেনি! বাতাস তো তেমনি গোঁ-গোঁ করে ছুটে চলেছে! ঢেউ তেমনি দামালি জুড়েছে। তবে কেন জাহাজ আর ভয়ংকর ভাবে লাফালাফি করছে না?

হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস দেখল গডফ্রে। দেখল, চিমনি থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে বটে, তবে সে ধোঁয়া চলেছে উল্টো দিকে!

উল্টো দিকে ধোঁয়া যায় কেন? ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি? দিনের বেলা তো ধোঁয়াকে ওদিকে যেতে দেখা যায় নি?

ক্যাপ্টেন অদূরে ছিলেন। গডফ্রেকে প্রথমে তিনি দেখতে পান নি। গডফ্রের ডাকে তাই তিনি ভীষণ চমকে উঠলেন।

"ক্যাপ্টেন!" হাঁক দিয়েছিল গডফ্রে।

"আপনি? এতরাতে?" যেন আঁৎকে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

"কি ব্যাপার? বাতাস কি উল্টো দিকে বইছে?"

"না, হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

"চিমনি ধোঁয়া উল্টোদিকে যাচ্ছে কিনা।"

"ও, হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন।"

"কি ধরেছি?"

"বাতাস নয়। জাহাজটাই উল্টোদিকে চলেছে।"

"সে কী!"

"কি করি বলুন! ঝড়ের খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্তে যেতে হচ্ছে। দিনের বেলা আবার সামলে নেব খন।"

"কিন্তু দেরী হয়ে যাবে যে।"

"সেটা আমি ভাবব।"

গডফ্রে বুঝল না সামান্য এই কৌতূহলে ক্যাপ্টেন খাঁ করে কেন চটে গেলেন।

দিন কয়েক পর।

এই কদিন জাহাজ দিনের বেলা সামনে এগিয়েছে, রাত হলেই চুপসারে পিছু হটেছে। অত আর খেয়াল করেনি গডফ্রে।

সেদিন আকাশের মুখ ফের ফরসা হয়েছে। মেঘ উড়ে গেছে। গডফ্রে ডেকে এসে শুনল ক্যাপ্টেন নাকি লঞ্চ নিয়ে কোথায় গেছেন। জাহাজ ঝড়ের ঠেলায় ভুল পথে এসে পড়েছে। ডাঙার সন্ধান পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্তে ক্যাপ্টেন বেরিয়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন। লঞ্চটা আর জাহাজের ওপর তোলা হল না—বাঁধা রইল পেছনে।

গডফ্রের পেট ফুলে যাচ্ছিল প্রচণ্ড কৌতূহলে। ক্যাপ্টেন সংক্ষেপে আশ্বস্ত করলেন। ভয়ের কোনো কারণ নেই। পথ ভুল একটু হয়েছে বটে, এখুনি এখুনি তা ঠিক করে নেওয়া যাবে। আর ডাঙা? না, ন ওটা চোখের ভুল। ধারে কাছে সেরকম কিছু তো দেখা গেল না।

এই বলে নিজের কামরায় অন্তর্হিত হলেন ক্যাপ্টেন এবং আবার গুজগুজ ফুসফুস শলাপরামর্শ আরম্ভ করলেন জাহাজ অফিসারের সঙ্গে।

দুর্ঘটনা ঘটল সেই রাতেই।

রাত দুপুরে সাংঘাতিক মড়মড় আওয়াজ শুনে ঘুম ছুটে গেল গডফ্রের। দারুণ সোরগোল পড়ে গেছে জাহাজে। ক্যাপ্টেন চেঁচাচ্ছেন—"মিস্টার গডফ্রে! মিস্টার গডফ্রে!"

"এই যে আমি! এই যে আমি।"

"জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। আপনি জলে লাফিয়ে পড়ুন।"

"ডুবে যাচ্ছে! কেন?"

"ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা-টাক্কা লেগেছে বোধহয়। যা কুয়াশা।"

"মাস্টার মশায় কোথায়?"

"তাঁর ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।"

"আপনি?"

"সবার ব্যবস্থা করার পর আমার ব্যবস্থা। নিন! ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আর দেরী করবেন না।"

ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে? নিকষ রাতে কনকনে জলে? কিন্তু জাহাজ যে ডুবছে, তাতে সন্দেহ নেই। জল ডেকের ওপর উঠল বলে!

আচমকা এক ধাক্কায় গডফ্রেকে জলে ঠেলে ফেলে দিলেন ক্যাপ্টেন। গডফ্রে যে পাকা সাঁতারু, তা সবাই জানে। সুতরাং

ছ্যাৎ করে ঠাণ্ডা জল গায়ে লাগতেই চনমনে হল গডফ্রে। ঝপাঝপ হাত চালিয়ে কিছুদূর যেতেই পায়ের তলায় শক্ত জমি ঠেকল। ডাঙায় উঠে বসে তাকাল জাহাজের দিকে।

চোখের সামনে একে-একে নিভে গেল লাল, সাদা, সবুজ লণ্ঠনগুলো! সত্যি সত্যিই ডুবে গেল জাহাজ।

ঘন শর্মশে অন্ধকারে একলা বসে রইল গডফ্রে মরগ্যান।

কেউ নেই। আশে পাশে মানুষ পক্ষী জন্তু জানোয়ার তো দূরের কথা, স্থলভূমিও আছে কিনা বোঝা মুস্কিল। কে জানে, এক টুকরো ডুবোপাথরের ওপর হয়ত ঠাই পেয়েছে গডফ্রে। সামান্য একটুকু প্রস্তরখণ্ড। আহার পানীয় কিছুই সেখানে নেই। অনাহারে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরেই বুঝি মৃত্যু লেখা ছিল গডফ্রের ললাটে

জাহাজের আর কেউ বোধহয় বাঁচেনি। বাঁচলে সাড়াশব্দ নিশ্চয় পাওয়া যেত। লঞ্চটা গেল কোথায়? জাহাজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল তো। সুতরাং একই সঙ্গে সলিল সমাধি হয়েছে লঞ্চেরও।

এখন উপায়? ভোরের প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভিজে সপসপে পোশাক খুলে ফেলে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল গডফ্রে।

অনেকক্ষণ পরে নিকষ নথর দুনিয়ায় ঊষার আভা দেখা দিল। কিন্তু তবুও দৃষ্টি ব্যাহত হল গাঢ় কুয়াশায়। কোথায় বসেছে গডফ্রে? সত্যিই কি ও পাহাড় চুড়া, না, দ্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশ? বোঝবার কোনো উপায় নেই।

কুয়াশা গড়িয়ে গড়িয়ে আবো সরে গেল সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে। তিমি মাছের পিঠের মত কালোপাথরের গা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার ওদিকে কি আছে এখনো বোঝা যাচ্ছে না। দ্বীপ নিশ্চয় নয়। ক্যাপ্টেন তো লঞ্চে চড়ে টহল দিয়ে এসে বলেছিলেন, ধারে কাছে ডাঙা কোথাও নেই। অথচ একটা

ডুবোপাহাড় বেরিয়ে পড়ল। ভাগ্য! সবই ভাগ্য! নইলে অমন খাসা মামার বাড়ী ছেড়ে মরতে কেউ এখানে আসে? ঘাড়ে অ্যাডভেঞ্চারের ভূত চেপেছিল! কোথায় ফেণা, কোথায় মামা-আর কোথায় গড়ক্রে মরগ্যান!

ভাবতেই চোখ জ্বালা করে উঠল গড়ক্রের।

কুয়াশা আরো সরে গেছে। পাহাড়ের গা আরো বিস্তৃত। হয়তো এটা দ্বীপ।

উঠে পড়ল গড়ক্রে। শ্যাওলাজমা বিপদ সংকুল একটা পাথর পেরিয়ে যেতে হবে। অত্যন্ত পিচ্ছিল পাথর। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে কেউ বুঝি সেখানে পা দেয়নি। গড়ক্রে প্রথম পদক্ষেপ করল সেখানে।

প্রাণটা হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে এগোলো মূল ভূখণ্ডের দিকে। একটু অসতর্ক হলে, সামান্য পা হড়কালেই আর রক্ষে নেই। নীচে ফেনিল সমুদ্র। ডুবোপাথরে বিপদজনক। প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে উঠে আসতে হবে না।

স্রেফ প্রাণের ভয়েই অবশেষে পাথরটা পেরিয়ে এল গড়ক্রে। পা পড়ল বালুকাবেলায়। কোথাও পাথর, কোথাও বালি। সন্তর্পণে এগিয়ে চলল গড়ক্রে। ত্রিভুবনে সে বুঝি এক। কেউ কোথাও নেই।

না, না, আছে। কয়েকটা গাংচিল আছে। মাথার ওপর উড়ছে তারা নির্ভীক ডানা সঞ্চারে। হয়ত বা শূন্য হতে বগড় দেখছে। গড়ক্রে এগুচ্ছে পা টেনে টেনে সামনে আরো ডাঙা দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি দ্বীপেই পৌঁছোলো সে? হৃদপিণ্ড উত্তাল হল গড়ক্রের।

পরক্ষণেই থমকে গেল হৃদযন্ত্র সামনের দৃশ্য দেখে।

অদূরে বালির ওপর লুটিয়ে রয়েছে অদ্ভুত একটা সামুদ্রিক জন্তু।

কাছে এগুলে গড়ক্রে। এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বিদঘুটে জন্তুটাকে না, জন্তু নয়। কোমরে বাঁধা দিয়ে ফুলোনো লাইফ-বেল্টের জন্যেই অমন কিম্ভূত কিমাকার মনে হচ্ছিল মূর্তিটাকে।

লোকটাকে চেনে গড়ক্রে। তারই নাচের মাস্টার!

"মাস্টারমশায়! মাস্টারমশায়!"

ছাত্রের আকুল হাঁকাহাঁকিতে অতিকষ্টে চোখ মেললেন নাচের মাস্টার।

যাক! প্রাণটা আছে তাহলে। বড্ড ভয় হয়েছিল গড়ক্রের।

হাত নাড়লেন মাস্টারমশায়। এতক্ষণে তার নিজেরও বিশ্বাস হল, এখনো মৃত্যু হয়নি। জায়গাটা পরলোক নয়—ইহলোক। ভয়ের চোটে চোখ খুলছিলেন না এই কারণেই। পাছে যমদূতদের দেখে ফেলতে হয়, তাই মটকা মেরে পড়েছিলেন এতক্ষণ।

এবার মুচকি হাসলেন ভদ্রলোক। প্রথমেই দেখলেন পকেট বেহালাটা ঠিক আছে কিনা এবং পায়ের তলার জমিটা নাচার উপযুক্ত কিনা!

উঠে দাঁড়ালেন মাস্টারমশায়। গডফ্রেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন অবরুদ্ধকণ্ঠে—"গডফ্রে!"

"মাস্টারমশায়!"

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস স্তিমিত হবার পর মাস্টার মশায়ের খেয়াল হল অগ্নি-দেবতা তাঁর জঠরের মধ্যে দাবানল জ্বালিয়ে বসে আছেন। সুতরাং ছাত্রের কাছে তাঁর প্রথম আবদার হল—এক্ষুনি কোথাও কব্জি ডুবিয়ে আহারের বন্দোবস্ত করা হোক। তারপর গডফ্রের মামাকেও খবর পাঠানো দরকার। সে-ব্যবস্থাও কোল্ডরুপের ভাগ্নের কাঁধে চাপিয়ে ইতিউতি তাকালেন মাস্টার মশায়।

গডফ্রে আর কিছু ভাঙল না।

কিছুদূর এগোতেই মাথার ওপর বিস্তর পাখী দেখা গেল।

পাখী! পাখী মানেই বাসা! বাসা মানেই ডিম! ডিম মানেই খাওয়া!

চকিতে এতগুলো কথা মাথার মধ্যে দিয়ে খেলে গেল গডফ্রের। উদরের ভাবনা সবার আগে, পরের ভাবনা পরে।

সুতরাং পাখীর বাসার সন্ধান শুরু হল। খুঁজতে খুঁজতে কিছু ডিমের সন্ধানও পাওয়া গেল।

ডিম খুঁজতে গিয়ে বেলাভূমির মধ্যে অনেকগুলো ছাগল মুরগী ভেড়া দেখে অবাক হল গডফ্রে। নিশ্চয় জাহাজ ডোবার পর ওরা ঠাঁই নিয়েছে দ্বীপে। ভালই হল। রবিনসন ক্রুশোর মত খোঁয়াড় বানিয়ে নিলেই সারা বছরে খাওয়ার সমস্যা মিটবে।

ডিম জোগাড় করার পরে দেখা গেল নতুন সমস্যা। আগুন কোথায়? সঙ্গে দেশলাই তো নেই! ডিমভাজা করা যায় কি করে?

বইপড়া বিদ্যে নিয়ে কাঠ ঘসতে শুরু করল গডফ্রে। কাঠে-কাঠে ঘসে নাকি আগুন জ্বালা যায়। কিন্তু মাস্টার মশায় এবং ছাত্রের দুজনেরই গা দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল কাঠ ঘসতে ঘসতে, তবু আগুনের কণাও দেখা গেল না কাঠের ফাঁকে।

অগত্যা পেটের আগুন নেভাতে কাঁচা ডিমগুলোই কোৎ-কোৎ করে গিলে ফেলল গডফ্রে। ছাত্রের কাণ্ড দেখে মাস্টার মশাইও ব্যাজার মুখে আত্মসমর্পন

করলেন উদর দেবতার কাছে। অর্থাৎ কাঁচা ডিম দিয়েই প্রসন্ন করলেন তাঁকে।

বিরস বদনে ফের শুরু হল বালি, পাথর, কাঁকর মাড়িয়ে এগিয়ে চলা। ওদের লক্ষ্য দূরের বনটা। উদ্দেশ্য রাত হলে মাথা গোঁজার জায়গা অন্বেষণ।

চারিদিক বড় বেশী চুপচাপ। আকাশ বাতাস যেন মুষড়ে রয়েছে। দ্বীপের সৃষ্টির দিনটি থেকে যেন এ-অঞ্চল পাণ্ডব-বর্জিত ছিল। এই প্রথম মানুষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সেখানে।

অরণ্য এসে গেছে। প্রকাণ্ড মহীরুহগুলোর গুঁড়ির মধ্যে নিশ্চয় খোঁদল, গর্ত, কোটর পাওয়া যাবে—এমনি আশা করেছিল গডফ্রে। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে পা টনটনিয়ে গেল, তবুও আস্তানা পাওয়া গেল না।

দিন ফুরিয়ে গেল। পেটের রাক্ষস আবার উৎপাত আরম্ভ করেছে। কাঁচা ডিম দিয়েই রাক্ষুসে ক্ষিদেকে তখনকার মত ঠেকনা দিয়ে গাছতলায় লম্বমান হল দুই অ্যাডভেঞ্চারিস্ট।

এবং সাক্ষাৎ কুম্ভকর্ণ বনে গেল সেই রাতের মত!

সকাল হতে না হতেই ফের খাওয়ার বায়না ধরলেন মাস্টার মশাই। সারারাত বেঘোরে ঘুমিয়ে ছিলেন বলে রক্ষে, নইলে রাতটাও খাই-খাই করে মাটি করে দিতেন।

ভদ্রলোক নাচতে জানেন, নাচাতে জানেন। এর বেশী কোনো বিদ্যে তার জানা নেই। ব্যবহারিক বুদ্ধি সংক্ষেপে শূন্য। বাস্তব বুদ্ধির বালাই নেই। তা নাহলে জাহাজ ডুবির পর ঘুমিয়ে উঠেই তিনি চা-টোস্টের বিরহে এত কাতর হবেন কেন?

গডফ্রে দেখল, মাস্টার মশাইয়ের ওপর ভরসা করে কোনো লাভ নেই। পরিস্থিতিটা যিনি এখনো হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন নি, তাকে সব কথা বলেও লাভ নেই। অবুঝ নাহলে এ-অবস্থায় কেউ বারবার বলে, মামা কোল্ডরুপকে সবচাইতে কাছের পোস্টাপিস থেকে যেন এখুনি একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়? সেইসঙ্গে কিছু টাকা চাওয়াও দরকার তাঁর কাছে। দুজনের পকেটই তো গড়ের মাঠ!

গডফ্রে মরগ্যান তাই ঠিক করল, যা করবার একাই করবে।

প্রথম কাজ হল, দূরের ঐ পাহাড়গুলোর ওপর চড়ে দেখতে হবে জায়গাটা সত্যিই কোনো দ্বীপ, না, মহাদেশের অংশ। প্রায় একপক্ষ কাল ধরে জলযাত্রা করার পর শ দুই মাইল নিশ্চয় আসা গিয়েছে। সুতরাং দ্বীপ নিশ্চয় নয়।

ম্যাপ অনুযায়ী শ দুই মাইল দূরে দ্বীপ না থাকারই কথা। মহাদেশের অংশ হলে তো পোয়াবারো!

রওনা হওয়ার জন্যে তৈরী হল গডক্রে। এমন সময়ে চোখে পড়ল মুরগী ছাগলের পাল। এদিক ওদিক চড়ে বেড়াচ্ছে তারা।

বললে—মাস্টার মশায়, আমি একটু ঘুরে আসি। আপনি এদের পাহারা দিন।"

বসে বসে ছাগল মুরগী পাহারা দেওয়ার কাজ করতে আপত্তি নেই নাচের মাস্টারের। তবে হ্যাঁ, যাওয়ার সময়ে মনে করিয়ে দিলেন তিনি, মামাকে যেন একটা টেলিগ্রাম করা হয় এবং কিছু টাকা চেয়ে পাঠানো হয়।

গডক্রে মরগ্যান চলেছে। বনের মধ্যে টুকরো রোদের আলোয় পথ দেখে দেখে চলেছে অদূরে অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণীর দিকে। পথ চলতে চলতে দেখছে বনের চেহারা, গাছপালার গোত্র। অবাক হচ্ছে শুধু একটা কারণে। পাদপ শ্রেণীর মধ্যে মার্কিনি ছাপ সুস্পষ্ট। আমেরিকার গাছপালাগুলোই কে যেন রোপন করে গেছে বিজন অঞ্চলে।

পাহাড় শ্রেণী এসে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বনভূমি ছাড়িয়ে ওপরে উঠল গডক্রে। চারপাশ এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কেবল জল আর জল। জল বেষ্টিত ভূখণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে গডক্রে মরগ্যান।

মনে যেটুকু আশা ছিল, ধূলিসাৎ হল। গডক্রে ভাবতেও পারেনি এটা দ্বীপ। অজানা দ্বীপ নিশ্চয়। মানচিত্রে যখন এ দ্বীপের হদিশ নেই তখন ভবিষ্যৎটিও অন্ধকার। অজ্ঞাত দ্বীপে জাহাজও নিশ্চয় আসবে না—ভুল করতেও পথ মাড়াবে না।

মনে মনে ভেঙে পড়লেও সামলে নিল গডক্রে। বাগদত্তা বধূর নামে নাম দিল অজ্ঞাত দ্বীপের—ফেণা দ্বীপ।

পাহাড় থেকে নামছে গডক্রে, এমন সময়ে চমকে উঠল হঠাৎ একটা ধোঁয়া দেখে।

দ্বীপের যেদিকে বড় বড় গাছ গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে, সেই দিক থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে।

ধোঁয়া! ধোঁয়ার অস্তিত্ব যেখানে মানুষের অস্তিত্বও সেখানে! জয় ভগবান! বিজন দ্বীপে গডক্রে মরগ্যান তাহলে একাকী নয়। জাহাজ ডুবির সুযোগ নিয়ে আরও কেউ ঠাঁই নিয়েছে দ্বীপের বুকে!

মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল ধোঁয়া দেখে। তরতর করে পাহাড় থেকে নেমে বন পেরিয়ে মাস্টার মশায়ের কাছে ছুটে এল গডক্রে। দেখল, কাঠ ঘসে চলেছেন ভদ্রলোক আগুনের আশায়!

ধোঁয়া-রহস্য নিয়ে সাত পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে কাঁচা ডিম দিয়ে সাঙ্গ করল আহার পর্ব। মাস্টার মশায় অবশ্য মুখখানাকে বাংলা পাঁচ-এর মত করে রইলেন এবং খিদের জ্বালায় বেশ কিছু ডিম কাঁচাই মেরে দিলেন।

বনবাস এখন অনেকটা সয়ে এসেছে গডক্রে মরগ্যানের। দ্বীপে নির্বাসিত হওয়ার পর বেশ কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়েছে। নাচের মাস্টার এখনো অকর্মণ্য আছেন বটে, কিন্তু গডক্রে বেশ চৌকস হয়ে উঠেছে। বিপদে পড়লে মানুষমাত্রেই অনেক বিচক্ষণ, অনেক সক্ষম এবং অনেক বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কল্পনার বাষ্প আপনিই উবে যায়। গডফে মরগ্যানও পালটে গিয়েছে এই কদিনে। খাওয়ার সমস্যা সে মিটিয়েছে কাঁচা ডিম, একরকম বুনো টক আপেল আর গেঁড়িগুগলি সংগ্রহ করে। অখাদ্য সন্দেহ নেই। দেখলেই গা-পাক দেয়। কিন্তু খিদের জ্বালা তো কমছে।

তাই এখন বাদবাকী সমস্যা নিয়ে উঠে পড়ে লাগল গডক্রে। আহারের পরেই দরকার বাসস্থান। তারপর আগুন। আগুন না হলে কাঁচা খাবার দাবার আর তো খাওয়া যাচ্ছে না।

ঈশ্বর সদয় হলেন। তাই কঠিন পরীক্ষাতেও উতরে গেল এ.....র দুলাল গডক্রে মরগ্যান।

দ্বীপ পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছিল সে। ধোঁয়া যখন দেখা গেছে, নিশ্চয় ডোবাজাহাজ থেকে কোনো আরোহী সাঁতরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু দিনের পর দিন হেঁটেও তেমন কাউকে দেখতে পায়নি গডক্রে। না পেলেও লাভবান হয়েছে অন্য দিক দিয়ে। মাথা গোঁজবার মত একটা আস্তানার সন্ধান পেল গডফে মরগ্যান।

মামার বাড়ীর মত জাঁকালো প্রাসাদ না হলেও গাছতলায় শোয়ার তুলনায় জায়গাটা স্বর্গ বলা চলে। বড় বড় গাছের ভীড় যেখানে, সেইখানে গিয়ে আস্তানাটার সন্ধান পেল গডক্রে।

আস্তানা মানে একটা খোঁদল। প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে বিরাট একটা ফোঁপরা গহ্বর। সে-যে কতবড় গহ্বর, তা অন্ধকারে ঠাহর করতে পারল না গডক্রে। ভেতরে ঝরা পাতার স্তূপ। ছাদ অন্ধকারে অদৃশ্য।

বহুমুখী ছুরী ছিল গডক্রের কাছে। এই ছুরী দিয়েই বাকল চেঁচেছুলে

নিয়ে খাসা আস্তানা বানিয়ে নিল সে। বৃক্ষকোটরের বাসিন্দা হয়েও মাস্টার মশায়ের গজগজানি থামল না। ঘরের মধ্যে ধোঁয়া বেরোনোর চিমনী নেই কেন এই হল অসন্তোষের কারণ।

কিন্তু আগে আগুন, তারপর তো ধোঁয়া। কিন্তু কাকে বোঝাবে গডফ্রে? তার চাইতে নিজেই চেষ্টা করা ভাল। খুঁজেপেতে একটা চকমকি পাথর জুটিয়েছিল সে। ইস্পাতের সঙ্গে ঠুকে-ঠুকে নীলচে স্ফুলিঙ্গও বার করেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। শুকনো ঘাসপাতা জ্বালাতে পারেনি।

বৃক্ষকোটরের সামনে ঘাসজমি, তারপর ছোট্ট নির্ঝরিণী। মন্দ নয় পরিবেশ। জলের ধারাটা পরে চওড়া হয়ে গিয়েছে। জলে বিস্তর মাছের সন্ধান পেয়েছে গডফ্রে। কিন্তু আগুন কই? আগুন না হলে কাঁচা মাছ তো খাওয়া যায় না।

খুঁজে পেতে আরও কিছু বুনো ফল পেয়েছে গডফ্রে। একরকম ষণ্ডের খোঁজও দেখেছে। কিন্তু আগুন না হলে তো এত আবিষ্কার মাঠে মারা যাবে।

পরম কারুণিক বিধাতা তাই করুণাবৃষ্টি করলেন আকাশ থেকে। আগুন নেমে এল আকাশ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে।

বৃক্ষকোটরে ঘুমোচ্ছিল গুরু শিষ্য। কোটরটার অবশ্য একটা নামও দিয়েছে গডফ্রে। মামার নামে নামকরণ হয়েছে। উইল বৃক্ষ মানে, মামার বাড়ী।

আচম্বিতে মামার বাড়ীর মজা ছুটে গেল প্রচণ্ড বজ্রগর্জনে। উঁকি মেরে দেখল গডফ্রে আকাশে দারুণ ঘনঘটা। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বজ্রশিখায় যেন আতসবাজীর খেলা চলছে। পরক্ষণেই কানের পরদা ফাটিয়ে বাজ পড়ল গাছের মাথায়।

না, মামার বাড়ীর ওপর না। ঠিক তার পাশের গাছটিতে। দারুণ সংঘাতে ছিটকে পড়ল গডফ্রে। গাছে আগুন লেগে গিয়েছে। আগুন ঝরছে চারদিকে।

চট করে দুটো জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিল গডফ্রে। নিয়ে ভালই করেছিল। কেনন, আচম্বিতে শুরু হল ঝমাঝম বৃষ্টি। গাছের আগুন নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু গডফ্রের হাতের আগুন রয়ে গেল অনির্বাণ।

আগুন, আগুন করে পাগল হয়েছিলেন নাচের মাস্টার। সেই আগুনই অবশেষে নেমে এল আকাশ থেকে।

আগুন তো এল। এখন তাকে ধরে রাখা একটা সমস্যা। ফস করে কখন

নিভবে, কে জানে। একবার নিভলে আর তো বিদ্যুৎ নেমে আসবে না আগুন হয়ে।

মাস্টার মশায়ের উৎসাহ অফুরন্ত এ-ব্যাপারে। তিনি কাঠকুটো ঘাসপাতা গুঁজে অগ্নিদেবতাকে পরিতুষ্ট রাখার ভার নিলেন। আগুনের কল্যাণে রান্নাকরা মাংসও পাতে পড়ল। মুরগী জবাই করে শিককাবাব বানানো হল। অথবা মুরগীর রোস্ট—কাঠিতে বিঁধে। কাঁচা ডিম, ঝিনুক, গেঁড়ি, গুগলি খেয়ে জিভের যেন আর সাড় ছিল না। মুরগীর রোস্ট তাই অমৃত সমান মনে হল।

খেয়েদেয়ে গডফ্রে নাকডাকাতে লাগল পরম আরামে। নাচের মাস্টার কিন্তু ঘুমের মধ্যে উঠে এসে কাঠকুটোর জোগান দিয়ে গেলেন আগুনের ধুনীতে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল গডফ্রের। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে কোত্থেকে? এই কদিন তো হাওয়ার উৎপাত দেখা যায়নি উইল-গাছের মামাবাড়ীতে। তবে কি কোটরের কোথাও ফাঁক রয়েছে? বাজপড়ার দরুণ কি বাকল চিড়ে গিয়েছে? দেখতে হয় তো!

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। কোটরের বাইরে গিয়ে ঘাড় কাৎ করে দেখল গডফ্রে। ঠাহর করে আঁৎকে উঠল।

অল্পের জন্যে বক্ষে পেয়েগিয়েছে দুজনে। বাজ শুধু পাশের গাছেই পড়েনি—এ-গাছের মগডালকেও ছুঁয়ে গিয়েছে। গুঁড়ির গা ঝলসে গেছে বজ্রপাতে। সর্বনাশ! ঝড়জলের সময়ে বৃক্ষকোটর তো তাহলে নিরাপদ নয়।

এতক্ষণে বুঝল গডফ্রে, কোটরের মাথার দিকে নিশ্চয় কোথাও ফুটো হয়ে গিয়েছে। নেহাৎ পরমায়ু ছিল, তাই বিদ্যুৎ বহ্নি ফুটো দিয়ে ওদের শিরে বর্ষিত হয়নি।

ফুটোটা কোথায় তা দেখবার জন্যে এবং দরকার হলে তা বুজিয়ে দেওয়ার জন্যে কোটরের ভেতর দিয়ে মাথার দিকে উঠতে লাগল গডফ্রে। জ্বলন্ত কাঠের মশাল গুঁজে রাখল শেকরের ফাঁকে। তারপর হাত এবং পায়ের ঠেলায় অতি কষ্টে প্রায় টিকটিকির মত উঠতে লাগল ওপর দিকে।

মশালের আলোয় ফোঁপরা কোটরের ছাদে সত্যিই একটা ফুটো দেখা গেল। অনেকক্ষণ পরে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল ফুটো দিয়ে বাইরে।

পুরো গাছটা বিলকুল ফোঁপরা। তাই কোটরটা প্রায় মগডাল পর্যন্ত বিস্তৃত। শাখার ওপর বসে একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করল গডফ্রে।

এবং চমকে উঠল!

আবার ধোঁয়া! দূরে সমুদ্রসৈকতে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী!

হন্তদন্ত হয়ে নেমে এল গডফ্রে। ধোঁয়ার উৎস তাকে জানতেই হবে। সেবারও পাহাড়ের ডগা থেকে সে ধোঁয়া উঠতে দেখেছিল গাছপালার মধ্যে। পরে কাউকে দেখতে পায়নি। এমন কি আগুন জ্বালার চিহ্নমাত্র ছিল না কোথাও।

আবার সেই রহস্যজনক ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ধারে। কে আছে ওখানে? কেন সে আগুন জ্বালছে? ধোঁয়ার সংকেতে কি বলতে চাইছে?

ছুটতে ছুটতে বেলাভূমি পৌঁছোলো গডফ্রে। কিন্তু কেউ তো নেই। তন্ন-তন্ন করে খুঁজল জমি, ফাঁকফোকর। পাথরের আনাচে কানাচেও আগুন বা ছাইয়ের চিহ্নমাত্র দেখল না।

তাজ্জব ব্যাপার তো! ভুতুড়ে ধোঁয়া নাকি?

সাংসারিক বুদ্ধি তিলমাত্র ছিল না গডফ্রে মরগ্যানের। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তাকে ঘোরতর সংসারী হতে হল। সভ্য দুনিয়ার বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘর সংসার গুছিয়ে বসা যে কি কঠিন কর্ম, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝবে?

গডফ্রে একা হাতে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সবই বানিয়ে নিল। পকেটে ছিল বহু ফলাওলা ছুরী। তাই দিয়ে কোটরের মধ্যে শেকড় চেঁচে বানানো হল খাবার টেবিল, বসবার টুল। খুঁজে পেতে আরও একটা ফোঁপরা গাছ বার করে তার মধ্যে রেখে দিল মুরগীর পাল। নিজেদের জামা কাপড় নতুন করে বানানোর উপায় নেই। তাই মাঝে মাঝে ময়লা পোশাকগুলিই জলে কেচে নিয়ে রোদে শুকিয়ে নিত দুজনে। গাছ থেকে ফল পেড়ে আনা, ক্ষেত থেকে যব তুলে আনা—এ-সব গডফ্রের কাজ।

এত করেও মনটা খুঁত খুঁত করত দুটি জিনিসের অভাবে। একটা মাছের জাল বা বঁড়শি পেলে মৎস্যাহারী হওয়া যেত। আর কিছু বাসন কোসন পেলে ঝোল-টোল রেঁধে খাওয়া যেত!

ছাগল-ভেড়াদের জন্যে খোঁয়াড় তৈরী করার দরকার হয়নি এখনো। খারাপ আবহাওয়া শুরু হলে সে কথা ভাবা যাবে'খন। আপাততঃ তারা মাঠে ঘাটে চড়ে দিব্বি মোটাসোটা হয়েছে। দুধ এবং মাংস—দুটোরই জোগান দিচ্ছে দ্বীপবাসীদের।

এই সময়ে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করে বসল গডফ্রে !

হাতে কাজ না থাকলে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াত গডফ্রে। দ্বীপে মানুষ-খেকো জন্তু-জানোয়ারের পাত্তা পাওয়া যায়নি এতদিনেও। সুতরাং নির্ভয়ে যত্রতত্র ভ্রমণ করত সে।

একদিন গিয়েছে সমুদ্রতীরে। দূর থেকে একটা অদ্ভুত আকারের বস্তু দেখে এগিয়ে গেল কাছে। গিয়ে দেখে, বালির মধ্যে অর্ধেক ডুবে রয়েছে একটা মস্ত সিন্দুক!

সিন্দুক!

নিশ্চয় জাহাজ ডুবির ফলে ভেসে এসেছে! কিন্তু এতদিন সিন্দুকটা তো চোখে পড়েনি?

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না গডফ্রে। একটা ভারী পাথর তুলে নিয়ে তালায় মারতেই খুট করে খুলে গেল তালা!

এত সহজে তালাটা খুলে যাবে ভাবতে পারেনি গডফ্রে। তবে কি তালায় চাবি দেওয়া ছিল না?

কে জানে!

সিন্দুকটা অতি জব্বর। বাইরের মোটা-মোটা তামার পাত মারা। ডালা খোলার পর দেখা গেল ভেতরেও দস্তার পুরু পাত দিয়ে মোড়া। জল ঢুকতে পারেনি এই জন্যেই।

থরে থরে জিনিস সাজানো হঠাৎ-পাওয়া সেই অতিকায় সিন্দুকের মধ্যে। সভ্য দুনিয়ার মানুষের যা না হলে দিন চলে না। সমস্ত গুছিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। ভারী আশ্চর্য তো? সিন্দুকের মালিক কি জানতেন জাহাজ ডুবি হবে এবং বিজন দ্বীপে অন্তরীণ হতে হবে?

বাসন কোসন, গুলবারুদ, জামাকাপড়, চা-কফি-মদ, যন্ত্রপাতি-হাতিয়ার, কাঁটা-কম্পাস, দূরবীন-ঘড়ি।

কিন্তু সবচাইতে তাজ্জব ব্যাপার হল, অত জিনিসের কোথাও এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যায় জিনিসগুলো অমুক দেশে তৈরী!

এমন কি পেল্লায় সিন্দুকে পর্যন্ত নির্মাতার নাম লেখা নেই!

ভোজবাজীর মত নিশ্চয় ইথার থেকে সৃষ্টি হয়নি অত জিনিস। কিন্তু নির্মাতা কে? কে এত জিনিসের স্বত্বাধিকারী?

সিন্দুক-রহস্য নিয়ে বিষম ভাবনায় পড়ল গডক্রে মরগ্যান!

দিনকয়েক ধরে নাচের মাস্টারকে নিয়ে সিন্দুক থেকে অল্প অল্প মালপত্র এনে উইল-গাছের মামাবাড়ীতে জড়ো করল গডক্রে। তারপর একদিন খালি সিন্দুকটাকে দুজনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এল কোটরের মধ্যে।

আলমারী হিসেবে মন্দ হল না মস্ত সিন্দুকটা!

আর কি চাই? হাঁড়িকুঁড়ি, যখন খুশী আগুন জ্বালাব সরঞ্জাম, জামাকাপড়, যন্ত্রপাতি। ড্যান্স-মাস্টারের বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল জিনিসপত্র দেখে। আগুন পাহারা দেবার মস্ত ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে ভদ্রলোক মন দিলেন নানারকম রান্নাবান্না আর রুটি তৈরীর কাজে।

গডক্রের কাজের কি আর শেষ আছে? সিন্দুকের মধ্যে ছুতোরের যন্ত্রপাতি যা ছিল, তাই দিয়েই কোটরের মধ্যে কয়েকটা তাক বানিয়ে নিল সবার আগে। বাসন কোসন থেকে আরম্ভ করে অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত, সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল সেখানে। সারারাত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যায় না পাছে কোটরের মধ্যে রাতজাগা উৎপাত ঢুকে পড়ে, এই ভয়ে। সুতরাং পরিপাটি নিদ্রার জন্যে গাছের পুরু ছাল জুড়ে তৈরী মজবুত পাল্লা। কপাটের গায়ে আলো বাতাস আসার জন্যে ঘুলঘুলিও রইল। ভেতর থেকে হুড়কো এঁটে দেওয়ার পর ফোঁপরা গাছের কামরাকে মনে হল যেন অমরাবতী। রাত্রে আলো? সে পরে ভাবা যাবেখন। চর্বি জমিয়ে বাতি বানিয়ে নেওয়া যাবে সে রকম প্রয়োজন হলে।

কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে দ্বীপের দিকে দিকে টহল দিয়ে আসত গডক্রে। উদ্দেশ্য, দ্বীপটাকে নখদর্পণে রাখা। ক্রমাগত চকিপাক দেওয়ার ফলে একটা জিনিস ভালভাবেই জানা হয়ে গেল। ফেনা দ্বীপে হিংস্র শ্বাপদের বালাই নেই। হরিণ এবং ঐ জাতীয় নিরীহ প্রাণী যা আছে, তা খাদ্য হিসেবে জীবন বিসর্জন দিতে লাগল একে-একে গডক্রের বুলেটের ঘায়ে। তাতে আরও একটা লাভ হল। ছাগল-ভেড়া-মুরগীর সংখ্যা না কমে ক্রমশঃ বেড়েই চলল।

গডক্রের প্রাণে কিন্তু সুখ নেই। বনেবাদাড়ে একা-একা ঘুরে বেড়ায় বন্দুক কাঁধে। পাহাড়ে-পর্বতে উঠে দ্যাখে আবার সেই রহস্যজনক ধোঁয়া দেখা যায় কিনা। দু'দুবার আশ্চর্য ধোঁয়াকে দ্বীপের দুদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শূন্যে উঠতে দেখেছে। কিন্তু কোনোবারই মানুষ বা ছাই কিছুই দেখতে পায় নি। এমনও হতে পারে যে কোথাও গরম জলের কুণ্ড আছে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও

সেরকম কিছু দেখা যায় নি। গডফ্রের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, আগুনটা মানুষের জ্বালা। কিন্তু মানুষটা কোথায়?

ধোঁয়া-রহস্য নিয়ে বিভম্বিত মনে একদিন একটা টিলার ওপর উঠে ইতিউতি তাকাচ্ছে গডফ্রে, এমন সময়ে বুকটা ধড়াশ করে উঠল।

আবার ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছে। এবার দ্বীপে নয়—সমুদ্রে!

ছুটতে ছুটতে টিলা থেকে নেমে এল গডফ্রে। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেল সমুদ্রের ধারে। দুরু দুরু বুকে লক্ষ্য করল ধোঁয়ার একটা টান রেখা দিগন্ত থেকে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জাহাজ।

সত্যিই জাহাজ। কলেচলা জাহাজ। তাই চিমনীর ধোঁয়া দেখা দিয়েছে দূর থেকে। সব চাইতে আনন্দের কথা হল জাহাজ সটান আসছে পাণ্ডববর্জিত এই দ্বীপের দিকেই।

গডফ্রের তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। এতগুলো মাস হাপিত্যেশ করে বসে থাকার পরেও যে-দ্বীপের ত্রিসীমানায় জাহাজের চিহ্নমাত্র দেখা যায় নি, আচম্বিতে সভ্যজগতের অতি-আধুনিক একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে সেই দ্বীপের দিকেই।

জাহাজটা আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। গলুইয়ের বড় পতাকা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে গডফ্রে। জাহাজটা আমেরিকানদের—কোনো সন্দেহই নেই তাতে।

জলপোতের গতিপথ এবার পরিষ্কার হয়ে গেল দ্বীপের মাইল দুয়েক দূর দিয়ে জাহাজটা উধাও হওয়ার ফিকিরে আছে।

সর্বনাশ! ভাগ্য একী ছলনা শুরু করেছে তার সঙ্গে? এতদিন পরে উদ্ধারকারী জাহাজকে দ্বীপের কাছে এনেও দূরে নিয়ে যাচ্ছে? জাহাজের লোকগুলোও কি অন্ধ? দেখতে পাচ্ছে না দ্বীপের কিনারায় লাল পতাকা উড়ছে? কিছুদিন আগে অনেক আশা নিয়ে গাছের বসে একটুকরো ন্যাকড়া রাঙিয়ে লাঠির ডগায় উড়িয়ে দিয়েছিল গডফ্রে এই রকম একটা সুদিনের প্রত্যাশায়। কিন্তু বিপদজ্ঞাপক অমন একটা নিশানও কি চোখে পড়ছে না খালাসীদের? অবাক হল গডফ্রে। একবার দুবার বারবার! কিন্তু জাহাজ থামল না। কোনো সঙ্কেতও জানালো না।

ক্রমশঃ আঁধার হয়ে এল চারিদিক। তাড়াতাড়ি শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিল গডফ্রে। কিন্তু বৃথাই। অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল কলেচলা জাহাজের চেহারা।

মনে-প্রাণে ভেঙে পড়ল গডফ্রে মরগ্যান। বিষণ্ণ মুখে অবসন্ন দেহে ফিরে এল গাছের কোটরে।

জংলীদের নৌকোটা দেখা গেল পরের দিন!

বিকেল নাগাদ সমুদ্রতীরে ডিম সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন ড্যান্স-মাস্টার। ফিরে এলেন লাফাতে লাফাতে। বিষম আতংকে দুই চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

"গডফ্রে! জংলী! জংলী!" ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন তিনি।

জংলী! ধড়াস্ করে উঠল গডফ্রের বুক। সর্বনাশ!

মুখে বলল—"ভুল দেখেছেন। এ-দ্বীপের ঠিকানা কেউ জানে না।"

"না, না, গডফ্রে। নিজের চোখে দেখে এলাম।"

"কি দেখে এলেন?"

"রেড ইণ্ডিয়ানদের নৌকোর মত একটা ছিপ। ক্যানো।"

"ক্যানো? কে ছিল ক্যানোতে?"

"কে কি হে? বলো কারা! নৌকো ভর্তি বিকট চেহারার জংলী। দ্বীপে নেমে পড়েছে নিজের চোখে দেখে এলাম।"

গডফ্রের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল মাস্টারমশায়ের কথা শুনে। কপালে শেষে এই লেখা ছিল? এত কষ্ট করে থাকার এই কি পুরস্কার? নির্ঝঞ্ঝাট দ্বীপে শেষকালে জংলীদের উৎপাতও শুরু হল?

বিষম ভাবনায় পড়ল গডফ্রে। জংলীরা নিশ্চয় এ-দ্বীপের ঠিকানা জানে। আগেও এসেছে। দ্বীপ জনমানববর্জিত জেনেই তারা ফের এসেছে। সুতরাং মনুষ্যবসবাসের নিদর্শন তাদের চোখে পড়লে কি কাণ্ড ঘটবে, ভাবতেও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল গডফ্রের। কে জানে ওরা নরখাদক কিনা? তা যদি হয় তো গুরু-শিষ্যকে শিককাবাব বানিয়ে খেয়ে নেবে ওরা!

আর দেরী করা যায় না। যে কোনো মুহূর্তে জংলীরা এদিকে আসতে পারে। চটপট হাত চালিয়ে গাছের কোটরের বাকলের পাল্লা লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিল গডফ্রে—যাতে বাইরে থেকে দেখে টের পাওয়া না যায়। ছাগল-ভেড়াদের তাড়িয়ে দিল দূরে। মুরগীদের কোটরটিও অনুরূপ ভাবে ঢেকে দিল ভাল করে। অগ্নিকুণ্ডের পোড়া কাঠ আর ছাই পরিষ্কার করে ফেলল জমি থেকে।

তারপর কোটরের মধ্যে মাস্টারমশায়কে নিয়ে বসে মতলব ঠিক করে ফেলল সে। এর পরে যদি জংলীরা কোটর আক্রমণ করে তো লড়ে যাবে

গডফ্রে। মাস্টারমশায়কে নিয়ে টেনে হিঁচড়ে উঠে যাবে ওপরকার ফুটো দিয়ে একদম মগডালে। সেখানে বসে এন্তার গুলি চালিয়ে জংলীদের যমালয়ে পাঠানোর পাইকারী উৎসব লাগিয়ে দেওয়া যাবে'খন।

সারাটা রাত কাটল বিষম উৎকণ্ঠার মধ্যে। মাঝে মাঝে মনে হল, কারা যেন চলাফেরা করছে কোটরের বাইরে। গাছের চারপাশে।

ভোরবেলা ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মারল গডফ্রে। কেউ নেই। গুটি গুটি বেরিয়ে এল বাইরে। না। আশপাশে কেউ কেই। পা টিপে টিপে গেল সমুদ্রতীরে। বন্দুক ঘাড়ে পেছনে এলেন নৃত্য-শিক্ষক।

ক্যানো নেই। অর্থাৎ জংলীরা চলে গেছে। যাবার সময়ে অবশ্য খুঁটি থেকে লাল নিশানটি নিয়ে গেছে।

অর্থাৎ, জংলীরা জেনেছে, এ-দ্বীপে মানুষ আছে!

কিন্তু জংলীরা সত্যিই কি দ্বীপ ছেড়ে লম্বা দিয়েছে, না, অন্য কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে? দূরবীন কষে সমুদ্রবক্ষ নিরীক্ষণ করল গডফ্রে, ক্যানো নামক ছিপজাতীয় হিলহিলে নৌকোর পাত্তা পেলোনা। তখন ঘোর সন্দেহ দেখা দিল মনে। খুঁটির মাথা থেকে লালরঙে বাঙানো ন্যাকড়াটি তারা নিয়ে গেছে। নিশ্চয় ন্যাকড়ার মালিককে খুঁজছে দ্বীপের ভেতরে।

নৃত্য-শিক্ষক গডফ্রের কথা শুনে ভিরমি যান আর কি। এখন উপায়?

উপায় আর কি! সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। জংলীরা খুঁজছে ওদেরকে—ওরা খুঁজবে জংলীদের। তারপর?

তারপর শুরু হবে গুলিবৃষ্টি। দু'দুটো বন্দুক আর রিভলবারের বুলেট বর্ষণ হজম করতে পারবে না জংলীরা। মস্তানি ছুটে যাবে তাদের। দ্বীপের একচ্ছত্র মালিক হবে গডফ্রে মরগ্যান।

কিন্তু নাচের মাস্টারটিকে নিয়ে হল বিপদ। ভদ্রলোক নাচতে পারেন, কিন্তু বন্দুক ছুঁড়তে তো পারেন না!

শুরু হল জংলী অন্বেষণ। রণসাজে সেজে, সঙ্গে খাবার দাবার নিয়ে গুঁড়ি মেরে গডফ্রে মরগ্যান এগোলো দ্বীপের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। গাছপালায় গা ঢেকে মাটির সঙ্গে মিশে পথচলা চাট্টিখানি কথা নয়। কালঘাম ছুটে গেল বেচারীদের। একমাইল যেতেই গেল একটি ঘণ্টা!

যাই হোক, ঘণ্টায় একমাইল গতিবেগেই তন্ন-তন্ন করে জংলীদের সন্ধান

করে চলল গডফ্রে এবং নৃত্যশিক্ষক। কিন্তু কোথাও তো নেই হতভাগারা? তবে কি একরাত্রি দ্বীপবাস করেই চম্পট দিয়েছে অসভ্যবৃন্দ?

এমন সময়ে দেখা গেল ধোঁয়ার কুণ্ডলী!

ফের ধোঁয়া! রহস্যজনক এই ধোঁয়াকে আরো দুবার দেখা গিয়েছে সেখা দ্বীপে—অদৃশ্য থেকেছে ধোঁয়ার স্রষ্টা। তবে কি জংলীরাই আগাগোড়া ছিল দ্বীপের মধ্যে? তারাই আগুন জ্বেলেছিল, ধোঁয়া উড়িয়েছিল? কিন্তু ঘাপটি মেরে থাকার কোনো দরকার ছিল কী? দেখা যাক।

গিরগিটির মত বুকে হেঁটে সমুদ্রতীরে এগিয়ে গেল গডফ্রে। দেখা গেল পাথরের ওদিকে মস্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। বেশ কয়েকজন বিকট দর্শন জংলী—পায়চারী করছে আর গডফ্রেদের দিকেই তাকাচ্ছে—কেন কে জানে। একটা খুঁটিতে একজন জংলীকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে। সমুদ্রের জলে ভাসছে ক্যানোটা। সর্দারের কাঁধে রয়েছে গডফ্রের লাল পতাকাটা!

মনের মন্দিরে এরকম একটা দৃশ্য দীর্ঘদিন ধরে কল্পনা করে রেখেছিল গডফ্রে মরগ্যান। 'রবিনসন ক্রুশো' তাকে অ্যাডভেঞ্চার পাগল করে ছেড়েছে। 'রবিনসন ক্রুশো'র মত দ্বীপান্তরে থেকে বুনো নায়ক হবার তার সাধ হয়েছে। 'রবিনসন ক্রুশো' অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের প্রতিটি রোমাঞ্চকর দৃশ্য তার মনের পটে জ্বলজ্বলে কল্পনায় আঁকা হয়ে গিয়েছে।

চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখল গডফ্রে, এ যেন সেই 'রবিনসন ক্রুশো' উপন্যাস থেকেই ছিঁড়ে আনা একটি পাতার বাস্তব রূপায়ণ। সে কাহিনীতেও 'ফ্রাইডে' নামক জংলীকে পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিল জংলীরা এবং রবিন্সন ক্রুশো তাকে উদ্ধার করে নিজের পরম অনুগত সহচর বানিয়েছিল।

গডফ্রে বুঝল, এখন তাকেও কি করতে হবে।

রবিনসন ক্রুশোর মতই হতভাগ্য জংলীকে উদ্ধার করতে হবে।

সর্দার জংলী হাঁক দিয়েছে।

তোড়জোড় শুরু হল। খুঁটিতে বাঁধা জংলীকে হিড়হিড় করে টেনে আনা হল আগুনের সামনে। দারুণ মারপিট আরম্ভ হয়ে গেল। এত সহজে তাকে আগুনে রোস্ট করে খাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। নরখাদকরাও ছাড়বে না। কিন্তু একা অতজনের সঙ্গে সে পারবে কেন?

এমন সময়ে বীর বিক্রমে পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল গডফ্রে। কিন্তু সর্দার জংলী তাকে দেখেও যেন দেখল না!

ভারী আশ্চর্য তা! গডফ্রে চেয়েছিল, ওর চেহারা দেখে তেড়ে আসুক জংলীরা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে বন্দুকবাজি। কিন্তু মোড়ল জংলীটা কোনো আমোলই দিল না তাকে।

রেগে তিনটে হয়ে বন্দুক তুলেই ধাঁ করে ঘোড়া টিপে দিল গডফ্রে। দুম করে ছুটে গেল গুলি। অমনি সর্দার জংলী শূন্যে লাফিয়ে উঠে পড়ে গেল মাটিতে! গুলি লেগেছে তাহলে!

তাই দেখে নাচের মাস্টারও চোখ বুজে ঘোড়া টিপে দিলে। কোনদিকে গুলি ছুটল কে জানে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আর একটা জংলী হাত-পা ছুঁড়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে!

আর যায় কোথা! বাকী জংলীরা চোখ বড় বড় করে এদিকে তাকিয়েই চীৎকার করতে করতে ছুটল ক্যানোর দিকে। পাঁজাকোলা করে নিয়ে গেল আহত সঙ্গীদের। লাফিয়ে উঠল ক্যানোয় এবং ঝপাঝপ দাঁড় টেনে সবে গেল তীরভূমি থেকে।

তার পরেই ঘটল রবিনসন ক্রুশো কাহিনীর আর একটি দৃশ্য।

আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সেই জংলীটা পাই পাই করে দৌড়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল গডফ্রেকে!

স্বপ্ন দেখছে না তো গডফ্রে মরগ্যান? বইয়ের কাহিনী বাস্তবে দেখা যায়?

জংলীটি বেশ পোষ মেনে গেল! রামভক্ত হনুমানের মতই গডফ্রে-ভক্ত হয়ে উঠল সে। গডফ্রে তাকে অনেক কিছু শেখাবার চেষ্টা করল। শেখবার আগ্রহ তার মধ্যে ছিল বলেই বহু শিক্ষাই সে রপ্ত করে নিলে—একটি ছাড়া। কিছুতেই ইংরেজীটাকে বাগে আনতে পারল না জংলী মহাশয়। চেষ্টার কসুর করল না গডফ্রে, ইংরেজী ভাষার সহজতম শব্দগুলোকেও ফুটিয়ে তুলতে পারল না কাফ্রীর জিহ্বায়!

অবশেষে হাল ছেড়ে দিল গডফ্রে। বনে-জঙ্গলে শিকার করতে যাওয়ার সময়ে জংলী সাগরেদটি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে থাকত। একদিন কচ্ছপের আড্ডা আবিষ্কার করে এবং চক্ষের নিমেষে বেশ কিছু কচ্ছপ উলটে দিয়ে তাজ্জব বানিয়ে দিল গডফ্রেকে। যাক, অতগুলো কচ্ছপের মাংস শীতকালে কাজে লাগবে। তাই নুন মাখিয়ে শুকিয়ে ভাঁড়ার বোঝাই করে রাখা হল শীতের প্রতীক্ষায়।

একদিন একটা মস্ত বিপদ থেকে এই জংলীটিই প্রাণে বাঁচিয়ে দিল গডফ্রেকে!

সেদিনও শিকারে বেরিয়েছিল গডফ্রে মরগান। সঙ্গে জংলী সাগরেদ।

দ্বীপের মাঝামাঝি অঞ্চলে দু'একটা হরিণ দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু গুলি তাদের গায়ে লাগেনি। অগত্যা বৃক্ষ কোটর অভিমুখে পদ-চালনা করেছে গডফ্রে। এমন সময়ে আঁৎকে উঠে ঘাড়ে এসে পড়ল জংলীটি এবং হ্যাঁচকা টানে গডফ্রেকে নিয়ে ছুটল জঙ্গলের বাইরে।

কেন? প্রশ্ন করবার সময় নেই তখন। পড়ি কি মরি করে দৌড়োলো গডফ্রে। জঙ্গল থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসে দাঁড়াল দুজনে। পেছন ফিরে হাত তুলে দেখালো।

দেখল গডফ্রে। ভয়ংকর-দর্শন একটা ভালুক গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

সর্বনাশ! ভালুকের খপ্পরে পড়া যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, তা দুঁদে শিকারিরাও জানে। সুতরাং দূর থেকেই বন্দুক তুলে ধড়াস করে গুলি চালালো গডফ্রে। গুলি নিশ্চয় মোক্ষম জায়গায় লেগেছিল। তাই গড়িয়ে পড়ল বিকট ভালুক। অক্কা পেল কিনা, দেখবার সাহসও আর হল না। চোঁ চা দৌড় দিয়ে বাড়িতে ফিরে এল দুজনে।

দ্বীপে ভালুক? এতগুলি মাস ছিল কোথায় ভালুকটা?

ভালুক রহস্যের কিনারা হল না। এর রহস্য আরো জবর আকার ধারণ করল জখম ভালুকের দেহটি অদৃশ্য হওয়ার পর। এমন কি রক্তের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না গাছতলায়। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো? গুলিবিদ্ধ না হলে ভালুকটা গড়িয়ে পড়ত না মেঝেতে। তারপর উঠে চম্পট দিলেও রক্ত তো থাকবে। কিন্তু কোথায় রক্ত? পরে ফিরে গডফ্রে যখন দেখল বৃক্ষ [illegible] দিব্বি বহাল, তখন থেকেই বৃদ্ধি পেল তার বুকের ধুকপুকুনি। না জানি কোন দিক থেকে কখন অজান্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে আহত ভালুকটা।

বৃক্ষকোটরের বাকল পাল্লা মজবুত করতে হল শুধু এই ভয়ের জন্যেই। যখন তখন বাইরে বেরোনোও বন্ধ করতে হল। বেরোলেও বাসা ছেড়ে খুব দূরে যেত না গডফ্রে।

নভেম্বরে বৃষ্টি নামল দ্বীপে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে আকাশ ভেঙে পড়লে যে এমন সাংঘাতিক দৃশ্য দেখা যায়, গডফ্রে তা কল্পনাও করতে পারেনি। আগে থেকেই অবশ্য কাজ সেরে রেখেছিল সে। বৃষ্টি এলে বাইরে আগুন জ্বালানো যাবে না জেনে কোটরের মধ্যে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছিল একটা বাঁশের পাইপের তলায়। বাঁশের গাঁট পরিষ্কার করে ধোঁয়া বার

করার খাসা নল বানিয়েছিল বলেই কোটরের মধ্যে আগুন জললেও ধোঁয়া বেরিয়ে গেল বাইরে।

সুতরাং বৃষ্টির দাপাদাপিতে খুব একটা অসুবিধেতে পড়ল না গডফ্রেরা।

কিন্তু এর পরেই আবার মরতে মরতে বেঁচে গেল গডফ্রে!

এবার দেখা দিল বাঘ!

জংলী সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়েছিল গডফ্রে। উদ্দেশ্য কিছু যব সংগ্রহ করা। কোটরের ভাঁড়ারে ঐ জিনিসটির ঈষৎ ঘাটতি দেখা দিয়েছে দিন কয়েক। তাই জলকাদা মাড়িয়ে গডফ্রে চলেছে খাদ্য সংগ্রহে।

নদীর মোড় পেরিয়ে এসেছে দুজনে। বেশ কিছু গাছ গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে। এমন সময়ে গডফ্রে আঁৎকে উঠল।

ভাঁটার মত চোখ জলছে কার? কে ওভাবে গাছের গায়ে দু'পা তুলে হিংস্র চোখে তাকিয়ে তাদের দিকে?

বাঘ! সন্দেহ নেই—ভালুকের পর এবার বাঘ!

আর দেরী করা সমীচীন নয়। চক্ষের পলকে বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপে দিল গডফ্রে। বাঘটা ছিটকে গেল জমিতে। মরেছে কী?

আচম্বিতে সামনে ধেয়ে গেল জংলী সাগরেদ। হাতে উন্মুক্ত ছুরি—আর কিছু নেই! গডফ্রে তাকে বাধা দেওয়ারও সময় পেল না। জ্যামুক্ত তীরের মত সটান ছুটে গিয়ে বিনা দ্বিধায় কাফ্রী জোয়ান লাফিয়ে পড়ল বিশালকায় বাঘটার ওপর এবং চক্ষের নিমেষে হাতের ছুরি বাঁট পর্যন্ত গেঁথে দিল রক্তলোলুপের বক্ষদেশে।

সামান্য একটু ঝটাপটির পর বাঘটা ছিটকে গেল নদীর জলে। বর্ষার দৌলতে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীটিই ফুলে-ফেঁপে সগজনে বেয়ে চলেছিল পাক খেতে খেতে। বাঘের ছুরিবিদ্ধ দেহটি জলের ঘূর্ণিপাকে পড়তেই ডুবে ঘুরে পাক সাট খেয়ে ছুটে চলল পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে।

রক্তাক্তদেহে ফিরে এল জংলী। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। প্রাণ দিয়েও প্রাণ ফিরে পাওয়ার ঋণ শোধ করতে যে বদ্ধপরিকর, ডানপিটে সেই জংলীর প্রাণ নিয়ে না এবার টানাটানি পড়ে!

একী প্রহেলিকার গোলকধাঁধায় পড়ল গডফ্রে মরগ্যান? এতগুলি মাস যে-দ্বীপে হিংস্র শ্বাপদের লেজের ডগাও দেখা যায়নি, সহসা সেখানে মাত্র কয়েক-

দিনের ব্যবধানে ভালুক এবং বাঘ? ব্যাপারটা কী? এ কোন ভূতের তাণ্ডব শুরু হল ভুতুড়ে দ্বীপে?

গডফ্রের স্নায়ু এখন অনেক শক্ত। পোড় খাওয়া ছেলের মতই বিপদ দেখে বিপদের সামনে দাঁড়াতে শিখেছে। তাই তার মাথায় এল নতুন চিন্তা। নখী-দন্তীদের খপ্পর থেকে বাঁচতে হলে বৃক্ষকোটরের বাসাকে আগে সুরক্ষিত রাখা দরকার। কঠিন কাজ কিছু নয়। একটা বেড়া দিয়ে ঘিরতে হবে বাসাবাড়ীকে। তাহলেই নিশ্চিন্ত মনে অন্ততঃ রাতটা তো ঘুমোনো যাবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। নাচের মাস্টার জংলী সহচর এবং মাস্টার-মশায়কে নিয়ে কুড়ুল কাঁধে বেরিয়ে পড়ল গডফ্রে। গাছের কোটর থেকে কিছু দূরে জঙ্গলে পৌঁছে ডাল কেটে জড়ো করা হল দিন কয়েক ধরে। তারপর একসঙ্গে আঁটি বেঁধে নদীর জলে ভাসিয়ে টেনে আনা হল বৃক্ষকোটরের কাছে। এইখানে নদী পারাপারের জন্যে বহু আগে থেকেই একটা সাঁকো বানিয়ে রেখেছিল গডফ্রে। কাঠের বাণ্ডিল এই সাঁকোর কাছে জল থেকে তোলা হল এপারে। তারপর তাই দিয়ে খুঁটি পুঁতে, আড়াআড়ি ভাবে কাঠ লাগিয়ে বেড়া বানাতে গেল আরো কয়েকটা দিন।

সম্পূর্ণ হল বেড়া। মনের আনন্দে শেষ কাজ সারছে গডফ্রে। অর্থাৎ একটা মজবুত দরজা বানাচ্ছে বেড়ার গায়ে। এমন সময়ে চমকে উঠল জংলীর জংলা হাঁকে।

কি হল আবার? হঠাৎ এরকম অদ্ভুত হাঁকডাক কেন? চোখ তুলে চাইল গডফ্রে। কাফ্রী সহচর গাছের ওপর উঠে কোটরের ওপরকার সেই ফুটোটা ঢাকছিল ডালপালার আচ্ছাদন দিয়ে! সেইখান থেকেই বেধড়ক চিল্লাচ্ছে জংলী মহাশয়।

দূরবীন নিয়ে ঝটপট মগডালে উঠে গেল গডফ্রে। আঙুল তুলে যেদিকটা দেখাল জংলী, সেদিকে তাকাতেই দেখা গেল দ্বীপের আর একটা পুরোনো রহস্যকে।

ধোঁয়া! কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে মাইল কয়েক দূরে দ্বীপের অন্য প্রান্তে!

মাস্টারমশায়কে কোটর পাহারায় রেখে জংলী স্যাঙাতকে সঙ্গে নিয়ে বায়ুবেগে ছুটে চলল গডফ্রে মরগ্যান। ধোঁয়াকে এ-দ্বীপে আরও দুবার দেখা গেছে। কিন্তু আর কাউকে দেখা যায়নি। এ ধোঁয়া গত দুবারের ধোঁয়ার

চাইতে বড় গোছের। সুতরাং ধোঁয়া নেভবার আগেই পৌছোনো যাবে এবং জানা যাবে কে বা কারা এই রহস্যজনক ধূম্রকুণ্ডলীর স্রষ্টা।

একী! একী! একী! আচমকা ধোঁয়াটা মিলিয়ে গেল কেন? যেন নিমেষ মধ্যে নিভিয়ে দেওয়া হল ধোঁযাকে। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে জায়গাটায় এসে পৌছোলো ওরা। ধোঁয়া না থাকলেও ধোঁয়া ওঠার জায়গাটা খেয়াল ছিল বলেই বেগ পেতে হল না অগ্নিকুণ্ডের দগ্ধাবশেষ আবিষ্কার করতে।

খানিকটা ছাই আর পোড়া কাঠ পড়ে পাথরের আড়ালে! আগুন জলেছিল নিশ্চয়। কিন্তু যে জ্বালিয়ে ছিল সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

মুখ চূণ করে বাড়ী ফিরছে গডফ্রে। এমন সময়ে পিলে চমকে উঠল জংলীর প্রচণ্ড ধাক্কায়। প্রাণটাও বেঁচে গেল ঠিকরে মাটিতে পড়ার দরুন!

অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সাপের ছোবল!

র‍্যাটল সাপ বড় বিষধর সাপ। এ সাপ যখন ছোটে, ঠিক যেন ঝুমুর ঝুমুর করে নুপুর বাজাতে থাকে। কারণ আর কিছুই না। র‍্যাটল সাপের লেজের ডগায় হাড়গুলি আলগা। তাই হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে অমন শব্দ হয়।

কালান্তক সেই র‍্যাটল সাপ সাঁ করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। পরক্ষণেই ঝুমুর ঝুমুর করে চম্পট দেওয়ার ফিকিরে ছিল বোধ হয়, কিন্তু পারল না জংলীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যে।

বিদ্যুৎবেগে নেমে এল তার কুঠার। সরীসৃপের হিলহিলে ক্ষিপ্রতাকেও হার মানিয়ে ক্ষিপ্রতর বেগে নেমে এসে দু-টুকরো করল নাগমশাইয়ের লিকলিকে দেহ!

তারপর?

তারপর দেখা গেল আরও কয়েকটা সাপ এদিকে-সেদিকে। দেখেই উড়ুউড়ু হল গডফ্রের প্রাণপাখী। সর্বনাশ! যে দ্বীপে বিছেটি পর্যন্ত দর্শনদান করেনি এই ক'মাস, সহসা সেখানে এত সর্প এল কোত্থেকে? ভালুক, বাঘ, শেষে সর্প?

না। এই শেষ নয়। আরো আছে!

নাগরাজ্য ছেড়ে তিনলাকে নিরাপদ ব্যবধানে বেরিয়ে এল সাগরেদ সহ

মরুদ্যান এবং বেগবান শকটকেও হার মানানোর গতিতে ফিরে এল বৃক্ষকোটরে।

কিন্তু দূর থেকেই শোনা গেল ভয়ার্ত চীৎকার।

মাস্টারমশায় চেঁচাচ্ছেন! প্রাণের ভয়ে চেঁচাচ্ছেন! শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন বলে নয়, নধর বপুটাকে স্টীম ইঞ্জিনের মত প্রবলবেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। ঐ রকম একটা কুমড়োপটাস বপু যে অমন গতিবেগ অর্জন করতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু কেন? অমন আর্ত চীৎকার করে হরিণের মত দৌড়োনোর কি দরকার পড়ল নৃত্য-শিক্ষকের? দৌড়টা নিশ্চয় নতুন-ধরনের কোনো নাচ নয়—কেননা তিলমাত্র নাচের ছন্দ নেই প্রায়-অদৃশ্য ছুটন্ত পদযুগলে। তবে?

কারণটা আবিষ্কার করতে মাস্টারমশায়ের পেছন দিকে তাকাল গডফ্রে। চক্ষু চড়কগাছ হল সঙ্গে সঙ্গে।

ভীষণ চেহারার একটা কুমীর নদীর জল থেকে উঠে এসে তাড়া করেছে বেচারী ড্যান্স-মাস্টারকে!

কুমীর! অবশেষে কুমীর! হল কি ফেগা দ্বীপের? একী রহস্যলহরী শুরু হয়েছে গোবেচারা দ্বীপটিতে?

কিন্তু চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না! ভয়ের চোটে নাচের মাস্টার ভুলে গেছেন, কুমীরের খপ্পর থেকে বাঁচতে হলে এঁকে-বেঁকে দৌড়োনো দরকার। উনি দু-পা শূন্যে তুলে দৌড়োচ্ছেন সিধে সামনের দিকে। ফলে, কুমীরের বিকট হাঁ-য়ের মধ্যে যেতে আর বিলম্ব নেই নৃত্যশিক্ষকের।

বন্দুক তুলল গডফ্রে। লক্ষ্যস্থির করে গুলি করল। নির্ভুল লক্ষ্য। ছিটকে পড়ল কুমীর বাহাদুর!

প্রাণ বাঁচল নাচের মাস্টারের। কিন্তু কুমীর রহস্যর সুরাহা হল না।

বর্ষা গেল, এল শীত। হাড়ভাঙা শীত। বরফ পড়া পযন্ত বাদ গেল না। ঠাণ্ডায় জমে নির্ঘাৎ মারা যেত দ্বীপবাসীরা যদি না সিন্দুকের ভেতর থেকে পাওয়া যেত এক গাদা গরম জামাকাপড়। সেই সঙ্গে শুরু হল ঝড়ের দাপট। কত ডাল পালা যে ভেঙে পড়ল, তার ইয়ত্তা নেই। একদিক দিয়ে ভালই হল। শুকনো কাঠকুটো দিয়ে কোটরের মধ্যে চুল্লীটাকে জ্বালিয়ে রাখা গেল এক নাগাড়ে।

কোটরের মধ্যে চুপচাপ বসে না থেকে আর একটা কাজ সেরে রাখল

গডক্রে। কোটরেব কেঠো গা কেটে পা রাখবার জায়গা বানিয়ে নিল অনেকটা সিঁড়িব ধাপের মত। বলা যায় না কখন কোন দিক থেকে বিপদ এসে হানা দেয় দোব গোড়ায়। ঐতো অপলকা পাল্লা। চটপট কোটরের ছাদে উঠতে হলে একটা সিঁড়ি দবকাব বইকি।

বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছিল গডক্রে।

শীতার্ত বাতে গুটি সুটি মেবে শুয়ে আছে তিনজনে। আচম্বিতে দূব হতে ভেসে এল বন্যজন্তুদেব ক্রুদ্ধ গর্জন।

সচমকে উঠে বসল তিনজনে। না। ভুল হযনি। একই গজবানি তিনজনেই শুনেছে। দূব হতে কাছে এগিযে আসছে অনেকগুলো হিংস্র শ্বাপদের ভযাবহ হুংকাব।

একী কাণ্ড! ছটি মাস ফেণাদ্বীপে নির্বিঘ্নে কাটানোর পড এসব কি উৎপাত আরম্ভ হয়েছে? কোথায ছিল এত জন্তু? বাঘ, সিংহ, নেকড়ে হাযনাব ক্ষুধিত চীৎকাব এভাবে ইতিপূর্বে দ্বীপে কখনো শোনা যায়নি তো?

এগিয়ে এসেছে! পালে পালে বত্তথেকে চতুষ্পদেব দল আবো এগিয়ে এসেছে! বেড়াব গাযে ধাক্কা মাবছে ছাগল ভেড়াব দল। প্রাণভযে দিশেহাবা হয়ে গিযেছে ওবা।

বাকলেব পাল্লা খুলে ছুটে বেরিযে গেল গডফে। ভীত ছাগল ভেড়াকে ভেতরে ঢুকিয়েছে, এমন সমযে অন্ধকাবেব মধ্যে দেখল একজোড়া ধকধকে চোখ। চোখ তো নয যেন আগুনেব মালসা।

বেড়ার দবজা বন্ধ কবাব আব সময ছিল না। এক হ্যাচকা টানে তংলী সাগবেদ গডফ্রেকে কোটবে টেনে বন্ধ কবে দিল পাল্লা। ততক্ষণে পাইকারী হত্যা আবম্ভ হযে গিযেছে বেড়াব মধ্যে। বেশ কএকটা হিংস্র জীব ঢুকে পড়েছে ভেতবে। থাবার ঘাযে, দাঁতেব কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে অসহায় ছাগল ভেড়াগুলো। কাতব চীৎকাবেব সঙ্গে ক্রুদ্ধ গজবানি মিলে মিশে যেন নাবকীয় শব্দলহরী আছড়ে পড়ছে বিহ্বল তিনটি মানুষেব কর্ণকুহরে।

কাঠ হযে বসে বইল ওবা। বিছানায মুখ গুঁজে গোঙাতে লাগলেন নাচেব মাস্টাব। আওয়াজ ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছে। দূব থেকে যেন আরও হাঁক ডাক ভেসে আসছে। আবও জন্তুজানোযাব রক্তেব সন্ধানে যেন ছুটে আসছে এই দিকে।

তবু রক্ষে, কোটবের অপলকা পাল্লাব সন্ধান পাযনি ওবা। বিপুলকায়

একটি জানোয়ার তেড়েমেড়ে ধাক্কা মারলেই তো প্রবেশ পথ দুহাট হয়ে যাবে। সুতরাং ট্যাঁ-ফোঁ না করে চুপচাপ বসে থাকাই ভাল।

কিন্তু তা আর হল না!

আচমকা পিস্তল নির্ঘোষ শোনা গেল কোটরের মধ্যে।

লাফিয়ে উঠে গড়ক্রে দেখল, ভয়ে আধমরা নাচের মাস্টার বিভলবার ছুঁড়ছেন বিছানায় বসে! গুলি দরজা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে।

বিভলবার তক্ষুনি কেড়ে নেওয়া হল বটে, কিন্তু ক্ষতি যা হবার, তাতো হয়ে গেল!

একসঙ্গে সব কটা জানোয়ার চড়াও হল পাল্লার ওপর।

আর নয়। কোটর আর নিরাপদ নয়। মগডাল এখন একমাত্র নিরাপদ স্থান। মাস্টার মশায়কে ঠেলে ঠুলে তুলতে হবে সবার আগে।

তার আগে এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করা দরকার। ঘুলঘুলি দিয়ে নলচে বার করে বসল গড়ফে। দেখাদেখি ক্যাপ্টেনটিও একটা বন্দুক তুলে নিয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে তাগ করল বাইরে।

কী আশ্চর্য! জীবনে যে বন্দুক ছোঁয়নি, এত আত্মবিশ্বাস তার এল কোত্থেকে? তার চাইতেও বড় কথা, এমন নির্ভুল লক্ষ্যভেদ আনাড়ির পক্ষে সম্ভব কি? অন্ধকারের মধ্যে চলমান জমাট অন্ধকার অথবা গনগনে চক্ষু দেখলেই বন্দুক ছুঁড়ছিল দুজনে এবং প্রতিবার বন্দুক নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছিল ক্রুদ্ধ কাতর গর্জনধ্বনি। আশ্চর্য! আশ্চর্য! কত আশ্চর্য আর দেখতে হবে গড়ক্রে মরগ্যানকে?

গুলি খেয়ে পিছু হটে গেছে জানোয়াররা।

কিন্তু রাত দুপুরে ফের এল তারা। এবার আর বন্দুকের সামনে বুক দিল না কেউই। উল্টে প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হয়ে গেল পাল্লার ওপর। পাল্লা আর টিঁকবে না।

মাস্টার মশাই কই? তাকে যে আগে তুলতে হবে মগডালে।

কিন্তু তার দরকার ছিল না। সবার আগেই মগডালে উঠে গেছেন মাস্টার মশায় টিকটিকির মত! এবং সেইখান থেকেই চেঁচাচ্ছেন প্রাণের ভয়ে!

মরগ্যান উঠে এল জংলী সাগরেদকে নিয়ে। কোটরের ছাদের ফুটো দিয়ে বন্দুক বাড়িয়ে তাগ করল ভেতরে। রক্তলোলুপদের রক্তের নেশা ছুটে যাবে এবার!

বেল্ট দিয়ে নৃত্যশিক্ষককে বেঁধে রাখা হল গাছের ডালে। নইলে ভদ্রলোক আর একটু হলেই পড়ে যেতেন বাঘের মুখে!

পাল্লা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে! অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কতগুলো জানোয়ার ঢুকছে ভেতরে। কিন্তু সব যে লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল তাদের দাপাদাপিতে।

আচম্বিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল বৃক্ষতলে!

আগুন কোত্থেকে এল? পাথর ঘেরা চুল্লীর মধ্যে থেকে! উন্মত্ত জন্তুর দল পাথরের উনুন ভেঙে আগুন ছড়িয়ে দিতেই শুকনো কাঠে আগুন লেগে গেছে। আগুন স্পর্শ করেছে কোটরের গা। ধোঁয়া উঠে আসছে ছাদের ফুটো দিয়ে।

সহসা প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে থর থর করে কেঁপে উঠল বনভূমি, প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল গাছটা। বেল্ট বাঁধা অবস্থায় 'বাবাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন নৃত্য-শিক্ষক।

বিস্ফোরণটা ঘটেছে কোটরের মধ্যেই। আগুনের ছোঁয়ায় গুলিবারুদের ভাঁড়ার উড়ে গিয়েছে!

বিস্ফোরণের ফলে অবশ্য লাভ হল একটাই। কিছু জন্তু জখম হয়ে ছিটকে পড়ল। বাদবাকীরা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল নিরাপদ অঞ্চলে।

বারুদের স্তূপে আগুন লাগলে আগুন তো আরও ছড়িয়ে পড়বে! এতক্ষণ যা ছিল শুধু অনল, আচম্বিতে তা হয়ে দাঁড়াল যেন দাবানল। গোটা গাছটায় চক্ষের নিমেষে আগুন ধরে গেল। লেলিহান শিখায় জীবন্ত দগ্ধ হতে চলল বৃক্ষারূঢ় তিন ব্যক্তি। আগুনের আভায় প্রদীপ্ত হল বহুদূর পর্যন্ত।

মৃত্যু সুনিশ্চিত। আগুনের বেড়াজাল থেকে আর রক্ষে নেই। নীচে নামারও উপায় নেই! ঠিক এই সময়ে প্রচণ্ড মড় মড় ধ্বনি উত্থিত হল গাছের তলা থেকে। দুলে উঠল ডালপালা। হেলে পড়ল একদিকে।

পোড়া গাছ এবার পড়ছে! ডাল থেকে আর একটু হলেই ঠিকরে পড়ে যেত মরগ্যান এবং তার জংলী সাগরেদ। রক্ষে পেল কেবল গাছটা অকস্মাৎ পাশের একটা মহীরুহে আটকে যাওয়ায়।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল গডফ্রে মরগ্যানের। একী দুর্দৈব? ভাগ্য তাদের নিয়ে কেন এভাবে ছিনিমিনি খেলছে? নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম লিখন অনুযায়ী কি এইভাবেই মৃত্যু নির্দিষ্ট রয়েছে ওদের ললাটে?

ঠিক এই সময়ে একটা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল একেবারে কাছে। পরিষ্কার ইংরাজীতে উচ্চারণে কে যেন বলছে :

"মিস্টার মরগ্যান, আপনার মামা মিস্টার কোল্ডরুপের এ-দ্বীপে পৌঁছোনোর কথা আজকেই। যদি না আসেন, তাহলে কেউই আর বাঁচব না!"

বিষম চমকে ফিরে তাকাল গডফ্রে। দেখল, মার্কিন ঢঙের ইংরেজীর খই ফুটছে যার মুখে, দীর্ঘ এই কটি মাস অসংখ্য বার তালিম দিয়েও তার মুখ দিয়ে সহজতম ইংরেজীও বার করা যায় নি।

বক্তা সেই জংলী সাগরেদ!

এরপর যদি পিলে না চমকায় তো, সে পিলে মানুষের পিলেই নয়। গডফ্রে মরগ্যান আঁৎকে উঠল কাফ্রীর মুখে সুসভ্য বচনমালা শুনে।

বিমূঢ়ের মত, বোকার মত বলল গডফ্রে—"তুমি···তুমি···।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই বলছি। মিস্টার কোল্ডরুপ আজ যদি না আসেন তো দফারফা হয়ে গেল আমাদের", উদ্বিগ্ন মুখে বলল কাফ্রী নন্দন।

আচম্বিতে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক দুমদাম শব্দ করে উঠল অদূরে। দেখা গেল, এক দঙ্গল খালাসী বন্দুক উঁচিয়ে এদিকেই ছুটে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ছেঁদা হয়ে যেন হুড় হুড় করে বৃষ্টি নামল। জলের ধারায় ফুস করে নিভে গেল প্রলয়ংকর অগ্নি।

"গডফ্রে! গডফ্রে!" অত্যন্ত চেনা গলায় কে যেন ডাকছে ছুটন্ত খালাসীদের পেছন থেকে।

হুড়মুড় করে হেলে পড়া গাছ থেকে নেমে এল গডফ্রে এবং ইংরেজী জানা কাফ্রী-তনয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভীষণ চেনা গলাটা ফুর্তি-উচ্ছল কণ্ঠে শুধোলো পেছন থেকে—"কিরে রবিনসন ক্রুশো, আছিস কেমন?"

বোঁ করে পেছন ফিরেই বক্তাকে দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল গডফ্রের—"মামা, আপনি?"

অট্টহেসে বললেন মিস্টার কোল্ডরুপ—"আঁৎকে উঠছিস কেন রে? আমার দ্বীপে আমি আসব না?"

"ফেণা দ্বীপ আপনার?"

"আরে গেল যা! এটা আবার ফেণা দ্বীপ হল কবে থেকে? এর নাম তো স্পেনসার দ্বীপ। ছমাস আগে কিনেছি আমি।"

পেছন থেকে শোনা গেল আর একটা কণ্ঠস্বর। ভারী মিষ্টি স্বরে শুধোলো ফেণা স্বয়ং—"গডফ্রে আমার নামেই দ্বীপের নামকরণ করেছে, বাবা।"

"আর এই গাছ-বাড়ীর নাম দিয়েছি আপনার নামে", উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে গডফ্রে।" "কিন্তু এ সবের মানে কি মামা?"

"তোর অ্যাডভেঞ্চারের সখ মেটাবো বলে। জাহাজডুবি হয়ে দ্বীপবাসের নেশা কি ছুটেছে? নাকি আরো কমাস থাকবি?"

"ওরে বাবা! আর না! কিন্তু তোমার জাহাজটা তো ডুবে গেল।"

"তোর মুণ্ডু! জাহাজ মোটেই ডোবেনি। তোকে ভড়কে দেওয়ার জন্যে ডেক পর্যন্ত ডোবানো হয়েছিল। যেই পাথরে গিয়ে বসলি, জল চেঁচে ফেলে দিয়ে ক্যাপ্টেন জাহাজ নিয়ে ফিরে এল সানফ্রান্সিসকো। এখান থেকে মাত্র তিন দিনের পথ তো!"

"মাত্র তিন দিনের পথ!"

"অ্যারে হ্যাঁ হ্যাঁ!"

"জাহাজের কেউ জলে ডোবেনি?

"কেউনা। শুধু ঐ সেই চীনে ছোকরাটার আর পাত্তা পাওয়া যায়নি। মনে আছে, বিনা টিকিটে খোলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে?"

"তাতো মনে আছে। কিন্তু রগড় করতে গিয়ে আমাদের প্রাণে মারতে গিয়েছিলে যে। জংলী ভর্তি ক্যানো—"

"দূর বোকা! ক্যানোটা আমার। জংলীরা ভাড়াটে অভিনেতা। ভাগ্যিস তোদের গুলি কারো গায়ে লাগেনি।"

"অ্যাঁ! আর, এই জংলীটা?"

"ও আবার জংলী হল কবে? ও তো আমার নিগ্রো চাকর।'

"জানো মামা, ও দু'দুবার প্রাণ বাঁচিয়েছে আমার। বাঘ আর ভালুকের হাতে যদি পড়তাম—"

"দুটোই খড়ের পুতুল।"

"কি—কি বললে?"

"বাঘ আর ভালুকের ভেতরে ছিল খড় আর স্প্রিংয়ের কলকব্জা। তাই থাবা ছুঁড়েছে, মাথা নেড়েছে, তুই ভেবেছিস আসল বাঘ, আসল ভালুক। তোর নিগ্রো স্যাঙাতই আগে ভাগে ওগুলো সাজিয়ে রাখত রাস্তার ওপর।"

"সাপ আর কুমীরকেও তুমি পাঠিয়েছিলে আমাকে মারবার জন্যে?"

"সাপ আর কুমীর!" অবাক হলেন মিস্টার কোল্ডরুপ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জ্যান্ত সাপ, জ্যান্ত কুমীর।"

"সাপ, কুমীর তো আমি পাঠাইনি গডফ্রে।"

"তবে তারা এল কোত্থেকে? এত বাঘ সিংহই বা কোত্থেকে এল?"

"তাও তো একটা কথা। স্পেনসার দ্বীপে হিংস্র জানোয়ার একদম নেই জেনেই তো তোকে পাঠিয়েছিলাম রে। দলিলেও তাই লেখা আছে।"

ইতিমধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন খালাসীদের দিয়ে মগডাল থেকে নামিয়ে আনল আধমরা নৃত্য শিক্ষককে।

গডফ্রে বললে—"আমাকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার এতই যদি ইচ্ছে ছিল তোমার তো সিন্দুকভর্তি অত জিনিসপত্র পাঠিয়ে আমার নবাব করে দিয়েছিলে কেন?"

"সিন্দুক! আমি তো সিন্দুক পাঠাইনি! ক্যাপ্টেন?"

মাথা চুলকে ক্যাপ্টেন বলে উঠল—"আজ্ঞে, আমার দোষ নেই। ফেণা এমন জুলুম করল যে—"

চোখ নামিয়ে রইল ফেণা।

মুচকি হেসে বললেন মিস্টার কোল্ডরুপ—"অ! বুঝেছি। গডফ্রে, দ্বীপটা তোকেই দান করে দিয়েছি। তুই বরং এখানেই থেকে যা।"

"আমি?" আঁৎকে উঠল গডফ্রে—"না, মামা, আর না।"

"তবে বেশ। বাড়ী গিয়েই কিন্তু বিয়ে করতে হবে। রাজী?"

"রাজী। কিন্তু মামা—"

"আবার কিন্তু কিসের?"

"দ্বীপে তিন-তিনবার ধোঁয়া উঠতে দেখেছি। আগুন জ্বালত কে?"

"ভূতে।" কাষ্ঠ হেসে বললেন মিস্টার কোল্ডরুপ। আসলে তিনি নিজেও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন দ্বীপে এত জন্তুজানোয়ার আর ধোঁয়ার রহস্য নিয়ে।

বিয়ে হয়ে গেল গডফ্রে আর ফেণার।

নৃত্যশিক্ষকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে ওরা তো অবাক। ঘরের দেওয়াল থেকে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা কুমীর। এটা সেই কুমীর যাকে খতম করে মাস্টারের প্রাণ বাঁচিয়েছিল গডফ্রে।

মিস্টার কোল্ডরুপও ছিলেন সেখানে। নৃত্যশিক্ষক গদগদ কণ্ঠে বললে "স্যার, কুমীরটা কার বলুন তো?"

"আপনিই বলুন না মশায়।"

"মিস্টার টাসকিনারের।"

সটান উঠে বসলেন মিস্টার কোল্ডরুপ—"টাসকিনারের? নীলাম ডাকে স্পেনসার আইল্যাণ্ড কিনতে এসেছিল যে, গুবরে পোকা সেই মোটা টাসকিনারের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কুমীরের চামড়ায় একটা লেবেল সাঁটা আছে। তাতে লেখা আছে কোন পশুশালা থেকে কুমীরটা পাঠানো হয়েছে মিস্টার টাসকিনারকে।"

চোখ পাকিয়ে গুম হয়ে রইলেন মিস্টার কোল্ডরুপ। পরক্ষণেই দমফাটা হাসি হেসে গড়িয়ে পড়েন আর কি! ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল তার কাছে। দ্বীপ কিনতে না পেরে শাসিয়ে গিয়েছিলেন মোটা টাসকিনার। তাই দেদার টাকা খরচ করে দেশ-বিদেশের পশুশালা থেকে বিস্তর জন্তুজানোয়ার কিনে এনে ছেড়ে দিয়েছেন স্পেনসার আইল্যাণ্ডে।

ধোঁয়া রহস্য? সে রহস্যও আর রহস্য নেই। ফেণা দ্বীপ থেকে জাহাজে তিনদিন বাদে সানফ্রান্সিসকো বন্দরে ফিরে আসতেই জাহাজের খোল থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে এসেছিল সেই চীনেম্যান! ছমাস আগে একেই দেখা গিয়েছিল জাহাজের খোলে। ছমাস ছিল সে নিপাত্তা!

তবে কি এই ছমাস জাহাজের খোলেই লুকিয়ে ছিল সে? মোটেই না। ছিল ফেণা দ্বীপে। একাকী থেকেছে এই ছটি মাস। ইচ্ছে করেই গডফ্রের সান্নিধ্যে আসেনি। কারণ চীনেরা একা থাকতেই ভালবাসে, তারা একাই একশ এবং তারা অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু!

ধোঁয়া-রহস্যর চৈনিক চালে গডফ্রে মরগ্যানের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছে এই মহাপ্রভুটিই!

গডফ্রে এবং ফেণা এখন সুখে ঘরকন্না করছে। মাংসাশী জন্তুগুলো পরস্পরকে খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত ফেণা দ্বীপ মাড়াতে দুজনের কেউই রাজী নয়।

উত্তর মেরু নীলামে উঠল
(দি পারচেজ অফ দি নর্থ পোল)

....

১॥ উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির বিজ্ঞপ্তি

"মিস্টার ম্যাসটন এমন ভাব করছেন যেন সত্যিই অঙ্ক বা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ব্যাপারে মেয়েদের কোনো অবদান নেই!"

"দুঃখিত মিসেস স্করবিট, কিন্তু কথাটা সত্যি!" বললেন জে. টি. ম্যাসটন। "অঙ্কে মাথাওয়ালা আশ্চয মেয়েছেলে কিছু-কিছু পৃথিবীতে জন্মেছে বটে, বিশেষ করে রাশিয়ায়, কিন্তু তাঁদের কারোর মাথা আর্কিমিডিস বা নিউটনের সমান নয়।"

"মেয়েজাতের হয়ে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি, মিস্টার ম্যাসটন!"

"মেয়েজাত বড় মিষ্টি জাত, মিসেস স্করবিট! উচ্চশিক্ষার পক্ষে অচল্!"

"আপনি তাহলে বলতে চান গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে মেয়েরা কস্মিনকালেও মহাকর্ষ আবিষ্কার করতে পারতো না?"

"গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখলে মেয়েরা একটা কাজই করতে পারে—তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলা—ইভ যা করেছেন!"

"ফুঃ! মেয়েদের কোনো যোগ্যতাই নেই বলতে চান?"

"যোগ্যতা? মিসেস স্করবিট, পৃথিবীটাকে মেয়েরাও ভোগ করে এসেছে ইভের সময় থেকে, কিন্তু অ্যারিসটটল, ইউক্লিড, কেপলার, লাপ্লেস কেউ হতে পেরেছে কি?"

"এটা কি একটা যুক্তি? অতীত দিয়ে ভবিষ্যতের বিচার হয়?"

"হাজার বছরেও যারা কিছু করতে পারেনি, হাজার বছরেও তারা কিছু করতে পারবে না।"

"সেইজন্যই তো এবার কিছু করা দরকার, মিস্টার ম্যাসটন—"

"মিসেস স্করবিট।"

"পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করণীয় আছে। আপনি তুখোড় অংকবাজ; অসাধারণ গণিতবিদ; অংক কষে বন্ধুদের সেবা করুন; আমি করব টাকা দিয়ে।"

"চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব সেজন্যে।"

শুনে আবার রাঙা হলেন মিসেস স্করবিট। লজ্জা পাওয়ার কারণ আছে। প্রথমতঃ, জে. টি. ম্যাসটনের ওপর ওঁর দারুণ সহানুভূতি; দ্বিতীয়তঃ, মেয়েদের মনের তলা খুঁজে পাওয়া ভার! কার মনে কি আছে তা কি বলা যায়?

মিসেস স্করবিট জাতে আমেরিকান। যে-কাজে তিনি টাকা ঢালতে যাচ্ছেন, সে-কাজটিও সামান্য নয়।

প্ল্যান এবং পরিণামটা সংক্ষেপে এই:

মালটি ব্রান, রিক্লুজ, সেন্ট-মার্টিন প্রভৃতি ভূগোল-বিশারদরা সুমেরু অঞ্চল সম্বন্ধে বলেছেন, ৭৮ সমাক্ষ রেখার ওপরে রয়েছে চোদ্দ লক্ষ বর্গমাইল জমি আর সাত লক্ষ বর্গমাইল জল।

এযুগের ডানপিটে অভিযাত্রীরা ৮৪ ডিগ্রী অক্ষাংশ পযন্ত এগিয়েছেন। সমুদ্র উপকূল পৌছে দেখেছেন শুধু হিমশৈল, ঐখান থেকেই তারা নামকরণ করেছেন বিভিন্ন অন্তরাপ, উপসাগর, পর্বতের। কিন্তু ৮৪ ডিগ্রীর ওপারে বিরাজ করছে চির-রহস্য। দুর্লঙ্ঘ্য হিমশৈল পেরিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই, সুমেরু পযন্ত ৬ ডিগ্রী পরিমাণ জায়গায় জল আছে কি ডাঙা আছে। তা আজও অজ্ঞাত।

১৮০০—সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্থির করলেন সুমেরু ঘিরে অনাবিষ্কৃত অঞ্চল নালামে বেচে দেবেন। একটা আমেরিকান সমিতি আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল উত্তর মেরু কিনে নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে।

অবশ্য বার্লিনের একটা আলোচনা সভায় কতকগুলো বিধি নিষেধ ঠিক করা হয়েছিল অন্যের জমিতে অনুপ্রবেশকারী বৃহৎ শক্তিসমূহের জন্যে। উপনিবেশ পত্তন বা কারবার ফাঁদা—এই দুই উদ্দেশ্যে বড়-বড় রাষ্ট্ররা যেন সিদ্ধান্তগুলি মেনে চলেন—এইটাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক রাষ্ট্র গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি বার্লিন কনফারেন্সের সিদ্ধান্তকে। তাছাড়া, উত্তর মেরুতে কেউ থাকে না। যে-জমি কারোর নয়, সে-জমি বলতে গেলে সবারই। তাই শুধু উত্তর মেরুকে দখল করতেই চায়নি নতুন সমিতি, কিনে নিয়ে অন্যের দখল নেওয়াও বন্ধ করতে চেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা দেশ যে-দেশে কোমর বেঁধে কেউ কোনো সৎ কাজে উদ্যোগী হলে তার টাকার অভাব হয় না। বছর কয়েক আগেই তার নজীর পাওয়া গিয়েছে। বাল্টিমোরের গান-ক্লাব একটা প্রোজেকটাইল পাঠিয়েছিল চাঁদের দিকে; উদ্দেশ্য—চাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্যে দেদার টাকার দরকার ছিল এবং সে-টাকার অভাব

হয়নি। গান-ক্লাবের সদস্যদেরও তারিফ করা দরকার অতি-মানবিক এই ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে।

সুয়েজ খালের স্রষ্টা লেসেপ্স যদি ইউরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত নতুন খাল বানাতে চাইতেন (আটলান্টিকের তীরভূমি থেকে চীনদেশের জল পর্যন্ত), অথবা ফুটন্ত সিলিকেট পর্যন্ত কুয়ো খুঁড়ে কেউ যদি আগুনের চুল্লীতে আগুন সরবরাহের ফন্দী আঁটতেন, অথবা কোনো ইলেকট্রিসিয়ান যদি বিশ্বের বিক্ষিপ্ত তড়িৎ সমূহকে একত্র করে আলো আর উত্তাপের অফুরন্ত ফোয়ারা বানাতে চাইতেন, অথবা কোনো ডানপিটে ইঞ্জিনীয়ার যদি গ্রীষ্মের বাড়তি গরমকে চৌবাচ্চায় জমিয়ে রেখে শীতকালে হিম অঞ্চলে কাজে লাগানোর প্ল্যান খাড়া করতেন, অথবা কোনো বেনামী সমিতি ওই ধরনের কয়েক'শ অভিনব উদ্যোগে উদ্যোগী হতে চাইত—তাহলেই আমেরিকার জনগণ কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার ঢেলে দিয়ে যেত তহবিলে, আমেরিকার বিভিন্ন নদীর জল যেমন হু-হু করে সাগরে গিয়ে পড়ছে। ঠিক তেমনিভাবে দশদিক থেকে ডলারের স্রোত এসে জমা হত উদ্যোগীর পকেটে।

এই কারণে নানারকম জনমত দেখা দিল সুমেরুকে নীলামে ডেকে নেওয়ার প্ল্যান শুনে। বিশেষ করে বিভ্রান্তি দেখা গেল চাঁদার খাতা না থাকায়। সমিতি আগে ভাগে চাঁদা তোলার দরকার মনে করেনি। বেশ কিছু মজুদ টাকা হাতে নিয়েই তবে উত্তর মেরু নীলামে কিনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

কিন্তু উত্তর মেরু কিনে হবেটা কী? কোনো কাজে লাগবে কী? অসম্ভব! সুতরাং একবাক্যে সবাই বললে, নিশ্চয় কোনো উজবুকের মাথায় পোকা নড়েছে।

উদ্যোগ পর্বের মধ্যে কিন্তু লঘুতা বা পরিহাসের লেশমাত্র ছিল না। দুটো বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর সব কাগজে ছাপানোর জন্যে। একটা গিয়েছিল ইউরোপের সংবাদপত্রে। অপরটা আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশের খবরের কাগজে। আমেরিকার খবরের কাগজে ছাপা হল নীচের বিজ্ঞপ্তিটি:

ভূ-গোলকের বাসিন্দাদের উদ্দেশে:

"চুরাশি ডিগ্রীর মধ্যে অবস্থিত সুমেরু অঞ্চলকে অ্যাদ্দিন নীলামে না তোলার একমাত্র কারণ হল জায়গাটা আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে।

১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ অভিযাত্রী প্যারি পৌঁছেছিলেন ৮২ ডিগ্রী ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। জায়গাটা স্পিটবার্গের পশ্চিমে।

১৮৬৭ সালের মে মাসে স্যার জন জর্জেস নারেস-এর অভিযান গিয়েছিল ৮৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট ২৮ সেকেণ্ড পযন্ত—গ্রীনেল ল্যাণ্ডের উত্তরে।

"লেফটেন্যান্ট গ্রীলির নেতৃত্বে আমেরিকান অভিযান ১৮৮২ সালের মে মাসে পৌঁছেছিল ৮৩ ডিগ্রী ৩৫ মিনিট অক্ষাংশ পযন্ত—নারেস ল্যাণ্ডের পশ্চিমে।

"এর বেশী কোনো অভিযাত্রী এগোতে পারেন নি। চুরাশি ডিগ্রীর পরে ছ'ডিগ্রী পরিমাণ অঞ্চল—সুমেরু বিন্দু পযন্ত ভূগোলকের বিভিন্ন দেশের লাগোয়া এবং অখণ্ড অঞ্চল। সুতরাং এমন একটা অঞ্চলকে নীলাম হেঁকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানানো যায় না।

"জায়গাটা বসবাসের উপযুক্ত নয়। যেহেতু এতখান অঞ্চলের প্রকৃত মালিকানা কারো নেই, তাই যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঠিক করেছেন একটা রফার মধ্যে আসতে হবে এবং তল্লাটটাকে কাজে লাগাতে হবে। উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি, এই নামে একটা কোম্পানীর পত্তন হয়েছে বাল্টিমোরে। সরকারীভাবেই এই প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি। সাধারণ আইন-অনুসারে এই সমিতি সুমেরু অঞ্চলকে কিনে নিতে চায়। তাহলেই সুমেরু নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, দ্বীপ মহাদেশ—সব কিছুর ওপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সুমেরুর এ-হেন মালিকানা নিয়ে পরে কোনো গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

"সুতরাং নীলামে হেঁকে সর্বোচ্চ দামে যে কেউ উত্তর মেরুকে কিনে নিতে পারেন তেসরা ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাল্টিমোর শহরের নীলামঘরে।

"বিশদ বিবরণের জন্যে উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির অস্থায়ী প্রতিনিধি ডব্লিউ. এস ফস্টারকে চিঠি লিখুন। ঠিকানা—৯৩, হাইস্ট্রীট, বাল্টিমোর।"

বিজ্ঞপ্তি পড়ে পাবলিকের মুণ্ডু ঘুরে গেল। বেশীর ভাগ লোকে বললেন, এ-একটা অলীক পরিকল্পনা। একেবারেই অবাস্তব। কেউ কেউ বললেন, এ-হল আমেরিকানদের জাতিগত হামবড়াই। অন্যেরা বললে, মোটেই না, প্রস্তাবটা ভেবে দেখা দরকার। এরাই চোখে আঙুল দিয়ে অবিশ্বাসীদের দেখিয়ে দিলে, উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি নীলাম ডাকার জন্যে কারো কাছে চাঁদা চায় নি—শুধু অনুমতি চেয়েছে। চাঁদার দরকার তাদের নেই। পাবলিকের টাকা নিয়ে চম্পট দেওয়ার মতলবও নেই। নিজেদের টাকা দিয়েই কিনে নিতে চায় উত্তর মেরুকে। সেই অনুমতিই চেয়েছে পাবলিকের কাছে।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবশ্য বললেন, এত ভনিতা করার কোনো দরকার ছিল না। সরাসরি সুমেরুর দখল নিতে পারত কোম্পানী প্রথম দখলদার হিসেবে। কিন্তু সমস্যা তো সেইখানেই। তখনো পর্যন্ত সুমেরু অঞ্চল প্রত্যেকের কাছেই নিষিদ্ধ। সুতরাং কোম্পানী এমন একটা দলিল চাইল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে যে দলিলেব ভিত্তিতে ভবিষ্যতে কেউ তাদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। তাছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে এমন একটা অনুচ্ছেদ ছিল যা ভাবিয়ে তুলল অনেককে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, মালিকানা-সত্ব কোনো পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করবে না। সুমেরুর অবস্থান বা আবহাওয়া—এই দুটোই যদি পালটে যায় তাহলেও জায়গাটার অধিকার নড়চড় হবে না।

এই অনুচ্ছেদের এত বকম ব্যাখ্যা করা হল যে আসল মানেটা আবো গুলিয়ে গেল। সুমেরুর অবস্থান বা আবহাওয়ায় পরিবর্তন? তার সঙ্গে মালিকানা-সত্বর কি সম্পর্ক? ধড়িবাজ লোকেরা তখন আঁচ করলেন, নিশ্চয় লটঘটে কিছু ব্যাপার আছে উদ্ভট পরিকল্পনার অন্তরালে।

ফিলাডেলফিয়ার একটা কাগজে বেরোলো নীচের খবরটা:

'সুমেরুর মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে যারা তারা নিশ্চয় খবর পেয়েছে, শীগ্‌গিরই একটা শক্ত পাথরের ধূমকেতু কষে ধাক্কা মারবে পৃথিবীকে। ফলে, ভূগোল এবং বায়ুমণ্ডল দুটোই অন্যরকম দাঁড়াবে এবং সুমেরু থেকে তখন প্রচুর লাভ করা যাবে।'

যাঁরা গভীর চিন্তা করেন, তাঁরা শক্ত পাথরের ধূমকেতু কাহিনী পড়ে হেসে উঠলেন। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাবী সুমেরু-ক্রেতারা দু'পয়সা লোটবার ফিকিরে আছে। নিশ্চয় আসন্ন কোনো ঘটনার খবর তারা রাখে।

নিউ অর্লিয়েন্সের একটা খবরের কাগজ লিখল—"নতুন কোম্পানী নিশ্চয় বিশ্বাস করে বিষুবের অগ্রগমন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে যার ফলে সুমেরুকে কাজে লাগানো যাবে।"

আরেকজন সংবাদদাতা লিখলেন—"অসম্ভব কী? বিষুব সরে গেলে ভূ-বর্তুলের অক্ষরেখাও তো অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে।"

প্যারিসের 'সায়েন্টিফিক রিভিউ' লিখল—"আ্যার্ডাহিমার ভবিষ্যদবাণী করেছেন, বিষুবের অগ্রগমনের সঙ্গে অক্ষরেখার পরিবর্তন এক হলে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে তাপ মাত্রায় হেরফের ঘটবে। দুই মেরুর জমাট বরফও আর জমাট থাকবে না।"

'এডিনবরা রিভিউ' প্রতিবাদ করল এই বলে—"তার কোনো ঠিক নেই।

এ-অবস্থায় আসতে ১২,০০০ বছর লাগবে। ভেগা যখন ধ্রুবতারা হবে, আবহাওয়ায় পরিবর্তন তখনি দেখা দেবে।"

হয়ত অ্যাডহেমার ঠিকই ভবিষ্যদবাণী করেছেন। হয়ত সে রকম কোনো ভবিষ্যদবাণীর কল্পনাও করে নি নয়া কোম্পানী। কিন্তু কি যে তাদের মতলব, তা উদ্ভট অনুচ্ছেদের হেঁয়ালী পড়ে ধরা গেল না।

সমিতির সেক্রেটারী বা প্রেসিডেন্টকে ধরলে হয়ত হেঁয়ালীর মানে জানা যেত। কিন্তু সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট এমন কি সমিতির সদস্যদেরও নামও কেউ জানে না দেখা গেল। বিজ্ঞপ্তিটা এল কোত্থেকে, তাও রহস্যময়। বাল্টিমোরের এক কডমাছ কারবারী, নাম তার উইলিয়াম এস ফস্টার, বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়েছে কাগজে, এ ছাড়া সব কিছুই রহস্যাবৃত, হেঁয়ালীপূর্ণ।

সমিতির সদস্যরা প্রহেলিকা হলে কি হবে, তাদের অভিলাষে কোনো প্রহেলিকা ছিল না, বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটিই তার প্রমাণ।

জায়গাটা কম নয়। চুরাশি ডিগ্রী থেকে নব্বই ডিগ্রী পর্যন্ত ছ'ডিগ্রী পরিমাণ জায়গার প্রতি ডিগ্রীতে ষাট মাইল হিসেবে ব্যাসার্ধ দাঁড়ায় ৩৬০ মাইল, অর্থাৎ ব্যাস ৭২০ মাইল, অর্থাৎ পরিধি ২,২৬০ মাইল, অর্থাৎ ইউরোপের এক দশমাংশ অঞ্চল।

বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, জায়গাটা কারো নয়—সুতরাং সবারই। কারো দখলে নেই, অতএব যে কেউ দখল করতে পারে। যে হেতু কেউ সেখানে থাকে না, সুতরাং জায়গাটা নিজের বলে দাবী করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু আশপাশের অন্যান্য দেশের জমির সঙ্গে লাগোয়া, সুতরাং তার মনে করতে পারে তাদের জমিই সুমেরুর ভেতর পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং সে জমির দখল রাখার ইচ্ছে হলে নীলামে আসা হোক। নীলামের ব্যবস্থায় কারো মুখভার হওয়াও উচিত নয়, কেননা কাউকেই ঘাড় ধরে সেখানে বাস করানো সম্ভব নয়।

ছটা রাষ্ট্রের অধিকার সম্বন্ধে কারো দ্বিমত দেখা গেল না। এই ছ'টা রাষ্ট্র হল—আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন-নরওয়ে এবং হল্যাণ্ড।

জমিটা কিন্তু যাদের প্রকৃত অধিকারে, সেই এস্কিমো এবং অন্যান্য সুমেরু বাসীদের মতামত নেওয়ার দরকার মনে করল না কেউ।

দুনিয়ার নিয়মই এই!

(২) ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ

নিমেষ মধ্যে একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়ে গেল সারা দুনিয়ার সামনে। নয়া সমিতি সুমেরু কিনে নিলে তার একছত্র মালিক হয়ে বসবে আমেরিকা। উদ্দেশ্যটা ভাল চোখে দেখলনা প্রতিদ্বন্দ্বী রাস্ট্ররা। আমেরিকা দেশটা এমনিতেই সব কিছুর দিকে হাত বাড়িয়েই আছে। এরপর যদি সুমেরুটাকে গ্রাস করে বসে, তাহলে তো ভাবনার ব্যাপার।

অথচ ভাবনার কিছুই ছিল না। সুমেরু নিযে কারো পোয়াবারো হচ্ছে কী? মোটেই না। তাই সুমেরুর সঙ্গে যে-সব দেশের জমি সংলগ্ন নয়, তারা মুখ ঘুরিযে বসল। কিন্তু যাদের ভূভাগ চুরাশি ডিগ্রীর লাগোয়া, তারা ঠিক করলে টাকা যায যাক, আমেরিকাকে হটিযে সুমেরুর দখল রাখতেই হবে।

সব ব্যাপারেই ইংরেজরা চাকচিক্য জাঁকজমক পছন্দ করে। এ-ব্যাপারেও তারা ঠিক করল টাকার গরম দেখাবে। ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, হল্যাণ্ড এবং রাশিযার প্রতিনিধিরাও বাল্টিমোর কমিশনারের কাছে আর্জি পেশ করল যুক্তরাস্ট্রের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্যে।

পৃথিবীর মেরু-মুকুটের কত দাম হওয়া উচিত, তা নিয়ে অবশ্য সমস্যার সৃষ্টি হল। নীলামে হাজির হল যারা, তারা প্রত্যেকেই একটা না একটা দাবী নিয়ে এল। যেমন, ডেনমার্ক বললে, সুমেরু অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ রয়েছে। ডেভিস চ্যানেলে ডিস্কোদ্বীপ, বাফিন সাগরে বেশ কযেকটা অঞ্চল এবং গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূল তাদেরই দখলে। তাছাড়া, তাদের দেশ থেকেই বেশ কযেকজন অভিযাত্রী, যেমন বেরিং আর জাঁমুঙ্ক, সুমেরু অঞ্চলের ধারে কাছে বিজয় কেতন উড়িয়ে এসেছে। সুতরাং নীলামে হাজির হবেই ডেনমার্ক।

হল্যাণ্ড পেছিয়ে রইল না। ৭২ ডিগ্রীর ঠিক তলায় একটা দ্বীপের দখল নিয়েছিল তাদেরই সন্তান জাঁমেযেন, হল্যাণ্ডের অনেক অভিযাত্রী বহুকাল আগে থেকেই ঘুর ঘুর করেছে চুরাশি ডিগ্রীর ধারে কাছে। সুতরাং অতীত কাযকলাপের ভিত্তিতে হল্যাণ্ডের দাবী আছে বইকি সুমেরুর ওপর। রাশিয়াও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত হাজির করল। বাস্তবিকই সে-দেশের বহু অভিযাত্রী সুমেরু বিজয়ে অগ্রসর হয়েছে। উত্তর মহাসাগরের অর্ধেক তারাই শাসন করছে। সুমেরু থেকে মাত্র নশ মাইলের মধ্যে ৭৫ সমাক্ষরেখার বহু দ্বীপ, নিউ সাইবেরিয়ার অনেক অঞ্চল রাশিয়াই তো আবিষ্কার করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর

গোড়ার দিকে এবং শাসনে রেখেছে তখন থেকেই। তাছাড়া ইংরেজ, আমেরিকান, সুইডিসদের অনেক আগে একজন রাশিয়ানই তো বেরিয়ে পড়েছিলেন উত্তর অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সর্টকাট রাস্তা খোঁজার জন্যে—যাতে চটপট যাতায়াত করা যায় দুই মহাদেশের মধ্যে।

আমেরিকানদের উদ্বেগটা যেন একটু বেশী রকমের দেখা গেল। যেন কেন প্রকারেন সুমেরুর মালিক হতেই হবে। তাদের দেশ থেকেই বিস্তর দুঃসাহসিক অভিযান গিয়েছে সুমেরুর দিকে। তাছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়েও তারা সুমেরু বৃত্তের ঠিক নীচে—বেরিং সাগর থেকে হাডসন উপসাগর পর্যন্ত। এ ছাড়াও, ওলাসটন, প্রিন্স অ্যালবার্ট, ভিক্টোরিয়া, কিং উইলিয়াম, মেলভিল, ককবার্ন, ব্যাঙ্কস, বাফিন, ইত্যাদি দেশ আর দ্বীপগুলো ঠিক বৃক্ষপত্রের মত বিস্তৃত রয়েছে নব্বই ডিগ্রী পর্যন্ত। সুমেরুকে যদি পৃথিবীর যে কোনো একটি বড় ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়, তাহলে আমেরিকার দাবীই আগে আসছে—এশিয়া বা ইউরোপের দাবী আসছে তার পরে। সুতরাং আমেরিকান সমিতির মাধ্যমে সুমেরুকে না কেনা পর্যন্ত স্বস্তি নেই যুক্তরাস্ট্র সরকারের।

আমেরিকার আধুনিক দাবী সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। সুমেরু তাদের দখলেই যাওয়া উচিত। কিন্তু ইংলণ্ড টিটকিরি দিয়ে বলে উঠল—"সেকি কথা! ইংরেজ ভূগোল বেত্তা ক্লিনট্রিনগান তো অন্য কথা বলছেন! ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা যে-যার দাবী নিয়ে লাফাক। কিন্তু ইংল্যাণ্ড তো সুমেরুকে হাতছাড়া করতে পারে না। উত্তর মেরুর লগ্ন অনেক অঞ্চলের মালিক তো আমরাই। উইলোবি, ম্যাকলুরের মত ইংরেজ অভিযাত্রীরাই তো সেখানকার বহু দ্বীপের আবিষ্কারক। ডেভিস, হল, হাডসন, বাফিন, কুক, রস, প্যারি, কেনেডি, নারেস প্রভৃতি অভিযাত্রীদের প্রত্যেকেই তো জাতে আংলো স্যাক্সন। আমাদের নাবিকরা যেখানে গিয়ে টহল দিয়েছে, সে দেশ তো আমাদেরই থাকা উচিত।"

"তাই নাকি?" অমনি জবাব দিল আমেরিকার 'ক্যালিফোর্নিয়া জার্নাল'—"নাবিকদের অধিকার নিয়েই যদি এত সোচ্চার হও তো বাপু একটা প্রশ্নের জবাব দাও! নারেশ অভিযানের ইংরেজ অভিযাত্রী মারখাম গিয়েছিল ৮৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট অক্ষাংশ পর্যন্ত। কিন্তু গ্রীলি অভিযানের আমেরিকান অভিযাত্রী লকউড আর ব্রেনার্ড পৌঁছেছিল ৮৩ ডিগ্রী ৩৫ মিনিট পর্যন্ত। সুমেরুর কাছাকাছি তাহলে কোন দেশটা গিয়েছিল শুনি? কার দাবী আগে আসছে?"

তর্কাতর্কি যতই হোকনা কেন, শেষ পর্যন্ত লড়াইটা হবে আমেরিকান ডলার আর ইংলিশ পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের মধ্যে—তা বেশ বোঝা গেল। উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি অবশ্য পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছেন, সব দেশের সঙ্গেই পরামর্শ করা হবে এবং সবাইকে নীলাম হাঁকার স্থযোগ দেওয়া হবে। নীলাম হবে বাল্টিমোরে তেসরা ডিসেম্বর। নীলামের টাকা ভাগা ভাগি করে নেবে ডাক দিয়েও যারা স্থমেরু কিনতে পারবে না তারা। টাকাটা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিয়ে ভবিষ্যতে স্থমেরুর ওপর যাবতীয় স্বত্ব ত্যাগ করবে এই সব দেশ।

বাল্টিমোরের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার ব্যবস্থা করে লণ্ডন, হেগ, স্টকহোম, কোপেনহেগেন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে প্রতিনিধিরা বেরিয়ে পড়লেন। তিন সপ্তাহ পরে এসে নামলেন বাল্টিমোরে। আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে তখনো কিন্তু উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির কর্মটার ছাড়া আর কেউ রইল না।

ইউরোপ প্রতিনিধিদের চেহারার বর্ণনা দেওয়া যাক:

হল্যাণ্ড- জ্যাকুইস জ্যানসেন। বয়স ৫৩। গাঁট্টাগোট্টা, বেঁটে। ক্ষুদে হাত, ঈষৎ বক্র ক্ষুদে পা, চাঁদের মত গোলাকার লালচে মুখ সাদা চুল। উত্তর মেরু আদৌ কাজে লাগবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দিহান।

ডেনমার্ক—এরিক বলডেনাক। উচ্চতা মাঝামাঝি; ঈষৎ ঝুঁকে চলেন, মস্ত গোলাকার মাথা, চোখ এত খারাপ যে বইয়ের পাতায় নাক ঠেকিয়ে পড়তে হয়! দৃঢ় বিশ্বাস, উত্তর মেরু তাঁদেরই সম্পত্তি। উত্তর মেরুর উপর কারো তিলমাত্র দাবী শুনতে রাজী নয়। ভাবখানা—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।

সুইডেন-নরওয়ে—জাঁ হারাল্ড। মুখ আর দাড়ির রঙ লাল, চুল সোনালী। উত্তর মেরু যে কিনবে, সে ডাহা ঠকবে—এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি এসেছেন স্রেফ কর্তব্য করতে।

রাশিয়া—কর্ণেল বরিস কারকফ। আধা মিলিটারী, আধা কূটনীতিবিদ। শক্ত, ঝাঁটা গোঁফ। অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে কোমরে তরোয়াল খোঁজেন (কোমরে ঝুলিয়ে অভ্যস্ত বলে)। উত্তর মেরু কেনার পেছনে নিশ্চয় কোনো মতলব আছে উ, মে, বা, সমিতির—এ-ধারণা তাঁর বদ্ধমূল বলেই কিঞ্চিৎ হতচকিত।

ইংলণ্ড—মেজর ডোনেলান এবং তাঁর সেক্রেটারী ডীন টুড্রিঙ্ক। মেজর দিব্বি ঢ্যাঙা, হাড়ে মাংস কম, খুক-খুক করে কাশা অভ্যেস, ষাট বছরেও

পায়ের গড়ন চমৎকার। অক্লান্ত পরিশ্রমী। হাসতে জানেন না, রেলের ইঞ্জিন কি হাসে? তিনিও হাসেন না। পক্ষান্তরে, তাঁর সেক্রেটারী একটি আস্ত বচন-ফকির। কথা বলতে শুরু করলে থামতে চান না। রূপকথা শুনতে বড্ড ভালবাসেন। দুজনেরই মনে এক গোঁ—আমেরিকাকে টাকার লড়াইয়ে কোনঠাসা করে উত্তর মেরুর মালিক হবেন। হতেই হবে। উত্তর মেরু যে তাঁদেরই!

জাহাজ ঘাটায় ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা নামতে না নামতেই জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, উদ্ভট, আবোল তাবোল সম্ভাবনা নিয়ে কত গল্প কত খবরই না ছাপা হল কাগজে কাগজে। উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির মতলবটা আসলে কি, তাই নিয়ে অন্ত রইল না কল্পকাহিনীর। উত্তর মেরুর মালিক হতে চায় যারা, তারা কি এতই বোকা? নিশ্চয় কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি আছে। অন্য দল তক্ষুনি বললে—"মোটেই না। কোনো উদ্দেশ্যই নেই উ. মে. ব্য সমিতির। হিমশৈলর বাজার দর ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কি অভিপ্রায় থাকতে পারে? প্যারিসের জার্নাল 'ফিগারো'তে প্রকাশ পেল উদ্ভট এই কল্পনা।

প্রতিনিধিরা এক জাহাজে বাল্টিমোর আসেনি। পাছে জাহাজে আলাপ করতে হয়, এই ভয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন প্রত্যেকে প্রত্যেককে। হাজার হোক, প্রতিদ্বন্দ্বী তো। দেখা হবে একবারই—নীলাম ঘরে।

কিন্তু বাল্টিমোরে পৌঁছোনোর পর গা-ঘসাঘসি আরম্ভ হয়ে গেল পরস্পরের সঙ্গে শুধু একটি কারণে। প্রত্যেকেই আলাদাভাবে গিয়েছিল উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির কার্যালয়ে। কিন্তু কার্যালয়ের সন্ধান পায়নি। কোনো কর্মচারীর টিকিও দেখা যায় নি। 'খবরা খবরের জন্যে বাল্টিমোরের হাইস্ট্রেটের উইলিয়াম এস ফর্স্টারের সঙ্গে দেখা করুন'—এই নির্দেশ অনুযায়ী কডমাছ ব্যবসায়ীর কাছে হতাশ হল প্রত্যেকেই। লোকটা যা জানে, রাস্তার একজন কুলীও তাই জানে।

ছিটেফোঁটা খবরও না পেয়ে গুজবে কান না দিয়ে আর উপায় রইল না। খবরের কাগজের অলীক কাহিনীগুলো থেকেও সমিতির গোপন অভিপ্রায় উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন প্রতিনিধিরা। হালে পানি না পেয়ে যোগাযোগ করলেন পরস্পরের সঙ্গে। মাখামাখি একটু বেশীরকম হতেই কর্নেল বরিস কারকফের উদ্যোগে সবাই একদিন জড়ো হলেন মেজর ডোনেলানের হোটেল কক্ষে। উদ্দেশ্য, সবাই এক হয়ে আমেরিকার কট উদ্দেশ্য বানচাল করে দেওয়া।

কথাবার্তা শুরু হল উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির সৃষ্টিছাড়া বিজ্ঞপ্তি নিয়ে। সুমেরু কিনে লাভ কি তাদের? কথায় কথায় প্রফেসর হারাল্ড জানতে চাইলেন, এ-ব্যাপারে কেউ কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা। একবাক্যে সবাই বললেন, কডমাছ কারবারী সবাইকেই রিক্ত হস্তে ফিরিয়েছে।

ডীন ট্রিড্রিক্স বললেন—"আমি গিয়ে তো মশাই ডাহা বোকা বনে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খবর আছে? লোকটা বলল, সাউথ ষ্টার জাহাজ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে মালবোঝাই হয়ে এসে গেছে। কডমাছের টাটকা চালানের অভাব হবে না।"

হল্যাণ্ডের প্রতিনিধি বললেন—"উনবের বরং জলে টাকাগুলো ছুঁড়ে না ফেলে কডমাছ কিনে নিয়ে গেলে কাজ দেবে।"

মেজর ডোনেলান চড়া গলায় বলে উঠলেন—"প্রশ্নটা সুমেরু অঞ্চল নিয়ে—কডমাছ নিয়ে নয়।"

হাসতে হাসতে বললেন মজাদার ট্রিড্রিক্স—"আমেরিকানদের মাথার ওপর দাঁড়াতে দিন না মশাই, সর্দি বসলে ঠেলা বুঝবে। প্রশ্ন হচ্ছে, সুমেরুর ৪০৭০০০ বর্গমাইল জায়গা কিনে নিতে চায় আমেরিকান গভর্নমেণ্ট। কেন?"

"নতুন কিছু বললেন না," বললেন ড। হারাল্ড—"প্রশ্ন হল সুমেরুর জল বরফকে কি কাজে লাগাবে উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি।"

"সেটাও প্রশ্ন নয়," তৃতীয়বার হুংকার ছাড়লেন মেজর ডোনেলান "একটা রাষ্ট্র ভূগোলকের বেশ খানিকটা জায়গা টাকার জোরে হাতিয়ে নিতে চাইছে। ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে জায়গাটা ইংলণ্ডের প্রাপ্য—"

"রাশিয়ার," বললেন কর্নেল কারকফ।

"হল্যাণ্ডের" বললেন জ্যাকুইস জ্যানসেন।

"সুইডেন-নরওয়ের " বললেন ডা। হারাল্ড।

"ডেনমার্কের," বললেন এরিক বলডেনাক।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রতিনিধি পাঁচজন। একচোট কথা শুরু হওয়ার আগেই ডীন ট্রিড্রিক্স বলে উঠলেন—"ভদ্রমহোদয়গণ, বসুন। আপনাদের কথার খেই তুলে নিয়ে বলছি, প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হল, আমেরিকা খানিকটা জায়গা বাগাতে চায়। আসুন আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে তাকে কলা দেখিয়ে দিই। সবার টাকা একজায়গায় হলে আমেরিকার সাধ্য নেই টক্কর দেয় আমাদের সঙ্গে।"

প্রস্তাবটা মনে ধরল প্রতিনিধিদের। কিন্তু ফস করে বলে উঠলেন ডা হারাল্ড—"তারপর?"

"তারপর," বললেন ডীন টুড্রিঙ্ক—"জায়গাটা কিনে নেওয়ার পর সবার দখলেই থাকবে। অথবা ক্ষতিপূরণ নিয়ে পাঁচজনের একজনকে দিয়ে দেওয়া যাবে। আমেরিকার খপ্পর থেকে সুমেরু বেঁচে গেলেই হল—উদ্দেশ্য তো সেইটাই।"

"মন্দ নয়।" বললেন বলডেনাক।

"চমৎকার।" বললেন কর্নেল কারকফ।

"ঠিক বলেছেন।" বললেন হারাল্ড।

"উত্তম প্রস্তাব।" বললেন জ্যানসেন।

"খাঁটি ইংরেজ বুদ্ধি।" বললেন ডোনেলান।

এরপর প্রশ্ন উঠল কে কত টাকা ঢালবে যৌথ তহবিলে। কথাটা তুললেন টুড্রিঙ্ক।

কিন্তু কেউ জবাব দিল না। কে কত টাকা জমা দিতে চায়, একথা কি বলা যায়? বললেই তো কোন দেশের টাকার জোর কতখানি তা আগে-ভাগে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে!

সবাই চুপচাপ দেখে হল্যাণ্ড প্রতিনিধির মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি সুড়সুড় করে উঠল।

তিনি বললেন—"সুমেরুর জন্যে বড় জোর পঞ্চাশটা রাইকসখেলার খরচ করতে পারি। তার বেশী নয়।"

"আমি পারি পঁয়ত্রিশ রুবল পর্যন্ত।" বলল রাশিয়া।

"আমি বিশ ক্রোনর," বলল নরওয়ে সুইডেন।

"আমি পনেরো ক্রোনেন," বলল ডেনমার্ক।

খাঁটি ইংরেজদের মতই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন মেজর ডোনেলান—"ইংল্যাণ্ড দেড় শিলিংয়ের বেশী খরচ করতে প্রস্তুত নয়।"

এই ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটল ইউরোপ প্রতিনিধিদের আলোচনা সভার।

(৩) সুমেরু বিক্রি হয়ে গেল

কানাঘুসো আরম্ভ হয়ে গেল সেসব। ডিসেম্বরের নীলাম নিয়ে। যেখানে চেয়ার-টেবিল, বাসন-কোসন, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ছবি, মেডেল, প্রাচীন দ্রব্যাদি ছাড়া কিছু বিক্রি হয় না, সেখানে সুমেরুকে নীলামে বেচে দেওয়ার আয়োজন করা হল কেন? বেকারী বা জজসাহেবদের সামনে এধরনের বিক্রির ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল নাকি? ভূগোলকের খানিকটা বিক্রি করার ব্যাপারে পাবলিক নীলামওয়ালার শরণাপন্নর হওয়ার কোনো দরকার ছিল

কি? চেয়ার টেবিল ইত্যাদির মত সুমেরুকে তো যেখানে শীখু রাখা যায় না, সুমেরু পৃথিবীর একটা অংশ, তবুও তাকে চেয়ার টেবিলের শ্রেণীতে ফেলা হল কেন? বিক্রির ব্যবস্থাও এমন কায়দায় হচ্ছে যেন ভবিষ্যতে টুঁ শব্দটিও কেউ না করতে পারে দখলীস্বত্ব নিয়ে। কেন? উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি কি গোপনে খবর পেয়েছে, উত্তর মেরুর মধ্যে এমন কিছু আছে, চেয়ার টেবিল ইত্যাদির মত যার স্থানান্তর সম্ভব?

এইসব দুরূহ সমস্যা নিয়ে বোঁ-বোঁ করে মাথা ঘুরতে লাগল যুক্তরাষ্ট্রের অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরও। ভূগোলকের অংশ নিয়ে নীলাম ডাকার ব্যাপারট অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও এমন কাণ্ড একবার ঘটেছে। সেবারও এই আমেরিকার মাটিতে সর্বোচ্চ দামে খানিকটা ভূপৃষ্ঠ বেচে দেওয়া হয়েছিল এক কোটিপতিকে।

ঘটনাটা ঘটে বছর কয়েক আগে সানফ্রান্সিসকোতে। প্রশান্তমহাসাগরের একটা দ্বীপ নাম স্পেনসার আইল্যাণ্ড, চড়াদামে বিক্রি হয়ে গেল। উইলিয়াম ডাব্লউ কোল্ডরুপ পাঁচলক্ষ ডলার দাম হেঁকে তার প্রতিপক্ষ আর টাস্কিনারের নাকের ডগা দিয়ে কিনে নিলেন স্পেনসার আইল্যাণ্ড। সব মিলিয়ে দ্বীপটার পেছনে তাঁর খরচ হল চল্লিশ লক্ষ ডলার। সে দ্বীপ অবশ্য উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, দ্বীপে মানুষও ছিল, চাষবাসও করা যেত।*

কিন্তু সুমেরু অঞ্চলে সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং অত দরও উঠবে না। তাসত্ত্বেও নীলামের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা চরমে উঠল জনসাধারণের মধ্যে।

বাল্টিমোরে পৌঁছোনোর পর থেকেই প্রতিনিধিদের অষ্ট প্রহর ঘিরে থাকত উৎসুক দর্শনার্থীরা, তাকিয়ে দেখত তাঁদের হাবভাব চালচলন। জনগণের উত্তেজনা নীলামের দিন এই সব কারণেই তুঙ্গে পৌঁছোলো। আরম্ভ হয়ে গেল সুমেরু কার দখলে যাবে, এই নিয়ে। বাজি ধরার হিড়িক শুধু আমেরিকায় নয়, ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ল। রাশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক যে পাত্তা পাবে না—এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ইংলণ্ড তাদের গোঁ ছাড়বেনা; জমি নাকি তাদেরই। ইংলণ্ড দেশটা চিরকালই সবকিছু গ্রাস করার ফিকিরে ঘুরছে—ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডে টাকারও অভাব নেই।

---

*রহস্য-কৌতুক, রোমাঞ্চ-মজা, আমোদ-উৎকণ্ঠায় ঠাসা 'রবিনসনদের পাঠশালা' অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসে জুল ভের্ন লিখেছেন সেই উপাখ্যান।

সুতরাং প্রকৃত লড়াই লাগবে আমেরিকা আর গ্রেট বৃটেনের মধ্যে। বাজি ধরাও আরম্ভ হল এই দুই দেশকে কেন্দ্র করে।

কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় শুরু হবে নীলাম ডাকা।

কাতারে-কাতারে লোক জড়ো হয়েছিল রাস্তায় ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই। তাই রাস্তাঘাটে যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সংবাদ-পত্রগুলো টেলিগ্রাম মারফৎ জেনেছিল, আমেরিকানরা যত বাজি হেঁকেছে, সবগুলোতেই নাকি বাজিমাৎ করবে ইংরেজরা। খবরটা তক্ষুনি বিজ্ঞপ্তির আকারে নীলামঘরে টাঙিয়ে দিলেন ডীন টুড্রিঙ্ক।'

উত্তেজনা ধাপে ধাপে বাড়ছিল। খবর পাওয়া গেল, গ্রেট বৃটেন নাকি মেজর ডোনেলানের ওপর হুকুমজারী করেছে, যত টাকা লাগে লাগুক, সুমেরু কিনতেই হবে। তক্ষুনি আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করা হল—যত টাকা লাগে লাগুক, উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতিকে দিয়ে সুমেরু কিনতেই হবে। সমিতির অত টাকার জোর নাও থাকতে পারে, সরকারের তো আছে। সুতরাং ওয়াশিংটনের প্রভাবশালী মহল উত্যক্ত করে ছাড়ল সরকারকে।

এইরকম একটা কি হয়—কি হয় উত্তেজনার মধ্যে নির্বিকার রইল শুধু একজন, নতুন সমিতির এজেণ্ট উইলিয়াম এস ফর্সটার। আস্ত সুমেরুটা যেন তার পকেটের মধ্যেই রয়েছে, এইরকম নিশ্চিন্ত ভাব তার।

নীলাম ডাকার মুহূর্ত এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জনতার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিন ঘণ্টা আগেই নীলাম ঘরে এত লোক দাঁড়িয়ে গেল যে ভয় হল এই বুঝি হুড়মুড় করে গোটা বাড়ীটাই ভেঙে পড়বে। তিল ধারণের স্থান ছিল না কোথাও। শুধু একটা জায়গায় কেউ দাঁড়ায় নি। রেলিং দিয়ে ঘেরা সামান্য সেই জায়গাটুকুতে কষ্টে সৃষ্টে কোনমতে দাঁড়ানোর স্থান রেখে দেওয়া হয়েছিল ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের জন্যে।

সেইখানেই অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলডেনাক, কারকফ, জ্যানসেন, হারাল্ড, ডোনেলান এবং টুড্রিঙ্ক। রণক্ষেত্রে সৈনিকরা যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের ভঙ্গিমাও অবিকল সেইরকম। যুদ্ধ তো বটেই! আমেরিকার সঙ্গে টাকার যুদ্ধ!

আমেরিকার তরফ থেকে কিন্তু ভাবলেশহীন মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কডমাছের সেই আড়ৎদার লোকটি! বদন মণ্ডলে পুঞ্জীভূত বিশ্বের চরমতম ঔদাসীন্য!

পরের জাহাজে কত চালান আসছে কডমাছের, এছাড়া যেন কোনো

চিন্তাই নেই ফর্সটার মশায়ের! আশ্চর্য হেঁয়ালী তো! বিপুল টাকার দর হেঁকে গ্রেট বৃটেনকে নাকানি চোবানি খাওয়ার মত লোক কই? সেরকম ভারিক্কী ব্যক্তি না থাকলে আমেরিকার অশেষ দুর্গতি ঘটবে যে! প্রচণ্ড কৌতূহলে যেন ফেটে পড়তে চাইল জনগণ।

ভীড়ের মধ্যে মিশে বসেছিলেন ম্যাসটন এবং মিসেস স্করবিট। গান ক্লাবের কয়েকজন সদস্যও বসেছিলেন আশেপাশে। লোকের মন বলছিল, ঘোরতর এই সমস্যার অন্তরালে ম্যাসটনের হাত আছে নিশ্চয়। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল না নীলাম ডাকা নিয়ে তার আদৌ কোনো আগ্রহ আছে। কডমাছের আড়তদারটিও তাকে চেনে বলে মনে হল না।

নীলামওয়ালার তরফ থেকে বাক্রমে শুরু হয়েছে। যা নিয়ে নীলাম ডাকা হবে, নিয়মমাফিক তা কাউকে দেখানো সম্ভব নয়। হাতে হাতে সুমেরু চালান করা কি সম্ভব? উল্টে পাল্টে দেখা বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে দেখারও ওঠে না। সুমেরু খাঁটি কি নকল, আধুনিক কি প্রাচীন—তা পরখ করাও সম্ভব নয়। তবে সুমেরু যে প্রাচীন, তাতে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর যা বয়স, সুমেরুরও তাই।

আস্ত সুমেরুকে টেবিলের ওপর হাজির করা না গেলেও চমৎকার একটা মানচিত্র ঝুলছিল দেওয়ালে। লালকালি দিয়ে দাগানো ছিল চুরাশি ডিগ্রী সমাক্ষরেখা। সে অঞ্চলে জল আছে কি বরফ আছে, ক্রেতা বুঝবে খন। নীলামওয়ালা বিক্রির জায়গাটুকু চিহ্নিত করেই খালাস।

ঘড়িতে বারোটা বাজতেই মঞ্চের ওপরকার পাটাতন সরিয়ে তলা থেকে উঠে এলেন নীলামওয়ালা। তার ঘোষক, ফ্লিণ্ট, আগেই হাজির হয়েছিল মঞ্চে এবং পায়চারী করছিল পিঞ্জরাবদ্ধ ভালুকের মত। দুজনেরই ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ, পরিস্থিতি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, চড়া দামে বিক্রি হবে সুমেরু এবং মোটা কমিশন আসবে নীলামওয়ালার পকেটে।

ঢং ঢং করে মস্ত ঘণ্টাটা বেজে উঠল। অর্থাৎ শুরু হল নীলাম। দর্শকদের বুকে যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে। বাইরে উদ্বিগ্ন জনতার মধ্যে ছোটখাট দাঙ্গা বেঁধে গেল এবং রেশ এসে পৌঁছোলো হল ঘরেও।

নীলামওয়ালা মিস্টার গিলমোর অবশেষে উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত হয়ে এল গোলমাল। দর্শকমণ্ডলী এবং সহকারীদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চশমা আলগা করলেন মিস্টার গিলমোর। টুপ করে সুতোয় বাঁধা প্যাসনে চশমা খসে পড়ল বুকের ওপর। যদ্দুর সম্ভব ধীর স্থির কণ্ঠে আরম্ভ করলেন:

"মশাইরা, চুরাশি সমাক্ষরেখার মধ্যে ভূগোলকের পুরো অংশটা এবার বিক্রি হবে। জল, মহাদেশ, উপসাগর, দ্বীপ, হিম শৈল, জমি বা জল—যাই থাকুক না কেন, ক্রেতা তা বুঝবেন। ঐ দেখুন ম্যাপ। জায়গাটার ক্ষেত্রফল ৪,০৭,০০০ বর্গমাইল। বিক্রির সুবিধের জন্যে বর্গমাইল পিছু একসেণ্ট দাম হাঁকা হবে। তার মানে, প্রতি বর্গমাইলে একসেণ্ট দাম ধরলে সুমেরুর দাম দাঁড়াচ্ছে ৪,০৭,০০০ সেণ্ট একডলায় দাম ধরলে ৪,০৭,০০০ ডলার। মশাইরা, একটু চুপ করুন।"

অনুরোধ না করেও উপায় ছিল না। উত্তেজিত জনতার প্রত্যেকেই যদি ফিসফিস করে কথা বলতে থাকে, ঘোষকের গলা শোনা যাবে কি করে? তা সত্ত্বেও গুঞ্জনধ্বনি ছাপিয়ে জাহাজের ভো-ধ্বনির মত হেঁকে উঠল ফ্লিণ্ট। হট্টগোল কমতেই ফের শুরু করলেন মিস্টার গিলমোর।

"একটা কথা শুধু বলার আছে। চুরাশি সমাক্ষরেখার ওদিকে যা কিছু আছে, সব কিছুর একছত্র মালিক হবেন ক্রেতা। ভবিষ্যতে তাঁর অধিকার নিয়ে কারো কোনো অভিযোগের অবকাশ থাকবেনা। ভূগোল বা বায়ুমণ্ডল নড়ে চড়ে গেলেও, সুমেরু যতক্ষণ চুরাশি ডিগ্রীর বাইরে বেরিয়ে না আসছে, ততক্ষণ ও-অঞ্চলের একছত্র সম্রাট হবেন সর্বোচ্চ দামের ক্রেতা।"

আবার সেই হেঁয়ালী!

শুনে অনেকে হেসে উঠলেন, কেউ-কেউ গুম হয়ে গেলেন।

মিস্টার গুলমোর হাতীর দাঁতের হাতুড়ি নাচাতে নাচাতে উচ্চকণ্ঠে বললেন —"নীলাম শুরু হল" বলেই গলা খাদে নামিয়ে এনে বললেন—"প্রতি বর্গমাইলে দশ সেণ্ট দর পেয়েছি।"

সত্যিই দশসেণ্ট হাঁক কেউ দিল কিনা, তা নিয়ে কারো মাথা ঘেমেছে বলে মনে হল না। বর্গমাইল পিছু দশসেণ্ট মানে পুরো জায়গাটার দাম ৪০,৭০০ ডলার জেনেও ডেনমার্ক ডাক ছাড়ল এরিক বলডেনাকের গলা দিয়ে।

"বিশ সেণ্ট।"

"তিরিশ সেণ্ট," গলা ছাড়ল সুইডেন নরওয়ে।

"চল্লিশ সেণ্ট," দর হাঁকল রাশিয়া।

তার মানে, শুরু হতে না হতেই সুমেরুর দর দাঁড়িয়ে গেল ১,৬২,৮০০ ডলার!

ইংলণ্ড কিন্তু বসে রয়েছে মুখে চাবী এঁটে। মেজরের চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এখনো দরের হাঁক শোনা যায় নি।

আমেরিকাও নির্বিকার। ফর্স্টার মশায় খবরের কাগজ খুলে দেখছে কবে কোন জাহাজে কি চালান আসছে।

"চল্লিশ সেণ্ট," রেলইঞ্জিনের বাঁশি বাজল যেন ফ্লিণ্টের গলায়—"চল্লিশ সেণ্ট। প্রতি বর্গমাইলে চল্লিশ সেণ্ট।"

মেজর ডোনেলানের চার সঙ্গী চাইলেন পরস্পরের মুখের দিকে। তবিল কি নিঃশেষিত প্রত্যেকের? এবার কি তবে বোবা হয়ে থাকার পালা?

নীলামওয়ালা গিলমোর হাঁক দিলেন এবার—"মশাইরা! থামলেন কেন? চালিয়ে যান! চল্লিশ সেণ্ট। উঠুন, আরো উঠুন! কে উঠবেন? মাত্র চল্লিশ সেণ্ট! সুমেরুর দাম কিন্তু আরো বেশী। খাঁটি বরফের গ্যারাণ্টি আছে মশায়!"

ডেনমার্কের প্রতিনিধি হাঁক দিলেন পঞ্চাশ সেণ্ট। ঝটিতি তাঁকে ডিঙ্গে গেলেন হল্যাণ্ডের প্রতিনিধি আরো দশ সেণ্ট দাম চড়িয়ে।

কারো মুখে কথা নেই। ষাট সেণ্ট মানে সুমেরুর মোট দাম গিয়ে ঠেকল ২,৪৭,২০০ ডলারে।

এই সময়ে ...ক্লুইস জ্যানসেন ফের তাল ঠুকলেন, মানে, দর হাঁকলেন। মেজর ডোনেলান নীরবে শুধু চাইলেন সেক্রেটারী ডীন টুড্রিঙ্কের পানে এবং ইঙ্গিতে স্তব্ধ করলেন তাকে। মিস্টার ফর্স্টার খবরের কাগজ থেকে কয়েকটা খবর টুকে নিলেন নোট বইয়ে। মিস্টার ম্যাস্টন মিসেস স্করবিটের হাসির জবাব দিলেন ঈষৎ মাথা হেলিয়ে।

"কী ব্যাপার? এত ঢিমে কেন?" মশাইরা, দর হাঁকুন! খামোকা সময় নষ্ট করছেন কেন? কী আশ্চর্য! সবাই চুপ মেরে গেলেন যে! এত সস্তায় বিকিয়ে যাবে উত্তর মেরু? বলে হাতীর দাঁতের হাতুড়ি নিয়ে এমন ভান করলেন নীলামওয়ালা যেন হাতুড়ি ঠুকে ঐ দরেই সুমেরু বেচে দেবেন।

"সত্তর সেণ্ট," গলা কেঁপে গেল জ্যাঁ হারাল্ডের।

"আশি," তক্ষুনি গলা শোনা গেল কর্ণেল কারকফের।

"জলদি, জলদি, আশি সেণ্ট," উত্তেজনায় প্রজ্বলন্ত চোখে হেঁকে উঠল ফ্লিণ্ট।

ডীন টুড্রিঙ্কের ইঙ্গিতের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন মেজর ডোনেলান। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গাঁক-গাঁক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন।

"একশ সেণ্ট!" গ্রেট বৃটেন যেন গর্জে উঠল তাঁর কণ্ঠে। এক ডাকেই ইংলণ্ডের ৪,০৭,০০০ ডলার খসবার উপক্রম হল।

সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠল ইংলণ্ডের দোস্তরা। বাইরেও সাড়া

পড়ে গেল গ্রেটবৃটেনের গর্জন শুনে। নিরাশ মুখে দৃষ্টিবিনিময় করল আমেরিকার সমর্থকরা। ৪,০৭,০০০ ডলার! বরফ ঢাকা, হিমশৈল ভরা, তুহিন উপত্যকাময় ভূখণ্ডর পক্ষে ৪,০৭,০০০ ডলার দামটা বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে নাকি?

উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির এজেন্ট মাছের আড়ৎদার লোকটি কিন্তু মাথা তোলেনি। মতলব কি লোকটার? ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে? এক ডাকেই মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে চায়? নাকি ডেনমার্কের দম ফুরোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায়? সুইডেন, হল্যাণ্ড, রাশিয়ার খেল তো খতম হয়ে গেছে। একশ সেন্ট ডাক শোনার আগেই বোঝা গিয়েছিল, রণে ভঙ্গ দিতে চান তাঁরা।

নীলামওয়ালার হাঁক শোনা গেল—'একশ সেন্ট। প্রতি বর্গমাইল মাত্র একশ সেন্ট।"

ফ্লিন্ট চেঁচিয়ে উঠল—"একশ সেন্ট! একশ সেন্ট! একশ সেন্ট!" গলা তো নয়, যেন কাড়া-নাকাড়া!

নীলামওয়ালার টিটকিরি—"সেকী! আর ওঠবার ক্ষমতা কারো নেই? তাহলে একশ সেন্টেই সুমেরু যাবে? পরে পস্তাবেন না যেন! ঠিক আছে, বিক্রি হল বলে —" কেরানীর দিকে ফিরে—"এক, দুই—"

"একশ দশ," খবরের কাগজ পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখ না তুলেই ভারী শান্ত গলায় বলল উইলিয়াম এস ফর্স্টার।

"হিপ, হিপ, হিপ," হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই আমেরিকার ওপর বাজি ধরেছিল। সুতরাং তাদের ফুর্তি দেখে কে!

বিস্মিত হলেন মেজর ডোনেলান। লম্বা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন ফর্স্টারের পানে। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল নিদারুণ উত্তেজনায়। দুই চোখ দিয়ে ভস্ম করতে চাইলেন আমেরিকান প্রতিনিধিকে। মিস্টার এস টারের গায়ে অবশ্য আঁচ লাগল না। বসে রইল শশার মত ঠাণ্ডা শরীরে পরম নিরাসক্তি নিয়ে।

"একশ চল্লিশ," বললেন মেজর ডোনেলান।

"একশ ষাট,' বলল ফর্স্টার।

"একশ আশি,' উত্তেজনায় কাঁপছেন মেজর।

"একশ নব্বই," বলল ফর্স্টার।

"একশ নিরানব্বই," হুংকার ছাড়লেন গ্রেট বৃটেন প্রতিনিধি। দুহাত বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে এমন বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যেন তাঁর সামনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সামান্য একটা পোকার সমান।

ঘরজোড়া নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তখন বুঝি একটা ইঁদুর দৌড়ে গেলে, অথবা মাছি উড়ে গেলে অথবা পোকা কিলবিল করে উঠলেও শোনা যেত। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে ঘরশুদ্ধ লোকের। মেজর ডোনেলানের প্রাণটা যেন গলায় এসে ঠেকেছে। মাথাটা কিন্তু অকস্মাৎ অনড় অচল হয়ে গিয়েছে। ডীন ট্ড্রিঙ্ক বসে পড়েছেন এবং একটি একটি করে মাথার চুল উৎপাটন করছেন।

নীলামওয়ালা গিলমোর সবুর করলেন কয়েকটা সেকেণ্ড। প্রতিটি সেকেণ্ড এক একটা শতাব্দীর মত দীর্ঘ মনে হল। যেন ফুরোতে চায় না।

কড়মাছ আড়ৎদার একমনে কাগজ পড়ছে এবং পেন্সিল দিয়ে কি যেন টুকে নিচ্ছে। নিশ্চয় সুমেরু সংক্রান্ত কিছু নয়। নাকি তারও দম ফুরিয়েছে? ভাঁড়ার খালি হয়েছে? আর একটা হাঁক দেওয়ার মত কলজের আর টাকার জোর আছে কি ফস টারের? একশ নিরানব্বই, মানে, ৭,৯৩,০০০ ডলার নগদ বার করা চাট্টিখানি কথা...।

'একশ নিরানব্বই সেন্ট।' ফের বললেন নীলামওয়ালা। 'এই দামেই বিক্রি করব সুমেরু।" হাতুড়ি উঠছে, হাতুড়ি নামছে। হাঁক দিল ফ্লিণ্ট—'একশ নিরানব্বই' বিক্রি হচ্ছে। 'বিক্রি হচ্ছে।" ঘরশুদ্ধ লোক ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে রইল উ. মে ব্য সমিতির প্রতিনিধির দিকে।

আশ্চর্য লোকটা কিন্তু তখন মস্ত একটা রুমালে নাক ঝাড়তে ব্যস্ত। সমস্ত মুখটাই প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে রুমালের আড়ালে। ম্যাস্টন এবং মিসেস স্কবিট নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন ওর পানে। দুজনেরই উদ্বিগ্ন মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, কত কষ্টে ভেতরের উত্তেজনাকে ভেতরে রাখতে হচ্ছে তাদের। ব্যাপার কী? ফস টার হেঁকে দিচ্ছে না কেন মেজরকে?

দুর্বোধ্য ফস টার কিন্তু নাক ঝাড়ল দ্বিতীয়বার এবং তারপরেও আর একবার। সেকী আওয়াজ! যেন জাহাজের ভোঁ বাজতে লাগল হলঘরের মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয়বার নাক ঝাড়ার ফাঁকে অতিশয় শান্ত, অতিশয় বিনীত এবং অতিশয় মিষ্ট করে বলল:

"দুশ সেণ্ট।"

সারা হলঘরটা যেন শিউরে উঠল তাই শুনে। তারপরেই আমেরিকান সমর্থকরা এমন চেঁচিয়ে উঠল যে জানলাগুলো পর্যন্ত খটখট করে উঠল চেঁচানির ধাক্কায়। মেজর ডোনেলান ভেঙে, গুঁড়িয়ে, হতাশ, নিরাশ, অভিভূত হয়ে ধপ করে বসে পড়েছেন যাঁর পাশে, সেই ডীন ট্ড্রিঙ্কের অবস্থাও অতীব শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড নিশ্চয় ঐ পরিমাণ টাকাই ওদের মঞ্জুর করেছে—তার বেশী নয়!

"দুশ সেণ্ট," ফের বললেন নীলামওয়ালা। "দুশ সেণ্ট," বলল ফ্লিণ্ট। "এক, দুই," বললেন নীলামওয়ালা। "আর কেউ উঠবেন?" মেজর ডোনেলান একটু উঠলেন, ঘোলাটে চোখে অন্য প্রতিনিধিদের পানে চাইলেন, মুখ খুললেন, ফের বন্ধ করলেন এবং ইংলণ্ডকে বসিয়ে দিয়ে ধপ করে বসে পড়লেন।

"হিপ, হিপ, হুররে—জয় হোক যুক্তরাষ্ট্রের।" সমস্বরে গর্জে উঠল আমেরিকা। মুহূর্তের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে গেল সারা বাল্টিমোরে, টেলিগ্রাফ মারফৎ সারা যুক্তরাষ্ট্রে, 'কেবল' মারফৎ সারা দুনিয়ায়।

উইলিয়াম এস ফর্স্টার নামক এজেণ্টের মাধ্যমে চুরাশি সমাক্ষরেখার ওপরে যাবতীয় ভূখণ্ডের মালিক হয়ে বসল উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি।

পরের দিন টাকা জমা দিতে গিয়ে ফর্স্টার কাগজপত্রে নিজের নাম লিখল ইম্পে বার্বিকেন এবং কোম্পানীর নাম বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী।

(৪) পুরাতনের পুনরাবির্ভাব

বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী। গান ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ইম্পে বার্বিকেন। ইনিই অনেক বছর আগে কামানের গোলায় চেপে চাঁদ ঘুরে এসেছিলেন না?*

হ্যাঁ, ইনিই তিনি। সঙ্গে ছিলেন ডানপিটে ফরাসি বৈজ্ঞানিক মাইকেল আর্দা এবং বার্বিকেনের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাপ্টেন নিকল। তিনজনেই অক্ষত শরীরে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। নীলামঘরে তিনজনের দুজনে হাজির ছিলেন—বার্বিকেন এবং নিকল। ফরাসি আর্দা নেই। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর ভদ্রলোক টাকার কুমীর হয়ে ইউরোপে ফিরে যান এবং সবাইয়ের পিলে চমকে দিয়ে নিজের বাগানে নিজের হাতেই কফির চাষ শুরু করেন। ডুখোড় সাংবাদিকদের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, মাইকেল আর্দা এখন নাকি সেই কফি খাচ্ছেন এবং বিলক্ষণ হজম করছেন।

কামান দাগার পর ক্যাপ্টেন নিকল এবং ইম্পে বার্বিকেনের জীবনধারা পালটে গিয়েছিল। পরম শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন দুজনে। টাকার তো অভাব ছিলনা। নতুন কিছু করবার বাসনাও ছিল মনের মধ্যে। নিত্য নতুন স্বপ্ন দেখতেন দুজনে, জল্পনা কল্পনা করতেন আরো কিছু অর্জনের কাণ্ড

*ইম্পে বার্বিকেন ক্যাপ্টেন নিকল, এবং মাইকেল আর্দার অসমসাহসিক কীর্তি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' উপন্যাসে (জুল ভের্ণ রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

করা যায় কিনা। চাঁদে যাওয়া'র জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ডলার সংগৃহীত হয়েছিল। সব টাকা তো খরচ হয়নি। দুলক্ষ ডলার তখনো পড়ে। এ ছাড়াও প্রোজেকটাইলের মধ্যে বসে দর্শনার্থীদের সামনে হাজির হতে হত তাঁদেরকে। সেদিক দিয়েও আসত দেদার টাকা। এক কথায়, মানুষের ভাগ্যে যতটা যশ, অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি পাওয়া সম্ভব, দুজনে তা পেয়েছিলেন। বাকী জীবনটা ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে কাটিয়ে দিলেও চলত—জীবন যন্ত্রণা কি জিনিস টের পেতেন না। কিন্তু সেইটাই ছিল ওদের কাছে যন্ত্রণা স্বরূপ। অলসতার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিলেন না এই দুই বিচিত্র ব্যক্তি। তাই স্রেফ কিছু একটা করার তাগিদেই প্ল্যান সাজিয়ে উত্তর মেরু কিনে নিলেন ওঁরা।

পুরো টাকাটা এল অবশ্য মিসেস স্করবিটের কোষাগার থেকে। শুধু এই ভদ্রমহিলার টাকার জোরেই আমেরিকার কাছে হেরে গিয়েছিল ইউরোপ। চাঁদ থেকে ফিরে আসার পর নিকল এবং বার্বিকেনকে মাথায় তুলে নিয়েছিল দেশের জনসাধারণ। কিন্তু এই দুজন ছাড়া আরো একজনকে সম্মান জানানো দরকার ছিল। চন্দ্রাভিযানের কৃতিত্ব এই ভদ্রলোকেরও পাওনা ছিল। ইনি জে টি ম্যাসটন—গানক্লাবের অস্থায়ী সম্পাদক। এঁর চুলচেরা আঁকজোক এবং গাণিতিক হিসেবের জন্যেই চাঁদে গোলা পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। অসাধারণ গণিতবিদ ইনি, অঙ্কে মাথাটি অত্যন্ত সাফ গণিতশাস্ত্রটিকে যেন গুলে খেয়েছেন। এঁর প্রতিভা সক্রিয় না হলে পৃথিবী থেকে চাঁদে কাহিনী কোনো দিনই লেখা হত না। দুঃখের বিষয়, ইনি গোলার সঙ্গে চাঁদে যান নি। না, না, তিনি ভীতু নন মোটেই। তবে যুদ্ধে তিনি এমন চোট খেয়েছিলেন যে না গিয়ে তিনি ভালই করেছেন। চাঁদের বাসিন্দারা হয়ত ওঁাকে উঠিয়ে তার হাতের বদলে লোহার আঁকশি আর মাথার বদলে গাটাপাচার খুলি দেখলে।

ঐ রকম বিকট চেহারার দরুণ ম্যাসটনকে দিব্যকান্তি বলা যায় না ঠিকই, বয়সটাও তার কম নয়—এ কাহিনী লেখবার সময়ে আটান্ন বছর। কিন্তু মগজের শক্তি দিয়ে উনি সব ঘাটতি পূর্ণ করে নিয়েছিলেন, বয়স হলেও তার দুরন্ত কল্পনা, প্রচণ্ড সাহস, মৌলিক চরিত্র এবং বহুমুখী প্রতিভার মরচে ধরেনি এতটুকু। গাটাপাচায় ঢাকা মস্তিষ্কটিও স্থবির হয়নি। গণিত শাস্ত্রের যে কোনো দুরূহ সমস্যায় তখনো তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুস্কিল-আসান।

এ-হেন মানুষকে মিসেস স্করবিট মনে মনে পছন্দ করবেন, এ আর আশ্চর্য কী।

সহজতম অংকও কিম্ভূতকিমাকার মনে হত মিসেস স্করবিটের কাছে।

অংক দেখলেই তাঁর মাথা ধরে যেত। অথচ অংকের ওস্তাদকে দেখলেই মাথা ছেড়ে যেত। গণিতবিদদের বড্ড পছন্দ করতেন মিসেস স্করবিট। মানুষ জাতের মধ্যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ যদি কেউ থাকে, গণিতবিদরাই নাকি সেইসব মানুষ—এ-বিশ্বাস শেকড় গেড়ে বসে ছিল মিসেস স্করবিটের মনের মধ্যে। যে-মাথার মধ্যে নাট-বল্টুর মত X, Y, Z, খটখট করে নড়ে, যে-মগজের মধ্যে বীজগণিতের জটিল চিহ্ন ডিগবাজী খায়, যে হাতের খেলায় সমাকলনের ত্রয়ীরা নেচেকুঁদে ওঠে সেই হাত, সেই ব্রেন, সেই মাথার অধিকারীদের পরম ভক্ত আমাদের মিসেস স্করবিট।

এ-হেন অতি মানুষদের মধ্যে অতি-অতি-মানুষ হলেন মিস্টার জে টি ম্যাসটন—মিসেস স্করবিটের বিশ্বাস তাই। তাঁর বড সাধ মিস্টার ম্যাস্টনকে বিয়ে করার। মিসেস স্করবিটের অংকের সেইটাই হল শেষ সীমা।

ম্যাসটন অবশ্য এ-সব নিয়ে খুব একটা বিচলিত নন। বিয়ে জিনিসটায় সুখ আছে, ম্যাসটন তা বিশ্বাস করেন না।

মিসেস ইভান জেলিনা স্করবিট তরুণী নন। বয়স তাঁর পয়তাল্লিশ, বিরল কেশরাশি ব্রহ্মতালুতে যেন আঠা দিয়ে লাগানো, একনজরেই বোঝা যায় চুলগুলিকে বহুবার বহুভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। মুখভর্তি লম্বা লম্বা দাঁত এবং একটি দাঁতও পড়েনি। বেটপ কোমর, হাঁটা চলায় শ্রী নেই। অনেকটা বুড়ি ঝি যের মত দেখতে তাকে। অথচ তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং বছর কয়েকের মধ্যেই বিধবা হয়েছিলেন। প্রাণে তার সব সুখ আছে, একটি ছাড়া। ম্যাস্টনের বউ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রাণের পেয়ালা টইটম্বুর হচ্ছেনা কিছুতেই।

টাকার তাঁর অভাব নেই। লক্ষপতি গোল্ডস, ম্যাকেস, ভ্যানডার বিল্টের মত বড় লোক না হলেও তিনি ধনবতী। মিসেস স্টুয়ার্টের মত তাঁর ত্রিবিশ কোটি ডলার নেই, মিসেস ক্রকারের মত আট কোটি ডলার নেই, মিসেস কার্পারের মত বিশ কোটি ডলার নেই। মিসেস হেটি গ্রীণ, মিসেস মাকিট, মিসেস মার্শালের মতও টাকার কুমীর তিনি নন। তবে নিউইয়র্কের যে হোটেলে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারী ছাড়া কারো প্রবেশ নিষেধ, মিসেস স্করবিটের অবাধ গতিবিধি সেই হোটেলে। সংক্ষেপে তিনি চল্লিশ লক্ষ নিরেট ডলার বা তুকোটি ফ্রাঁর মালিক। এ-টাকা তিনি পেয়েছেন মিস্টার জন পি স্করবিটের কাছ থেকে—তিনি পেয়েছেন নুন মাখানো শুওরের মাংস বিক্রি করে। পুরো টাকাটাই মিসেস স্করবিট ম্যাস্টনের সেবায় লাগাতে ইচ্ছুক, সেই সঙ্গে দিতে ইচ্ছুক হৃদয় জোড়া মমতা—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়েও যার পরিমাপ হয় না।

এই কারণেই ভদ্রমহিলা যখন জানলেন, ম্যাস্টনের কিছু টাকার দরকার..

আনন্দে ডগমগ হয়ে টাকা গুঁজে দিলেন উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির তহবিলে। টাকা নিয়ে কি করা হবে, তা জানতেও চাইলেন না। ম্যাস্টন যে-ব্যাপারে আছেন, সেখানে নিশ্চয় সৎকাজে লাগবে টাকাটা, নিশ্চয় কোনো অতিমানবিক, মহৎ, চমকপ্রদ কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হবে তার ছ্যাতলাধরা ডলারের পাহাড়. সুতরাং অত কৌতূহল না দেখালেও চলবে।

তারপর যখন প্রকাশ পেল কোম্পানীর নাম বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী রাখা হয়েছে, তখনও উনি বিচলিত হলেন না। কোম্পানীর সবচেয়ে বড় অংশীদার যখন তিনি, তখন সুমেরুর মালিকানাও তাঁর!

এইভাবে চুরাশি ডিগ্রীর গণ্ডী দিয়ে ঘেরা বরফ খণ্ডের সম্রাজ্ঞী হলেন মিসেস স্করবিট। কিন্তু বরফ-অঞ্চল নিয়ে হবেটা কী? সমিতি অপূর্বব সুমেরু থেকে লাভের কড়ি গুণতে পারবে কী? সারা পৃথিবী তখন ঝুঁকে পড়েছে উত্তর মেরুর ওপর, পরিত্যক্ত জায়গাটাকে নিয়ে অকস্মাৎ কেন এত রহস্য দানা বেঁধে উঠল, বুঝতে না পেরে সারা দুনিয়া পাগল হয়েছে উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির পাগলামি দেখে। টাকা বিনিয়োগের এইটাই মস্ত সান্ত্বনা মিসেস স্করবিটের। তারপর?

মাঝে মাঝে অবশ্য ম্যাস্টনকে কথার পিঠে জিজ্ঞেস করে ছিলেন মিসেস স্করবিট, উত্তর মেরু কিনে কি লাভ? যদিও তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল চন্দ্রবিজয়ের গৌরবকেও এবার ম্লান করে ছাড়বেন বার্বিকেন এবং তাঁর স্যাঙাতরা, এমন একটা এলাহি ব্যাপার করবেন যা অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতে থাকবেনা। তবুও প্রশ্ন করে ছিলেন ম্যাস্টনকে।

ম্যাস্টন কিন্তু প্রতিবারেই এড়িয়ে গিয়েছেন। শুধু বলেছেন "ধৈর্য ধরুন, ম্যাডাম।"

তাই যখন ইউরোপকে থ বানিয়ে আমেরিকা জিতে গেল, আনন্দ রাখবার আর জায়গা পেলেন না মিসেস ইভানজেলিয়া স্করবিট। আনন্দে আটখানা হয়ে আবার শুধোলেন ম্যাস্টনকে—"এখনো কি জানতে পারব না কি উদ্দেশ্য?"

"নিশ্চয় জানবেন" আমেরিকান ভদ্রমহিলার করমর্দন করে শুধু বলেছেন মিস্টার ম্যাসটন।

শুনে তখনকার মত শান্ত হলেন মিসেস স্করবিট। দিন কয়েক পরেই হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে গেল সারা দুনিয়ায় কোম্পানীর গোপন উদ্দেশ্য ঘোষিত হওয়ার পর। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদার আবেদন জানাল উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি।

নতুন কোম্পানী সুমেরু কিনেছে বরফের তলায় চাপা কয়লাখনি থেকে কয়লা তুলবে বলে!

(৫) উত্তর মেরুতে কয়লাখনি আছে তো?

ঘোষণার পরেই যে-প্রশ্নটা সবার আগে মগজের মধ্যে খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করে দিল, তাহল উত্তর মেরুতে কয়লাখনি আছে তো? সুমেরুতে কয়লা থাকবে কেন?

অন্যদল তক্ষুনি তার জবাব দিলে—থাকবে না কেন? সারা পৃথিবীতে কয়লা ছড়িয়ে আছে, এ-তত্ত্ব সবাই জানে। ইউরোপে বহুস্থানে আছে। আমেরিকাতেও আছে এবং খুব সম্ভব আমেরিকার কয়লাখনির মত উৎকৃষ্ট কয়লায় ঠাসা খনি আর কোথাও নেই। কয়লাখনি আছে এশিয়ায়, আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়। তাছাড়া যত দিন যাচ্ছে, ততই নতুন নতুন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হচ্ছে। কম করেও একশ বছরের মত কয়লা মজুদ রয়েছে সারা ভূগোলকে। ইংলণ্ড একাই সারা বছরে ১৮০,০০০,০০০ কয়লা উৎপাদন করছে। সারা পৃথিবীতে কয়লা তোলা হচ্ছে বছরে ৪০০,০০০,০০০ টন। কলকারখানা যত বাড়বে, কয়লার উৎপাদনও সেই হারে বেড়ে চলবে। স্টীমের বদলে ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার আরম্ভ হলেও কয়লার চাহিদা কমবে না। কয়লা আমাদের এত বেশী দরকার যে পৃথিবীটাকে একটা 'কয়লা দানব' বললেও চলে। সেই কারণেই কয়লা জিনিসটাকে আগলে রাখা দরকার বইকি।

কয়লা পুড়িয়ে শুধু রান্নাবান্নাই হচ্ছে না। কলকারখানায় শুধু জ্বালানি হিসেবেও এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়; কয়লার প্রয়োজন বহুক্ষেত্রে বহুভাবে। বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে আকরিক কয়লাকেও কত রকম ভাবে সমাজের মঙ্গলে লাগানো যায়। গবেষণা-মন্দিরে কয়লা নিয়ে নাড়াচাড়া করে তার কয়লা-কালো চেহারা পালটে দেওয়ার পর তা থেকে তৈরী হচ্ছে সুগন্ধি, তাপ, আলো। এমনকি হীরেকেও ঝকঝকে করার কাজে এগিয়ে আসছে শ্রীহীন এই কয়লা।

লোহার মতই কয়লার তাই এত কদর। হয়ত তার চাইতেও বেশী। আমাদের কপাল ভালো, তাই পৃথিবীর জঠর থেকে লোহা কোনোদিন নিঃশেষিত হবে না। পৃথিবীটা তো লোহা দিয়েই মূলতঃ গড়া। যেন একটা প্রকাণ্ড লোহার ডেলা আমাদের এই ভূগোলক, অন্যান্য ধাতু, এমন কি জল আর পাথরও আসছে তার পরের শ্রেণীতে।

সুতরাং লোহা কোনোকালে ফুরোবেনা। কিন্তু কয়লা ফুরোবে। দূর ভবিষ্যতের চেহারা যাঁরা দেখতে পান, যাঁরা আগামী কয়েকশ বছরের কল্পনায়

নিমগ্ন থাকতে পারেন, তাঁরা বলেন, পৃথিবীতে একসময়ে কয়লার দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।

কিন্তু সুমেরু ঘিরে কয়লার খনি থাকতে যাবে কেন? এ-প্রশ্নের জবাবে বার্বিকেনের স্তাবকরা বললে—"কেন থাকবে না বলতে পারেন? ভূ-প্রকৃতি যখন সংগঠনের পথে, সেই সময়ে সূর্যের তাত হয়ত মেরু অঞ্চল আর নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় সমান ছিল। গহন অরণ্য ছেয়েছিল মেরু অঞ্চল। তার অনেক পরে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে, আরম্ভ হয়েছে প্রচণ্ড তাপ, শৈত্য আর আর্দ্রতার প্রলয়ংকর খেলা। দানবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বর্তমান চেহারা গড়ে ওঠার আগেই সুবিশাল জঙ্গল রূপান্তরিত হল কয়লায়—পৃথিবীর উত্তাপে আর মহাকালের প্রভাবে।"

এই অনুমিতি বিভিন্ন আকারে ছড়িয়ে পড়ল নানা কাগজে, সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, নিবন্ধে। কেউ লিখল ঠাট্টা করে, কেউ সিরিয়াস হয়ে। মোটকথা, লোকের মনে বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল, উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি সত্যিই কয়লার সন্ধান পেয়েছে সুমেরু অঞ্চলে।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে একদিন একটা রেস্তোরাঁর নিরালা কোণে বসে আড্ডা মারছিলেন মেজর ডোনেলান এবং ডীন টুড্রিঙ্ক।

ডীন টুড্রিঙ্ক বললেন—"বার্বিকেন লোকটা একদিন ফাঁসিতে ঝুলবে ঠিকই, কিন্তু সে যা বলেছে। হয়ত তা সত্যি।"

"তা ঠিক," সায় দিলেন মেজর। "প্রোফেসর নোরডেনস্কিঅল সুমেরু সম্পর্কিত গবেষণায় বিস্তর শিলীভূত উদ্ভিদের নমুনা হাজির করেছেন বকমারি পাথরের মধ্যে।"

"ভেতর দিকে?"

"অনেক ভেতরে, উত্তর দিকে।" বললেন মেজর। "কয়লার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করে লাভ নেই। অনেক প্রমাণ আছে। এমনভাবেও নাকি কয়লা ছড়িয়ে আছে সেখানে যে শুধু কুড়িয়ে নিলেই হল। তাই যদি হয় তো বলব কয়লার সেই স্তর সারা ভূগোলকটাকে মুড়ে রয়েছে।"

খাঁটি কথা বলেছেন মেজর। একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন:

"একটা ব্যাপারে শুধু খটকা লাগছে। এ-ব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ার, নিদেনপক্ষে নৌ-অভিযাত্রী নাক গলালে মানাতো, কিন্তু বন্দুক বাজদের টনক নড়ল কেন?"

কিছুদিন যেতে না যেতেই সভ্য দুনিয়ার সংবাদ পত্রগুলোয় এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হল।

বার্বিকেনের পক্ষ নিয়ে বললে একটা মার্কিন কাগজ—"ক্যাপ্টেন নারেস ১৮৭৫ এবং ১৮৭৬ সালে বিরাশি ডিগ্রী অক্ষাংশ রেখায় ফুলগাছ, হ্যাজেল পপলার, বীচ গাছ দেখেছিলেন। সুতরাং কয়লা থাকবে না কেন?"

ধুয়ো ধরে বললে নিউইয়র্কের একটা কাগজ—"১৮৮১ আর ১৮৮৪ সালে লেফটন্যান্ট গ্রীলি লেডি ফ্রাঙ্কলিন উপসাগরে কয়লার স্তর আবিষ্কার করে ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন। ডক্টর-পেভীও বলেছিলেন, কয়লা ঠাসা আছে সুমেরুতে।"

ধারালো যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারল না বার্বিকেনের শত্রুপক্ষ। মানতে বাধ্য হল, হ্যাঁ কয়লা আছে সুমেরুতে। সুমেরু বৃত্ত বরাবর অঞ্চলে হিমমুকুটের তলায় ঢাকা রয়েছে সুবিশাল কয়লা-খনি—প্রাগৈতিহাসিক যুগে যা ছিল বিস্তীর্ণ অরণ্য।

শত্রুপক্ষ একদিক দিয়ে হেরে আরেক দিকে টু মারা আরম্ভ করল। গানক্লাবের হল ঘরে একদিন একটা মিটিংয়ের পর বার্বিকেন কে সোজা বললেন মেজর ডোনেলান—"আছে, আছে, কয়লা আছে। স্বীকার করছি আপনাদের কেনা বরফ ঢাকা অঞ্চলে রাশি রাশি কয়লা আছে। যান, গিয়ে তুলে আনুন সেই কয়লা। হাঃ হাঃ হাঃ!"

"সেই ব্যবস্থাই তো করছি," বললেন ইম্পে বার্বিকেন।

"চুরাশি ডিগ্রীর ওদিকে, যেখানে আজও কোনো অভিযাত্রীর পায়ের চিহ্ন পড়েনি, সেইখানে গিয়ে কয়লা তুলবেন?"

"সেখান থেকেও আরো ভেতরে যাবো—উত্তর মেরুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবো।" বললেন বার্বিকেন। "যাবোই যাবো।"

যেন এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া বেড়াতে যাচ্ছেন, এমনি আশ্চর্য শান্ত স্বাভাবিক স্বরে কথা বললেন বার্বিকেন। প্রত্যয়, দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাস যেন ঠিকরে গেল প্রতিটি শব্দ থেকে। বলেন কি বার্বিকেন? গলা কাঁপা দূরে থাকুক, চন্দ্রাভিযান আমলের সেই দুর্দান্ত অথচ ধীর, বেপরোয়া অথচ অচঞ্চল বার্বিকেনই যেন ফের দেখা গেল চোখের সামনে। রক্তে যাঁর অ্যাডভেঞ্চারের নাচন, মন যাঁর ঘড়ির মত—এ সেই অকুতোভয় বার্বিকেন।

প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীও সেই স্বর এবং সেই মূর্তির সামনে কেঁচোর মত কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেল।

মেজর ডোনেলানের তখন বড় ইচ্ছে হল, বার্বিকেনের গলাটা টিপে ধরার। কিন্তু ইম্পে বার্বিকেনও রোগাপটকা নন, রীতিমত বলশালী সুদেহী পুরুষ। সুতরাং বাহুবলে বিশেষ সুবিধে হবে না বুঝে চম্পট দিলেন মেজর।

জগতে ঈর্ষাকাতর মানুষের কখনো অভাব হয় না। বার্বিকেনের জয়জয়কার দেখে একদল লোক তাই আদাজল খেয়ে লেগে গেল কেচ্ছা ভর্তি গল্প আর ছবি ছাপানোর কাজে। ব্যঙ্গ চিত্রগুলো বেশী করে প্রকাশ পেল ইংলণ্ডের লণ্ডনে। ডলারের কাছে পাউণ্ডের পরাজয়ের জ্বালা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না ইংরেজরা। তাই টিটকিরি দিয়ে কাগজে কাগজে লেখা হল—"ইয়াঙ্কি বার্বিকেন নাকি যেখানে মানুষ কখনো যায়নি এবং যাবেও না—সেইখানে ইমারত বানিয়ে শহরের পত্তন করতে চাইছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের অ ? একটা 'হোয়াইট হাউস' বানাতে চাইছেন।"

ব্যঙ্গচিত্র যে কত ছাপা হল, তার ইয়ত্তা নেই। ইউরোপের সর্বত্র দোকানে দোকানে সাজিয়ে রাখা হল শ্লেষচিত্র। আমেরিকার বড় বড় শহরও পেছিয়ে রইল না বার্বিকেনকে বিদ্রূপ করতে। একটা ছবিতে দেখা গেল গানক্লাবের সদস্যরা উত্তর মেরুর বরফের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে এগিয়ে চলেছে প্রত্যেকের হাতে শাবল গাঁইতি কোদাল।

আর একটা কার্টুন ছবিতে দেখা গেল ইম্পে বার্বিকেন তাঁর দুই সহচর ক্যাপ্টেন নিকল এবং ম্যাসটনকে নিয়ে বেলুনে চেপে পৌঁছেছেন সুমেরুর অভীপ্সিত অঞ্চলে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কয়লার সন্ধান পেয়েছেন একটিমাত্র কয়লার ডেলা। ওজন সাকুল্যে আধ পাউণ্ড।

ম্যাসটনকে নিয়ে আঁকা হল একটা পেটফাটা হাসির ছবি। সুমেরুর চুম্বক আকর্ষণের উৎস খুঁজতে গিয়ে ম্যাসটন বেচারীর লোহার আঁকশি হাত আটকে গেছে উত্তর মেরুতে।

ম্যাসটন রগচটা মানুষ। দেহ-বিকৃতি নিয়ে ইয়ার্কি একদম সইতে পারেন না। তাই প্রত্যেকটা কার্টুন তাঁর মাথা গরম করে ছাড়ল। মিসেস স্করবিটও ক্ষুব্ধ হলেন ব্যঙ্গ চিত্রীদের নষ্টামি দেখে।

ব্রাসেলস থেকে বেরোলো একটা ভারী মজার ছবি। সুমেরুর বরফ গলানোর জন্যে গান ক্লাবের সদস্যরা অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন সমুদ্র-সমান সুরাসার ঢালছেন বরফের রাজ্যে এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে যাতে আগুনের আঁচে বরফ গলে গিয়ে কয়লার স্তর বেরিয়ে পড়ে।

সবচাইতে কৌতুকাবহ হল একটা ফরাসি কার্টুন। উত্তর মেরু পৌঁছোনোর শর্টকাট ব্যবস্থা করে ফেলেছেন বার্বিকেন। দেখা গেল একটা তিমির পেটে বসে মহানন্দে তাস পিটছেন বার্বিকেন এবং ম্যাসটন। তিমি এগিয়ে চলেছে বরফের মধ্যে দিয়ে।

ছবি দেখে ম্যাস্টন অগ্নিশর্মা হলেন বটে, কিন্তু বার্বিকেন মাথা গরম করলেন না।

উত্তর মেরুর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসার পরেই জনসাধারণের কাছে টাকা তোলার ব্যবস্থা করলেন বার্বিকেন। সবশুদ্ধ দেড়কোটি ডলার দরকার। একশ ডলার দরের কোম্পানীর কাগজ বাজারে ছাড়তেই হু-হু করে টাকা আসতে লাগল আমেরিকার সব জায়গা থেকে। বিজ্ঞান-জানা পণ্ডিতরাও তিলমাত্র সংশয় রাখলেন না বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। বার্বিকেন জয়যুক্ত হবেনই, এ বিশ্বাস রইল আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনে।

ষোলই ডিসেম্বর দেড়কোটি ডলার জোগাড় হয়ে গেল। চাঁদে যাওয়ার সময়ে গান ক্লাব যে পরিমাণ ডলার সংগ্রহ করেছিল, এ টাকা তার তিনগুণ।

(৬) বজ্রের বদ রসিকতা

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন জানতেন, তিনি সুমেরু জয় করবেনই। টাকার জোগাড় হয়ে যাওয়ায় একটা বড় বাধা দূর হল। এবার প্রস্তুতির পালা। ফ্রাঙ্কলিন, কেন, ডি লং, নারেস, গ্রীলি যা পারেন নি, উনি তা পারবেন। চরাশি ডিগ্রী সমাক্ষরেখা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বেন। শুধু জমির দখল নিয়েই ক্ষান্ত হবেন না, সুমেরুই হবে আমেরিকার জাতীয় পতাকায় ঊনচল্লিশতম তারকা।

ইউরোপের সবাই অবশ্য বার্বিকেনকে ধাপ্পাবাজ আখ্যা দিলেন। বার্বিকেন তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। কেননা উত্তর মেরু বিজয়ের পরিকল্পনাটি এতই সহজ যে ছেলেখেলা বললেই চলে। আইডিয়া এসেছে অবশ্য জে টি ম্যাস্টনের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে। ভদ্রলোকের মাথাটি অঙ্কের ব্যাপারে অত্যন্ত সাফ বলেই নতুন নতুন আইডিয়ার কারখানা বিশেষ। ম্যাস্টন গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সে-কথা বারবার বলার দরকার নেই। এ রকম অসাধারণ প্রতিভা বড় একটা দেখা যায় না। হিসেবে তার ভুল হয় না কখনো। গণিত বিজ্ঞানের যে কোনো দুরূহ সমস্যা হাতে নিয়ে আগে একচোট হেসে নিতেন ম্যাস্টন। তারপর সারাদিন অংক কষে বার করে দিতেন নির্ভুল উত্তরটি। বীজগণিত পাটীগণিত তাঁর কাছে নেহাতই ছেলেখেলা।

উনি অংক করতেন ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ি দিয়ে। খড়িটা লাগানো থাকত তার লোহার হাতে। সেই সময়ে তাঁর অংক লেখার পারিপাট্য দেখলে তাজ্জব

হতে হবে। লিখতেন বড বড অক্ষবে বেশ পরিষ্কার ভাবে। 2 আব 3 কে মনে হত দিব্বি নিটোল নধরকান্তি, 7 কে অবিকল গঞ্জযষ্টিব মত দেখতে লাগত—দেখলেই ভর দিতে ইচ্ছে কবে। 8 কে মনে হত একজোড়া চশমা। X, Y, Z যেন সত্যিই অজানা অঞ্চলেব রহস্য, + তো নয়, যেন মূর্তিমান যোগ, — একটু ছিমছাম হলে বিযোগ ব্যাথায় বিধুর, - চিহ্ন এমনভাবে লিখতেন যেন ম্যাসটন যে দেশেব মানুষ সেখানে সবাই সবার সমান।

অভিনব গাণিতিক পাণ্ডিত্যেব জন্যে গান ক্লাবেব প্রত্যেকেব অসীম আস্থ ছিল ম্যাসটনেব ওপব। অংকেব ব্যাপাবে তিনি নির্ভবযোগ্য। কংগে ডুবিয়ে দেবেন না। এঁব অংকেব ভিত্তিতেই গান ক্লাবেব চন্দ্রাভিযান সম্ভব হয়েছিল। উত্তব মেরু বিজয়ও সম্ভব হবে ম্যাসটনেব অংক কষা শেষ হবে। কতকগুলো জটিল সমস্যাব জট ছাড়াতে হবে দুরূহ অংক কষে। তাহলেই বিজয়কেতন উড়বে সুমেরু শীর্ষে।

না, ম্যাসটন কখনো ভুল কবেন না। সামান্যতম ভুলেব ফলে সাংঘাতিক বিভ্রাট ঘটে যেতে পাবে, লক্ষ লক্ষ লোকেব প্রাণহানি ঘটতে পাবে, কোটি মুদ্রাব অপচয় ঘটতে পাবে কিন্তু ম্যাসটন কখনো ভুল কবেন না। যদি কবতেন, নিজেব হাতেই নিজেব গাটাপাচাব থুলি উপড়ে আনতেন।

উত্তবমেরু সম্পর্কিত দুরূহ সমস্যা নিয়েও অংক কষতে হয়েছে তাঁকে। সে দৃশ্য দেখতে হলে পেছিয়ে যেতে হবে কয়েকটা সপ্তাহ।

বিজ্ঞপ্তি ছাপানোব একমাস আগে ম্যাসটন কথা দিয়েছিলেন বন্ধুদে উত্তবমেরু বিজয়েব গোপন সূত্র তিনি তাঁদেব হাতে তুলে দেবেন। ম্যাসটন থাকেন ১৭৯ নং ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রীটেব অত্যন্ত নিরিবিলি একটা বাড়ীতে। বাইরেব গোলযোগ সেখানে পৌঁছায় না। নিভৃতে বসে তিনি শুধু অংক কষেন। চাকব বলতে একজনই—নাম তাব 'ফাযাব ফাযাব। জাতে নিগ্রো। ম্যাসটনেব টাকাব দবকাব অতি সামান্য। গোলন্দাজ বাহিনীব অবসব প্রাপ্ত অফিসাব হিসেবে কিছু মাসোহাবা পান। গান ক্লাবেব সেক্রেটাবী হিসেবেও কিছু মাইনে পান। তাইতেই তিনি সন্তুষ্ট। অথচ ইচ্ছে কবলে তিনি লাখ লাখ টাক বোজগাব করতে পাবেন। ইচ্ছে করলে তিনি বিয়েও কবতে পাবেন। কিন্তু উনি একলা থাকতেই ভালবাসেন। ম্যাসটন অকৃতদাব। কাবণ ওঁব মতে, এ দুনিয়ায় ভালভাবে বাঁচতে হলে চিবকুমাব থাকাই উচিত। নির্জনে একলা থাকেন বলেই মাথা থেকে এমন সব অংকেব খেল বেবোয় যা দেখলে নিউটন ইউক্লিড, লাপ্লেস-ও ঈর্ষায় জ্বলে মবতেন।

ম্যাসটনের ছোট্ট, সাদাসিদে বাড়ীব নাম 'ব্যালিস্টিক কটেজ'।

ঠিক উল্টো হল মিসেস স্বরবিটের বাড়ী। যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি সাজানো। নিউপার্কের সবসেরা অঞ্চলে তাঁর জমকালো প্রাসাদ দেখবার মত। ঝুল বারান্দাগুলো অতিশয় বাহারি। স্থাপত্য শিল্পের অর্ধেক রোমান্টিক ধাঁচের রোমানেস্ক। অর্ধেক কর্কশ ধাঁচের গথিক। বড় বড় ঘরগুলিতে মূল্যবান আসবাবপত্র। সুবিশাল সুসজ্জিত হলঘর। আর্টগ্যালারীতে বিস্তর বিখ্যাত ছবি—অধিকাংশই ফরাসি আর্টিস্টদের আঁকা। সোপান সারি রাজপ্রাসাদের বিরাট চওড়া সিঁড়ির মত। আস্তাবল, বাগান, সেরা ফুল, প্রস্তরমূর্তি, ফোয়ারা—কিছুরই অভাব নেই। বাড়ীর ছাদে মস্ত গম্বুজ। গম্বুজের ওপর উড়ছে জমকালো নিশান—তাতে নীল আর সোনালী রঙে আঁকা স্বরবিট বংশের বংশ প্রতীক।

'ব্যালিস্টিক কটেজ' আর নিউপার্কের প্যালেস—মাঝে তিন মাইলের ব্যবধান। কিন্তু একটা প্রাইভেট টেলিফোন লাইন পাতা হয়েছিল দুই ভবনের মধ্যে এবং যখন খুশী 'হ্যালো-হ্যালো' করে খবরা খবর নেওয়া যেত পরস্পরের। চোখের দেখা সম্ভব না হলেও মুখের কথা তো শোনা যেত।

তেসরা ডিসেম্বর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা অন্তে 'ব্যালিস্টিক কটেজে' ফিরে এলেন ম্যাসটন। রহস্যজনক অংক কষা নিয়ে তন্ময় হতে হবে এবার। এ অংকের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে সুমেরুর তুষারে ঢাকা অঞ্চলের ব্যবহার। প্রহেলিকাবৎ সেই আঁকজোক করতে দিন সাতেক সময় লাগবেই। এই সময়ে ব্যাগড়া পড়লে ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই সাব্যস্ত হল সাতটা দিন ম্যাসটনকে কেউ বিরক্ত করবেন না। কেউ তাঁর বাড়ী যাবেন না।

বিদায়কালে এই কথা শুনে মিসেস স্বরবিট বড় হতাশ হলেন। সাত সাতটা দিন দেখা হবে না ম্যাসটনের সঙ্গে?

বারবেন বললেন—"দেখবেন, ভুল-টুল যেন না হয়।'

"ভুল? বিশ্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে স্রষ্টা যতটুকু ভুল করেছেন, তার বেশী করব না, বললেন ম্যাসটন।

সদলবলে বিদায় নিলেন বারবিকেন। বন্ধ হয়ে গেল 'ব্যালিস্টিক কটেজে'র সদর দরজা। 'ফায়ার ফায়ার-যের ওপর হুকুম রইল, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এলেও যেন দরজা খোলা না হয়।

প্রথম দুটো দিন শুধু ভাবলেন ম্যাসটন। চকখড়ি ছুঁলেন না, কেবল ভেবে গেলেন। বিস্তর বই পড়লেন আর একনাগাড়ে চিন্তা করে গেলেন কিভাবে অংক শুরু করলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

ওঁর ভাবনার মূল অংশ নীচে দেওয়া হল :

পৃথিবী একটা পরাবৃত্ত পথে পরিভ্রমণ করছে, এর দীর্ঘতম ব্যাসার্ধ হল ৬,৩৭৭,৩৯৮ মিটার এবং হ্রস্বতম ব্যাসার্ধ হল ৬,৩৫৬,০৮০ মিটার। নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর পরিধি ৪০,০০০,০০০ কিলোমিটার। ভূপৃষ্ঠ প্রায় ৫১০,০০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর ঘনত্ব জলের ঘনত্বর প্রায় পাঁচগুণ। মোটামুটি এই সব তত্ত্বকে মূল ধরে অংক শুরু করা স্থির করলেন ম্যাসটন।

ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে বিকেল পাঁচটায় মাথা ঠাণ্ডা করে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ম্যাসটন। ঘরের কোণে পালিশ করা ওক কাঠের স্ট্যাণ্ডের ওপর বসানো ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে স্ট্যাণ্ডে লাগানো ছিল চকখড়ি। পাশেই স্পঞ্জ। ডান হাত, মানে ডান হাতের আঁকশিটাও নিশপিশ করছে অঙ্ক কষবার জন্যে।

প্রথমেই একটা মস্ত বৃত্ত আঁকলেন ম্যাসটন। এই হল পৃথিবী। মাঝখান দিয়ে টানলেন একটা সরলরেখা, অর্থাৎ নিরক্ষরেখা, অর্থাৎ পরিধি। পাশে গোটা গোটা ছাঁদে লিখলেন ভূ-পরিধির মাপ :

৪০,০০০,০০০

শেষ হল প্রাথমিক পর্ব। এবার শুরু হল সমস্যার সমাধান। অংক কষতে কষতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন বলে খেয়াল করলেন না আকাশের চেহারা পালটে যাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি এল বলে। কংকেবার বিদ্যুৎও চমকাল। কিন্তু ধ্যানমগ্ন ঋষির মতই তা দেখেও দেখলেন না ম্যাসটন। আচম্বিতে কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল টেলিফোন।

এবার সম্বিৎ ফিরল ম্যাসটনের। টেলিফোনের বাজনা শুনে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—"আচ্ছা আপদ তো! সদর দরজা বন্ধ করেছি, টেলিফোনের তারটাও কেটে দিলে ভাল হত।"

বলে, রিসিভার তুলে খেঁকিয়ে উঠলেন—"হ্যালো কে?"

"মিস্টার ম্যাসটন কি আমার গলা চিনতে পারছেন না? আমি মিসেস স্করবিট।"

"মিসেস স্করবিট!" পরক্ষণেই এমন নিম্নকণ্ঠে একটি বচন আওড়ালেন তিনি যা মিসেস স্করবিটের কানে গেল না। বললেন—"একটা সেকেণ্ডও রেহাই দেবেন না?" তারপরেই বললেন উচ্চ কণ্ঠে এবং মার্জিত সুরে "তাই বলুন, আপনি!"

"হ্যাঁ, মিস্টার ম্যাসটন, আমি।"

"বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে।"

"দারুণ ঝড় এসেছে। তছনছ করছে শহরকে।"

"কি করব বলুন। ঝড় আমার বারণ শুনবে না।"

"জানলাগুলো বন্ধ করেছেন তো?"

মিসেস স্করবিটের মুখের কথা খসতে না খসতেই ভয়ংকর বাজ পড়ল শহরের ওপর। বজ্রপাত ঘটল 'ব্যালিস্টিক কটেজে'র কাছেই। টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ ছুটে এসে গণিতবিদ ম্যাসটনকে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঘরের অপর কোণে। জীবনে কখনো অমন ডিগবাজী খাননি ম্যাসটন। লোহার আঁকশিটা তারে ঠেকতেই এই বিপত্তি। নিজে আছাড় খেতেই ব্ল্যাকবোর্ডটাও শূন্যপথে ঠিকরে গিয়ে পড়ল উল্টোদিকের দেওয়ালে। এরপর তড়িৎ প্রবাহ অন্যান্য জিনিসের মধ্যে দিয়ে উধাও হল মেঝে দিয়ে।

হতভম্বভাবে উঠে দাঁড়ালেন ম্যাসটন। এটা সেটা নাড়া চাড়া করে দেখলেন হাত-পা ভাঙেনি। তারপর ধীরস্থিরভাবে গুছোতে লাগলেন লণ্ডভণ্ড জিনিসপত্র। ব্ল্যাকবোর্ড রাখলেন যথাস্থানে। খড়ি নিয়ে অংক কষতে গিয়ে দেখলেন, যে অংকটা প্রথমে লিখেছিলেন, ছিটকে যাওয়ার সময়ে তার ডানদিকের খানিকটা মুছে গেছে। উনি তা নতুন করে লিখতে যাচ্ছেন। এমন সময়ে ফের ঝন্‌ঝন্ করে বাজল টেলিফোন।

ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিয়ে বিষম বেগে বললেন ম্যাসটন—"আবার কে?"

"মিসেস স্করবিট।"

"কি চান মিসেস স্করবিট?"

"ব্যালিস্টিক কটেজে বাজ পড়েনি তো? কি সাংঘাতিক আওয়াজ বলুন তো?"

"নির্ভয়ে থাকুন।"

"চোট লাগেনি তো?"

"একদম না।"

"কোনো রকম চোট লাগেনি? ঠিক জানেন তো?"

"আপনার সহানুভূতি তা ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করেনি আমাকে।"

"গুড ইভনিং, ডিয়ার মিস্টার ম্যাসটন।"

"গুড ইভনিং, ডিয়ার মিসেস স্করবিট।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে মিসেস স্করবিটের মুণ্ডপাত করলেন ম্যাসটন বললেন—"জ্বালিয়ে মারলে! যমেরও অরুচি! ফোন না করলে ইলেকট্রিক কারেণ্ট আমাকে এভাবে ধাক্কা মারত না।"

এই বলে আর কোনো ঝুঁকির মধ্যে গেলেন না ম্যাসটন! ছিনে জোঁক মিসেস স্করবিটকে বিশ্বাস নেই। তাই টেলিফোনের তার কেটে দিলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে ফের দাঁড়ালেন ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে। শুরু হল সূত্র, ভগ্নাংশ, গৌণিক, ধ্রুবকের খেলা।

এক সপ্তাহ পরে শেষ হল ঐতিহাসিক অংক-পর্ব। ফলাফল পৌছোলো উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির কর্তাদের হাতে। সুমেরু বিজয়ের সূত্র পাওয়া গিয়েছে অংকের হিসাবে।

(৭) বার্বিকেন মুখে কুলুপ আঁটলেন

২২শে ডিসেম্বর বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী অংশীদারদের এক মিটিং ডাকলেন গান ক্লাবের সভাকক্ষে। এতবড় হলঘরেও তিলধারণের স্থান রইল না। খোলা জায়গাতেও মিটিং করা সম্ভব নয় এই ঠাণ্ডার দিনে। তাছাড়া গান ক্লাবের সভাকক্ষর ইজ্জৎও আলাদা। সে ঘরের দেওয়ালে নানা রকম আগ্নেয়াস্ত্র ঝোলানো। চেয়ার-টেবিল, সোফা, ডিভানগুলোর কিম্ভূত-কিমাকার গড়ন পর্যন্ত কামান বন্দুকের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ঘরের সব কিছুই অদ্ভুত, বিচিত্র এবং আশ্চর্য। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে খুনখারাপির নিদর্শন বর্তমান।

মিটিংয়ের দিন অবশ্য খুনখারাপির সব চিহ্ন মুছে দেওয়া হল সভাকক্ষ থেকে। কামান-বন্দুক ইত্যাদি সরিয়ে নেওয়া হল। উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির উদ্দেশ্য মারপিট করা নয়—শান্তির বাণী বহন করা এবং পৃথিবীর মঙ্গল করা।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছেন কোম্পানীর অংশীদাররা, গান-ক্লাবের বিভিন্ন ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকেও এসেছেন অনেকে। এসেছেন ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা। বার্বিকেন আজকের মিটিংয়ে ঘোষণা করবেন, কি ভাবে সুমেরুর কেন্দ্রে রওনা হবে উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি এবং কয়লা তুলবে কয়লা খনি থেকে! প্রতিটি রক্তকণিকায় সীমাহীন উৎকণ্ঠা উত্তেজনা নিয়ে তাই প্রতীক্ষা করছেন অংশীদাররা।

রাত আটটা। রাস্তায় পর্যন্ত কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে বার্বিকেনের যুগান্তকারী ঘোষণা শোনবার জন্যে। এডিসন বাতির কল্যাণে আলো ঝলমল করছে গান ক্লাবের সবত্র।

হলঘরের মধ্যে টুঁ শব্দ নেই। মঞ্চে এসে বসলেন সপারিষদ ইম্পে বার্বিকেন। 'হুররে' ধ্বনিতে হল ফেটে পড়ার উপক্রম হল।

ইম্পে বার্বিকেন দাঁড়িয়ে উঠে বক্তিমে শুরু করলেন :

"মশাইরা! আজকের সভায় পরিচালকমণ্ডলী একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শোনাবেন আপনাদের! আপনারা জানেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার উত্তর মেরুর দখলীসত্ত্ব আমাদের দিয়েছেন। সেখান থেকে কয়লা তোলার টাকাও আপনারা দিয়েছেন। লাভের টাকা হাতে এলেই বুঝবেন এতবড় বাণিজ্যিক সাফল্য ইতিহাসে আর নেই।" হাততালির চোটে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না বার্বিকেন। তারপর—"নানা রকম নিবন্ধে আমরা প্রমাণ করেছি, উত্তর মেরুতে শুধু কয়লা কেন, শিলীভূত হাতির দাঁতও থাকতে পারে। কয়লা ছাড়া মনুষ্য সমাজ এখন অচল। পাঁচশ বছর পরে কিন্তু কয়লার অনটন দেখা দেবে। জানা কয়লা খনিতে আর কয়লা থাকবে না।"

"তিনশ বছর!" চীৎকার করে উঠল একজন। আরেকজন আরো চেঁচিয়ে বললে—"দুশ বছর।"

বার্বিকেন বললেন—"দুদিন কি দশ দিন পরে, কয়লা ফুরোবেই। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেও কয়লা শেষ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং মশাইরা, চলুন এখুনি যাওয়া যাক উত্তর মেরুতে।"

তৎক্ষণাৎ হলশুদ্ধ লোক উঠে দাঁড়ালেন। বার্বিকেনের সঙ্গে যেন এখুনি সবাই বেরিয়ে পড়বেন। ছন্দপতন ঘটালেন মেজর ডোনেলান। উচ্চকণ্ঠে শুধোলেন—"কিভাবে যাবো?"

"জলপথে, স্থলপথে, অথবা শূন্যপথে," ঠাণ্ডা গলায় বললেন বার্বিকেন।

হলশুদ্ধ লোক তক্ষুনি বসে পড়লেন। উদগ্র কৌতূহলে জোড়া জোড়া চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল শামুকের চোখের মত।

বার্বিকেন বললেন—"জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করেও অভিযাত্রীরা চুরাশি ডিগ্রী পেরিয়ে যেতে পারেন নি। নৌকোয় চেপে তারা গিয়েছেন হিমশৈলর প্রান্তে। সেখান থেকে বরফের ওপর দিয়ে স্লেজগাড়ীতে গেছেন আরো কিছুদূর। কিন্তু এভাবে কি বেশী দূর যাওয়া যায়? সাংঘাতিক ঠাণ্ডায় মৃত্যু অনিবার্য। আমরা তাই অন্যভাবে পৌঁছোবো উত্তর মেরুতে।"

"কি ভাবে?" ইংলণ্ড-প্রতিনিধি শুধোলেন।

"দশ মিনিটের মধ্যেই তা শুনবেন, মেজর ডোনেলান। কোম্পানীর অংশীদারদের মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরাই চাঁদে গোলা পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং আস্থা রাখুন আমাদের ওপর।"

টিটকিরি দিয়ে উঠলেন ডীন টুড্রিঙ্ক—"তাতো দেখতেই পাচ্ছি। চাঁদ পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত এই ঘরেই বসে রইলেন।"

কর্ণপাত করলেন না বার্বিকেন—"দশ মিনিট সবুর করুন। তারপর শুনবেন আমাদের পরিকল্পনা।"

চাপা গুঞ্জনধ্বনি উঠল শ্রোতাদের মধ্যে। এমন উৎকণ্ঠিত মুখে তারা বসে রইলেন যেন ঠিক দশ মিনিট পরেই উত্তর মেরু পৌঁছে যাবেন সকলেই।

বার্বিকেন কিন্তু থেমে রইলেন না। বললেন—"সুমেরু অঞ্চল মহাদেশ, না, মহাসমুদ্র? কম্যাণ্ডার নারেস অবশ্য বলেছিলেন, প্যালিওক্রিস্টিক মহাসমুদ্র, মানে, প্রাচীন বরফ সমুদ্র। আমার মনে হয়, কম্যাণ্ডার ভুল বলেছিলেন।"

খ্যাঁক করে উঠলেন এরিক বলডেনাক—"আপনার মনে হওয়ার ধার ধারি না মশায়। নিশ্চিতভাবে কিছু জানলে বলুন।"

"হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে জেনেই বলছি," সমান তেজে জবাব দিলেন বার্বিকেন—'সুমেরু অঞ্চল আসলে একটা নিরেট মহাদেশ। বরফ সমুদ্র নয়—উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির টাকা জলে পড়েনি। সুতরাং বিরাট এই মহাদেশে ইউরোপের আর কোনো অধিকার নেই।"

কে যেন ভেংচি কেটে বললে—"মহাদেশ না ছাই। স্রেফ জল। জল ছেঁচে বার করবেন কি করে, তাই বলুন।"

বার্বিকেন তক্ষুনি বললেন—"আজ্ঞে না মশায়। মহাদেশ ছাড়া সুমেরুতে কিস্সু নেই। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন-চার কিলোমিটার উঁচু—গোবি মরুভূমির নয়। সুমেরু বৃত্তের আশপাশের জমি দেখলেই তা বোঝা যাবে—এই জমিই সোজা বিস্তৃত হয়ে পৌঁছেছে সুমেরুতে।

'নরডেনস্কয়েড, পেরী, মেইগার্ড অভিযান থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন, গ্রীনল্যাণ্ড উঁচু হতে হতে সুমেরু হয়ে গিয়েছে আরো উত্তরে।

"তারা নানা রকম উদ্ভিদ, পাখী, এমন কি হাতীর দাঁত এনেও প্রমাণ করে দেখেছিলেন, উত্তর মেরুর ধু ধু অঞ্চলে এক সময়ে মানুষ থাকত, সেখানে গাছপালা ছিল। শ্বাপদ ছিল, সুতরাং এখন কয়লাও আছে। মশাইরা, উত্তর মেরু আসলে একটা মহাদেশ। আমেরিকার পতাকা শীগ্গিরই উড়বে সেই মহাদেশে।"

মেজর ডোনেলান বেঁকা সুরে বললেন—"দশ মিনিটের সাত মিনিট তো হয়ে গেল। উত্তর মেরু আর কদ্দূর?"

"বাকী তিন মিনিটেই পৌঁছে যাব," নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিলেন বার্বিকেন। "মহাদেশটি কিন্তু বরফের বাধায় দুরতিক্রম—সে বাধা পেরোনো খুবই কষ্টকর।"

"অসম্ভব," বললেন হারাল্ড।

"হ্যাঁ, অসম্ভব," জবাব দিলেন বার্বিকেন। "নৌকো বা স্লেজগাড়ীতে অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করব বলেই উত্তর মেরু কিনেছি। আমরা উত্তর মেরুর বরফ গলিয়ে দেব। বরফের বাধা আপনা হতেই সরে গিয়ে পথ করে দেবে। অথচ তার জন্যে একটি ডলারও খরচ হবে না। একটা মিনিটও বাজে নষ্ট হবে না।"

নৈঃশব্দ্য। চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে!

"মশাইরা," বললেন বার্বিকেন, "পৃথিবীটাকে চাড় মেরে তোলার জন্যে আর্কিমিডিস চেয়েছিলেন শুধু একটা হ্যাণ্ডেল। আমরা আবিষ্কার করেছি সেই হ্যাণ্ডেল। উত্তর মেরুকে সরিয়ে আনার কল আমাদের হাতের মুঠোয়।"

"উত্তর মেরুকে সরাবেন?" এরিক বলডেন গলার শির তুলে চেঁচালেন।

"সরিয়ে আমেরিকায় এনে ফেলবেন নাকি?" হারাল্ডের প্রশ্ন।

বার্বিকেন বললেন—"হ্যাণ্ডেলটা—"

"বলবেন না! বলতে হবে না! ফাঁস করবেন না!" দারুণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল একজন সাগরেদ।

"না, না, একদম না, সিক্রেট বলার জায়গা এটা নয়!" সমস্বরে ধুয়ো ধরল হলশুদ্ধ বার্বিকেন সমর্থকরা।

"বেশ, বেশ, বলব না," বলার কোনো ইচ্ছেও ছিল না বার্বিকেনের। কৌশলে শ্রোতাদের মুখ দিয়েই নিষেধাজ্ঞা বার করে নিলেন। ইউরোপের শত্রুপক্ষ তাই শুনে বেজায় দমে গেল।

বার্বিকেন বললেন—"উত্তর মেরু দখলের সিক্রেট আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কিন্তু জে টি ম্যাসটনের। শিল্পযুগের বিপ্লব এই গুপ্তরহস্য আবিষ্কার করার জন্যে প্রয়োজন ছিল এমন একজনকে অংকে যাঁর মাথা খুব সাফ। বেশ কয়েটা কঠিন গাণিতিক প্রহেলিকার জটিলতায় লুকিয়ে ছিল হ্যাণ্ডেল-রহস্য। তাই সেক্রেটারী ম্যাসটনের শরণ নিয়েছিলাম আমরা।"

"জয় হোক জে টি ম্যাসটনের! হিপ্‌, হিপ্‌, হুররে!" বজ্রগর্জন করে উঠল শ্রোতারা।

শুনে আনন্দে অবশ হয়ে এল মিসেস স্করবিটের সারাদেহ! ম্যাসটনের প্রশংসা শুনলে তাঁর বুক দশ হাত হবে, এ আর আশ্চর্য কী!

ম্যাসটন ডাইনে-বাঁয়ে নীরবে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করলেন তাঁর স্তাবকদের!

বার্বিকেন শুরু করলেন—"আপনাদের মনে থাকতে পারে, চাঁদে যাওয়ার

আগে (কথাটা এমন ভাবে বললেন যেন পাশের বাড়ী যাওয়ার কথা বলছেন) ম্যাসটন বলেছিলেন, 'উত্তর মেরুকে সরিয়ে আনার যন্ত্র আমরা আবিষ্কার করবই। ঠিক কোন জায়গায় চাপ দিলে পৃথিবীর অক্ষরেখা সিধে করা যাবে, তা আমরা বের করবই।' মশাইরা, যন্ত্রটা শেষ পর্যন্ত আমরা আবিষ্কার করেছি। কোন জায়গায় ঠেলা মেরে অক্ষরেখাকে সিধে করব, তাও বের করেছি। এখন শুধু হ্যাণ্ডেল ঢুকিয়ে চাপ দেওয়ার পালা।" হতভম্ব হয়ে গেল হলশুদ্ধ শ্রোতা। মুখে কথা সরল না কারু।

অবশেষে তেড়েমেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর ডোনেলান—"পৃথিবীর অক্ষরেখার অবস্থান পালটাতে চান? আপনার স্পর্ধা কম নয় তো!"

জ্বলন্ত চোখে বললেন কর্ণেল কাবকফ—"আপনি খোদার ওপর খোদকারি করতে চান?"

"হ্যাঁ, চাই। তবে ঘূর্ণনবেগের সময় যা আছে, তাই থাকবে। উত্তর মেরু সরে আসবে সাতষট্টি অক্ষাংশ রেখায়। ফলে, পৃথিবীর অবস্থা দাঁড়াবে ঠিক বৃহস্পতি গ্রহের মত। বৃহস্পতির অক্ষরেখা কক্ষপথের সঙ্গে সমকোণে থাকায় সে-গ্রহে সুবিধে অনেক। উত্তর মেরুকে ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট সরিয়ে আনতে পারলেই দেখবেন বরফ গলতে শুরু করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে যে বরফ জমেছে, তা গলে যাবে দেখতে দেখতে।"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল শ্রোতারা। হাততালি দেওয়ার কথাও কারও মনে হয় নি পাছে বক্তিমে শুনতে না পাওয়া যায়। এত সহজে উত্তর মেরুর বরফ গলানো সম্ভব? পৃথিবী যে অক্ষরেখা বরাবর ঘুরছে, তা ঈষৎ হেলে রয়েছে। ঝুঁকে থাকা অক্ষরেখাকে খাড়া করে দিলেই উত্তর মেরু কব্জায় আসবে?

ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা এত অবাক হলেন যে মনেপ্রাণে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে! পরক্ষণেই ছাদ ভেঙে পড়ার উপক্রম হল তুমুল হর্ষধ্বনিতে।

হর্ষধ্বনির আগে অবশ্য আর একটা কথা বলেছিলেন বার্বিকেন। তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতার ক্লাইমাক্স সেই কথা। বলেছিলেন:

"সূর্য নিজে গলিয়ে দেবে উত্তর মেরুর বরফ। গলে যাবে হিমশৈল আর তুষার প্রান্তর। মানুষ উত্তর মেরুতে যেতে পারেনি এতদিন, তাই উত্তর মেরু নিজেই এগিয়ে আসবে মানুষের কাছে!"

(৮) হ্যাঁ, অবিকল বৃহস্পতির মতই

চাঁদে যাওয়ার আগে ম্যাস্টন একটা মিটিংয়ে বলেছিলেন, পৃথিবীর মেরুদণ্ডকে খুঁচিয়ে সিধে করে দিতে পারলে সুবিধে অনেক। পৃথিবীর চেহারাই পালটে যাবে।

তারপর থেকে সম্ভাবনাটা মাথা থেকে যায়নি ম্যাস্টনের। কত ভেবেছেন, কত অংক কষেছেন, কত পড়াশুনা করেছেন পৃথিবীর অভিনব ভবিষ্যৎ নিয়ে। অবশেষে মেরুদণ্ডকে চাড় দিয়ে সিধে করার পন্থাও বাংলে দিয়েছেন।

একবার তা সম্ভব হলে প্রবীণ পৃথিবী রাতারাতি নবীন হয়ে যাবে। বসন্ত-কালে নরওয়ের Trondhjem অঞ্চলে যে রকম ঝিরঝিরে বাতাস, ফুটফুটে রোদ দেখা যায়, উত্তর মেরুতেও বারোমাস বিরাজ করবে বসন্তের সেই হাসি। উষ্ণ অরুণ কিরণে গলে যাবে জমাট বরফ।

একই আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীময়। বৃহস্পতি গ্রহের মতই পৃথিবী গ্রহেও একই রকম আবহাওয়া বিরাজ করবে বারো মাস। দিন রাত সমান হয়ে যাবে। দিন হবে বারো ঘণ্টা, রাতও তাই। এখনকার মতই বিদ্যমান থাকবে ঊষা এবং গোধূলি। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেবে ঋতুর আনাগোনায়। শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত বলে কোনো ঋতু আর পৃথিবীতে থাকবে না। একই রকম নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় রমণীয় হবে ধরিত্রী। মিলিয়ে যাবে গায়ে ফোস্কাপড়া গরম বা রক্ত জমানো ঠাণ্ডার জায়গা।

ভূগোলকে এমন স্থান আছে, যেখানকার মানুষ সূর্যকে বছরে দুবার খ-বিন্দুতে দেখে (Torrid Zone) আবার এমন জায়গাও আছে যেখানকার খ-বিন্দুতে সূর্য কোনো সময়েই পৌঁছোয় না। মেরু অঞ্চলে দেখা যায় ছমাস দিন, ছমাস রাত। পৃথিবী জুড়ে এই যে উল্টো পাল্টা ব্যাপার ঘটছে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে, এর জন্যে দায়ী হেলে পড়া অক্ষরেখা। কক্ষপথের দিকে ঝুঁকে থাকার দরুন পৃথিবীর কোথাও বেজায় গরম, কোথাও কনকনে ঠাণ্ডা কোথাও অতিবৃষ্টি কোথাও অনাবৃষ্টি।

বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর দৌলতে উল্টো পাল্টা আবহাওয়ার অবসান ঘটবে। নিরক্ষরেখার ওপরেই সূর্য পরিভ্রমণ করবে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন অর্থাৎ ঠিক বারো ঘণ্টা অন্তর অস্ত যাবে—উদিত হবে বারো ঘণ্টা কাটলে।

ফলে, পৃথিবীর মানুষ পছন্দমত আবহাওয়ায় গিয়ে থাকবে। যার ধাতে যে আবহাওয়া সইবে, সেই রকম আবহাওয়ায় গিয়ে বসবাস করবে। বাত-

সর্দি, হাত-পা খেঁচে ধরা ইত্যাদি ব্যাধির কথা কারো মনে থাকবে না। সাংঘাতিক গরম বা মারাত্মক ঠাণ্ডার যুগ বিগত হবে।

আবহাওয়া পালটে গেলে কবিদের কবিতা লেখাও মাথায় উঠবে ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর সুখ সুবিধের অন্ত থাকবে না। চাষীদের হবে পোয়াবারো। যে চাষে যে রকম আবহাওয়া প্রয়োজন, তা পাবে বারো মাস। অর্থাৎ ফসল কাটবার পরেই আবার বীজ বুনে দেওয়া চলবে। হা-পিত্যেশ করে কয়েক মাস বসে থাকতে হবে না। ঝড়, বাদলা, শিলাবৃষ্টির বিপর্যয় দেখা দেবে না। ফসল নষ্ট হবে না। ঝড়বৃষ্টি হলেও তার রুদ্ররূপ আর দেখা যাবে না।

এই রকম বিভিন্ন মত প্রকাশ পেল দুনিয়ার সব কটা পত্র পত্রিকায়। বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর জয় জয়কার আরম্ভ হয়ে গেল দিকে দিকে!

(৯) ফরাসি ইঞ্জিনীয়ার

বার্বিকেনের উদ্যোগে পৃথিবী নতুন রূপে দেখা দেবে। ঘূর্ণন বেগ অবশ্য যা আছে, তাই থাকবে। এক বছরে দিনের সংখ্যাও পালটাবে না।

কিন্তু কি কৌশলে পৃথিবীর অক্ষরেখাকে চাড় মেরে সিধে করা হবে? বার্বিকেন, ম্যাসটন এবং নিকল, তিন জনেই মনের সিন্দুকে কুলুপ এঁটে রেখে দিলেন। জনসাধারণ সে-তত্ত্ব কস্মিনকালেও জানতে পারবে কিনা, এই নিয়েই ঘোর সংশয় দেখা দিল নানা মহলে। সুতরাং কাগজে কাগজে মুখর হল সমালোচক, নিন্দুক এবং মুখফোড় ব্যক্তিরা। এরকম অনিশ্চিত অবস্থায় কাঁহাতক আর ধৈর্য ধরে বসে থাকা যায়? কোন্ যন্ত্র দিয়ে অক্ষরেখা সিধে করতে চলেছেন বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী? নিশ্চয় কল্পনাতীত শক্তির প্রয়োজন হবে সেই যন্ত্র চালাতে। একটা নামী কাগজ লিখল— পৃথিবীটা যদি মেরুদণ্ড বরাবর বন্‌বন্ করে পাক না খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত, একটু ধাক্কাতেই অক্ষরেখাকে সিধে করা যেত। কিন্তু তাতো নয়। সুতরাং কাজটা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব না হয়ে দাঁড়ায়!

পৃথিবীর অক্ষরেখা সিধে হয়ে দাঁড়াবে! সেই সঙ্গে নিশ্চয় আরো অনেক পরিবর্তন দেখা দেবে সারা পৃথিবী জুড়ে! কি ধরনের হবে সেই পরিবর্তনগুলো? বিজ্ঞানী মহল, এমন কি আকাট মূর্খ মহলও ভীষণ ভাবনায় পড়ল এই নিয়ে। অক্ষরেখাকে হঠাৎ খুঁচিয়ে সিধে করতে শেষে হিতে বিপরীত হবে না তো?

উদ্যোক্তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হল না। অক্ষরেখা মাথা তুলে দাঁড়াবে—খুব ভালো কথা। কিন্তু তার জন্যে মাশুল দিতে হবে কতখানি, সেটা হিসেবের মধ্যে রাখা উচিত ছিল নয় কি? ভালর চাইতে মন্দ হবে কতটা, সেটা ভাবা দরকার ছিল নয় কি?

ইউরোপীয় শত্রুপক্ষ হেরে গিয়ে মরছিল গায়ের জ্বালায়। তারা এই সুযোগে জনমতকে খেপিয়ে তোলার কসুর করল না। গানক্লাবের সদস্যরা যাতে পাবলিকের আস্থা হারায় তার জন্যে লেগে গেল আদাজল খেয়ে।

ভুললে চলবে না ফ্রান্সের সঙ্গে এই প্রতিনিধিদের বিন্দুবিসর্গ সম্পর্ক ছিলনা। উত্তর মেরু কেনা নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। একজন ফরাসি ভদ্রলোক কিন্তু স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থে, মানে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে, বাল্টিমোরে এসে গান ক্লাবের প্রতিটি কাযকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন।

ইনি পেশায় ইঞ্জিনীয়ার। বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়। পলিটেকনিক স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন এবং সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে পাশ করেন। ম্যাস্টনের মতই এঁরও পারদর্শিতা ছিল জটিলতম অংকে।

ভদ্রলোক মেধাবী, আমুদে এবং প্রাণ প্রাচুর্যে টলমল। কথা বলেন প্রাণের ভেতর থেকে, ভাষা অতিশয় সাদাসিদে, বোঝা যায় না মজা করার জন্যে বলছেন না সত্যিই গুরুত্ব নিয়ে কিছু বলছেন। দরকার হলে মুখ খারাপ করতেও তার আটকায় না।

ইনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেবিলে বসে ঝড়ের বেগে অংক কষতে পারেন। অংক ছাড়া তার কাছে মস্ত আনন্দের খেলা হল 'হুইস' তাসের খেলা। অবশ্য বিপুল আনন্দলাভ করলেও তাস পেটেন অতিশয় নিরাসক্তভাবে।

আশ্চর্য এই মানুষটার নাম অ্যালসিড পিয়েদো। ইনি মাথায় তালঢ্যাঙা। বন্ধুরা বলেন, পিয়েদোর উচ্চতা নাকি এক চতুর্থাংশ দ্রাঘিমাবৃত্তের পঞ্চাশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। আন্দাজটা খুব ভুল নয়।

পিয়েদোর মাথাটি ছোট্ট। কাঁধটা দারুণ চওড়া বলেই মাথাটাকে অত ছোট মনে হয়। সারা মুখে আশ্চর্য রোশনাই, চশমার আড়ালে নীলচে চোখ দুটি যেন সদাই নাচছে। ফুর্তি যেন উপচে পড়ছে তার মনের পেয়ালায়, প্রাণরস যেন নায়গ্রার মত স্বগর্জনে বেগে চলেছে শিরা উপশিরায়—উচ্ছল মুখচ্ছবিই তার প্রমাণ।

স্কুল কলেজে সেরা ছাত্র ছিলেন ইনি, মাথাটিও গরম হত না যখন তখন। মাথার সাইজ ছোট হলেও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর মস্তিষ্কের। পূর্বপুরুষদের

মত উনিও ঝানু গণিতবিদ। কিন্তু পর্বপুরুষদেব মত গণিত নিয়ে ব্যবসা কবা তাঁব ধাতে ছিলনা। অংক শাস্ত্রটাকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন শুধু অজানাকে জানাব জন্যে।

পিয়োর্দো বিয়ে-থা কবেন নি। বিয়েব খুবই ইচ্ছে ছিল যদিও। বন্ধুরা ভেবেছিল, ভাবী সুন্দব, ভাবী মিষ্টি, ভাবী ফুর্তিবাজ বিশেষ একটি মেয়েকে বিয়ে করবেন পিয়ের্দো। কিন্তু ব্যাগডা দিলেন মেয়েটিব বাবা। তিনি বললেন, পিয়ের্দো নাকি বড্ড বেশী চালাক, বড্ড বেশী তুখোড, বড্ড বেশী মেধাবী। যে ভাষায় পিয়ের্দো কথা বলে, তা বোঝাব সাধ্যি তাঁব মেয়ের নেই।

কন্যা পক্ষেব এই বিনয় বচনে ক্ষুব্ধ হয়ে দেশত্যাগী হলেন পিয়ের্দো। স্বদেশ এবং পবদেশেব মধ্যে স্থাপন করলেন বিশাল মহাসাগবকে। বাল্টিমোবে এসে গ্যাঁট হযে বসে গান ক্লাবেব বিচিত্র কাণ্ডকাবখানাব ওপব নজব বাখলেন পবম কৌতূহলে।

প্রথমে কিন্তু পৃথিবীব অক্ষবেখা নিয়ে তাব তিলমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাবপব তাঁব আগ্রহ চবমে উঠল শুধু একটি ব্যাপাব জানাব জন্যে। পৃথিবীকে নডানো হবে কি কবে, এই নিয়ে তিনি উদয়াস্ত কেবল ভেবেই চললেন। অনেক উদ্ভট পবিকল্পনা মাথায এল এবং বাতিল হল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেলেন না পৃথিবীব ঠিক কোন অঞ্চলে কাজ শুরু কববেন বার্বিকেন।

পৃথিবী বনবন কবে ঘুবেই চলেছে। সুতবাং ঘুবন্ত অবস্থায তাকে ঝাঁকুনি দিযে সিধে কবা কি সম্ভব? বার্বিকেন—ম্যাস্টনের মূল প্ল্যানটা কি ধবনেব? কোন সূত্রব ভিত্তিতে এতবড কাজে নামতে যাচ্ছেন ওঁরা?

সেদিন ছিল উনত্রিশে ডিসেম্বব। বাল্টিমোবেব বাস্তায় উদভ্রান্তেব মত হাঁটতে দেখা গেল এক যুবাপুরুষকে। চিন্তা কুটিল কপাল খামচে ধবে হন হন কবে হাঁটছেন তিনি।

ইনিই অ্যালসিড পিয়ের্দে।

(১০) অস্বস্তি শুরু হল

নযা কোম্পানীব অংশীদাবদেব নিযে সাধাবণ সভাব পব একমাস অতিবাহিত হয়েছে। জনমতও অনেক পালটে গেছে। অক্ষবেখা সিধে হলে যে কত সুবিধে, সেকথা আব কেউ বলছে না। এখন লোকের মুখে কেবল ভযংকর অসুবিধেব কথা।

লোকে বলছে, অক্ষরেখা যে-অবস্থায় আছে, সে-অবস্থা থেকে তাকে নড়াতে গেলে দবকার সাংঘাতিক একটা ধাক্কা। সে-ধাক্কার পরিণামটা নিশ্চয় খুব আরামের হবে না। পৃথিবী জুড়ে যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড দেখা দেবে তা কল্পনা করে ভয়ের চোটে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে গেল জনসাধাবণেব।

অনেক প্রশ্ন ছোবল মারতে লাগল মগজের মধ্যে। বিপর্যয় কি ধবনেব হতে পাবে? আবহাওযাব পবিবর্তন কি নেহাতই দবকার? এস্কিমো এবং অন্যান্য মেরুবাসীদেব পোযাবাবো সন্দেহ নেই। ওদেব তো ষোল আনাই লাভ, ক্ষতি কাণাকডিও নয। ইউবোপীয প্রতিনিধিবাই তাতিযে তুলল জনসাধারণকে। মুহুর্মুহু তারা খবব পাঠাতে লাগল নিজেব গভর্ণমেণ্টকে এবং নির্দেশ পাওযা মাত্র সেই অনুযাযী পাবলিকেব মন ঘুবিযে দিতে লাগল বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীব বিরুদ্ধে। খবব আদান প্রদান হল অবশ্য সাগরেব তলায় পাতা টেলিগ্রাফেব তারেব মধ্যে দিযে এবং পাছে গুপ্ত সংবাদ ফাঁস হয়ে যায়, তাই সাংকেতিক শব্দে খবর গেল এবং খবব এল।

খববগুলো এইবকম: মেজব ডোনেলান—পৃথিবীব সবনাশ আসন্ন।

কর্ণেল ববিস কাবকফ—আমেরিকান ইঞ্জিনীযাববা নিশ্চয এমন ব্যবস্থ করছে যাতে যুক্তবাষ্ট্রেব গাযে আঁচটি না লাগে।

জঁ। হাবাল্ড—কিভাবে? গাছ ধবে ঝাকুনি দিলে সবকটা শাখাতেই ঝাঁকুনি পৌঁছোয।

জ্যাকুইস জানসেন—পিঠে কোঁৎকা খেলে সাবা গাযে বেদনা হয় নাকি?

ডীন টুড্রিঙ্ক—আবোল তাবোল অনুচ্ছেদটাব মানে কি? কেন ভৌগোলিক পবিবর্তনেব কথা বলা হযেছিল?

এবিক বলডেনাক—ভয তো সেইখানেই। অক্ষবেখা সিবে হলেই সমুদ্রব জল উঠে এসে স্থলভাগ ভাসিয়ে দেবে।

জঁ। হাবাল্ড—আবহাওয়াব ঘনত্ব বেড়ে গিযে দমবন্ধ হওযাও বিচিত্র নয।

মেজব ডোনেলান—লণ্ডন শহর পাহাড়ের ডগায ঠেলে উঠবে।

এই বলে পাযেব ওপব পা তুলে দিয়ে শিবনেত্র হযে বসলেন মেজব। ভাবখানা যেন, লণ্ডন শহব পাহাড়ের ডগাতেই পৌঁছে গিযেছে এবং মেঘের মধ্যে অদৃশ্য অবস্থায় বিবাজ কবছে।

সংক্ষেপে, বার্বিকেনেব কথামত কাজ হলে জনসাধারণকে যমালযের পথই ধরতে হবে। পবিবর্তনটা কেবল ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিটের নয়। মেরু অঞ্চল চ্যাপটা হলেই মহাসমুদ্ররা অগ্নিমূর্তি ধাবণ কববে।

তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠল দেশে দেশে। যুক্তবাষ্ট্র সবকারের ওপর

প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হল বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর এগতিয়ারে নাক গলানোর জন্যে। নানা জনের নানা মন্তব্যে কোনঠাসা হয়ে পড়ল আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট। "এ কাজ না করাই ভাল।" "পরিণামে পৃথিবী ধ্বংস হবে।" "ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁর সৃষ্টিতে ভুল নেই, খোদার ওপর খোদকারি করার দরকার নেই।" ফুর্তিবাজরা অবশ্য টিটকিরি দিল এই বলে—"ভাখরে ভাখ। ইয়াঙ্কিদের কারবার ভাখ। পৃথিবীর অক্ষরেখা সিধে করতে চায়। আরে বাবা, কোমর বেঁকা অবস্থাতেই কোটি বছর কাটল, না হয় আরো কোটি বছর কাটবে। তোদের অত মাথাব্যথা কেন রে?"

পিয়ের্দো কিন্তু কথার কচকচির মধ্যে না গিয়ে অন্য তালে ছিলেন। ম্যাসটন অংক কষে নিশ্চয় বের করেছেন ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ অঞ্চলে উদ্যোগপর্ব শুরু করবে বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী। পিয়ের্দো সেই বিশেষ স্থানটি জানার জন্যে চেষ্টার কসুর করলেন না। সবচেয়ে বেশী বিপদ ঘটবে তো সেই অঞ্চলেই।

ইউরোপের কিছু লোক বলল, বার্বিকেন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা সকলেই যখন ইয়াঙ্কি, তখন নিশ্চয় স্বদেশ রক্ষার আয়োজন করেই তবে তারা পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে নাড়াতে যাচ্ছেন। তাছাড়া, এই বার্বিকেন লোকটাই তো চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতলেছিলেন। হয়ত পৃথিবীটাকে বেশ করে নাড়িয়ে দিয়ে শুধু নিজেদের সুবিধে করার ফিকিরে রয়েছেন ইয়াঙ্কিরা। আমেরিকার দুই উপকূলে দুই মহাসমুদ্রের গর্ভে কি আছে, সে-খবর কি কেউ রাখে? হয়ত আমেরিকার উদ্দেশ্য মূল্যবান কোন অঞ্চল এইভাবে গ্রাস করে নেওয়া।

বিশ্বনিন্দুকরা বললে—"ম্যাসটন কি ভগবান? তার হিসেবে ভুল থাকবে না, সেটা কে বলবে? বার্বিকেন নিজেও নিশ্চয় বিশ্বকর্মা নন। কাজ করতে গিয়ে যদি একটু ভুলচুক হয়? ঠেলা সামলাবে তো পৃথিবীর মানুষ।

জনমত যত ফুটতে লাগল, ততই বাতাস দিয়ে আগুনকে দাবানল বানাতে লাগল ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা। প্রত্যেকেই নিজের নিজের দেশের কাগজে গরম গরম প্রবন্ধ ছেপে মুণ্ডপাত করতে লাগল চ্যালাচামুণ্ডা সমেত বার্বিকেনের।

এমন কি খোদ আমেরিকাতেও দুটো দল হয়ে গেল। রিপাবলিকানরা দাঁড়াল বার্বিকেনের পেছনে। ডেমোক্র্যাটরা ঘুসি বাগিয়ে দাঁড়াল মুখোমুখি সামনে। এমনকি কয়েকটা আমেরিকান কাগজও ইউরোপের দলে ভিড়ে গেল। আমেরিকায় সংবাদপত্রের শক্তি বড় কম নয়। খবরের জন্যে সেদেশে বছরে দুকোটি ডলার খরচ করা হয়। জনমতের ওপর তাদের প্রভাব উপেক্ষা

করা যায় না। কাজেই বৃথাই কিছু কাগজ উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। বৃথাই লাইন পিছু দশ ডলার খরচ করতে লাগলেন মিসেস স্করবিট—বার্বিকেনদের হয়ে উত্তম নিবন্ধ লেখার পারিশ্রমিক স্বরূপ। ম্যাসটনের যে অপিচ ভুল হয় না, তা প্রমাণ করার জন্যে খামোকা জলের মত টাকা খরচ করলেন বিধবা ভদ্রমহিলা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষকালে গোটা আমেরিকা ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠবোস করতে লাগল ইউরোপের ধামাধরাদের কথায়।

বার্বিকেন—ম্যাসটনরা কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বিরুদ্ধ কথাবার্তার প্রতিবাদও করলেন না। যে যা বলছে বলুক। মুখের তো ট্যাক্স লাগে না। লোকের মন পরিবর্তন করার সময়ও তাঁদের নেই। তাঁরা তখন ব্যস্ত আসন্ন বৃহৎ কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে। এই সেদিন যারা এত উৎসাহী ছিল, আজ তারা হঠাৎ ভেঙে পড়বে এবং উল্টো সুর গাইবে, এটাও তো ভাবা যায়নি।

মিসেস ইভানজেলিয়া স্করবিট টাকার শ্রাদ্ধ করেও প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল রাখতে পারলেন না। বার্বিকেন এবং ম্যাসটন নাকি অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক, এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল দুনিয়ার প্রত্যেকের।

শেষকালে জল অনেকদূর গড়ালো। ইউরোপীয় রাষ্ট্ররা সোজাসুজি চাপ সৃষ্টি করল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর। গভর্ণমেন্ট নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে, আর বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী পৃথিবীটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলবে, এ তো হতে পারে না। সুতরাং এখুনি তাঁদের তলব করা হোক। তাঁরা এসে প্রকাশ্যে বলুক, কি তাঁদের অভিপ্রায়, কোন পন্থায় তাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছোনো স্থির করেছেন এবং পৃথিবীর কোন অঞ্চলে বসে তাঁরা পাঁয়তারা কষার প্ল্যান করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভেতর এবং বাইরে থেকে ঠেলা খেয়ে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। জনপ্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করলেন। ভূগোল, গণিত, কারুশিল্প ইত্যাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পঞ্চাশজনকে নিয়ে এই কমিশনের ওপর ঢালাও ক্ষমতা অর্পণ করা হল। কমিশন জনস্বার্থে যা খুশী করতে পারেন।

প্রথমেই বার্বিকেনকে তলব করা হল কমিশনের সামনে। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তিনি। কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না বার্বিকেন। লোক ছুটল তাঁর বাড়ীতে। বাড়ী ফাঁক, তিনি কোথায়? কেউ জানেনা। কোন চুলোয় গেছেন? সপ্তাহ আগে ১১ই জানুয়ারী বাল্টিমোর ছেড়ে তিনি রওনা হয়েছেন। সঙ্গে গেছেন ক্যাপ্টেন নিকল। কিন্তু কোথায় গিয়েছেন গান

ক্লাবের দু'দুজন বিশিষ্ট সদস্য, তা কেউ বলতে পারল না। নিশ্চয় গিয়েছেন রহস্যজনক সেই অঞ্চলে যেখান থেকে আরো রহস্যজনক পন্থায় পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দেওয়া হবে।

সুতরাং তাঁদের আয়োজন পণ্ড করতে হলে আগে জানা দরকার জায়গাটার নাম।

বার্বিকেন এবং নিকল উধাও হয়েছেন! খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। জনগণ এত ক্ষেপে গেল যে সামনে পেলে ছিঁড়ে ফেলত উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির ম্যানেজারদের। ভয়ে রাগে ঘৃণায় উন্মাদ হয়ে গেল দুনিয়ার প্রায় সব মানুষ।

বার্বিকেন নেই, নিকল নেই! কিন্তু এমন একজন এখনো আছেন যিনি এই দুজনের ঠিকানা জানেন। ইনি সেক্রেটারী ম্যাসটন! পৃথিবীজোড়া আসন্ন বিপর্যয়ের অন্যতম হোতা! কিন্তু তিনি আছেন তো? না, পালিয়েছেন!

লোক ছুটল ম্যাসটনের বাড়ী। ম্যাসটন বাড়ীতেই ছিলেন। সারাদিন নতুন নতুন অংক কষছিলেন এবং সন্ধ্যে হলে মিসেস স্করবিটের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় গিয়ে আড্ডা মারছিলেন। কমিশনের শমন বাড়ী পৌঁছোতেই আগে তেড়ে এল ফায়ার-ফায়ার, পরে ম্যাসটন স্বয়ং।

ম্যাসটন কিন্তু কমিশনের সামনে স্বেচ্ছায় হাজির হলেন জবাবদিহির জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্ন—"প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকল এখন কোথায়?"

ম্যাসটনের সুদৃঢ় জবাব—"জানি, কিন্তু বলব না।"

"ওঁদের উদ্যোগ পর্ব কি সমাপ্ত?"

"বলব না। যে খবরটা আমি গোপন রাখতে চাই, এটা তারই অংশ।"

"আপনি ভুল করছেন কি ঠিক করছেন, তা যাচাই করে দেখতে চায় এই কমিশন। আপনার কাজকর্ম কি দেখতে দেবেন কমিশনকে?"

"মোটেই না। সব কিছু ধ্বংস করে ফেলব, সেও ভাল, তবুও কাউকে কিছু যাচাই করতে দেব না। আমার মেহনৎ আমার নিজস্ব, তাতে কারো কোনো অধিকার নেই। স্বাধীন আমেরিকার নাগরিক হিসেবে সে অধিকার আমার আছে বইকি।"

"মুখে চাবী এঁটে থাকার অধিকার আছে। সারা যুক্তরাষ্ট্রেরও অধিকার আছে আপনার মুখ খোলানোর। দেশের মানুষ এই গুজব বন্ধ করতে চায়। তারা জানতে চায় কোম্পানী কিভাবে অক্ষরেখা পালটানোর প্ল্যান করেছে।"

"আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেবার অধিকার আমার নেই। আমার কর্তব্য তা নয়।"

চোখ রাঙানি থেকে আরম্ভ করে অনুনয় বিনয় করেও ম্যাসটনের মুখ থেকে আর কোনো কথা বার করা গেল না। মাথা উঁচু করে কমিশনের সামনে থেকে ফিরে এলেন তিনি। মিসেস স্বরবিট আনন্দে আটখানা হলেন ম্যাসটনের বুকের পাটা দেখে। লোহার আঁকশিওলা মানুষটার 'গাটাপার্চা' খুলির মধ্যে এত তেজ, এত জেদ, এত সাহস লুকোনো ছিল, তা কি কেউ ভেবেছিল?

ম্যাসটনের একরোখা কথাবার্তায় আপামর জনসাধারণ কিন্তু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সেক্রেটারী মশায়ের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে দাঁড়াল। গভর্ণমেণ্টের ওপর এমন চাপ এসে পড়ল যে কমিশনকে হুকুম দেওয়া হল—ম্যাসটনের পেট থেকে কথা টেনে বার করার জন্যে যা খুশী করা হোক। দেরী কেন?

তেরোই মার্চ ম্যাসটন মনের আনন্দে অংক কষছেন, এমন সময় বিশ্রী শব্দ করে বেজে উঠল টেলিফোন।

ভীষণ বিরক্ত হয়ে শুধোলেন ম্যাসটন—"হালো, কে?"

"মিসেস স্বরবিট।"

"কি দরকার মিসেস স্বরবিটের?"

"দরকারটা আপনার। এইমাত্র খবর পেলাম—"

বাকী কথাটা শোনা গেল না। দারুণ হট্টগোল এবং দরজা ভাঙার শব্দ ভেসে এল সদর দরজা থেকে। দলে দলে লোক ছুটে আসছে ওপরে। 'ফায়ার-ফায়ার' একা তাদের রুখতে চেষ্টা করছে!

তারপরেই ভেঙে পড়ল ম্যাসটনের ঘরের দরজা। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল কয়েকজন পুলিশ। ম্যাসটনের যাবতীয় কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করার এবং প্রখ্যাত গণিতবিদকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেণ্ট তাদের হাতে।

ছিটকে গিয়ে রিভলবার বার করলেন ম্যাসটন। একজন ঝটিতি অস্ত্রশূন্য করল তাঁকে। কাগজপত্র বাণ্ডিল বাঁধা হল তাঁর চোখের সামনে। আচম্বিতে পুলিশদের ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে গেলেন ম্যাসটন। একটা নোটবই তুলে শেষের পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেললেন।

বললেন হৃষ্টকণ্ঠে—"জেলে যেতে আর আপত্তি নেই।"

জেলেই যেতে হল তাঁকে। গিয়ে ভালই করলেন। নইলে উন্মত্ত জনতা তাঁর ছাল ছাড়িয়ে নিত।

(১১) নোটবুকের পাতায় যা লেখা ছিল

নোটবইয়ের তিরিশটা পাতায় কেবল অংক, সংখ্যা আর সূত্র। সবই ম্যাসটনের কীর্তি। পুলিশের তো চোখ ঠিকরে গেল এবং মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল অংকের সারি দেখে। উচ্চতম গণিত জানা না থাকলে সে অংকের মাথামুণ্ডু বোঝার সাধ্য কারো নেই।

পাতায় পাতায় জটিল অংকের গোলক ধাঁধায় দেখা গেল একটা সূত্রকে খুব বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী থেকে চাঁদে অভিযানে এই সূত্রর ভিত্তিতেই কামান দাগা হয়ে ছিল চাঁদকে টিপ করে।

অংকের মানে বোঝার জন্যে পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে খবরের কাগজওলা পর্যন্ত প্রত্যেকেই নানাবিধ গবেষণা শুরু করে দিলে। শেষকালে তদন্ত কমিটির কাছে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। অংকগুলি আর যাই হোক ভুল নয়। পক্ষান্তরে, এত বেশী নির্ভুল যে সেই অংকের ভিত্তিতে এগোলে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর অক্ষরেখাকে সিধে করে দেওয়া যাবে!

তদন্ত কমিটির যে রিপোর্টটা কাগজে কাগজে ছাপা হল, তা এই:

"উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির মতলবটা বোঝা গেছে। অক্ষরেখাকে খাড়া করার জন্যে তাঁরা কামান দাগার পরিকল্পনা এঁটেছেন। কামানটা মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিলে গোলা বেরোনোর সময়ে পেছনে ধাক্কা মারবে। জবর ধাক্কায় পৃথিবীর ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। তবে খাড়াই ভাবে কামান দাগলে কিসসু হবে না। জমির সঙ্গে অনুভূমিক ভাবে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে কামান ছুঁড়লে অক্ষরেখা ঘুরে যাবেই। বারবিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী ঠিক করেছেন কামান দাগা হবে দক্ষিণ দিকে। ভূপৃষ্ঠের কোন একটি অঞ্চলে কামানটি বসানো হবে।

সুচতুর অ্যালসিড পিয়ের্দে৷ নিজেও এই ধরনের একটা ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন। ওঁর শেষ কথা ছিল, কামান দাগার সময়ে বাসন্তী ক্রান্তিপাত যদি অধোবিন্দুতে থাকে, উপযুক্ত পেছন ধাক্কায় মেরুবিন্দু ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট সরে যাবে এবং নতুন অক্ষরেখায় পৃথিবী আবর্তিত হবে। বৃহস্পতির দশা হবে পৃথিবীর।

১৮০,০০০ টন ওজনের গোলাকে যদি সেকেণ্ডে ২৮০০ কিলোমিটার বেগে নিক্ষেপ করা যায় ২৭ সেন্টিমিটার কামানের দশলক্ষ গুণ বড় কামান থেকে, তবেই অক্ষরেখা সিধে হবে। কিন্তু সেরকম শক্তিশালী বারুদ কোথায়?

সৌভাগ্যক্রমে ক্যাপ্টেন নিকল তা আবিষ্কার করেছিলেন। নতুন বারুদের নাম দিয়েছিলেন 'মেলিমেলোনাইট'। ফরমূলাটা সবিস্তারে ম্যাসটনের নোটবইতে না লেখা থাকলেও এ-টুকু বোঝা গেল, জৈব বস্তুর মেলিমেলোর সঙ্গে অ্যাজোটিক অ্যাসিড মিশিয়ে বারুদটা বানিয়ে ছিলেন তিনি।

ম্যাসটনের নোটবুক থেকে যা জানবার তাতো জানা গেল। এরপর কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত হল জনসাধারণ।

২৭ সেন্টিমিটার কামানের দশলক্ষগুণ বড় কামান বানানো কি সম্ভব? নিশ্চয় নয়। সুতরাং বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী লাটে উঠবেই।

কিন্তু বার্বিকেনরা এখন কোথায়? নিশ্চয় কামান তৈরীর জায়গায়। সে জায়গাটাই ব। কোন চুলোয়? বার্বিকেন এবং নিকল হাতগুটিয়ে বসে নেই নিশ্চয়। কামান তৈরীর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ঠিকানা জানা না গেলে তাঁদের কাজ ভণ্ডুল করা যায় কি করে?

সব রাগ গিয়ে পড়ল তখন ম্যাসটনের। ঠিকানাটা নিশ্চয় ছিল শেষের পাতায়—যে পাতাটা কোঁৎ করে গিলে নিয়েছেন ম্যাসটন বন্ধুদের হদিশ গোপন রাখবার জন্যে।

সবই জানা গেল। এমন কি কামান দাগার তারিখটা যে ২২শে সেপ্টেম্বর তাও অজানা রইল না। অজ্ঞাত রইল শুধু ওঁদের বর্তমান ঠিকানা—যে ঠিকানায় তোড়জোড় চলছে মাটির মধ্যে অতিকায় কামান বসানোর।

অথচ ঠিকানা জানা না গেলে কপালে দুঃখ অনেক। বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী যদি নির্বিঘ্নে কামানটি দেগে দেয়, তাহলেই সর্বনাশ। ভূপৃষ্ঠের কোন অঞ্চল জলতলে নিমজ্জিত হবে এবং কোন অঞ্চলে জল থেকে মাথা তুলবে, ম্যাসটন ছাড়া আর কেউ জানে না। অথচ কাঠগোঁয়াড় ভদ্রলোক নোটবইয়ের পাতায় সে রকম কোনো আভাস রাখেননি। সমুদ্রপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ পরিবর্তন ঘটবে ৮৪১৫ মিটারের মধ্যেই। জলপৃষ্ঠের ঐটুকু ওঠানামার মধ্যেই জলতল খটখটে ডাঙা হবে এবং কত শুকনো জমি জলতলে হারিয়ে যাবে। ঠিক কোন কোন অঞ্চলে এই বিপর্যয় ঘটবে জানা যাবে কামান দাগার স্থানটি নির্ণীত হলেই।

হালে পানি না পেয়ে কমিটি বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করল এইভাবে:

"পৃথিবীবাসীরা হুঁশিয়ার! বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী সবার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বসেছে। তাঁদের গুপ্তরহস্যর মূল অংশ এখনো অজ্ঞাত। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার যাবতীয় কামান কারখানা এবং বারুদ কারখানা যেন সজাগ থাকেন। সন্দেহজনক কোনো

ব্যক্তির আগমণ ঘটলেই তৎক্ষণাৎ যেন বাল্টিমোরস্থ তদন্ত কমিটির কাছে তারযোগে বার্তা পাঠানো হয়। ঈশ্বর করুন যেন সংবাদটা এই বছরের ২২শে সেপ্টেম্বরের আগেই পাওয়া যায়। ঐ দিনই স্রষ্টার সৃষ্টিকে নতুন রূপ দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানী।"

(১২) অকুতোভয় ম্যাসটন মুখে চাবি এঁটে রইলেন

'পৃথিবী থেকে চাঁদে' যাওয়ার সময়ে কামানকে কাজে লাগিয়েছিলেন গান ক্লাবের মোড়লরা। এবারও সেই কামানকে ব্যবহার করছেন তাঁরা পৃথিবীর অক্ষরেখাকে সিধে করার জন্যে!

কামান আর কামান! কামান ছাড়া যেন কোন চিন্তাই নেই ওঁদের। কামান-পাগল মানুষ ক'জনের পাগলামির জন্যে এবার কি মহাপ্রলয় দেখা দেবে বিশ্বে?

ফ্লোরিডায় কলাম্বিয়াড দাগার পর থেকেই আরো ভয়ংকর, আরো দানবিক, আরো অকল্পনীয় কামানের স্বপ্ন দেখেছিলেন বার্বিকেনরা। তাই পৃথিবীর অজ্ঞাত অঞ্চলে বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে তাঁদেব শিহরণ-জাগানো পরিকল্পনা। পরিকল্পনার তো শেষ নেই তাঁদের মাথায়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখা গিযেছিল চন্দ্রাভিযানের কাহিনী। হুংকার শোনা গিয়েছিল—দাগো কামান! নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যাবে অক্ষরেখা পরিবর্তনের উপাখ্যান। আবার শোনা যাবে সেই হুংকার—'দাগো কামান।' নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে কি ঘটবে, তাও সহজে অনুমেয়। 'দাগো কামান' গর্জন তৃতীয়বার শোনা যাবে বিশ্ব জুড়ে। হুংকার দেবে ১৪০ কোটি পৃথিবীবাসী এবং নিমেষ মধ্যে তোপের মুখে উড়িয়ে দেবে সপারিষদ ইম্পে বার্বিকেনকে!

কমিটির সর্বশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মাথার মধ্যে যেন আগুন জলে উঠেছিল। বার্বিকেন এবং নিকলের এক্সপেরিমেণ্ট সবনাশ আনছে ধরিত্রীর বুকে, এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতেই জনগণ সরোষে হুংকার দিল—নিপাত যাক, গোল্লায যাক উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি।

বার্বিকেন এবং নিকল আমেরিকা ত্যাগ করে গা-ঢাকা দিয়ে ভালই করেছিলেন। বিশ্ববাসীর পরম শত্রুদের কেউ ক্ষমা করত না। চরম বিপদ ঘটে যেত দুজনেরই।

রহস্যের পর রহস্য, হেঁয়ালীর ওপর হেঁয়ালী নিয়ে আক্কেল গুড়ুম হল জনসাধারণের। বার্বিকেন এবং নিকল কি হাওয়ায় উবে গেলেন? দুজনেই

স্বনামধন্য পুরুষ। অথচ কেউ বলতে পারছে না তাঁরা কোন পথ দিয়ে, কি ভাবে, কোথায় গিয়েছেন। এ তো বড় জবর রহস্য!

তার চাইতেও বড় প্রহেলিকা হল উপকরণ নিয়ে। কামান আর বারুদ বানাতে প্রয়োজন বিস্তর মালমশলা। সে সব বয়ে নিয়ে যেতে দরকার শখানেক রেলগাড়ী অথবা শখানেক জাহাজ। কিন্তু সেরকম জাহাজ বা রেলগাড়ী তো কারো চোখে পড়েনি! তবে কি অত মালমশলা শূন্যপথে বহন করা হয়েছে?

ইউরোপ আমেরিকার সব কটা কামান ঢালাইয়ের আর বারুদ তৈরীর কারখানায় খোঁজ নেওয়া হল। একবাক্যে সবাই বললে, পিলে চমকানো আকারের কোনো কামানের অর্ডার তারা পায়নি। বারুদের ফরমাশও কেউ দেয় নি!

গণরোষ গিয়ে পড়ল ম্যাসটনের ওপর। ভদ্রলোক একা পড়েছিলেন বাল্টিমোরের সুদৃঢ় জেলে। জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে নিরাপদে বসে উনি দিন গুনছিলেন। কল্পনা করতেন, কামান তৈরী শেষ করে এনেছেন বার্বিকেন। নিকলের প্রলয়ংকর বারুদ ঠাসা হয়েছে কামানে। ত্রিভুবন কাঁপিয়ে গোলা ছুটেছে মহাশূন্যে। পৃথিবীরই কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হয়েছে নিক্ষিপ্ত গোলাটা। আদর করে গোলাটার নাম রাখলেন 'স্করবেটা'—মিসেস স্করবিটের নামানুসারে!

তদন্ত কমিটি নিয়মিত হানা দিচ্ছে কারাগারে। ম্যাসটনের পেট থেকে কথা বার করার জন্যে কত চেষ্টাই না করছেন। কিন্তু ম্যাসটনের 'না'কে কিছুতেই 'হ্যাঁ' বানানো যাচ্ছে না!

শেষকালে তদন্ত কমিটির মাথায় একটা বুদ্ধি এল। মিসেস স্করবিটকে দিয়ে ম্যাসটনের পেট থেকে ঠিকানাটা বার করে নিলেই তো হয়। উত্তর মেরু এই ভদ্রমহিলার টাকাতেই যখন কেনা হয়েছে, তাঁর অনুরোধ নিশ্চয় ম্যাসটন ঠেলতে পারবেন না।

তদন্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট বেশ খানিকটা ভয় ধরিয়ে দিলেন মিসেস স্করবিটের মনে। গণরোষ তাঁকে এবং তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকাকে রেহাই দেবে না। এখনও সময় আছে। বার্বিকেনরা তাঁদের এক্সপেরিমেণ্ট বন্ধ না করলে ক্রুদ্ধ জনগণ হাতের কাছে যাকে পাবে, তাকেই টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অর্থাৎ মিসেস স্করবিটের প্রাণ তো যাবেই, তাঁর বাড়ী-ঘর-দোরেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে।

এইভাবে ভয় খাইয়ে দিয়ে মিসেস স্করবিটকে বলা হল, তিনি যখন খুশী জেলে গিয়ে ম্যাসটনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

প্রথম দিন তাঁকে দেখেই ম্যাসটন বললেন—"এসেছেন ?"

"হ্যাঁ, এসেছি। চার চারটে সপ্তাহ পরে ফের দেখা হল আমাদের।"

"আটাশ দিন পাঁচ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বলুন," ঘড়ি দেখে বললেন ম্যাসটন।" কিন্তু এলেন কিভাবে ?"

"আমাকে ওঁরা পাঠিয়েছেন আপনার মুখ থেকে মিস্টার বার্বিকেনের বর্তমান ঠিকানা জানবার জন্যে।"

"মিসেস স্করবিট ! শেষে আপনি—"

"না, না, মিস্টার ম্যাসটন। প্রাণ গেলেও ওঁদের কিছু বলব না আমি।"

"মিসেস স্করবিট, আমার মৃত্যু হয় হোক, তবুও বলব না কামান দাগা হবে কোথায়।"

"আমি আপনার সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করতে চাই মিস্টার ম্যাসটন !"

প্রতিদিনই এই ছেঁদো কথাবার্তার পর বিদায় নিলেন মিসেস স্করবিট। বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান তদন্ত কমিটিকে রোজই বলতেন এক কথা—"না, আজও কিছু বলেন নি। তবে বলবেন মনে হচ্ছে।"

কিন্তু সময় যে হু-হু করে বয়ে চলেছে। মিনিট, ঘণ্টা, মাস যেন ডানা মেলে উড়ে গেল। এল যে মাস।

তদন্ত কমিটি যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেল। মিসেস স্করবিটের প্রভাব খাটিয়েও ম্যাসটনের মনের খিল খোলা গেল না !

তবে কি প্রলয়কে আর ঠেকানো যাবে না ? সত্যিই কি অক্ষরেখা পালটাবে, মহাদেশ ডুবে যাবে, কোটি কোটি নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাবে ? পৃথিবীর সব কটা রাষ্ট্র একযোগে ঠিক করলে, বার্বিকেনের এক্সপেরিমেণ্ট বন্ধ ঘোষণা করা হবে। আমেরিকা অবশ্য অনেক বোঝাল। বার্বিকেনকে গ্রেপ্তার করার অধিকার দিল সব রাষ্ট্রকে। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করল না আমেরিকার কথায়। কেন বাপু ! নিজের ঘর নিজে সামলাতে পারো না ? বার্বিকেন আর নিকল নিপাত্তা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ম্যাসটন তো রয়েছে। তার মাথার মধ্যেই তো ঠাসা রয়েছে গোটা পরিকল্পনাটা। তাকে ফুটন্ত তেলে ডুবিয়ে অথবা গরম লোহা ছ্যাঁকা দিয়ে অথবা কুকুর দিয়ে জ্যান্ত খাওয়াতে শুরু করলেই তো হয় ! সুড় সুড় করে ঠিকানা বেরিয়ে আসবে মুখ দিয়ে !

কিন্তু মধ্য-যুগীয় বর্বরতা উনবিংশ শতাব্দীতে অচল। সুতরাং ম্যাসটনের গায়ে আঁচ লাগল না। বহাল তবিয়তে জেলে বসে তিনি দিন গুনতে লাগলেন নতুন পৃথিবীর নব বসন্তের।

(১৩) ম্যাসটনের রসিকতা

ম্যাসটনের নোট বইতে লেখা ছিল, কামান দাগতে হবে নিরক্ষরেখা বরাবর কোন অঞ্চলে। কিন্তু পুরো নিরক্ষবৃত্ত বরাবর অঞ্চলে জনবসতি আছে। ফাঁকা জায়গা কোথাও নেই। বার্বিকেনরা তাহলে কয়েক হাজার লোক নিয়ে অতবড় কামানটাকে কি অদৃশ্য অবস্থায় তৈরী করছেন?

অ্যালসিড পিয়ের্দো কিন্তু পুলকিত হয়েছিলেন ম্যাসটনের উঁচুদরের অংকগুলো দেখে। না, অংকে কোথাও ভুল নেই। তাঁর হিসেব মত কাজ হলে অক্ষরেখা সিধে হবেই। তখন কোথাও প্লাবন দেখা দেবে, কোনো মহাসাগরের জল ছলকে উঠে আসবে, ভূমিকম্প হবে, আগ্নেয়গিরিদের আগুন বমি বেড়ে যাবে এবং সমুদ্রের জল জলন্ত আগ্নেগিরির জঠরে প্রবেশ করলেই নিমেষ মধ্যে ঘন ঘন বিস্ফোরণে তুরুক নাচ নাচবে বেচারা পৃথিবী!

পিয়ের্দো শুধু খারাপ দিকটা ভাবেন নি। উল্টোটাও ভাবছিলেন। প্রতিদিন পৃথিবীর ওপর প্রতিমুহূর্তে কতরকম ঝাঁকুনি পড়ছে। হেঁটে চলে বেড়ালেও মাটিতে ঝাঁকুনি লাগছে। সম্মিলিত ঝাঁকুনির ফলে পৃথিবী তো কই কেঁপে উঠছে না? একটা কামান দেগে সেই অটল অবস্থাকে টলটলায়মান করা কি সম্ভব?

হ্যাঁ, সম্ভব। অংক তাই বলছে। অংকের হিসেবে ভুল নেই।

একজন পণ্ডিত বললেন, ১০০০ সালের প্রথম দিনটিকেও এমনি আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইবেলের ভবিষ্যদবাণী মত হাজার বছরের শেষেই বয়েছে শেষের সেদিন। হঠাৎ মারা যাবে প্রতিটি জীবিত প্রাণী। ভয়ার্ত লোক জমিজমা সম্পত্তি সব চার্চের নামে লিখে দিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কেউ মারা যায়নি। তবে বার্বিকেনরা যা করতে যাচ্ছেন, তা নিশ্চয় সাংঘাতিক ব্যাপার। মিস্টার ম্যাসটনের হিসেবে কোনো ভুল নেই। মহাপ্রলয় অনিবার্য।

পরিণামে বিশ্ববাসীদের সমস্ত ঝাল গিয়ে পড়ল ম্যাসটনের ওপর। কাতারে কাতারে লোক ভীড় করে রইল বাল্টিমোর জেলের আশেপাশে। একবার হাতে পেলে হয়, জ্যান্ত ছাল ছাড়ানোর জন্যে হাত নিশপিশ করতে লাগল আপামর জনসাধারণের।

এমনকি মিসেস স্করবিট পর্যন্ত উল্টো সুর গাইবেন কিনা ভাবতে লাগলেন মনে মনে। কি দরকার বাপু অত ঝামেলায় গিয়ে? ম্যাসটনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কামান ছোঁড়া বন্ধ করে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়!

ম্যাসটন তো বীরের মত লড়ে গেলেন তদন্ত কমিটির সঙ্গে। একটি বেফাঁস কথাও বললেন না। কিন্তু নিঃসীম আতংক ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল বাল্টিমোরের বাসিন্দাদের। প্রাণের ভয়ে মারমুখো হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকেই। বিক্ষুব্ধ জনতাকে আর সামলাতেও পারছিল না পুলিশবাহিনী। উত্তেজনায় ইন্ধন জোগাচ্ছে দৈনিক কাগজগুলো। প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রবন্ধ বেরুচ্ছে এবং আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। ম্যাসটন সে সময়ে জনতার হাতে পড়লে নির্ঘাৎ তাঁকে হিংস্র বন্য জন্তু দিয়ে খাওয়ানো হত। ম্যাসটন কিন্তু তাতেও পেছপা নন। বারে বারে তাঁকে বলতে শোনা গেছে—"কপালে আমার যে দুর্গতিই লেখা থাকুক না কেন, প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকলের কাজে ব্যাগড়া দিতে কাউকে দেব না।"

একটি মানুষ স্রেফ মনের জোরে লড়ে চললেন সারা বিশ্ববাসীর সঙ্গে। কিছুতেই টলল না তাঁর অটুট মনোবল। দেখেশুনে আরো মোহিত হলেন মিসেস স্করবিট। ম্যাসটনের লৌহ-কঠিন চরিত্রের পরিচয় পেয়ে অমন ঘোর দুর্দিনেও কিছু স্তাবক জুটে গেল। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল কিছু লোক।

বাদবাকী লোক রেগে কাঁই হয়ে অষ্টপ্রহর ঠেলাঠেলি মারামারি করতে লাগল বাল্টিমোর জেলের সামনে। কারাপ্রাচীর ভেঙে তারা ম্যাসটনকে এনে ফেলতে চায় পায়ের তলায়। সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করতে চায় সুবিখ্যাত গণিতবিদের জীবন্ত শরীরটাকে।

আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট প্রমাদ গুণল। বেশ বোঝা গেল, ক্রুদ্ধ জনগণকে আর ধরে রাখা যাবে না। সুতরাং জনসাধারণকে শান্ত করার জন্যেই ঠিক করা হল কোর্টে হাজির করা হবে ম্যাসটনকে।

শুনে পিয়ের্দো বলে উঠলেন—"যা কেউ পাবেনি, তা জজ সাহেবরাও পারবেন না।"

সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখে বেলা এগারোটায় তদন্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট জন প্রেসটিস আবির্ভূত হলেন বাল্টিমোর জেলে। সঙ্গে মিসেস স্করবিট। বাইরে জনতা ফুঁসতে লাগল ম্যাসটনের ফাঁসির রায় শোনার অপেক্ষায়।

জন প্রেসটিস সোজাসুজি কাজের কথায় এলেন এবং প্রশান্ত কণ্ঠে কাটছাঁট জবাব দিয়ে গেলেন ম্যাসটন।

"শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি, জবাব দেবেন?" জন প্রেসটিস শুধোলেন।

"কি জবাব দেব?" পাল্টা প্রশ্ন করলেন ম্যাসটন।

"আপনার সহযোগী বার্বিকেন এখন কোথায়?"

"জবাব একশ বার দেওয়া হয়ে গেছে।"

"একশ একবার দিন।"

"কামান যেখানে ছোঁড়া হবে, সেখানে।"

"কামান কোথায় ছোঁড়া হবে?"

"যেখানে আমার সহযোগী বার্বিকেন রয়েছেন, সেখানে।"

"মিস্টার ম্যাসটন, হুঁশিয়ার!"

"কি জন্যে?"

"জবাব না দেওয়ার জন্যে। পরিণামটা—"

"খুব সোজা। যা জানতে চান, তা আর জানতে পারবেন না।"

"জানবার অধিকার আমাদের আছে।"

"আমার তো মনে হয় না।"

"আদালতে টেনে আনবো আপনাকে।"

"যথা অভিরুচি।"

"জুরী আপনাকে ফাঁসির রায় দেবে।"

"তাতে আমার বয়ে গেল।"

"রায় বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি হয়ে যাবে আপনার।"

"বাঃ, বেশ, বেশ।"

মিসেস ইভানজেলিনা স্করবিট আর সহ্য করতে পারলেন না। ককিয়ে উঠলেন—"মিস্টার ম্যাসটন!"

"ম্যাডাম! আপনিও?" বললেন ম্যাসটন।

নত মস্তকে বোবা হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।

জন প্রেসটিস বললেন—"দুই প্লাস দুই যেমন চার হয় হয়, আপনার ফাঁসিও কিন্তু অবধারিত জানবেন।"

"মশাই, তা যদি বলেন চট করে মরব বলে মনে হয় না। অংক জিনিসটা যদি জানতেন, তাহলে বুঝতেন, দুই প্লাস দুই চার হয় না। অ্যাদ্দিন পর্যন্ত সব অংকবাজ মানুষই যেভাবে বোকা বনে এসেছেন, আপনি তারই পুণরাবৃত্তি করছেন। দুটি সংখ্যা যোগ করলে তাদের একটির সমান হয়, এই হল আপনার বক্তব্য। অর্থাৎ দুই আর দুই হল গিয়ে চার।"

"মশাই!" ভ্যাবাচাকা খেয়ে বিস্ময়ধ্বনি করলেন তদন্ত কমিটির প্রেসিডেন্ট।

"আপনি যদি বলেন এক আর এক মানেই দুই, তা মেনে নিচ্ছি। কেননা, ওটা আর উপপাদ্য থাকছে না, সংজ্ঞা হয়ে যাচ্ছে।"

সরল পাটিগণিতে এই শিক্ষা লাভের পর কারাকক্ষ থেকে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন তদন্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট। ম্যাসটনের অসাধারণ প্রতিভায় আনন্দে আটখানা হয়ে পেছন পেছন উধাও হলেন মিসেস স্করবিট।

(১৪) বার্বিকেনের সন্ধান পাওয়া গেল

জে টি ম্যাসটনের পুণ্যের জোর ছিল বলেই বোধ হয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটা টেলিগ্রাম এসে পৌছালো জানজিবার থেকে—পাঠিয়েছেন আমেরিকান কনসাল।

টেলিগ্রামটা এইরকম :

"জানজিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ভোর পাঁচটা (স্থানীয় সময়)।

কিলিমানজারোর গিরিমালার দক্ষিণে ওয়ামাসাইতে এলাহি কাণ্ডকারখানা চলছে। সুলতান বালি-বালির বহু কৃষ্ণবর্ণ লোকজনকে নিয়ে গত আটমাস ধরে প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকল কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।"

জে টি ম্যাসটনের গুপ্তকথা এইভাবেই গেল ফাঁস হয়ে। তাঁর ফাঁসিও হল না।

হলেই বুঝি ভাল ছিল—অন্ততঃ ম্যাসটন নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করতেন যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতেন কি বিপুল নৈরাশ্য তার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে অদূর ভবিষ্যতে!

(১৫) পৃথিবীবাসীদের উদ্দেশে দু'চার কথা

পর-পর আরও কয়েকটা টেলিগ্রাম এল জানজিবার থেকে। নিরক্ষ বৃত্তের গা ঘেঁসে আফ্রিকার বিজন অঞ্চলে সত্যি সত্যিই বিপুল কর্মকাণ্ডর আয়োজন করে চলেছে উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির দুই চাঁই।

কিন্তু বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দিয়ে কিলিমানজারোর সানুদেশে পৌছোলেন কি করে বার্বিকেন এবং নিকল? অতবড় কামান ঢালাই করার কারখানাই বা বানালেন কি করে? মাল মশলা? সে সবই বা পেলেন কোত্থেকে? এত লোকজনই বা জোগাড় করলেন কি মন্ত্রবলে?

আফ্রিকার বিপজ্জনক, নির্মম উপজাতিদের সঙ্গে আঁতাত ঘটল কি করে?

রহস্য রহস্যই থাকবে মনে হচ্ছে। বার্বিকেন এবং নিকল কি করে এতগুলি অসাধ্যসাধন করলেন, তা কেউ জানে না, জানতেও পারবে না। জেনেও

আর লাভ কী? ২২শে সেপ্টেম্বরের আর তো দেরী নেই! ম্যাসটনও মিসেস স্করবিটের মুখে টেলিগ্রাম বৃত্তান্ত শুনে প্রথমে অবাক হলেন, তারপর অট্টহেসে বললেন—"টেলিগ্রামে চেপে তো আর আফ্রিকা পৌছোনো যাবে না। যা হবার তা হবেই—কেউ ঠেকাতে পারবে না!"

শেষ মুহূর্তেও লোহার হাতওলা ম্যাসটনের এ-হেন মনোভাব দেখে বিস্মিত হলেন অনেকে।

ম্যাসটন ঠিকই বলেছিলেন। এই কদিনের মধ্যে দুস্তর বাধা পেরিয়ে দুর্গম কিলিমানজারোর সানুদেশে পৌছোনো কোনমতেই সম্ভব নয়। পথে হাজারো উৎপাত তো আছেই, ধুঁকতে ধুঁকতে পৌছানোর পরেও হয়ত দেখা যাবে তেড়ে আসছে সুলতান বালি-বালির সাঙ্গপাঙ্গ। সুলতানের স্বার্থ না থাকলে নিজের লোকজন দিয়ে কুলির মত খাটাবে কেন?

অকুস্থলে পৌছোনো না গেলেও, জায়গাটার ভৌগোলিক অবস্থান যখন নির্ণীত হয়েছে তখন ভূপৃষ্ঠের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে, তা আঁচ করা সম্ভব। কাজটা সহজ নয়। কিন্তু দলে দলে অংক বিশারদরা বসে গেলেন খাতা-পেন্সিল-ম্যাপ নিয়ে। উদ্বিগ্ন বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করার জন্যে নাওয়া খাওয়া ভুললেন পণ্ডিতরা।

১৪ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে জানা গেল ভূপৃষ্ঠের কোথায় কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে। ওয়াশিংটন মানমন্দিরের প্রতিবেদন পরের দিনই ছাপা হল হাজার হাজার খবরের কাগজে। সেই রিপোর্ট পড়ার পর একটা প্রশ্নই দেখা দিল প্রত্যেকের মনে—কি হবে তাহলে?"

রিপোর্টটা এই:

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকলের পরিকল্পনা নীচে দেওয়া হল:

২২শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে ২৭ সেন্টিমিটার কামানের দশলক্ষগুণ বড় কামান থেকে ২৮০০ কিলোমিটার গতিবেগে নিক্ষিপ্ত হবে ১,৮০,০০০ টন ওজনের গোলা। বারুদের শক্তি গান পাউডারের শক্তির ৫৬০০ গুণ বেশী। ফলে, গোলাটা সবেগে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে পেছনে দারুণ ঠেলা দিয়ে যাবে। সেই ধাক্কাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

প্যারিস দ্রাঘিমার পশ্চিমে, নিরক্ষরেখার সামান্য তলায়, ৩৪° ডিগ্রী

অক্ষাংশ থেকে যদি দক্ষিণ দিকে কামান দাগা হয়, পেছন-ধাক্কার সঙ্গে ঘূর্ণন-বেগ মিলিত হবে এবং নতুন অক্ষরেখার সৃষ্টি হবে। মিস্টার ম্যাসটনের হিসাব অনুযায়ী পুরোনো অক্ষরেখা ২৩° ডিগ্রী ২৮ মিনিট সরে যাবে এবং কক্ষপথের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত হবে।

উত্তর অঞ্চলে নতুন অক্ষরেখার আবির্ভাব ঘটবে গ্রীনল্যাণ্ড আর গ্রীনেল-ল্যাণ্ডের মাঝামাঝি অঞ্চলে বাফিন সাগরে, দক্ষিণ অঞ্চলে অ্যাডেলিয়াল্যাণ্ডের পূবে।

কিলিমানজারো গিরিমালার ওপর দিয়ে সৃষ্টি হবে নতুন জিরো দ্রাঘিমা। নিরক্ষরেখাও সরে যাবে। নতুন নিরক্ষবৃত্ত বরাবর সূর্য পরিভ্রমণ করবে বারোমাস—গতিপথ একচুলও নড়বে না। নতুন বিষুব দেখা দেবে কিলিমান-জারো, গোয়ার ওপর দিয়ে, কলকাতার সামান্য তলা দিয়ে। চীন দেশে হংকং, শ্যামদেশে মান্দালয। প্রশান্ত মহাসাগরে ওয়াকার দ্বীপের ওপর দিয়ে বিস্তৃত হবে নতুন বিষুব।

নিরক্ষরেখা সরে গেলে সমুদ্র প্রবাহে পরিবর্তন দেখা দেবে। উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতির অংক বিশারদরা এ ব্যাপারে সভ্য-দুনিয়ার প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব করেছেন। দক্ষিণমুখো কামান না দেগে যদি উত্তর দিকে দাগা হয়। তাহলে ঘনবসতিপূর্ণ অধিকতর সভ্য দেশগুলির সর্বনাশ হবে। কিন্তু কামানের মুখ দক্ষিণ দিকে রাখার ফলে অনুন্নত এবং বিরল বসতিময় অঞ্চল গুলিতে বিপর্যয় দেখা দেবে।

মিস্টার ম্যাসটনের হিসাব অনুযায়ী মেরু অঞ্চলের বরফ গলা জল এবং কয়েকটা মহাসমুদ্রের ছলকে ওঠা জল অন্য দেশে সরে যাবে। জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা দাঁড়াবে ৮৪১৫ মিটারে।

আটলান্টিক মহাসাগর বিলকুল জলশূন্য হবে। বার্মুডার কাছে জমি বেরিয়ে পড়বে। ফলে, ইউরোপ আর আমেরিকার মাঝামাঝি অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা আবিষ্কৃত হবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড ফ্রান্স, স্পেন এবং পর্তুগাল সেই জমির দখল নিতে চাইবে নিজের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে

জল সরে গেলে বাতাসের ঘনত্বেও হেরফের ঘটবে। বার্মুডায় বাতাসের ঘাটতি দেখা দেবে। ৮৬০০ মিটার ঊর্ধ্বে বৈমানিকের যে শ্বাসকষ্ট, বার্মুডা অঞ্চলেও সেই শ্বাসকষ্ট দেখা দেবে। ফলে, সে-অঞ্চল মনুষ্য বসতিহীন হবে।

একই অবস্থা দেখা যাবে ভারত মহাসাগর, অস্ট্রেলিয়া, এবং প্রশান্ত মহাসাগরে। প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু জল নিক্ষিপ্ত হবে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে।

এই সব অঞ্চলেই বাতাস এত পাতলা হয়ে যাবে। শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হবে। মানুষ থাকতে পারবে না।

সমুদ্র সরে যাওয়ার ফলে উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে নতুন-নতুন জমি মাথা তুলবে। সমুদ্রে কিছু জল থাকবেই। সুতরাং বিস্তর দ্বীপ আর জলমগ্ন পাহাড়ের আবির্ভাব ঘটবে।

অন্যান্য অঞ্চলে মানুষের তৈরী জলপ্লাবন দেখা দেবে। এশিয়াটিক রাশিয়া, ভারতবর্ষ, চীনদেশ, জাপান, আমেরিকান আলাস্কা এবং বেরিং সাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হবে। সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, কলকাতা, ব্যাংকক, সায়গন, পিকিং, হংকং জলের তলায় পুরোপুরি অদৃশ্য হবে। অর্থাৎ রুশীয়, ভারতীয়, চীনে, জাপানী এবং শ্যামদেশীয় সময় থাকতে নিরাপদ অঞ্চলে সরে না গেলে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হবে।

কিলিমানজারোর দক্ষিণ পূবে আটলাণ্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের জল ঠেলে উঠবে ৮৪১৫ মিটার পর্যন্ত। উত্তমাশা অন্তরীপ, সেণ্ট্রাল ব্রেজিল, চিলি, এবং আর্জেন্টিনা জলমগ্ন হবে।

বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর কুকর্ম বন্ধ করতে না পারলে পৃথিবীময় বিপর্যয় রোধ করা যাবে না। বিশ্ববাসীকে রক্ষে করার সাধ্য কারো নেই। পৃথিবীর মানুষ সম্পূর্ণ অসহায় মাত্র দুটি মানুষের ক্রিমিন্যাল এক্সপেরিমেণ্টের সম্মুখে।

(১৬) ম্যাসটনের কারাকক্ষে জনগণের প্রবেশ

বিশেষজ্ঞদের ভয়ংকর ভবিষ্যদবাণী অনুযায়ী অসংখ্য পৃথিবীবাসীর প্রাণ যাবে দুভাবে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, নয়তো জলমগ্ন হয়ে।

বাতাসের অভাবে মারা যাবে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেনের বহু অধিবাসী। মহাসমুদ্র থেকে উঠে আসা নতুন নতুন অঞ্চল লাভের সম্ভাবনাতেও পুলকিত হল না তারা।

প্যারিসের কোনো জমি লাভ হচ্ছে না। ক্ষতির মধ্যে বাতাস কমে যাচ্ছে। তাতে বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হল প্যারিসের বাতাস-লোভী বাসিন্দারা।

জলে ডুবে মারা যাবে দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতবর্ষ, জীল্যাণ্ড প্রভৃতির অধিবাসীরা। গ্রেটবৃটেন হারাবে অনেকগুলো শাঁসালো উপনিবেশ।

নতুন মহাসাগরের তলায় অদৃশ্য হবে তাতার, স্যাময়েডেন, ল্যাপন, প্যাটাগোনিয়ান, চীনে এবং জাপানীরা। সুতরাং উন্নত দেশগুলো চুপচাপ

থাকলেই পারত। অনুন্নত দেশগুলোকে বলি দিয়ে যদি নিজেদের লাভ হয় তো মন্দ কি! কিন্তু তা হল না। তুমুল বিক্ষোভের ঝড় উঠল দেশে দেশে। ইউরোপের মধ্যভাগ নিরাপদ থাকছে, কিন্তু পশ্চিমদিক ওপরে উঠছে এবং পূর্বদিক নীচে নামছে। অর্থাৎ একদিকে শ্বাসকষ্ট, আর একদিকে গলা পর্যন্ত জল। ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগর শুকিয়ে যাবে। ফলে, বরবাদ হবে সুয়েজ খাল!

জিব্রাল্টার, মালটা আর সাইপ্রাস যদি মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়, ইংলণ্ড তাতে খুশী হবে কেন? রণসরঞ্জাম পৌছোবে কি করে পাহাড় চূড়োয়? আটলাণ্টিক মহাসাগরের কিছু নতুন ভূভাগ দখলে আসছে ঠিকই কিন্তু তার বিনিময়ে এতবড় ক্ষতি স্বীকার করা যায় না!

দেশদেশান্তরের প্রতিবাদ চরমে পৌঁছোলো। দুনিয়ার সব কটা খবরের কাগজ এক হল। প্রতিদিন অনেক বেশী ছেপেও কুলিয়ে ওঠা গেল না, একই সংস্করণ ফের ছাপতে হল। বার্বিকেন, নিকল এবং ম্যাসটনকে চিহ্নিত করা হল মানবতা বিরোধী বিশ্বশত্রুরূপে।

বারুদের স্তূপে বোমা ফাটলে যে কাণ্ড ঘটে, জ্ঞানজিবাবের টেলিগ্রাম পাওয়ার পর সেইভাবে লক্ষ স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ফেটে পড়ল থর-থর উত্তেজনা। সবাই কমবেশী বিপদগ্রস্ত। সুতরাং কেউ কারো স্বার্থ আলাদাভাবে দেখল না। সম্মিলিত রোষ বজ্ররূপে ধাবিত হল তিন অপরাধীর উদ্দেশে!

ম্যাসটনের শেষদিন বুঝি ঘনিয়ে এসেছিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর উন্মত্ত জনতা জেলের ফটক ভেঙে ঢুকে পড়ল তার কক্ষে। উদ্দেশ্য ছিল ম্যাসটনের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং জীবন্ত ম্যাসটনের চামড়া খুলে নেওয়া। জেল রক্ষক রুখতে পারল না তাদের। কিন্তু কারাকক্ষে ঢুকে দেখা গেল, ম্যাটসন যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছেন! ঘর শূন্য!

মিসেস স্করবিট আবার তাঁর টাকার খেলা দেখিয়েছেন। জেলরক্ষককে এত সোনাদানা দিয়েছেন যে বাকী জীবনটা তার চাকরী করার দরকার হবে না। বাল্টিমোর, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং আরো কয়েকটা বড় আমেরিকান শহরে বাতাসের ঘাটতি হবে না। জেলরক্ষকের জীবদ্দশায় টাকারও অভাব হবে না।

মহীয়সী মিসেস স্করবিটের কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেলেন ম্যাসটন। আর মাত্র চারটে দিন! চারদিন ঘাপটি মেরে থাকতে পারলেই বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর এতদিনের তৈরী কামান ভীম গর্জনে পৃথিবীর চেহারা পালটে দেবে!

জনস্বার্থে প্রকাশিত ইস্তাহারগুলো পড়ে পড়ে আদ্যোপান্ত মুখস্ত করে ফেলল ভয়ার্ত জনগণ। পরিণামে, আরও এককাঠি বৃদ্ধি পেল উত্তেজনা আতংক উদ্বেগের মাত্রা। এতদিন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় যে কজন বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীকে ভাঁওতাবাজ উপাধি দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল, তাদেরও টনক নড়ল।

প্রতিটি দেশে পৃথক ইস্তাহার ছাপা হল। ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দেওয়া হল কোন কোন অঞ্চল মেঘের দিকে ঠেলে উঠবে এবং কোথায় কোথায় জলপ্লাবন দেখা দেবে।

পরিণামটা হল সাংঘাতিক। প্রাণের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল কাতারে কাতারে লোক। রিফিউজি সমস্যা এভাবে কখনো দেখা দেয়নি। পাঁচটা মহাদেশ থেকেই একযোগে শুরু হল চম্পট দেওয়ার পালা। সাদা, কালো, বাদামী, হলদে—সবজাতের সব মানুষ রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে ভিটেমাটি ফেলে পালাতে লাগল নিরাপদ অঞ্চলে। হাতে সময়ও কম। প্রতিটি ঘণ্টার হিসেব রাখা আরম্ভ হয়ে গেল দেশত্যাগের হিড়িক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। চীন, অস্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া থেকে নিরাপদ অঞ্চলে সরে যাওয়ার জন্যে পুরো একটি মাস দরকার। কিন্তু সময় কই?

বাদবাকী দেশগুলোর লোক কিন্তু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কামান ছোঁড়ার অঞ্চল ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এই সব দেশের লোক জেনে গিয়েছিল, তাদের দেশে জলপ্লাবন বা বাতাসের ঘাটতি—কোনোটাই দেখা দেবে না। শুধু যা ভয়ংকর ঝাঁকুনি মাথার ঘিলু পর্যন্ত নড়ে যেতে পারে। তা যাক! প্রাণটা তো বাঁচবে!

পৃথিবীব্যাপী এই আতংক আর অস্বস্তির মাঝে একটি লোক একনাগাড়ে অন্বেষণ করছিলেন একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব। সাতাশ সেন্টিমিটার কামানের চাইতে দশলক্ষ গুণ বড় কামান বানানো একেবারেই অসম্ভব! অসম্ভবকে কি করে সম্ভব করবেন ইম্পে বার্বিকেন?

ইনি অ্যালসিড পিয়ের্দো!

(১৭) কিলিমানজারোর আটটি মাস

ওয়ামাসাই জায়গাটা মধ্য আফ্রিকার পূবে, জানজিবারের উপকূল ভিক্টোরিয়া নিয়ানজা লেকের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। জায়গাটা পর্বতসঙ্কুল এবং দুর্গম। সুলতান বালি-বালি এখানকার একমাত্র অধিপতি।

কিলিমানজারো থেকে মাত্র কয়েক লীগ নীচে কিসোনগো গ্রাম।

সুলতানের নিবাস এই গ্রামে। গ্রামটা তাঁর রাজত্বের রাজধানীও বটে। সুলতানের প্রজাসংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ হাজার নিগ্রো। রাজধানীতে সুলতানের সেবায় নিযুক্ত থাকে বিস্তর ক্রীতদাস। সুলতানের লৌহ শাসনে তারা অভ্যস্ত এবং রীতিমত অনুগত।

মধ্য আফ্রিকায় যে-নৃপতিরা বৃটিশ শাসনের রক্তচক্ষুকে ডরায় না, সুলতান বালি-বালি তাদের শীর্ষস্থানীয়। দুর্দান্ত এই সুলতানের রাজধানীতেই জানুয়ারী মাসে পদার্পণ করলেন বার্বিকেন, নিকল এবং আরো ছজন অনুরক্ত সাগরেদ।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁদের গোপন অন্তর্ধানের খবর রাখতেন কেবল দুজন—মিসেস স্করবিট এবং মিস্টার ম্যাসটন। নিউইয়র্ক থেকে ওরা জাহাজে আসেন উত্তমাশা অন্তরীপ, সেখান থেকে জানজিবারে। সুলতানের ভাড়া করা জাহাজে চেপে গোপনে অভিযাত্রীরা আসেন মোম্বাসা বন্দরে। সেখান থেকে সুলতানের সাঙ্গপাঙ্গরা গহন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিয়ে আসে রাজধানীতে।

ম্যাসটনের হিসেবমত কামান ছোড়ার জায়গাটা নির্দিষ্ট হওয়ার পর থেকেই সুলতান বালি-বালির সঙ্গে বার্বিকেন যোগাযোগ রেখেছিলেন একজন সুইডিশ অভিযাত্রীর মারফৎ। সুলতান বার্বিকেনের নাম শুনেছিলেন 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' অভিযানের নায়ক হিসেবে। ডাকাবুকো এই ইয়াঙ্কির বন্ধু হওয়ার বড্ড ইচ্ছে ছিল সুলতানের। বার্বিকেন সেই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করলেন।

সুলতানকে আসল অভিপ্রায় বললেন না বার্বিকেন। কিলিমানজারোর দক্ষিণদিকে বিরাট কর্মকাণ্ডের অনুমতিটা কেবল নিয়ে রাখলেন। তিন লক্ষ ডলার হাতে পেয়ে সুলতান কথা দিল তার প্রজারাই কুলির কাজ করে দেবে।

সংক্ষেপে, নির্দিষ্ট অঞ্চলটিতে যা খুশী করবার ঢালাও ফরমান লাভ করলেন বার্বিকেন। ইচ্ছে হলে পাহাড় পর্বত তুলে নিয়ে যেতে পারেন যেখানে খুশী। যদি সম্ভব হত! অথবা নতুনভাবে সাজাতে পারেন, অথবা যাকে খুশী দান করতে পারেন দিগন্ত বিস্তৃত গিরিমালাকে। সোজাকথায়, টাকার বিনিময়ে অঞ্চলটার মালিক হয়ে বসল উত্তর মেরু ব্যবহারিক সমিতি।

সুলতান লোকটা গুণীর কদর করতে জানে, মানীর মান রাখতে জানে। ইম্পে বার্বিকেন যে সামান্য লোক নন, সুলতান বালি-বালি সে খবর রাখে এবং বার্বিকেনদের দেবতার মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তার রাজত্বে এ-হেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা কি কাজ নিয়ে ব্যাপৃত হতে চলেছেন, তা না জেনেও সুলতান সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল। প্রজাদের ওপর কড়া হুকুম ছিল। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য ছেড়ে বাইরে যাওয়া চলবে না। অন্যথা ঘটলেই কঠিন সাজা পেতে হবে।

তা সত্ত্বেও খবরটা বেরিয়ে গেল শেষের দিকে। এতদিন সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যাবৃত ছিল বলেই বৃটেন আমেরিকার ঘুঘু গোয়েন্দারাও হদিশ পাননি বার্বিকেনের। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নিগ্রোদের মধ্যেও আছে বইকি। এইভাবেই খবরটা পৌছোলো জানজিবারে কনসালের কাছে। কিন্তু বড় দেরীতে পৌছোলো। বার্বিকেনের আটমাসের আয়োজন পণ্ড করার মত সময় আর নেই!

কিন্তু প্রশ্ন হল, এত জায়গা থাকতে ওয়ামাসাইকে প্রলয়-নাটকের রঙ্গমঞ্চ করলেন কেন বার্বিকেন?

প্রথমতঃ, ওয়ামাসাইয়ের ভৌগোলিক অবস্থান ম্যাসটনের অংকের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, আফ্রিকার এই বিশেষ অঞ্চলটি সম্বন্ধে কেউ কোনো খবর রাখে না। তৃতীয়তঃ, জায়গাটা এত দূরে এবং এমনভাবে পাহাড়-জঙ্গল-শ্বাপদ সুরক্ষিত যে ভুলেও কোনো অভিযাত্রী ও-পথ মাড়ায় না।

আরো কারণ আছে। কিলিমানজারো পর্বতমালা থেকে পাওয়া যাবে অঢেল উপকরণ। কামান আর বারুদ বানাতে যা কিছু কাঁচা মালের দরকার, ওয়ামাসাইয়ের মাটিতে প্রকৃতি যেন ঢেলে রেখেছেন অকৃপণ হস্তে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে উধাও হওয়ার মাস কয়েক আগেই সুইডিশ অভিযাত্রীর মুখে খবর পেয়েছিলেন বার্বিকেন, কিলিমানজারোর সানুদেশে কয়লা আর লোহার অফুরন্ত ভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে। ভূস্তর ফুটো করে হাজার ফুট পাতালে নেমে খনির মধ্যে থেকে কয়লা বা লোহা তোলার ঝক্কি নেই সেখানে। জমির ওপর থেকে শুধু তুলে নিলেই হল।

প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের আরো সন্ধান পেয়েছিলেন বার্বিকেন। গিরিমালার কাছেই এন্তার সোডিয়াম নাইট্রেট আর আয়রণ পাইরাইট পাওয়া যাবে। মেলিমেলোনাইট নামক শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরী করতে দরকার এই দুটি উপকরন।

সুলতান বালি-বালি ১০০০০ হাজার নিগ্রো দিয়েছিলেন বার্বিকেনকে। এদেরকে নিয়ে দুসপ্তাহের মধ্যে তিনটে কারখানা বানালেন উনি। কামান, কামানের গোলা আর মেলিমেলোনাইট আলাদাভাবে তৈরী হবে তিনটে কারখানায়।

কিন্তু সবচেয়ে জটিল ধাঁধা হল কামানের সাইজ। ২৭ সেন্টিমিটার কামানের দশলক্ষ গুণ বড় কামান তৈরী কোনমতেই সম্ভব নয়। কামানবাজ বার্বিকেনরা কি তা জানেন না? নিশ্চয় জানেন। জেনে শুনেও এই অসম্ভব পরিকল্পনায় হাত দিলেন কেন?

কারণ, ওঁরা যা বানাচ্ছেন, তা আদৌ কামান নয়, মর্টারও নয়—স্রেফ একটা সুড়ঙ্গ! কিলিমানজারো পাথুরে স্তর ফুঁড়ে সুদীর্ঘ একটি পাতাল গহ্বর—খনির মুখ বললেও চলে!

অভিনব এই প্রস্তর-কামান ধাতুর কামানের চাইতে অনেক দিক দিয়ে সুবিধেজনক। ধাতুর কামান ঢালাই করার ঝামেলা তো কম নয়। তাছাড়া অতবড় কামান বানানোর জন্যে অতি মানুষের প্রয়োজন। পাছে ফেটে যায়, তাই বেজায় পুরু করাও দরকার নলচের গা।

কিন্তু পাথরের গা কেটে তৈরী টানা সুড়ঙ্গে এত হাঙ্গামা নেই। বিস্ফোরক যত শক্তিশালীই হোক না কেন, ফেটে চৌচির হওয়ার ভয়ও নেই। সুড়ঙ্গ কাটা হচ্ছে অবশ্য ম্যাসটনের অংকের ভিত্তিতেই। ম্যাসটন আবার অংক কষেছিলেন ২৭ সেন্টিমিটার কামানকে মূল ধরে।

এতবড় সুড়ঙ্গ খনন করার জন্যে বার্বিকেন পাহাড়ি জলপ্রপাত থেকে শক্তি ধার করে আনছিলেন। অর্থাৎ, জলের ধারাকে কাজে লাগিয়ে বাতাসকে উচ্চচাপের মধ্যে রাখছিলেন। তারপর সেই বাতাসের ঠেলা দিয়ে চালাচ্ছিলেন খনক-যন্ত্র। ...ের উড়িয়ে দিচ্ছিলেন মেলিমেলোনাইট দিয়ে। কঠিনতম শিলাও পাউডার হয়ে যাচ্ছিল এক-একটি বিস্ফোরণের পর।

প্রস্তর কামানের ব্যাস ১৭ মিটার। সুড়ঙ্গের গা মসৃণ রাখবার জন্যে ঢালাই লোহার লাইনিং বসানো হচ্ছিল ভেতরে। ছ মিটার পুরু লোহার আস্তরণ টুকরো টুকরো ভাবে ঢালাই হচ্ছিল কামান-কারখানায়। সেখান থেকে এনে সুড়ঙ্গের ভেতরে বসানো হচ্ছিল একে-একে। গোলা নিক্ষেপের সময়ে যাতে কোথাও এতটুকু বাধা না পায়, সেদিকে কড়া নজর রেখেছিলেন বার্বিকেন।

কামানের গোলাটি তৈরী হচ্ছিল আরেকটি কারখানায়। এতবড় গোলা একেবারে ঢালাই করা সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও ১,৮০,০০০ টন ওজনের গোলা তুলে এনে কামানের নলে ঢোকানোর সাধ্য পৃথিবীর কারো নেই। সুতরাং ছোট ছোট টুকরো ঢালাই হচ্ছিল গোলার কারখানায়। এক-একটা টুকরোর ওজন ১০০০ টন। টুকরোগুলি এনে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল কামানের মধ্যে। ভেতরের প্রকোষ্ঠে মেলিমেলোনাইট পরিপাটি ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল আগে থেকেই। এই প্রকোষ্ঠের ওপরের টুকরো টুকরো অংশ জুড়ে হচ্ছিল অতিকায় গোলাটা।

লোহা গালাইয়ের হাঙ্গামাও তো কম নয়। দশটা চুল্লী তৈরী হয়ে ছিল। প্রতিটার উচ্চতা দশ মিটার। প্রতিটি থেকে সারা দিনে লোহা উৎপাদন হত

১৮০ টন। অর্থাৎ একদিনে দশটি চুল্লী থেকে ১৮০০ টন। ১০০ দিনে ১, ৮০, ৮০০ টন!

বারুদ-কারখানায় অতি সংগোপনে বিস্ফোরক উৎপাদক সমাপন করেছিলেন নিকল। কোন কেমিক্যালের সঙ্গে কি মেশানো হয়েছে এবং কিভাবে মেশানো হয়েছে—তা কাউকে বলেন নি। কোথাও এতটুকু বিপর্যয় ঘটেনি!

নিগ্রোরা দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করেছে সুলতান বালি-বালিকে দেখলেই। সুলতান রোজই এসেছে এবং বিপুল উৎসাহে পরিদর্শন করেছে কামান, গোলা এবং বারুদ বানানোর এলাহি কাণ্ড কারখানা। তার বিজন রাজ্যে এরকম-ভাবে কাজের সাড়া পড়ে যাবে, এ-যে ভাবাই যায় না! একবার শুধু কৌতূহল প্রকাশ করেছিল বার্বিকেনের কাছে দানবিক কামান তৈরীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে।

সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিলেন বার্বিকেন—"পৃথিবীর চেহারা পালটে দেব। সুলতানের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসে।"

২৯শে আগাস্ট শেষ হল সব কাজ। কামানের নীচের প্রকোষ্ঠে রইল ২০০০ টন মেলিমেলোনাইট, তার ওপর ১০৫ মিটার লম্বা চোঙার মত গোলা। ফাঁকা জায়গা রইল ৪৯২ মিটার। বিস্ফোরকের গ্যাস সম্প্রসারিত হয়ে পুরো জায়গা দখল করবে এবং প্রচণ্ড পেছন-ধাক্কা মেরে গোলাকে ঠেলে দেবে শূন্যে।

২২শে সেপ্টেম্বর। কামান সুড়ঙ্গর ধারে পাড়ে দাঁড়িয়ে বার্বিকেন এবং নিকল। দুজনের কেউই জানেন না, সেই মুহূর্তে ম্যাসটন ব্যালিস্টিক কটেজ ছেড়ে নিরাপদ অঞ্চলে লুকিয়ে আছেন। বর্বর জনতা হন্যে হয়ে খুঁজছে তাঁকে। খুঁজছে বার্বিকেন এবং নিকলকেও।

আনন্দে মশগুল হয়ে নিকল বললেন—"বার্বিকেন, বলুন দেখি সেকেলে গান-পাউডার দিয়ে কামান দাগতে গেলে কটা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হত?"

"কটা?"

"১৮০টা!"

"বেশ তো! ১৮০ টা সুড়ঙ্গই খুঁড়ে নিতাম!"

"১,৮০,৮০০ টন ওজনের গোলা লাগতে ১৮০টা।"

"লোহা গালিয়ে তাও বানিয়ে নিতাম, নিকল।"

আর মাত্র কয়েকঘণ্টা পরে অতিকায় কামান থেকে অতিকায় গোলা ছুটে যাবে আকাশে। এতবড় কাজটা নির্বিঘ্নে সমাধা হওয়ায় তাই ফুর্তির চোটে আবোল তাবোল বকতে লাগলেন চন্দ্র-প্রত্যাগত দুই অসমসাহসিক মানুষ।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাল্টিমোরের একটি ঘরে বসে অংক কষতে কষতে আচমকা ভীষণ চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যালসিড পিয়েরদো—"উফ! কি বোকা এই ম্যাসটন লোকটা!"

পিয়েরদোর টেবিল বোঝাই শুধু কাগজ আর কাগজ। এন্তার অংক কষে কষে চোখ মুখের চেহারা তাঁর উদভ্রান্ত। তা সত্ত্বেও পরমানন্দে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন পিয়েরদো।

"কি বোকা! কি বোকা! এত বড় ভুলটা করল কি করে ম্যাসটন? পুরো প্ল্যানটাই তো বানচাল হয়ে যাবে! আহারে! বড্ড ইচ্ছে করছে বোকচন্দর ম্যাসটনের সঙ্গে এক কাপ চা খাওয়ার! কি উজবুক! গোড়ার দিকে মনটা ছিল কোথায়? এত আয়োজন মাঠে মারা গেল বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর!"

(১৮) দাগো কামান

২২শে সেপ্টেম্বর!

আতংকে আধমরা হয়ে যে দিনটির প্রতীক্ষায় প্রতিটি সেকেণ্ড মিনিটের হিসেব রেখেছে বিশ্ববাসী, এসেছে সেই ভয়ংকর ২২শে সেপ্টেম্বর! ১০০০ সালের প্রথম দিবসের সঙ্গে যে তারিখটির তুলনা হয়েছে বারংবার, আজ সেই দিন! রাত বারোটায় সময়ে ক্যাপ্টেন নিকল কামান দাগবেন!

কিলিমানজারোতে যখন রাত বারোটা, বাল্টিমোরে তখন সন্ধ্যে ৫টা ২৪ মিনিট। শহরবাসীদের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

ওয়ামাসাইতে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছে সুলতান বালি-বালি। কামান থেকে তিন মাইল দূরে আয়োজন হয়েছে ভূরি ভোজের। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা আমেরিকান বন্ধুদের নিয়ে উদর সেবায় মন দিয়েছে সুলতান। উদরদেব তুষ্ট হলেন যখন ঘড়িতে বাজে রাত এগারোটা।

কামানকে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকারে জড়ো হয়েছিল সুলতানের হাজার হাজার প্রজাবৃন্দ। প্রতিবেশী রাজ্য থেকেও গণ্যমান্যদের নেমন্তন্ন করে এনেছিল সুলতান কামান ছোঁড়ার দৃশ্য দেখানোর জন্যে। তিন মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে তারা দলে দলে। কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মাটি দুলে উঠলে যেন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হতে না হয়, তাই এতখানি দূরে থাকার হুকুম দিয়েছেন বার্বিকেন।

খাওয়া শেষ হল। মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন বার্বিকেন। হাতে তাঁর ক্রনোমিটার। নিকলের হাত ব্যাটারীর বোতামের ওপর। ব্যাটারী থেকে ইলেকট্রিক তার চলে গেছে কামানের একদম তলায় ২০০০ টন

বিস্ফোরকের মধ্যে দিয়ে। বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের মধ্যে এমন বিস্ফোরণ ঘটবে যা পৃথিবীতে কখনো ঘটেনি।

কিন্তু সময় যেন আর কাটে না। অথচ ম্যাসটনের হিসেব অনুযায়ী কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটায় কামান দাগতে হবে। ঠিক ঐ সময়ে খ-বিষুব বৃত্তের ওপরে আসবে সূর্যদেব।

বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট, চার মিনিট, তিন মিনিট, দু মিনিট, এক মিনিট……

লণ্ঠনের আলোয় ক্রনোমিটার কাঁটার দিকে অপলকে চেয়ে রইলেন বার্বিকেন। বোতামের ওপর নিকলের আঙুলও কাঁপছে না তিল মাত্র।

বিশ সেকেণ্ড, দশ সেকেণ্ড, পাঁচ সেকেণ্ড, এক সেকেণ্ড।

ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন বার্বিকেন—"ফায়ার!"

বোতাম টিপে দিলেন নিকল। সঙ্গে সঙ্গে কানের পর্দা যেন ফেটে গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের গগন বিদারী শব্দে। প্রতিধ্বনির তরঙ্গ ছড়িয়ে গেল ওয়ামাসাইয়ের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত। তীক্ষ্ণ, তীব্র, বংশীধ্বনির মত শব্দ করে বাতাস ছিন্নভিন্ন করে মহাশূন্যে ধেয়ে গেল অতিকায় গোলা। তাল তাল ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল বহুদূর পর্যন্ত। গোলা তো নয় যেন ধরিত্রীর বুক ঘেঁষে উড়ে গেল একটা ভয়ংকর উল্কা। পৃথিবীর সবকটা কামান একসঙ্গে গর্জন করলেও আকাশের সমস্ত বজ্র একত্রে নির্ঘোষ সৃষ্টি করলেও তুলনা হয় না প্রস্তর কামানের প্রলয়ংকর সেই নিনাদের সঙ্গে!

(১৯) ম্যাসটনের অভিপ্রায়—মৃত্যুও বুঝি ছিল ভাল

সারা পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল আতংকিত জনসাধারণ। খবরের কাগজের মারফৎ প্রত্যেকেই জানে স্থানীয় সময় অনুসারে ঠিক কখন কামান গরজাবে এবং মহাপ্লাবন ও বায়ুশূন্যতা দেখা দেবে।

নির্বিকার ছিলেন কেবল একজন। অ্যালসিড পিয়েরদো। সর্বশেষ অংকে তিনি যে আনন্দ সংবাদ জেনেছেন, তা কাউকে জানানোর আর সময় ছিল না। তাই তিনি বাল্টিমোরের সেরা হোটেলে ঢুকে এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে বসে গুণ গুণ করে গান গাইছিলেন মহাফূর্তিতে।

বাল্টিমোরের প্রলয় মুহূর্ত এসে গেল। সন্ধ্যে পাঁচটা চব্বিশ!

অথচ কিছুই ঘটল না বাল্টিমোরে।

ঘটল না লণ্ডন, প্যারিস, কন্সটানটিনোপল, বার্লিনেও। সামান্যতম ভূমিকম্পও অনুভূত হল না কোথাও।

মাটি কাঁপার প্রমাণ পাওয়া গেল না কয়লাখনির সিসমোগ্রাফেও। বাল্টিমোরের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় নক্ষত্রগুলোর অবস্থান পালটে গেল কিনা দেখা গেল না।

ম্যাসটন রাতারাতি বুড়ো হয়ে গেলেন যেন। উন্মাদের মত আচরণ করতে লাগলেন এক্সপেরিমেন্ট সফল হওয়ার কোনো প্রমাণ না পেয়ে। তেইশ তারিখে সকাল বেলাও গগন মণ্ডলে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। পরের দিন চিরাচরিতভাবে দিগন্ত রাঙিয়ে সূর্য উঠলেন এবং ডুবলেন।

দামী দামী যন্ত্রপাতি নিয়ে সূর্যের গতিপথ মেপে ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা। পরক্ষণেই এমন হর্ষধ্বনি করে উঠলেন যে হোটেলের লোক ভাবল বুঝি পাগল হয়ে গেলেন সবাই।

কিন্তু কামানটা আদৌ দাগা হয়েছে তো? উল্লাস স্তিমিত হওয়ার পর বলে উঠলেন জীন টুইস্টিক্স।

আশ্চর্য! ঠিক সেই সময়ে আরও দুজন একই সন্দেহ মনে পোষণ করছিলেন। এঁরা ম্যাসটন এবং মিসেস স্করবিট।

অচিরেই অবসান ঘটল সংশয়ের। জানজিবারের কনসালের টেলিগ্রাম এসে পৌঁছোলো আমেরিকায়:

জানজিবার, সেপ্টেম্বর ২৩, সকাল ৭-২৫ মিনিট

"গতকাল রাত বারোটায় কিলিমানজারোর দক্ষিণে সুড়ঙ্গের মধ্যে কামান দাগা হয়েছে। দারুণ বিস্ফোরণ শোনা গেছে। বাতাস চিরে সশব্দে গোলা উড়ে গেছে। সারা তল্লাটটা মাটিতে মিশে গেছে। মোজাম্বিক প্রণালী পর্যন্ত সমুদ্র উথালি পাথালি ঢেউ তুলেছে। অনেকগুলো জাহাজ উপকূলে আছড়ে পড়েছে। শহর-গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কিস্সু হয়নি —সব ঠিক আছে।"

বাতাসের মাতন, জলের নাচন আর জমির কাঁপন—ত্রয়ীর মত্ততায় দফারফা হয়েছে কেবল ওয়ামাসাইয়ের। কৃত্রিম জলস্তম্ভ ভাসিয়ে দিয়েছে ওয়ামাসাইয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল; কৃত্রিম টাইফুনে তলিয়ে গিয়েছে বহু জলযান। 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' গোলা নিক্ষেপের সময়েও এমনি বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল। একশ মাইল পর্যন্ত ভূমিকম্প এবং জলধি-নৃত্য দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে আরো ভয়ংকর বিপর্যয় আশা করা গিয়েছিল।

জানজিবারের টেলিগ্রাম থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল:

(১) কামান খাড়া করা হয়েছে কিলিমানজারো শৈল শ্রেণীর সানুদেশে।

(২) নির্দিষ্ট সময়ে কামান দাগা হয়েছে।

ফলে, সারা বিশ্ব হৃষ্টচিত্তে এমন অট্টহেসে উঠল যে ভাবায় তা বর্ণনা করা যায় না।

বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর উদ্ভট এক্সপেরিমেণ্ট উদ্ভটই থেকে গিয়েছে—ব্যর্থ হয়েছে উত্তর মেরু ব্যবহারিক সম্বিত্তির উদ্দেশ্য। স্রষ্টার সৃষ্টি যা ছিল, তাই আছে। খোদার ওপর খোদকারি সম্ভব হয় নি।

তবে কি হিসেবে ভুল করেছিলেন সেক্রেটারী ম্যাসটন?

এতদিন ধরে তাহলে এত কাগজ, কালি, সময়, এনার্জি, মস্তিষ্কশক্তি খরচ করে কি অংক কষেছেন তিনি? ২৭ মিটার চওড়া ৬০০ মিটার লম্বা চোঙ থেকে ২০০০ টন মেলিমেলোনাইট ফাটিয়ে ২৮০০ কিলোমিটার প্রাথমিক গতিবেগে ১,৮০,০০০ টন ওজনের গোলা নিক্ষেপ কি তাহলে অসম্ভব?

কিন্তু কেন অসম্ভব?

বিষম উত্তেজিত হলেন জেটি ম্যাসটন। নিভৃত আলয়ে একান্ত সংগোপনে তাঁকে এই কদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন মিসেস স্করবিট। কিন্তু আর পারলেন না।

ম্যাসটন খেপে গেছেন। ঘরে বন্দী তিনি থাকবেন না। বৃথাই তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করলেন মিসেস স্করবিট। প্রাণহানির আশংকা আর নেই বটে, কিন্তু টিটকিরি বিদ্রূপ-তাচ্ছিল্য অপমানের জ্বালা তো আছে! সেই সঙ্গে আছে গান ক্লাবের সদস্যদের আক্রমণ। একা ম্যাসটনের জন্যেই তো তাঁরা আজ হাস্যাস্পদ হচ্ছেন দুনিয়ার সামনে। একা ম্যাসটনের কাঁধেই সব দায়িত্ব চাপিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু একি করলেন ম্যাসটন?

মিসেস স্করবিটের অনুনয় বিনয় কান্নাকাটিতে ভ্রূক্ষেপ না করে তেড়েমেড়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে পথচারীরা তাঁকে চিনতে পারল। শুরু হল ভেঁপু বাজানো, বক দেখানো, ভেংচিকাটা এবং ব্যঙ্গ করা। ফুটপাতের ভিখারীরাও বাদ দিল না হতভাগ্য ম্যাসটনকে। বললে—"ত্যাখরে ত্যাখ, অক্ষরেখা পালটানোর স্বপ্নে মশগুল সেই লোকটা যাচ্ছে! উত্তর মেরুর কয়লাখনি আর কদ্দুর মশায়?"

ম্যাসটন পরিকল্পিত সুবৃহৎ কামান গর্জন করেছে ঠিকই, তবে কাজ হয়েছে পাখী মারা বন্দুকের সমান!

টিটকিরির জ্বালা সইতে না পেরে অগত্যা মুখ কালো করে মিসেস স্করবিটের সহানুভূতি-স্নিগ্ধ গৃহকোণে ফিরে এলেন ভগ্ন মনোরথ জে টি ম্যাসটন।

কিন্তু প্রাণে বেঁচেছেন তো বার্বিকেন এবং নিকল?

হ্যাঁ। বিস্ফোরণের প্রথম ধাক্কায় অবশ্য সুলতান সমেত প্রত্যেকেই ছিটকে

পড়েছিলেন। তারপর ধূলো ঝেড়ে উঠে প্রথমেই শুধোলো সুলতান—"যা চেয়েছিলেন, তা হয়েছে তো ?"

"তাতে কোনো সন্দেহ আছে ?" বার্বিকেন বললেন। "দুচার দিনেই টের পাবেন।"

বার্বিকেন বুঝেছিলেন, কেলেংকারী হয়েছে। পণ্ডশ্রম সার হয়েছে। কিন্তু সুলতানের কাছে তা ভাঙলেন না। দুদিন পর প্রচুর টাকা গুঁজে দিলেন সুলতানের হাতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। সে টাকার কাণাকড়িও নিগ্রো প্রজাবৃন্দকে দিতে হল না বলে এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হওয়ার জন্যে অখুশী হল না সুলতান।

ছদ্মনামে সদলবলে দেশে ফিরলেন বার্বিকেন। নিউ পার্কের সুরম্য অট্টালিকায় প্রবেশ করলেন ১৫ই অক্টোবর দুপুর বারোটা বেজে তিন মিনিটে।

সামনে এসে দাঁড়ালো মিসেস স্করবিট এবং জে টি ম্যাসটন।

(২০) অসম্ভব অথচ সত্য কাহিনীর আশ্চর্য পরিসমাপ্তি

"বার্বিকেন !!! নিকল !!!"

"ম্যাসটন।"

যুগপৎ বললেন বার্বিকেন এবং নিকল। নিঃসীম ব্যঙ্গ ভৎর্সনা যেন ঝরে পড়ল একটিমাত্র নামের মধ্যে।

লোহার আঁকশি দিয়ে ললাট চেপে ধরলেন জে টি ম্যাসটন।

বললেন ধরা গলায়—"পাতাল-সুড়ঙ্গর ব্যাস কত ছিল ? সাতাশ মিটার ?"

'আজ্ঞে হ্যাঁ !"

"গোলার ওজন ? ১,৮০,০০০ টন ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ !"

"২০০০ পাউণ্ড মেলিমেলোনাইট ফাটানো হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্রতিটা 'হ্যাঁ' মুগুরের মত আঘাত হানল ম্যাসটনের মস্তিষ্কে।

"তাহলে একটা সিদ্ধান্তেই আসতে হয়।" বললেন ম্যাসটন।

"কথা ?" প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের প্রশ্ন।

"গোলার প্রাথমিক গতিবেগ ২৮০০ কিলোমিটার ওঠেনি। বারুদ তা দিতে পারেনি। পেছন ধাক্কার জোর কমে গেছে সেই জন্যেই।"

"তাই নাকি ?" বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন নিকল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার মেলিমেলোনাইট দিয়ে শুধু খড়ের পিণ্ডকে ছোঁয়া যায়।"

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। অসহ্য! এ-অপমান সহ্য করা যায় না।

"ম্যাসটন!" ডাকাতে হুংকার ছাড়লেন তিনি।

"নিকল!"

"আপনাকে মেলিমেলোনাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া উচিত।"

"আরে না, না, সাবেকী গান কটনের বারুদে বেশী কাজ দেবে—ডোবাবে না!"

মিসেস স্করবিট মাঝখানে এসে উপস্থিত শান্ত করলেন দুই ক্রুদ্ধ কামানবাজকে।

প্রশান্ত স্বরে বললেন বার্বিকেন—"খামোকা দোষারোপ করে লাভ কি? ম্যাসটনের হিসেব নির্ভুল, নিকলের বারুদও শক্তিশালী। কিন্তু বিজ্ঞান কতটুকুই বা আর জানে। কেন সব ভণ্ডুল হল, তা কেউ জানে না। বলতেও পারবে না। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতার অভাব।"

"তাহলে গোড়া থেকে শুরু করা যাক।" ম্যাসটন বললেন।

"টাকা? পুরো টাকাটাই তো জলে গেল!" নিকল বললেন।

"পাবলিক আর এক্সপেরিমেন্ট করতে দেবে না।" মিসেস স্করবিট বললেন।

পর্বতের মূষিক প্রসবের মতই বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানীর বৃহৎ কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হল। একেই বলে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া! কোম্পানীর শেয়ারের কানাকড়িও দাম রইল না বাজারে। লাটে উঠল কোম্পানী।

পৃথিবী জোড়া বিদ্রূপ-ঝটিকা একযোগে ধেয়ে এল বার্বিকেন এবং তাঁর সহযোগীদের লক্ষ্য করে। কাগজে কাগজে কৌতুকচিত্র, ব্যঙ্গ কাহিনী এবং টিটকিরি সংবাদ ছাপার হিড়িক আরম্ভ হল। একজন বুদ্ধিমান ফরাসি এই ফাঁকে একটা নৃত্যনাট্য রচনা করে ফ্রান্স আর আমেরিকাকে দীর্ঘদিন ধরে হাসতে সাহায্য করল। গানের পদ লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে।

কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তর এল দিন কয়েক পরে। এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হল কেন? সতেরোই অক্টোবরের 'টাইমস' পত্রিকায় ছাপা হল ছোট্ট একটা অনুচ্ছেদ:

"পৃথিবীর নতুন অক্ষরেখা সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। যে টি ম্যাসটনের

অংকে গোড়ায় গলদ থাকার জন্তেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পৃথিবীর পরিধির মাপকে মূল ধরে অংক কষতে আরম্ভ করেছিলেন মিস্টার ম্যাসটান। উনি লিখেছিলেন ৪০,০০০ মিটার। পৃথিবীর পরিধি কিন্তু ৪০,০০০ মিটার নয়, ৪০,০০০,০০০ মিটার। ভুলটা প্রথম ধাপেই হয়েছে বলে পরের সবকটা ধাপই ভুল হয়ে গেছে।

"কিন্তু এ-ভুল হল কেন? এতবড় অংক বিশারদের হাত দিয়ে এতবড় ভুল বেরোয় কি করে?

"প্রথমে তিনটে শূন্ত ভুল করে উনি বসান নি। ফলে শেষে বারোটি শূন্তর হেরফের হয়েছে।

"সাতাশ সেন্টিমিটার কামানের দশ লক্ষগুণ বড় কামান দিয়ে অক্ষরেখা সিধে করা যাবে না। এ জন্তে চাই একের পিঠে বারোটি শূন্ত বসালে যে সংখ্যা দাঁড়ায়, ততগুলি কামান এবং ততগুলি গোলা। প্রতিটি গোলার ওজন হওয়া চাই ৮০,০০০ টন। তবেই যদি উত্তর মেরুকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হয়। অবশ্য ক্যাপ্টেন নিকলের আবিষ্কৃত মেলিমেলোনাইটও যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া চাই।

"এই ভুলের জন্তেই কিলিমানজারোর কামান উত্তর মেরুকে সরিয়েছে এক মিলিমিটারের তিন হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ পালটেছে অতি সামান্ত; এক মিলিমিটারের তিন হাজার ভাগের এক ভাগকেও ন'হাজার ভাগ করলে যা হয়—তাই।

"কামানের গোলা গ্রহাণু হয়ে গিয়েছে।

"অ্যালসি পিয়েরদে৷"

গলদটা তাহলে গোড়াতেই ঘটেছে! সামান্ত অন্তমনস্কতার দরুন এতবড় মাশুল দিতে হল মিস্টার ম্যাসটনকে? কিন্তু কেন? এ ভুল হল কেন?

ম্যাসটনের সহযোগীরা নিরতিসীম ক্রুদ্ধ হলেন তাঁর ওপর। পৃথিবীবাসীরা কিন্তু বেঁচে গেল তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্তে।

সুতরাং পৃথিবীর প্রতিটি দেশ থেকে রাশি রাশি টেলিগ্রাম আসতে লাগল ম্যাসটনের নামে। প্রশংসা, অভিনন্দন, তারিফের অন্ত রইল না। তিনটি শূন্ত লিখতে ভুল করায় পৃথিবীর মানুষ যেন মাথায় তুলে নাচতে লাগল ম্যাসটনকে।

প্রতিটি জয়ধ্বনি, প্রতিটি অভিনন্দন শেল হানতে লাগল ম্যাসটনের বুকে। মরণ মুদগর বুঝি এর চাইতে শ্রেয় ছিল। অধোবদনে ম্রিয়মান মুখে গৃহকোণে। বসে রইলেন মৃতপ্রায় ম্যাসটন।

বেচারী ম্যাসটন! প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল, টম হান্টার প্রমুখ পরম সুহৃদরাও তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নি। কিন্তু একজন কিছুতেই রাগ করতে পারেন নি তাঁর ওপর। ইনি মহীয়সী মহিলা মিসেস ইভানজেলিনা স্করবিট

ম্যাসটন কিন্তু ফের অংক শুরু করলেন। গোড়ায় তিনটে শূন্যের জন্যে শেষ বারোটি শূন্যের তফাৎ হয়েছে, তা মানতে পারলেন না কিছুতেই।

আচম্বিতে ম্যাসটনের মনে পড়ে গেল একটা ঘটনা! মনে পড়ে গেল কিভাবে তিনটে শূন্য স্রেফ মুছে গিয়েছিল পৃথিবীর পরিধির মাপ থেকে!

'ব্যালিস্টিক কটেজে' দ্বাররুদ্ধ করে ব্ল্যাকবোর্ডে পৃথিবীর পরিধীর মাপ লিখেছিলেন ৪০,০০০,০০০। আচম্বিতে বেজে উঠেছিল টেলিফোনের ইলেকট্রিক ঘণ্টা।

ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলেছিলেন ম্যাসটন। মিসেস স্করবিটের সঙ্গে দু'চার কথা বলার পরেই ঝড়ের মেঘ থেকে বজ্রপাত ঘটেছে। টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বিপুল শক্তিভরে তাঁকে এবং ব্ল্যাকবোর্ডকে নিক্ষেপ করেছে ঘরের অন্যপ্রান্তে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ম্যাসটন। ব্ল্যাকবোর্ড খাড়া করার পর দেখলেন, সদ্যলেখা সংখ্যাটা অর্ধেক মুছে গেছে ঠিকরে যাওয়ার দরুণ। চকখড়ি নিয়ে সংখ্যাটা ফের লিখতে শুরু করলেন উনি। ৪০,০০০ পর্যন্ত লিখতেই দ্বিতীয়বার বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। মিসেস স্করবিটকে আশ্বস্ত করে এসে অংক শুরু করলেন বটে, কিন্তু পৃথিবীর পরিধির পুরোপুরি মাপ লিখতে ভুলে গেলেন। তিনটে শূন্য সেই যে বাদ রয়ে গেল, আর খেয়াল হল না।

দোষটা মিসেস স্করবিটের। উনি টেলিফোন না করলে মেঝেতে ছিটকে পড়তেন না ম্যাসটন। ঝড়-বিদ্যুৎ ওঁর নজরেই আসত না। ধ্যানমগ্ন ঋষির মতই অংকের মধ্যে ডুবে থাকতেন এবং নির্ভুল ফললাভ করেতন।

ঘটনাটা মিসেস স্করবিটকে না বলেও পারলেন না ম্যাসটন। শুনে সাংঘাতিক আঘাত পেলেন ভদ্রমহিলা। তাঁরা জন্যেই এত বড় ভুল করে বসলেন মিস্টার ম্যাসটন? তার জন্যেই এত ধিক্কার, এত লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে ভদ্রলোককে? বিষম বিপর্যয়ের মূল তিনি-ই এবং তাঁরই জন্যে বাকী জীবনটা অপমানে ডুবে অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ জে টি ম্যাসটনকে?

কথা কটি মিসেস স্করবিটকে শুনিয়ে ম্যাসটন ব্যালিস্টিক কটেজে ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন আপন মনে—"এ পৃথিবীতে আমাকে-দিয়ে আর কোন কাজ হবে না।"

"এমন কি বিয়েটাও আর হবে না," পেছন থেকে ভাঙা গলায় কে যেন বলে উঠল।

সচমকে ফিরে দেখলেন ম্যাসটন। মিসেস স্করবিট। বুক ভেঙে গেছে তাঁর ম্যাসটনের ভাগ্য-বিপর্যয়ে। নিউ পার্কের প্রাসাদ থেকে সটান চলে এসেছেন ম্যাসটনের পেছন পেছন!

"ডিয়ার ম্যাসটন," অনুনয় করলেন মিসেস স্করবিট।

ম্যাসটন বললে—"বিয়ে হতে পারে, তবে একটি সর্তে। ইহ-জীবনে আর অংক কষব না আমি।"

"বন্ধু, অংক দেখলেই কিন্তু মাথা ধরে যায় আমার" জবাব দিলেন মিসেস স্করবিট।

যথা সময়ে সাঙ্গ হল শুভ-পরিণয়। মিসেস স্করবিট হলেন মিসেস ম্যাসটন।

অ্যালসিড পিয়ের্দোর হল পোয়া বারো। নামডাকের অন্ত রইল না তার। তার বিশেষ প্রবন্ধটি দেশদেশান্তরে ছাপা হল সব রকম ভাষায়। সারা পৃথিবী জুড়ে জয় জয়কার পড়ে গেল অ্যালসিড পিয়েদোর।

যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে না পেরে তিনি গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, তার পিতৃদেব পিয়ের্দোর প্রবন্ধ পড়ে মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে না পারলেও একটা জিনিষ বুঝলেন হাড়ে হাড়ে। জগৎজোড়া খ্যাতি যাঁর, তাঁকে জামাই করা ভাগ্যের ব্যাপার।

সুতরাং একটি শুভলগ্নে অ্যালসিড পিয়ের্দোকে তিনি খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন। বলাবাহুল্য খাওয়ার টেবিলে হাজির রইল তার মেয়েও।

(২১) উপসংহার

বিশ্ববাসীরা এবার নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যে এক্সপেরিমেণ্ট এমন শোচনীয়ভাবে পণ্ড হয়েছে, দ্বিতীয়বার তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকল। যতই নির্ভুল হোক না কেন, জে টি ম্যাসটনও আর অংক কষবেন না। সার সত্য রয়েছে অ্যালসিড পিয়ের্দোর নিবন্ধে। অক্ষরেখাকে ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট নড়াতে দরকার কিলিমানজারোর কামানের সমান ১,০০০,০০০,০০০,০০০টি কামান! কিন্তু ভূপৃষ্ঠে এত কামান খোড়ার জায়গা নেই। সুতরাং পৃথিবীগ্রহের বাসিন্দারা নাকে তেল দিয়ে নির্ভয়ে ঘুমোতে পারেন। পৃথিবীকে স্রষ্টা যে ভাবে বানিয়েছেন, ঠিক সেই ভাবে তা থাকবে। মহাবিশ্বের সর্বত্র তাঁর ব্যবস্থাই বিরাজ করবে। মানুষের সাধ্য নেই খোদার ওপর খোদকারি করার।

[তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত]